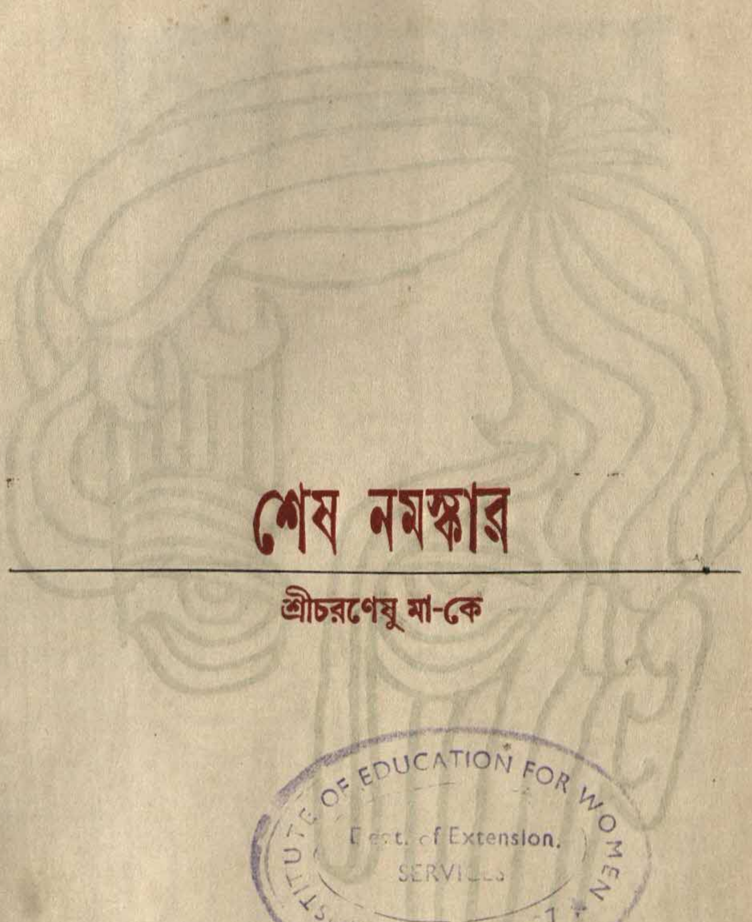
সন্তোষকুমার ঘোষ

শেষ নমস্কার

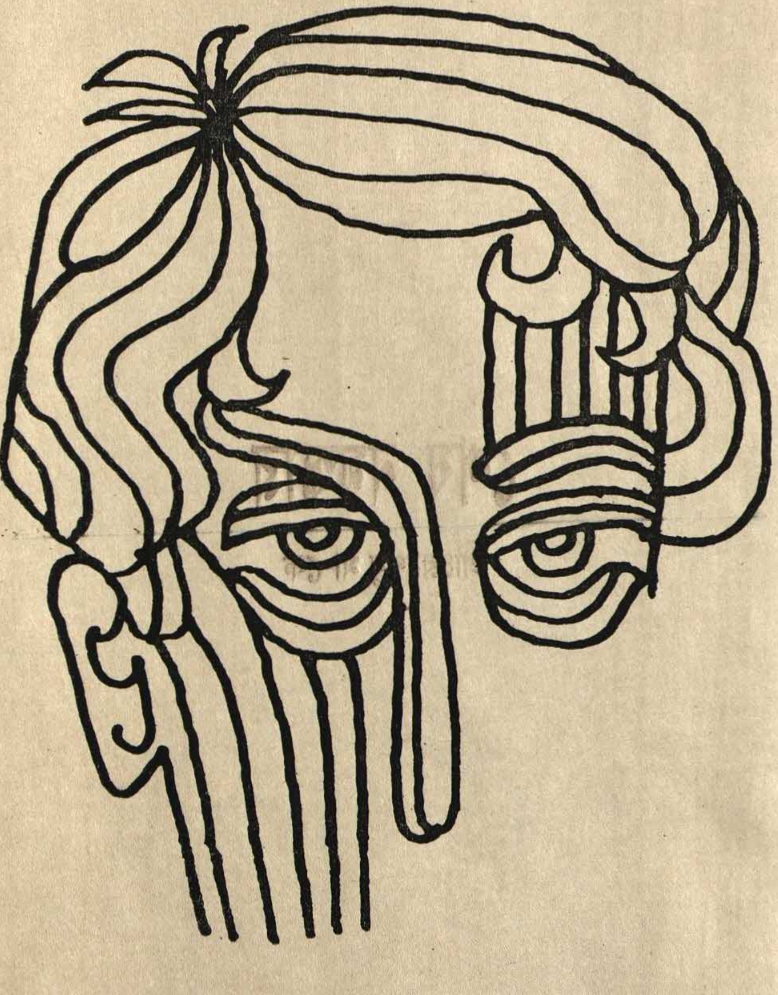
১৯৭২এর
আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত
উপন্যাস



শেষ নমস্কার

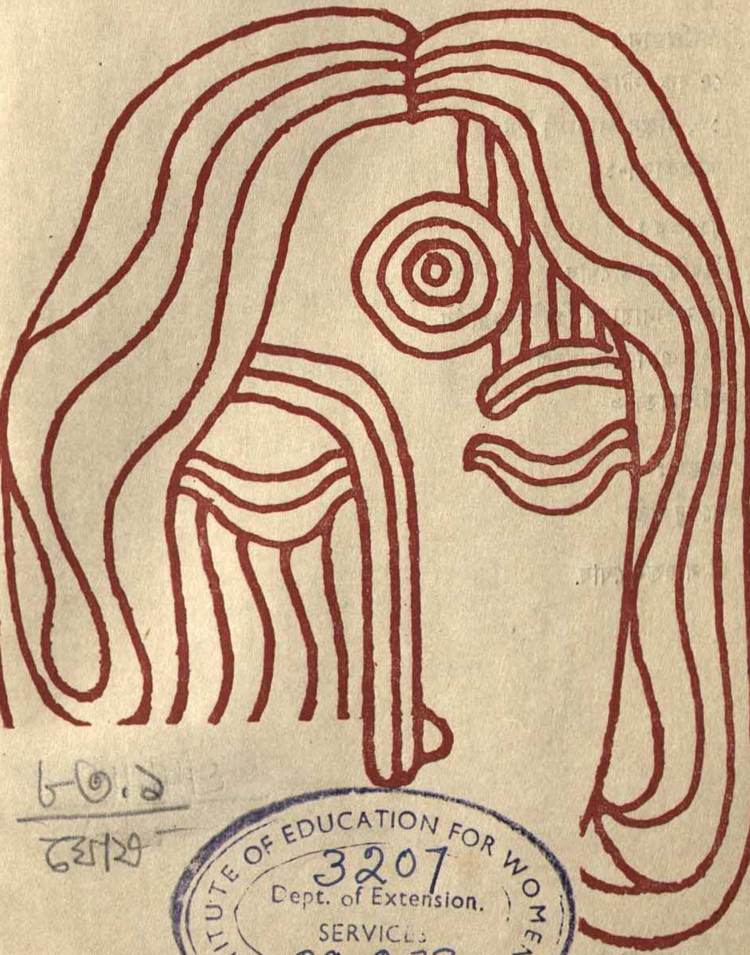
শ্রীচরণেষু মা-কে

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৯



সন্তোষকুমার ঘোষ

শেষ নমস্কার



প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৭৮
১৫ই এপ্রিল ১৯৭১

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯ এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম—কুড়ি টাকা

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে॥

স-প্রণাম উৎসর্গ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনী ?—কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, বইটি যখন ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে। জীবনী মানে যদি হয় জীবনের কতকগুলি প্রামাণিক ঘটনা, তা হলে এক কথায় উত্তর—"না।" কিন্তু কিছু বেদনা, কিছু অনুভূতি, কিছু সন্ধান, কিছু প্রতীতি, তা-ও তো জীবন-ই !

ধরা যাক, একটি সকাল। তার কতটুকু আলো, কতটুকু ভিজে-ভিজে ছায়া ? আলাদা করে বলা যায় না। মিলেমিশে থাকে। এই লেখাটাতেও হয়ত আছে।

আসলে, আমার ধারণা, সব লেখকই সারা জীবন একটা লেখাই লিখতে চায়, লিখতে থাকে, ক্রমাগত চেষ্টা করে। আমিও করেছি। পারিনি। "নানা রঙের দিন," "মুখের রেখা," "জল দাও," "স্বয়ং নায়ক"।—মৃত বা শুধুই স্মৃত গ্রন্থ, একটির পর একটি। অবশেষে আমার সেই না-পারার কাছে এই শেষ নমস্কার রেখে ছুটি নিতে চাইছি।

কিন্তু শেষ হল কি ? জানি না। হয়ত হয়নি, ফিরে আসতে হবে। ফিরিয়ে যে আনবে সে হয়ত লিখিয়েও নেবে, কিন্তু সেই নিবেদনের নাম কী ?

"শ্রীচরণেষু মা-কে"-র পরে শুধু "তোমাকে ?"

—লেখক

SESH NAMASKAR

A NOVEL BY

SANTOSH KUMAR GHOSH

Rs-20·00

॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

উপন্যাস :

কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, মোমের পুতুল, মুখের রেখা, রেণু তোমার মন, জল দাও, ত্রিনয়ন, স্বয়ং নায়ক।

গল্প সংকলন :

সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প,
চিনে মাটি, কড়ির ঝাঁপি, শুকসারী, পারাবত, ছায়াহরিণ, বহে নদী প্রভৃতি।

রম্য রচনা ও প্রবন্ধ :

বাইরে দূরে, সোজাসুজি।

নাটক :

অজাতক।

এক

তার প্রথম চিঠি "শ্রীচরণেষু, মা।" চিঠি লিখে লিখে তামাম-শোধের যে-খেলায় সে নেমেছে, তার প্রথম চিঠি মাকে লেখাই তো ভাল। যিনি মূল, যিনি ধাত্রী, তাকে এনেছিলেন, ধরেছিলেন। প্রাণের ঋণ, ধারণের ঋণ। রক্তের, স্তন্যের ; স্নেহের, নীড়ের। ঘিরে থাকার, ঢেকে রাখার, দৃষ্টি দিয়ে পিছনে ছোটার—মমতায়, উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে। অহর্নিশ "ভালো হোক"-ভাবনায়।

[এই ব্যক্তিটি কে, একে কি আমি চিনি, দেখেছি কখনও ? কী করে চিঠিগুলো আমার হেপাজতে এল, স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। যেন এক জাদুকর, হঠাৎ কোথা থেকে একদিন সামনে এসে দাঁড়াল, টেবিলের উপরে ছুঁড়ে দিল কাগজের বানডিল, সম্মোহক দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে বলল, 'সাজিয়ে নাও'। রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীতে যেমন ঘটে। তার চোখে শীত, তার স্বরে শীত, মানে শীতে যেন শিঁটিয়ে-কঠিন, আর আদিষ্ট আমি কাগজগুলো হাত বাড়িয়ে ধরে অনিশ্চিত, কম্পমান। "সাজিয়ে দাও", হুকুম শুনেই আমি 'অবশ্য অবশ্য' বলে একটু একটু হাসতে গেলাম, সেই হাসি কাগজ ছেঁড়ার ফড়ফড়ের মতই শোনাল, সাজাব যে কিন্তু কীভাবে তার কূল পাচ্ছিলাম না, খেলা ভেঙে গেলে যেভাবে পড়ে-থাকা তাস কুড়িয়ে সাজিয়ে তুলি, সেইভাবে ?

কতক্ষণ সে ছিল মনে নেই, কখন দেখি মগ্ন হয়ে গিয়েছি সেই পত্রস্তূপে, আর পড়তে-পড়তেই টের পেয়েছি আমাকে কী করতে হবে। আগাগোড়া ঢেলে সাজালাম আমার নিজের প্যাটার্নে, তাতে উন্নতি কিছু হল কিনা জানিনে। জানি, যেহেতু সে উপস্থিত আছে, কোথাও আছে, হঠাৎ না-জানি কখন আবার আবির্ভূত হয়, অতএব নিরূপায়, আমাকে গুছিয়ে তুলতেই হবে।

“কেননা আমি পৌত্তলিক”, তার লেখা প্রথম বাক্যটি এই ছিল, এভাবে আবার অন্বয় হয় নাকি! তাই ঘুরিয়ে, যেভাবে লেখা হয়ে থাকে, মানে লেখকেরা লিখে থাকেন, সেই অভ্যস্ত ছাঁচে তার গল্‌গল তারল্য ঢেলে দিলাম। একটু চিটচিটে হোক, নইলে পড়া যাবে না।

এইবার শুরু।]

তার প্রথম চিঠি “শ্রীচরণেষু মা।”

যে-পূজায় সে বসেছে, বয়সের বেশ কয়েকটা বাঁক পার হয়ে এসে, তার উদ্দিষ্ট দেবতা অনেক, কেননা সে পৌত্তলিক, কেননা সে বহুর সঙ্গে বাসনায়, ঘৃণায়, আশায়, হতাশায়, আচারে-অভিচারে—এবং কৃতজ্ঞতাতেও—লিপ্ত। যত পুতুল আর প্রতিমা আজ সুদূর-উদ্ভাসে ঝাপসা চোখে ধরা দিচ্ছে তার প্রথমটি মা হবেন না তো কে!

কিন্তু কেন। বোঝাপড়ায় সব চুকিয়ে দেবার দুর্মর সাধ তাকে কেবলই মর্মরিত করে কেন! কোন্ ঋণ শোধ হয় কবে, আর দেউলিয়া দশায় দাঁড়িয়ে কি কেউ ধার মিটিয়ে দিতে পারে?

তবে হয়ত কথাটা ঋণ নয়। পাপবোধ। যাদের প্রতি পাপ করেছি, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। যাদের সঙ্গে করেছি, তাদের ভাগ দিতে ডাকব, আরও কে-যেন একদিন ডেকেছিল না? কী নাম, কী নাম যেন তার—রত্নাকর। সে সাড়া পায়নি, আমি পাব। আর যারা অন্যায় করেছে আমার প্রতি, তাদের, তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেব। দেব, যেহেতু আমি রক্তমাংসের মানুষ, জিতেন্দ্রিয় নই, আমার সত্তায় ত্রিগুণাতীত কোনও দৈবী আবেশ নেই, অতএব আমি বলে যাব। একে আমার সওয়াল বলতে চান বলুন, জবাব বলতে চান বলুন, কাউকে অভিযোগ, কাউকে নালিশ—এই আমার শেষ টেস্‌টামেন্ট, আখেরী বোঝাপড়া। আসলে

বোঝাপড়া এই পৃথিবীর সঙ্গে, পরিচিত মানব-মানবীর—একটু আগে যাদের দেব-দেবী বলেছি—সমষ্টি যে-পৃথিবী। যার জরায়ুতে এতকাল বাস করেছি, শ্বাস নিয়েছি, কখনও ফুঁসেছি দমবন্ধ করে, যে জুগিয়েছে কত সুখ আর যতেক অসুখ, তার সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত না করে চলে গেলে 'পুনর্জন্ম' নামক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে না! অন্তত অতৃপ্ত আত্মা প্রেত হয়ে ফিরে আসবে। ইহজন্মের কোনও জের তাই রেখে যেতে চাই না।

হঠাৎ একটা কঠিন অসুখে পড়ে শীতের শেষ-বেলায় সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছিল। অদ্ভুত এই খেয়ালটা এসেছিল তার মনে, চিঠি লিখে-লিখে যাবার। সবাইকে ডাকার, মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে যেমন ডাকে। ডাক্তারবাবুর উপস্থিতিকে উড়িয়ে দিয়ে, সকলকে কাছে ডাকা, তখন মুখে কথাও ফোটে না, মাথায় কপালে হাত বুলানো, চোখে জল, মুখে ফোঁটা কয়েক গঙ্গাজল।

সেদিন কী-যেন-কেন তার কেমন ধারণা হল, সে বেশি দিন আর বাঁচবে না। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধারণাটা মনের মধ্যে আস্তে আস্তে বসে গেল, টিউবওয়েলের নল যেমন স্তরের পর স্তর ফুঁড়ে মাটিতে বসে। আকাশের আকার ডিমের ঘোলাটে সাদা খোলার মতন, শীত কিনা তাই নীলরঙ। অনন্ত-টনন্ত এ সব মাথায় তখন আসছিল না, হতাশ ছাই-ছাই ডানার কয়েকটা পাখি তখনই ক্লান্ত ফিরে আসছে। বিড়বিড় করে সে নিজেকে বলল, শীতের বেলা ছাখ, কেমন হঠাৎ বুঁজে যায়, সোনাদানায় ভরা সিন্দুকটায় ঝপাং করে ডালা পড়ার মত। বেলাটা এই জ্বলছিল, এই নিবে একেবারে ধোয়া-মোছা চিতা হয়ে গেল।

পেটের যন্ত্রণাটা তখনই নড়ে চড়ে উঠল, যেন গর্ভস্থ ভ্রূণ যার বিনাশ শতমারী বৈদ্যেরও অসাধ্য, হাতড়ে হাতড়ে একটা বড়ি খেল

সে, কুঁচকে যাচ্ছে ঠোঁট, চোখের কোণ, দুই ভুরুর বিভাজিকা কপাল, তলপেট চেপে ধরেও ত্রাণ নেই।

বিস্তারিত আকাশের আশ্বাসে মরা মাছের মত চোখ দুটি ন্যস্ত করে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "এইবার আমি যাব। স্বদেশে ফিরব।" ভিতরে ভিতরে এই সে প্রথম যথার্থই প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, স্বদেশ! স্বদেশ! একটা আকস্মিক আলোড়নের মত। যেখানে সে আছে, এই শয্যা, এই ঘর, তার নয়, সাময়িক সরাই শুধু, এই যন্ত্রণার আগে এবং পরে আছে যা তার উৎস, বা যা তার পরিণাম। যেখানে সে সহজ, স্বচ্ছন্দ, শান্ত। তার স্বদেশ।

কষ্ট হবে না? হবে। দুঃখ পাব। সে তো—সে বিচার করে দেখল—কতবার যে-বিদেশে যাই, ফেরার সময় ঘরের হাতছানি সত্ত্বেও, একটু টন্‌টন্ করে। এত আলো, এত ঐশ্বর্য, ঝকঝকে রাস্তা, বিলাস, আরাম, মসৃণতা, এ সব ছেড়ে সেই শহরে আবার, যেখানে কত ধুলো, সব কত চাপা-চাপা, অভাব সর্বত্র।

তবু সেই স্বদেশের শহর তাকে টানে। আজ আরও দূরের, সামনের, হয়ত পিছনেরও, আর-এক স্বদেশ তাকে যেমন টানছে। সেখানে গেলে এ-দেশ থাকবে না, পায়ের তলার এই মরমী মাটি, শয্যার উষ্ণতা, এই স্বাদ, প্রাণ, মোহ, পরিজন, কত সুখ, কত ক্ষত। এ সব ছেড়ে যেতে একটু লাগবে বইকি, বিদেশ ছেড়ে আসতেও যেমন লাগে। তবু ফিরতে হবে, ফিরতে চাই, যদিও সেই জীবন সেই অস্তিত্ব কেমন, তা জানি না, অন্তত মনে নেই। সেখানে সবই হয়ত বায়বীয়, অথবা বায়ুর চেয়েও নির্ভার, নীরূপ যা ভাসমান। মোহানার নদী, নদীর প্রার্থিত নিয়তি সমুদ্রও, তো অলক্ষ্য সূক্ষ্মাকারে আকাশে ফেরে।

স্বদেশে ফেরার আগে সব দুঃখ-সুখ, আঘাত-অভিমানের খোপে খোপে সে একটি করে চিঠি লিখে রেখে যাবে ভাবল। তার সব অতৃপ্তিতে এইভাবে পূর্ণাহুতি। বিষয়ী মানুষের শেষ সই যেমন তার উইল।

মনে মনে ডাকল সে অনেককে একে একে, যারা জীবিত ; যাদের জীবদ্দশায় সব খুলে বলে ফেলা অসম্ভব বলে সে এতকাল জানত। ডাকল তাদেরও, যারা মৃত। হ্যাঁ, মৃতদের কাছেও নতজানু হয়ে স্বীকারোক্তি পেশ করবে, তবে সে মুক্ত। তাই কাগজ-কলম টেনে, ব্যথায় অস্থির সে মাঝে মাঝে থেমে, শিরোনামায় লিখল, "শ্রীচরণেষু মা!"

শ্রীচরণেষু মা, সম্বোধনের এই পাঠটা লিখেই তোমার যে ছবিটা ফুটে উঠছে, সেটা বাঁধানো, টাঙানো, প্রায়-জীর্ণ একটি বয়সের ফটো, মাঝে মাঝে যাতে স্মরণদিনে মালা-টালা ঝুলিয়ে দিই। কম বয়সের ছবি বিশেষ মনে আনতে পারছি না, যদিও এক-আধখানা তোলা হয়েছিল নিশ্চয়, সেকালের সেই ফটোয়ালরা তেপায়ার উপরে ক্যামেরা রেখে কালো কাপড়ে মাথা মুড়ি দিয়ে যে রকম ছবি তুলত। তোলা কি আর হয়নি, ধরো তোমার বিয়ের সময় কিংবা তারও আগে, থর-থর একটি কিশোরী, কুসুমকুমারী, নকল, চাঁদ-আঁকা পট পিছনে রেখে, গালে হাত দিয়ে উদাস, ভাবছে। পাত্রপক্ষকে যেসব ছবি ডাকে পাঠানো হত, কিংবা যারা দেখতে আসত, গুঁজে দেওয়া হত তাদের হাতে। যারা পছন্দ করতে আসত, তাদের শোনাতে তুমি কি গানও গাইলে, বলো না মা, বলো না! নাকি এসব রেওয়াজ হয়েছিল আর একটু পরে, তোমাদের কালে শুধু মুখে মুখে সম্বন্ধ, স্নানের ঘাটে কোনো গৃহিণীর হঠাৎ নজরে পড়ে যাওয়া, তারপর কুষ্ঠিঠিকুজি মেলানো, মেয়ে পয়মন্ত কিনা, ক'টা পদ জানে রাঁধতে, পারবে ক'জনের হাঁড়ি ঠেলতে। যারা দেখতে আসত, তারা বাটা-ভরা পান গাল ভরে খেত, আর বড় চুল খুলিয়ে পা-পা হাঁটিয়ে, দেখত চলন, কখনও শাড়ি তুলিয়ে পায়ের গোছ গড়নও দেখত। খুশী হলে বলত, "যেন লক্ষ্মীর ছাপ।"

যে ছবিটা এখন দেখছি, সেটা ঝোলানো আছে এই বাড়িরই কোনও ঘরের দেয়ালে। ওটা বোধ হয় একটা গ্রুপ থেকে আলাদা করে নেওয়া, তোমার মৃত্যুর পরে, যখন মাথা খুঁড়ে মরছি ছবি কই, ছবি কই, যেভাবে হোক আবিষ্কার করা চাই, নইলে ছাই বাঁধিয়ে রাখব কী, ঘটা করে স্থাপিত করব কোন্ প্রতিকৃতি শ্রাদ্ধবাসরে ?

এই গ্রুপের কুণ্ঠিত, একান্ত ছবিটা তোমার জবুথবু অশক্ত বয়সের, মুখটা যখন মাকড়সার জাল, মায়াবী ভীরু ভীরু চোখ দু'টি চশমার পুরু কাচে ঝাপসা। বেশি নড়া-চড়া করতে পারতে না, এক ঠায় বসে তোমার চোখ দু'টি দুপুর গড়িয়ে বিকালের সূর্যের মতন ঘুরে ঘুরে যেত। ফটোটা তোলার আগে তোমাকে ধরে ধরে চেয়ারে বসানো হয়েছিল, তোমার ঠোঁটে তখন কয়েৎবেল-মাখা আচার লেগেছিল। আঁচলের কোণে মুখটা মুছেছিলে। তবু কিন্তু হাসি ছিল না, মা, তখন তুমি হাসতে না, তোমার হাসি ঢের আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই ছবিটা দেখতে দেখতে আরও যত ক'টা ছবি ভেসে উঠছে, সবই ওই এক-ধারা বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভীতু-ভীতু। হয়ত অনেক ঘা খেয়েছিলে বলে একটা ভয়ই হয়ে গিয়েছিল, তোমার মুখমণ্ডলের প্রসাধন, চর্চিত মুখে যেমন স্নো-ক্রীম, তোমার মুখেও তেমনই একটা আতঙ্ক লেপা থাকত। একটা ভরসার নিশ্চিন্ত খুঁটি তোমার আগেই নড়ে গিয়েছিল, তোমার প্রথম যখন দাঁত নড়ে তারও অনেক আগে, তোমাকে সজ্ঞানে যবে থেকে জেনেছি, তবে থেকেই তুমি একটি কাঁপা-কাঁপা স্নায়ুর পুঁটুলি।

তোমার যৌবনকাল আমি দেখিনি। মানে স্মরণে আনতে পারছি না, স্মরণে রাখিনি। অর্থাৎ পাতা কেটে তুমি চুল বাঁধতে যখন, তুমিও বাঁধতে, নইলে বাবা যেদিন-যেদিন হঠাৎ-হঠাৎ আসত, সেদিন খাটে পা দুলিয়ে মুখ তুলতে কী করে, কিংবা যে বয়সে তুমি ঝুপঝাপ ডুব দিতে পুকুরে, কলসী বুকে দিয়ে দিতে সাঁতার, পাড়ে ভিজে পায়ের

ছোপ এঁকে শপশপে কাপড়ে ঘরে ফিরতে। তুমিও কি ছিলে কোনও প্রতাপের শৈবালিনী? ক্ষমা করো, এসব আমার বলার কথা নয়, বলা উচিত কিনা ঠিক করতে পারিনি।

> আমার জন্মকালে যে মেয়েরা যুবতী ছিল,
> তাদের আর দেখা যায় না। তারা নেই। আর তখন
> যারা জন্মাল? হাহাকারের মত টের পাচ্ছি, তাদেরও
> কেউ আর যুবতী নেই, কেউ বিগত, কেউ জরতী।
> আজ তাদের বয়স দিয়ে আমার বয়সটাকে মাপি,
> কুন্‌কো দিয়ে চাল মাপার মত।

কী জানি, কখনও ভাবি, সেই কুড়িতেবুড়ির কালটাও এক হিসাবে ছিল ভাল। জুড়োতে যখন হবেই, তখন তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যাওয়া, সেই বা মন্দ কী। মুখের শিরাগুলি তো কষ্টের রক্তেও ফুটন্ত। দীর্ঘকাল যৌবনকে ধরে রেখেছি বলে যারা দাপাদাপি করি, তারা বুঝি না যে আসল সময় থেকেই না-হক খানিকটা সময় খোয়া যাচ্ছে, বেশিক্ষণ ধরে হুবুডুবু খায় যে, তার জিৎ, না তাড়াতাড়ি পাড়ে যে পৌঁছে গেল, জিৎ তার? ভালমন্দ যা কিছু আছে যত শীগগির সম্ভব চুকে যাক, ক্ষণায়ু প্রাণীদের জগতে যা দেখি—জনন, প্রজনন সব লহমায় পার। তারা কি ঠকে? আমাদের সীমিত বিচারে তাই বটে, কিন্তু তুচ্ছ আপেক্ষিক অর্থে। মহাকালের পরমায়ু কোনও মানুষও তো পায় না। তবে কিসের ডগমগে দেমাক?

মা, তোমার সেই পাড়ে-বসা রূপই বেশি দেখেছি। একের পর এক থাকে, ক্রমাগত না-পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলে।

তোমাকে আকুলিত হতে কখনও কি দেখেছি, কোনও হাসিতে কি ঠাট্টায়, জাঁতি হাতে সুপুরি কুচোতে কুচোতে পড়োশিনীদের গায়ে

গড়িয়ে পড়ায়? মনে পড়ছে না। গানের কথা তো ওঠে না, তখন গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা গান কমই গাইত, বেশির ভাগ জানতই না।

তবে তারা শুনত। চিকের আড়ালে ধোঁয়া ধোঁয়া মুখ, মাথায় ঘোমটা, সারা গায়ে আলোয়ান জড়ানো, দল বেঁধে পালাগান কি কীর্তন শুনতে যেত, বাচ্চাদেরও নিয়ে যেত কোলে বা কাঁকালে। তুমি ঢুলছ, আশেপাশে ফিসফিস, চাপা হাসি, ঠিক তখনই হয়ত আসরে দুই সৈনিক তরোয়াল খুলেছে, আমি সেই ঝনৎকারে উত্তেজিত তোমাকে ঠেলছি, 'ওমা দ্যাখো, দ্যাখো না!' জয়দেব, হরিশ্চন্দ্র—কেঁদে তোমার চাদর ভাসিয়েছি, কখনও তুমি যখন মুগ্ধ, মগ্ন, ঠেলে ঠেলে তোমাকে বিরক্ত করেছি, বায়না তুলেছি "বাইরে যাব, বাইরে যাব বলে।" সরিয়ে দিয়ে তুমি বলেছ, "যা না, ওই তো মাঠে।" আমি যেতাম না। ওই বয়স থেকেই আমি একটু ভীতু।

ওই ভয়-ভয় ভাবটা আমি কি তোমার কাছ থেকেই পাই? রাত্রে পেঁচার ডাক শুনে চমকানো, স্বপ্নে আঁতকে ওঠা, সন্ধ্যায় গা-ছমছম, দেয়ালের দাগে নানা না-জানা মানুষের ছাপ খুঁজে পাওয়া, বটগাছের গোড়ায় তেলে-সিন্দুরে মাখামাখি রঙটা তো ভয়াবহ রকম, সর্বত্র অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা, কারা যেন কাঁচা মাছের আঁশ চিবোয়, দুপুরের কুকুরের কঁকিয়ে কান্না—সব সেই থেকে আমার স্নায়ুতে জড়ো করে করে জমিয়েছি। আজও এই বেমানান বয়সেও পুষে রেখেছি। ওরা যাচ্ছে না, কিংবা ওদের যেতে দিচ্ছি না, কারণ গেলে তো বেবাক সাদামাটা হয়ে গেল, যা-দেখতে পাই ভয় ব্যতিরেকে তার বাইরের কিছুর অনুভব আমি কী করে পাব।

আমাদের সেই আধা-শহরের বাড়িটার চারপাশে মৃত্যু যেন সততই হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াত। টিনের চালটা মাঝরাতে কেন যে থেকে থেকে কটকট ডেকে উঠত, পেয়ারা গাছে ঝোলা বাদুড়গুলো কাকে যে দেখতে পেয়ে দুদ্দাড় উড়ত, আমি কিছুই বুঝতাম না, খালি কাঁথার নিচে আরও গুটিগুটি তোমার গায়ের গন্ধ নিতাম।

জীবনে প্রথম কবে সজ্ঞানে কাঁদি মনে নেই, কবে কী দেখে প্রথম হেসে উঠি ভুলে গিয়েছি তাও, কিন্তু প্রথম দেখা মৃত্যুটি মনে আছে—আমার দাদার। এক অর্থে তোমারও বোধ হয় মৃত্যু সেই দিনে, হঠাৎ চিৎকার করে উঠেই পাথর হয়ে গেলে, তার আগের আর পরের তুমি একেবারে আলাদা, কে বা কারা যেন তোমাকে ধরে রইল, ধীরে ধীরে উঠিয়েও নিতে চাইল, তুমি উঠছিলে না, জাপটে রইলে দাদার দেহটা, তোমার প্রথম সন্তানের, ওরা জোর করতেই ঠাস করে পড়ে গেলে মাটির উপরে। হয়ত তখন তোমার সম্বিত ছিল না। লণ্ঠনটা জ্বলছিল, মৃত্যুর দৃশ্যে পরে দেখেছি, সিনেমায় যেমন নেবে, প্রতীকী ধরনে, কই, তেমন করে তো নিবল না!

তখন আমার বয়স কত আর, বারো-তেরো, একটু একটু মনে পড়ছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার মত। মৃত্যুকে সেই থেকে আমার ভয়, আবার মৃত্যু আমাকে টানত। আজ স্বীকার করি, কেউ কোথাও মরছে শুনলেই পরে সেখানে যেতাম ছুটে, ভিড়ের সঙ্গে মিশে, উঠোনে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই দাঁড়িয়ে থাকতাম, ড্যাবডেবে চোখে দেখতাম ডাক্তার গলায় নল জড়িয়ে বেরিয়ে আসছে, ওষুধ আনতে ছুটছে কেউ, কিংবা কমপাউণ্ডারের হাতে ছুঁচে-ভরা ইনজেকশন, আমার চোখের পাতা কাঁপছে অধীর অপেক্ষায়, কখন চাপা ফোঁপানিগুলো হা-হা কান্নায় ফেটে পড়ে, শুনতে পাব! যদি রোগী না মরত, যদি অন্তত মৃত্যুটা পিছিয়ে যেত, বোঝাতে পারব না কী যে হতাশা, কী যে অবসাদ আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত! যেন কেউ কথা দিয়ে কথা রাখল না, চোখে-কানে শোক চাখার চমৎকার স্বাদ পেতে দিল না, সেই নীচ, নিষ্ঠুর, অদ্ভুত মনোভাবটা কথায় বোঝাবো কী করে! আর কারও ভিতরে ভিতরে এই জিনিসটি আছে কিনা জানি না, আজ সরাসরি লিখে দিচ্ছি আমার আছে।

দাদার মৃত্যুর পরদিন সকালের সেই ছবিটা। সুধীর মামার চেহারাটা মনে পড়ছে, শবের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন, হয়ত সারারাতই ছিলেন, তোমার মাথায় হাত রেখেছিলেন, আর তখনই কী বিশ্রী চিৎকার করে উঠলে তুমি মা! পাগলের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলে উঠলে "না—না—না।" সকলে মিলে যা পারেনি, সুধীর মামার একটুখানি ছোঁয়াতেই তাই হল, চুলখোলা, আলুথালু তুমি ছিটকে সরে গেলে, খুঁটিতে মাথা ঠুকছিলে।

সুধীর মামা গেলেন সেখানেও। এবার জোর মুঠিতে ধরলেন তোমার শাঁখা সমেত হাতের কবজি, "ছি, আনু, ওরকম করে না, শান্ত হও", পুট করে শাঁখাটা ভেঙে গেল, ফুটল তোমার সাদা চামড়ায়, অল্প একটু রক্ত দেখা দিল! রক্ত দেখে একটু থতমত তুমি ডুকরে উঠলে ভাঙা গলায়, "বলে দাও সুধীরদা, কী রইল আমার, আমি কী নিয়ে থাকব।"

দৃশ্যের ফ্যালফ্যাল দর্শক আমি একটু দূরে অবোধ দাঁড়িয়েছিলাম, যেন সেদিন সকালে আমার এই পড়া, কিন্তু এক ফোঁটা মানে বুঝছি না। মৃত্যুতে কী যায়, কার যায়, কিছুই তখন বুঝতাম না তো!

সেই দর্শক অকস্মাৎ দৃশ্যেই উৎক্ষিপ্ত হল। কখন আমাকে টেনে নিয়ে গেছেন সুধীর মামা, বসিয়ে দিয়েছেন তোমার কোলে, বলেছেন "ওর দিকে তাকাও, একদিন ওই তোমার সব হবে।"

কী ঠাণ্ডা হাতে আমাকে তখন তুমি চেপে ধরেছিলে মা, আমার শরীর সিরসির করছিল। তোমার চাহনি বিহ্বল, দেখছ আমাকে, অথবা দেখছ না কিছুই, কিংবা সেই মরা দৃষ্টি কি তখন ঘুরে ঘুরে একটি মরা মুখের সঙ্গে আমার মুখটা মিলিয়ে দেখছিল?

নীচু গলায় হরিধ্বনি দিতে দিতে ওরা যখন দাদাকে তুলল, তখন আমাকে কোলে জাপটেই পিছু পিছু ছুটে গেলে তুমি, সকলে মিলে ঠেকাতে আমাকে কোলে নিয়েই ফিরে এলে।

ওরা ফিরে এল দুপুরের পরে। শূন্যতা হাতে নিয়ে কেউ যে ফেরে,

ফেরা যায়, সেটা তখন বুঝতাম না, বুঝেছিলাম অনেক বিজয়ার বিসর্জনের সন্ধ্যায়, আরও বড় হয়ে, কিন্তু সেদিন ওরা ফিরল, অথচ দাদাকে ফিরিয়ে আনল না, দাদা আর নেই, ফিরবে না সেটা তখনই যেন প্রথম নির্ভুল জেনে আমিও হঠাৎ গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠলাম, যে-দাদা অঙ্ক ভুল হলে মারত, যে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেলে বাঁচা যেত, বাজার থেকে কখনও আমার জন্যে যে সন্দেশও আনত, সে আর ফিরবে না বুঝে, সব মিলিয়ে, তার জন্যে কাঁদলাম।

মা, তখন তোমাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না, মাথা নাড়ছিলে বেভুলের মত, আঁচলের দিশা নেই, হঠাৎ কী হল, সুধীর মামার কাঁধ খামচে ধরে, এবার তুমি নিজেই ধরলে, কেবলই বলছ, "কোন্ পাপে আমার এমন হল, বলে দাও তুমি সুধীরদা, বলে দা—ও!"

আমি আজও সেই দৃশ্যটা দেখছি। তোমার রুক্ষ চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন সুধীর মামা, খুব নম্র, খুব ধীর স্বরে বলছেন, "পাপ? সে কথা তো আনু জানা থাকে শুধু একজনের— যিনি ওপরে। মানুষ তো পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখে না!"

সুধীর মামা। অনেকদিন নামটা মনে ছিল না, আজ তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে বসে অবশ্যম্ভাবী ফিরে এল। পুরনো একটা পানা পুকুরে নাড়াচাড়া দিচ্ছি কিনা, তাই একের পর এক মরা মাছ ভেসে উঠছে।

সুধীর মামা কে, কোন্ সম্পর্কে মামা জানতাম না, তুমিও কোনদিন বলে দাওনি। তখনকার কালে এসব দরকারও হত না। কাছে যে আসত, হাত বাড়িয়ে তাকেই নিতাম, মন এইভাবেই তৈরি থাকত কিংবা তৈরি করা হত। যেন স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটি মানুষ বিনা প্রশ্নে জল, হাওয়া, সকালের ফেনাভাত, বিকালের মুড়ি-পাটালির মত স্বীকৃত, গৃহীত। গুরুজন, ওদের মান্য করতে হয়, এইসব শিক্ষা মজ্জায় মজ্জায় মিশে যেত।

চট করে কেউ কাউকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করছে, আজকাল আর বড় একটা দেখিনে। ওপাটটা বোধ হয় উঠতে বসেছে।

সুধীর মামা, জীবনের সেই সকালে যেন একটি নিয়ম, একটি অভ্যস্ততা, একটি পৌনঃপুনিকতা। আজ ছবিটা অস্পষ্ট, তাই ঠিক-ঠিক বর্ণনা হয়ত করতে পারব না, শুধু প্রস্থহীন একটা দৈর্ঘ্যের কথাই মনে পড়ছে। ওঁর পাশে সব কিছু কত ছোট, আমি তো সেই বয়সে কখনও ওঁর কোমর ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি। মা, মনে হয় না যে, তুমিও ওঁর বুক ছাড়াতে পেরেছ। উনি ফরসা ছিলেন কিনা মনে নেই, পল্লীগ্রামে সে সময়ে ঠিকঠিক যাকে ফরসা বলে, সেরকম লোক বেশি দেখা যেত না তো, পুকুরের জলে, মাঠের রোদে, অন্তত পুরুষ-দের চেহারা কেমন একটা পোড়া-পোড়া হয়ে যেত। সুধীর মামাও, অনুমান করি, ছিলেন তামাটে।

ওঁর আর যেসব অনুষঙ্গ মনে পড়ছে তার মধ্যে একটা ছিল কমফরটার, উনি সর্বদাই গলায় জড়িয়ে রাখতেন।

> (মা, তুমি ঠাট্টা করে বলতে 'মহাদেবের সাপ।' হাসতে হাসতে জবাব দিতেন সুধীর মামা— 'মহাদেবই তো, দেখছ না নীলকণ্ঠ হয়ে আছি।' তুমি ভ্রূকুঞ্চিত করতে। কিন্তু সুধীর মামা যেই কণ্ঠনালীর কাছে ফুলেওঠা নীল শিরাটা দেখিয়ে দিতেন, তুমিও হেসে ফেলতে তখন—'ওঃ এই মানে!')

ওই কমফরটার, প্রায় সুধীর মামার গায়ের চামড়ার মত, নিতান্ত গরমের ভরদুপুর ছাড়া, ওঁকে কমফরটার ছাড়া দেখিনি। থেকে থেকেই খকখক কাশতেন, ওঁর কাশির ধাত, কখনও কখনও দেখেছি দমক পারছেন না সামলাতে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, গলার সেই নীল শিরাটা বুঝি পাইপের মত ফেটে যাবে। হাত বাড়িয়ে এক গ্লাস জল নিতেন সুধীর মামা, সুস্থির হয়ে হাত বোলাতেন

জিরজিরে বুকে, কেমন লাজুক হেসে বলতেন, বুকেই আঙুল ঠেকিয়ে, 'বিলকুল জখম, ভিতরে কিছু আর নেই, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

মা, তুমি বলতে 'মাথায় তো আছে। যা আছে তারই খানিক আমার এই ছেলে দুটোকে দাও না।' সুধীর মামার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হত—'দেব, দেব। ওরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানুষের মত মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, দ্যাখোই না।'

শীতে দেখতাম সুধীর মামা আরও নুয়ে-পড়া, গলাবন্ধ পাটকিলে কোটটার উপর জড়াতেন একটা বেখাপ্পা কমলা রঙের দোলাই, আরও শীর্ণ, জবুথুবু নিষ্প্রাণ ঠেকত। তখন আরও বিশেষ করে চোখে পড়ত ওঁর হাতের লাঠি। লাঠি ছাড়া ওঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঠিক ভর দিয়ে চলতেন না, তখনও না, লাঠিটা কেমন একটু আগে ফেলে ফেলে এগোতেন, যার ফলে টকাটক আওয়াজ উঠত, বেশ খানিকটা দূর থেকেই বোঝা যেত উনি আসছেন, মনে হত যেন লাঠি ঠুকঠাক করে সুধীর মামা পরীক্ষা করছেন মাটিটা কত খাঁটি।

আর মনে পড়ছে সুধীর মামার নাকের লম্বা দুটি চুল, শুঁয়া-পোকার মত লাগত, অনেকটা বেরিয়ে এসে গোঁফের চুলগুলোর দলে মিশে যেত।

(স্মৃতির ব্যাভার কী আশ্চর্য দেখছ? এত কিছু ভুলে গুলে খেয়ে নাকের দুটি চুল অ্যাদ্দিন বাদে কোথা থেকে তুলে এনেছে!)

চেয়ারে ঢুলতে ঢুলতে যখন নাক ডাকত সুধীরমামার, ওই চুল দু'টি তখন কাঁপত। আমার তলপেটে তখন হাসির সুড়সুড়ি লাগত। তোমাকে ডেকে দেখিয়েছি কতদিন! চেয়ারে বসে ঘুম তো, একটু সাড়া শব্দেই ছুটে যেত। সিধে হয়ে বসতেন সুধীর মামা, পিটপিট চেয়ে বলতেন, "কী রে, কী দেখছিস?" নজরটার নিশানা দেরি হত না ধরে ফেলতে। চুল দুটো সোজা টানটান করে ধরে বলতেন 'ওঃ, এই! শুধু কি এই দুটি? ভাল করে চেয়ে দ্যাখ, আরো অনেক

আছে, একটা ঘন অরণ্য। এই নাক কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ ঢুকে ফিরে এসে বলেনি, দিশাহারা নিবিড় বন, শ্বাপদসঙ্কুল, তীর ধনুক হাতে অদিবাসী কিংবা' —মুচকি হেসে সুধীর মামা জুড়ে দিতেন, 'বলাতো যায় না, হয়ত তপস্যারত মুনি ঋষিদেরও সাক্ষাৎ পেয়ে যাবি!'

দুই

রোজ সকালে সুধীর মামা ছিলেন ঘড়ির মত বাঁধা। দাওয়ায় সকালে রোদ্দুর পড়ল আর উনি গ্যাঁট হয়ে মোড়ায় বসলেন। গুন-গুন করে কী-একটা ভজন-না-কীর্তনের সুরও ভাঁজতেন, তার একটা লাইনই শুধু মনে পড়ছে, 'নিশি অবসান হে।'

তুমি আঁচলে হাত মুছতে এসে বলতে "কোথায় অবসান? অন্ধকার কাটার আমি তো কোনও লক্ষণ দেখছিনে।"

সুধীর মামা বলতেন, "কাটবে, কাটবে!" আকাশের আলোর দিকে মুখ তুলে কী বিশ্বাসে যে কথাটা উচ্চারণ করতেন! তার আভাসও আমি, আমরা, একালে খুঁজে পাইনে।

তারপর সুধীর মামা পড়তেন আমাদের নিয়ে। দাদাকে শেখাতেন শক্ত শ্লোক, আগে মুখস্থ, পরে ব্যাখ্যা। একটা শ্লোকে 'বক্ত্র-নেত্র' বলে কী-একটা খটমটে কথা ছিল, দাদা কিছুতে তার মানে মনে রাখতে পারত না। আমাকে পড়াতেন ইংরিজী, মানে পড়ে পড়ে গল্পটা বলে দিতেন। "ফোকটেলস্ অব বেঙ্গল", রাক্ষস খোক্কসের গল্প, হাঁউ মাউ কাঁউ, এ-সব তখনই শুনি। ইংরিজী ভাষাটা সেই থেকেই কান-সওয়া হয়ে যায়, সেটা খুব বড় কথা নয়, রূপকথার একটা মায়াবী রাজ্য তখনই যে তৈরী হয়ে গেল মনে, অনেক দিন সে রাজ্যপাট অন্তরে বহাল ছিল। অলীক-অসম্ভব, জগৎ-টগৎ উবে গেছে কবে, তবু তার একটুখানি রেশ আনাচে কানাচে কোথাও কি রেখে যায়নি?

পড়ানো শেষ হতেই সুধীর মামা হাত বাড়িয়ে বলতেন 'দাও।' তুমি সবুজ রসে টসটসে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিতে। নিমপাতা সিদ্ধ রস, সুধীরমামার পিত্ত-দোষ ছিল, কোন-কোন দিন সর্দিকাশির জন্যে আলাদা করে তুলসী-আদাও নিতেন।

মা, তোমার নিজের ছিল চায়ের নেশা, পেয়ালায় চিনি মেশাতে মেশাতে সামনে এসে বসতে। একদিন তোমাকে বলতে শুনেছি, 'চা খাবে একটু সুধীরদা? একটি দিন খাও না!'

সুধীর মামা বলতেন, 'নতুন আর একটা অভ্যাস? আর ধরিয়ো না। তা ছাড়া চা মিষ্টি যে! মিষ্টি কিছু এই মুখে স'বে না।'

তোমাকে মৃদুস্বরে বলতে শুনেছি 'তোমাকে শুধু তেতোই দিয়ে গেলাম। ভাবতেও খুব খারাপ লাগে।'

সুধীর মামা ঈষৎ হেসে বলেছেন 'যার যা প্রাপ্য!' পরে ওই হাসির নাম জেনেছি—দার্শনিক নির্বেদ। একভাবে একটা বিধান মাথা পেতে নেওয়া, স্নান যে করতে পারছে না, সে যেভাবে ঘাটে দাঁড়িয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছোঁয়ায়।

সুধীর মামা কোন-কোনদিন হঠাৎ-হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন, 'প্রণববাবুর চিঠি-টিঠি এল?'

বাবার নাম শুনলেই মা, তুমি যে কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে যেতে! তোমার পাতলা ঠোঁটের কোণ বেঁকে যেত, অথবা ঠোঁট অল্প হাওয়ায় পাপড়ির মত কাঁপত।

শুকনো গলায় তুমি বলেছ 'ন্ না—হ্!'

'ছাড়া পাননি?'

'গবরমেণ্ট ছেড়ে তো দিয়েছে ওদের সবাইকেই, কাগজে লিখেছে শুনেছি। তুমি পড়োনি?'

'পড়েছি। তাই তো জিজ্ঞেস করছি। তা ছাড়া টাকা কড়ি—'

'ওর মামা মনি-অরডার করেছিল, সেও তো ওই মাসে। আর কোন খবর আসেনি।'

সেই পাটকিলে কোটের পকেট থেকে সুধীর মামা তখন, খুব কুণ্ঠিত, বের করেছেন একটা দশ টাকার নোট।—'এটা রাখো। যদি হঠাৎ আটকে যাও—'

মা, তুমি টাকাটা ছুঁয়েও ছাখনি। একই রকম নিঃস্পৃহ গলায় বলেছ 'তোমার কাছেই থাক। খুব টানাটানিতে যদি পড়ি, চেয়ে নেব।'

'না হয় শোধই দিতে।'

মুহূর্তের মধ্যে, মা, অপরূপ একটি বিষাদ মহিমা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমার মুখে।—'শোধ? তোমাকে? না সুধীরদা, এবারের যাত্রায় তা বোধ হয় আর সম্ভব হল না।'

একবার সুধীর মামা কোথায় গিয়ে জ্বরে পড়ে দিন সাতেক আটকে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন, আরও শীর্ণ, আরও সরলতররেখা হয়ে! মা, তোমাকে সেদিন হঠাৎ হালকা চাপল্যে বিস্তারিত হতে দেখলাম। আঁচল ধরেছ মুখের কাছে, হাসছ, 'আমরা তো ভাবলাম সুধীরদা, তুমি একেবারে—'

'বিয়ে করে ফিরছি?'

'ঠিক, ঠিক। তাই। তোমার দরকারও। এই বয়সে জ্বরে বেঘোরে—'

'তাই বলছ টোপর পরি?'

হাততালি দিয়ে হেসেছ তুমি। 'দেখি টোপর পরলে কেমন মানাবে! উঁহুঁ', মাথা ছুলিয়ে বলেছ তুমি 'না সুধীরদা, তাহলে আরও ঢ্যাঙা হয়ে যাবে।'

সুধীর মামা আমাদের দিকে চেয়ে বলেছেন 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে, সেই ছড়াটার মতো, না রে?'

একটি মৃত্যু সিঁথিচিহ্নের মতো পূর্বাপরকে বিদারিত করে দিয়ে সোজা চলে গেল। পরে যা রইল, এই সংসারের রূপ, তোমার যে-রূপ, কিছুই আর আগের মত রইল না। সব কেমন সাদা হয়ে গেছে, নিঝুম, খাঁ-খাঁ গ্রীষ্মের ছুপুরের মতো, কিংবা কোনো-কোনো

একলা সময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হত ছাই-ছাই, যেন শীতের বিকাল, যত সময় আসে যায়, আমরা খাইদাই ঘুমিয়ে পড়ি, তার চেহারা একটা ন্যাড়া ডালের মত, সব অর্থ শুকনো পাতার মতো ঝরিয়ে দিয়ে বসে আছে।

বিশেষ করে কী সর্বস্বান্ত লাগত শীত শেষের মাঠঘাটকে, পুকুর-গুলো মণিখোয়ানো চোখের গর্ত, আর মাঠ খড়খড়ে, কারা সব ফসল নিড়িয়ে নিয়ে গেছে, খালি পায়ে হাঁটলে পায়ে ফোটে। তবু একা একা ঘুরতাম, ফাঁকা মাঠে মরা পশুর হাড় মাঝে মাঝে চিকচিক করত, কী বীভৎস ধবধবে সাদা, এই কি মৃত্যুর চেহারা, আমি কখনও কখনও কাঠ হয়ে ভেবেছি, না, না, মৃত্যু তো কালো, ফকিরের আলখাল্লার মতো কালো, বস্তুত অনেকদিন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি মৃত্যুর রঙ কালো, না সাদা।

আর তার গন্ধ? তাও একদিন টের পেয়েছি, মৃত্যুর গন্ধও আছে। সেবার খুব হিম পড়েছিল, হঠাৎ কবে বুঝি সন্ধ্যার পর লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে গেল, তুমি বললে, চট করে যা তো দোকানে, খানিকটা নারকেল তেলও আনিস, সারা রাস্তা ছমছম, সারা রাস্তা ভয়ার্ত, কারা যেন আমার সঙ্গ নিয়েছে, কে যেন হাসছে হাওয়া-হাওয়া কণ্ঠস্বরে, আমি দৌড়লাম, এক ছুটে বাজার, কিন্তু ফেরার পথে এক ঝলক সেই গন্ধ। তেলের। দাদার একবার পা ফাটে, তুমি তখন তার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে কর্পূর মিশিয়ে এই তেল মাখিয়ে দিয়েছিলে, আমি ঝুঁকে পড়ে দাদার পায়ের ক্ষত দেখতে গিয়ে তার গন্ধ পেয়েছিলাম। সেই গন্ধ চেতনায় যে ছিটিয়ে গিয়েছিল তা জানতাম না তো, সেদিন সেই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনল দাদাকে। তার মৃত্যুকে।

এক-একটা মৃত্যুর এক-একরকম গন্ধ। ইদানীং শহরে মড়ার চাদরে ঢেলে দেয় কী-এক আতর, বেশির ভাগ দেখা মৃত্যুর গন্ধও তাই ওই আতরের, আতর আমি এই জ্যান্ত অঙ্গে কখনও মাখিনি।

আমার সেই স্নায়ু-শিহরিত শীতল শৈশবে দাদা আরও কতভাবে

ফিরে ফিরে এসেছে। স্বপ্নে তো বটেই, কখনও কখনও কল্পনা করেছি —ভূত হয়েও। মা তুমি যদিও বলতে 'দূর, ও-সব বলে না। ভালো-বাসার লোক কখনও ভূত হয়ে আসে না।' তোমার সেই বিশ্বাস, আহা, আমি যদি কণাও পেতাম! তা-হলে দরজার টকটক শব্দে, পুকুরের শালুক ফুলের ঠোঁট-তোলা হাসিতে দাদাকে বারেবারে উঁকি দিতে কি দেখতাম! কত তেঁতুলের আচার তেতো হয়ে গেছে, ডাঁসা পেয়ারায় দাঁত বসাতে গিয়ে ফেলেছি ছুঁড়ে, বাটিভরা গুড় আর মুড়ি তুমি দিয়েছ যদি, আমি অপেক্ষা করেছি কখন তুমি সরে যাবে কিংবা একটু পরে আসছি বলে অনেকটা দূরে গিয়ে সব মুড়ি পাখিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।

তুমি কিন্তু সহজেই একটা বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করেছিলে। তোমার হাসি সেই যে ফুরিয়ে গেল আর ফিরল না। একটা মন্ত্রের বই কোথা থেকে জোগাড় করলে, ঘরের কোণে বসেছ আসন বিছিয়ে, মানে-না-জানা মন্ত্র একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছ, এই ক্ষণে তোমার সেই শান্ত বিশ্বাসী, সমর্পিত রূপটি দেখতে পাচ্ছি।

সেই সময়ে সারা সকালটার অর্থই হয়ে গিয়েছিল তোমার স্তব। শুনে শুনে আমারও মুখস্থ হয়ে যেত। আজও যত স্তব, যত মন্ত্র ভাঙাভাঙা ভাবে জানি, উচ্চারণ করি, সব তখনকার কানে শোনার অবশিষ্ট ভাগ। কিন্তু তোমার উদাসীনতার ভাগ আমি পাইনি। দাদার অভাবের বোধটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, কবে আমি প্রত্যাবৃত্ত হলাম আমার স্বভাবে, চাপল্য আর লোভে, কিন্তু তুমি যা ছাড়লে তা আর ধরলে না। একেবারে আলাদা। একটি মৃত্যু এল, কী নিয়ে গেল, বিনিময়ে তোমাকে দিয়ে গেল সম্পূর্ণ একটি শুভ্রতা, যেন যেই শীত পড়ল অমনই তুমি পুরু একটা চাদরে নিজেকে জড়িয়ে নিলে। সেই চাদর সহজে আর খুলে পড়ল না।

এই চিঠি লেখার একটা অসুবিধে এই যে, তোমার কাছ থেকে কোন উত্তর পাব না। যদি ভুলচুক কিছু লিখে ফেলি, ঘটনা-পরম্পরায়, কিংবা আমার চোখ দিয়ে তাদের বোঝায়, তোমার ভুরু কুঁচকে উঠবে না। শুধরেও তো দেবে না তো তুমি। ছাখো লিখছি আর আমার হাত কাঁপছে, ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। ভাঁটিতে বসে উজানের কথা লেখা খুব সহজ নয়। ভাবছি বটে যা দেখেছি তাই হুবহু টুকে দিচ্ছি, কিন্তু যে দেখেছে সে তো লিখছে না, এই বয়সের চোখ দিয়ে সেই বয়সের ফুলে আর কাঁটায় কাঁটায় বিচরণ—ওখানে বড় রকমের একটা তফাত ঘটে যেতে পারে, হয়ত ঘটেছে। কে জানে, হয়ত যা-দেখেছি তা লিখছি না, যা দেখতে চাইছি যেভাবে চাইছি দেখতে, তাই কলমে কালি হয়ে সরছে।

তুমি সুদূর-ধূসর নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছিলে দাদার মৃত্যুর পর, খুব করুণ তুলিতে এই ছবিটা আঁকলাম, কী জানি, সেটা হয়ত ঠিক নয়, কোন্ প্রতিকৃতিই বা কবে একেবারে ঠিক-ঠিক হয়ে থাকে, এখন যেন মনে হচ্ছে ওই মৃত্যু তোমাকে খালি যে দূরেই সরিয়ে দিয়েছিল, তা তো নয়, আমার আরও অনেকখানি কাছেও নিয়ে এসেছিল।

এক সঙ্গে শুতাম, সে-তো শুয়েছি বরাবরই, কিন্তু এত কাছে ঘেঁষে এর আগে আর কখনও কি, নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিয়ে, গুটিসুটি হয়ে, যতটা পারি পরস্পরকে আঁকড়ে, একটি মৃত্যু ঘটল ঠিকই, কে একজন ছিল সে নিরুদ্দেশ হল, যাবার সময় সে যেন নিশ্চিত একটি অলিখিত চিরকুট রেখে গেছে যে এখন থেকে আমরা দু'জনের জন্যেই দু'জন। কুয়োতলায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে শীতের সকালেও ঘটি ঘটি জল ঢেলে নাওয়ানো, মা, এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলো কি তুমি শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলে ?

রেখেছিলে নিশ্চয়। রাখিনি আমি। কারণ একজন গেল বটে,

তার বদলে এল আর একজন, না-না বউয়ের কথা বলছি না, ওসব বাইরেকার ব্যাপার, আসলে মা আর ছেলের সম্পর্কের মধ্যে পা টিপে টিপে যে আসে, তার নাম বয়স ; সেই বদলে দেয়, সেই মূল, আমরা ভুল করে তাকে 'বন্ধু'-'বউ' এইসব নাম দিই। আদম আর ইভের মধ্যে যেমন ছদ্মবেশী সাপ, মা আর ছেলের সম্পর্কের নন্দনেও তেমনই বয়স। সেই বয়সই আমাকে বদলে দিচ্ছিল, ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে ক্রমশ দূরে ঠেলে দিতে চাইছিল।

যাক সে-সব বৃত্তান্ত আরও পরের। তখন কিন্তু মা, আমরা এক থালায় খেতাম, ভাত মেখে মেখে তুমি এক-একটা গ্রাস ডেলা পাকিয়ে সাজিয়ে রাখতে, আমি কখনও টপাটপ মুখে তুলতাম, কখনও তুলে দিতে তুমি, গালে এঁটো লাগল তো হাতের পিঠ দিয়ে মুছিয়ে দিতে, আজ সেই সুখস্পর্শের কথা লিখে রাখতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে। আর ছিল শেষ চাঁচিমুছি, ওটার সর্বস্বত্ব আমার তো ছিলই, এমন-কী তোমার মুখের চিবোনো পানের দিকেও সতৃষ্ণ চেয়ে থেকেছি, কখন তুমি জিভের আগায় তুলে ধরে একটুখানি দেবে সেই লোভে অধীর, ক্লাশে শেখা সরল স্বাস্থ্যবিধিকে একটুও কেয়ার করিনি। খঞ্জনী বাজিয়ে বৈরাগী এলেই তোমার কাছ থেকে চাল চেয়ে নিয়ে দৌড়ে যাওয়া, তোমার পাশে বসে জোড়হাতে প্রতি বিষ্যুৎ বারে লক্ষ্মীর পাঁচালি শোনা—পদ্মাসন করে বসা কাকে বলে তুমিই শিখিয়েছিলে, তোমার ঠাকুরের জন্যে অন্যের বাগানের ফুল চুরি, সজনে আর বকফুল পেড়ে আনা, আজও দেখছি স্মৃতির ঝুড়ি এমন অনেক কড়িতেই ভরতি। ছুটির দুপুরে তোমার চুলে বিলি কেটে দিয়েছি, এসব লেখার কোনও মানে নেই, কারও কাছে এর কোনও দাম নেই, আমার কাছেই বা কতটা দাম আছে ?

রাত্তিরে উঠে বাইরে যাবার দরকারে তোমাকে ডাকতাম যখন, ঘুমকাতুরে তুমি উঠে বসতে, কোনো দিন বা দেখতাম তোমার দুষ্টু ভ্রূভঙ্গি : 'ভীতু ছেলে! এখন না হয় আমি দাঁড়াচ্ছি, এর পর দাঁড়াবে

কে ? তোর বউ এলে তাকেও দাঁড়াতে হবে। কেন এত ভয়, এত ভয় কিসের।'

তোমাকে তখন কী করে বোঝাব মা, ভয় কিসের। যাদের দেখা যায় না, কিন্তু যারা নিরন্তর নানা অবোধ্য শব্দ তুলে কথা বলে, রাত হলেই সার দিয়ে পাহারা দেয় বাইরে। একলা সেখানে গেলেই যে তাদের অধিকারে চলে যাব!

মধ্য রাত্রের আরও দু'একটি ছবি উঠে আসছে। গা থেকে লেপ কি কাঁথা সরিয়ে দিলে তুমি ঢেকে দিয়েছ, কিংবা জ্বরে যদি ছটফট করছি, কপালে ঠাণ্ডা হাত, হাতটাই যেন জলপটি, বুলিয়ে দিচ্ছ, এসব তো মামুলি। কিন্তু এক-একদিন দেখেছি যে, মশারির মধ্যে তুমি ঠায় বসে, হাত দুটি জড়ো করা উপাসনার ধরনে, দৃষ্টি উপরে, সর্বাঙ্গ যেন কঠিন, আমার চেনা মা হঠাৎ যেন পাষাণ-মূর্তি ; তুমি স্তব্ধ, বিবিক্ত, নিস্তরঙ্গ ; মূক প্রশ্নে অদৃষ্ট কাউকে বিদ্ধ করছ। তুমি যেখানে আছ, সেখানে নেই স্পষ্ট বুঝতে পারতাম।

যদি টের পেলে আমি জেগে গেছি, চেয়ে আছি, অমনই তুমি ফিরে আসতে। তাড়াতাড়ি বলতে 'ঘুমো! বাইরে বোধহয় একটা সাপে ব্যাঙ ধরেছিল, কোঁ-কোঁ আওয়াজ শুনতে পেলাম, ঘুম ভেঙে গেল।'

একটা পাণ্ডুর মিথ্যা তোমার মুখে ছড়িয়ে পড়ত কিনা, কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনের ম্রিয়মাণ ফিতেটাও সেটা ধরিয়ে দিত, আমি বুঝতে পারতাম। তুমি দাদার কথা ভাবছ। তোমার বাকী সময়টার সমস্তটাই আমি আত্মসাৎ করে নিয়েছি, খালি এই নিভৃত নীরব খানিকটা ক্ষণ আলাদা করে রাখা। বিনিদ্র এই সময়টুকু দাদার।

কখন আস্তে আস্তে তোমার হাঁটুতে মাথা তুলে দিতাম আমি, হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম।—'মা, বাবা আজও এল না ?'

তুমি উত্তর দিতে না।

'এত বড় খবরটা পেয়েও দাদা—দাদা নেই শুনেও এল না ?'

'ও ওই রকম। কিংবা কী জানি হয়ত খবর পায়নি।'

'চিঠি তো দিয়েছ।'

'যে ক'টা ঠিকানায় থাকতে পারে তার সব ক'টাতেই। লোকের মুখেও খবর পাঠিয়েছি।'

'তারা হয়ত খুঁজে পায়নি।'

'হবে। আবার শুনেও আসেনি, হতে পারে। আসবে কি, ওর আসার মুখ কি আছে? চিরকাল বাইরে বাইরে দূরে দূরে, সংসার দেখল না। দেখবেই না যদি, তবে সংসার করল কেন।'

সংসার করা কাকে বলে, তখন আমি মানে জানতাম না।

'বাবা কোথায় থাকে মা, কী করে?'

'ছি, থাকেন বলতে হয়। উনি দেশের কাজ করেন।'

দেশের কাজ কাকে বলে, ঠিক বুঝিনি। তবে জেলে যেতে হয়, জানতাম। বাবা মাঝে মাঝে গেছেন শুনেছি।

'শুধু দেশের কাজ?'

'ছাড়া পেলে, পালা লেখেন। অনেক বই লেখা হয়ে আছে, বড় হয়ে পড়িস। খাতার পর খাতা বোঝাই। তা-ছাড়া ওর মাথায় সব সময় কত যে টুকিটাকি ব্যবসার ফন্দী। ওই করেই তো সব গেল। আমার বাবা বেঁচে থাকতে কত বুঝিয়েছেন, সুধীরদাও কতবার বলেছেন—'

সুধীর মামা, একটি নোঙর সুধীর মামা। আমাদের উত্তরের ভিটের ঘরটার পাশে একটা মস্ত নারকেল গাছ, ঠিক সেইরকম ঠায় দাঁড়িয়ে।

একদিন সকালে খুব শীত-শীত করছিল, তা-ছাড়া অ্যানুয়েল পরীক্ষা শেষ, ঘুম ভেঙেও লেপের তলায় চুপচাপ আছি। টের পাচ্ছি সুধীর মামা এসেছেন। যথারীতি চুমুক দিচ্ছেন নিমের রসে। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে তুমি বুঝি দিচ্ছিলে বড়ি। বলতে শুনলাম সুধীরমামাকে— 'তোমার বড়টা এভাবে না গেলে, আনু, আর আট-দশটা বছর মাত্র, তুমি একটা নির্ভর পেয়ে যেতে।'

হঠাৎ ডাল-গোলা বাটিটা পড়ে গেল ঝনঝন করে। মা, তুমি জানো না, আমি হঠাৎ বিছানা থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়েছি। দাঁড়িয়েছি কবাটের ঠিক এপাশে, রোদ্দুর যেখানে একটি অবিরত তীর হয়ে ঠিকরে পড়েছে, ঠিক সেখানে। তোমার স্থির আয়ত দৃষ্টি দেখতে পেয়েছি, সেই দৃষ্টি কাঁপল না, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে, তোমার গলা কেঁপে গেল, "কোন্ পাপে এমন হল সুধীরদা, আজ আবার জিজ্ঞাসা করছি। ঈশ্বর জানেন, কোনও পাপ তো আমরা করিনি।'

'পাপ ? পাপ হয়ত অনেক রকমের হয়, আনু, সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে। ঠিক জানিনে।'—এইরকমই কী একটা কথা হয়ত বলেছিলেন সুধীর মামা, অস্পষ্ট স্বরে, অথবা সেই নিমের গেলাসেই মুখ রেখে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেছিলেন বলে ঠিক শুনতে পাইনি।

কিন্তু বলতে বলতে বিষম খেয়েছিলেন সুধীর মামা। মা তুমি তাড়াতাড়ি উঠে, যে-হাতে বড়ির গোলা লেগে নেই, সেই হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছিলে ওঁর পিঠে। সুধীর মামা একটু স্থির হতে তুমি বললে, 'এখনও সময় আছে সুধীরদা। তোমার এই শরীর! কাউকে এনে তোমাকে দেখাশোনার ভার তুলে দাও।'

পলকে আরও যেন ফ্যাকাশে, ভাঁজ ভাঁজ কাগজের মত দেখাল সুধীরমামার মুখ। কেমন অপরিচিত স্বরে তাঁকে বলতে শুনলাম, 'কেন, তোমরাই তো দেখছ শুনছ।'

'আমরা ?' তোমার মুখে ফুটতে দেখলাম যে-হাসি হাসি নয়, সেই হাসি। 'আমরা ? আমি তো নিজের শোকে, দুঃখে, নিজের মায়ায় সংসারে জড়িয়ে আছি। বরং তুমিই আমাদের জন্যে—কেন, কেন সুধীরদা, তোমাকে তো কিছু দিতে পারিনি। তুমি শুধু দিয়েই গেলে। একটি ফোঁটাও কখনও পাওনি।'

তখন দিব্য যে-আভা ছড়িয়ে গেল সুধীরমামার মুখে, এখনও তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।—'কী জানি আনু, পাইনি যে, তা-ও জোর করে বলতে পারব না, ওই তো মুশকিল। পাওয়ার চেহারা বোধ হয় সব

সময় ঠিক এক রকমের হয় না। না-পাওয়াটা কতকটা অভ্যাস হয়ে গেলে তারও একটা নেশা লাগে, সেটাও তখন এক ধরনের পাওয়া হয়ে দাঁড়ায়।'

ঠিক এই কথাগুলোই কি বলেছিলেন সুধীর মামা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে চলা বাতাসের মত স্বরে, আর আমি অবিকল তাই মনে রাখলাম? কী-জানি মা, মিথ্যে বলব না, হয়ত কথাগুলো অন্য ভাষায় ছিল, কিন্তু তার ভাবটা ছিল এইরকম, আমি আমার এই বয়সের আশা-হতাশার সমীকরণের দর্শন দিয়ে তাঁর বিস্মৃত কথাগুলো এইভাবে বসালাম। বানালাম।

মাঝে মাঝে চিঠি আসত বাবার, কদাচিৎ টাকা। কিন্তু তিনি আসেন নি, অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত না, দাদার মৃত্যুর অন্তত বছর দেড়েকের মধ্যে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তার মানে দাদা গেল এক শীতে, মাঝখানে আর একটা শীত, বাবা যেদিন হঠাৎ উদয় হলেন, তখন চৌধুরীদের বড় বাগানে পাখিগুলো ডেকে থেমে গেছে, শুনেছি ওরা শীতে আসে, গ্রীষ্মে ওদের কোথায় না কোথায় দেশে ফিরে যায়, আমের বোল ফুরিয়ে গুটি ধরেছে। বাবার আসার দিনটি আমার মনে কীভাবে আঁকা আছে তোমাকে বুঝিয়ে বলব পরে, এখন এই পর্যন্ত বলি, পরিবার নামক সংস্থায় পিতা নামক ব্যক্তিটি যে অনিবার্য অঙ্গ, অনেকদিন অবধি সেটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়নি। কতকটা মাতৃতন্ত্রে মানুষ, আমার কাছে বাবার মূর্তি সেই শিশুকালে ছিল একটি বিলীন জলরেখা, পরোক্ষ একটি অস্তিত্ব মাত্র।

কেন যে আমরা এই বাড়িতে থাকতাম, শুনতাম, ওটা ছিল আমাদের মামার বাড়ি, মামা নেই, তাই একমাত্র ওয়ারিশ হিসাবে তুমিই পেয়েছিলে, ওটা যে আমার পৈতৃক বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়, এ-সব বোধ বেশ কিছুটা বয়স পর্যন্ত মনে জাগে নি। ক্লাশের

আর-সব ছেলে বাবাকে ভয় পায়, কিন্তু ফিরে ফিরে বাবার কথা বলে, বেড়াতে যায় তার সঙ্গে, আমার বলার মত ছিলে তুমি, কেবল তুমি—কিন্তু তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন, কোনও দৈন্য বা অভাববোধ বিশেষ পীড়া দেয় নি। কারও বাবা নিয়ম, কারও মা। এইটেই ধরে রেখেছিলাম। আমি, দাদা আর তুমি মিলে বেশ ছিলাম।

দাদা চলে গেল, ফলে, বলেইছি তো তিনের জাগায় হল দুই। সারা সকালটা হল তোমার স্তব, সারা দিনমানরাত্রি জুড়ে তোমার প্রগাঢ় আবরণ। প্রথম যেবার শীত ফিরে এল, কী-জানি কেন, সেবার অকাল মেঘ চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে থাকল, কনকনে ঠাণ্ডা, বেরুতে পারছি না, পাতলা একটা চাদরে মুড়ি দিয়ে পড়ছিলাম, পড়ার বই থেকে বাংলা একটা পদ্য—"ডেকে দাও, ডেকে দাও দাদারে আমার। একা আমি পারি না খেলিতে", পরে জেনেছি ওটা বিদেশী একটা কবিতার তর্জমা, পড়তে পড়তে হিহি করে কাঁপছিলাম—শীতে ? নাকি, ভিতরে ভিতরে কবিতার কথাটা কুয়াসার মত একাকার হয়ে হুহু করে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল ? কখন তুমি যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ টের পাই নি। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, তুমি চলে যাচ্ছ।

ফিরে এলে একটু পরে, হাতে একটা কোট, আমার গায়ে ছুঁড়ে দিলে। মুখে বলো নি, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, পরতে বলছ।

পরলামও, আমাদের মধ্যে একটা নির্বাক ছায়াছবির অভিনয় চলছিল, বেশ আরাম লাগছিল কোটটায়, আমার কোট ছিল না, দাদা স্কুলের স্পোর্টস ক্লাব থেকে একটাই পেয়েছিল, পলকে চলে গেল শীত, তোমার মুখেও ফুটি-ফুটি খুশি, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

এই কোটটা এতদিন তুমি দাও নি, তুলে রেখেছিলে, আজ দিলে, দিতে পারলে। বস্তুত দাদার ব্যবহার-করা সব জিনিসই যত্ন করে তুলে রেখেছিলে তুমি, রঙ-ওঠা তোরঙটাতে, যে-তোরঙে ন্যাপথলিনের গন্ধ, কোটটার গায়ে মরা কয়েকটা পোকা সেঁটে আছে, আমি খুঁটে খুঁটে বাছছিলাম, আর তার ওম্ আমার শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সাহস করে একদিন দাদার পড়ার বইও বের করলাম, এবার আমি নিজেই, কয়েকটা বই ওর প্রাইজেও-পাওয়া, যেমন রবিনহুড্, পাতা উল্টে পড়ছিলাম সেই গ্রীনউড্ ডাকাতের গল্প, তুমি দেখে অবাক !—'ওর বই তুই পড়তে পারিস ?' বললাম, 'পারি, একটু একটু', তুমি বললে 'পড়তো দেখি', আমি আস্তে আস্তে শুরু করলাম, তুমি তন্ময় শুনছিলে, কী বড়-বড় চোখ তোমার মা, কী ছোট-ছোট বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ! খানিক পরে তুমি বললে, 'ওর মতো কিন্তু হয় না', সরে গেলে, আমি বইটা মুড়ে হিম হাওয়ার ঝাপটায় কয়েকটা কাকের কর্কশ কান্না শুনলাম, উঠোনে-লাগানো পেঁয়াজ কলিতে কলিতে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছিল, পিছনের পুকুরের শালুক ফুলগুলি মড়া-মড়া, ন্যাতানো।

স্বীকারোক্তি করব বলে কলম ধরেছি, অবশেষে আমি কি তবে প্রণামপূর্বক প্রচ্ছন্ন একটু অভিমানও পেশ করছি ? জানি না। খানিক আগেই তো লিখেছি কত কাছাকাছি এসেছিলাম আমরা, তার মধ্যে হঠাৎ একী ! সেই সরল বাল্যেও শাখা-প্রশাখা লতায়-পাতায় জড়ানো কত যে জটিলতা, তার জট ছাড়াতে গেলে আজও চমকে যাই।

তুমি বলেছিলে, এবার আর পিঠে হবে না। তাতে আমার এমন কিছু এসে যেত না, কেননা পিঠে আমার কখনই প্রিয় নয়, তবু কী করে সে বছর তেতো হয়ে গেল, সেই কথা বলে খালাস হতে চাইছি। সুধীর মামা না-হয় এসে পিঁড়িতে চেপে বসে বললেন, 'করো পিঠে করো', আর ওঁর হাত থেকে খেজুর গুড়ের হাঁড়িটা নিয়ে বিনাবাক্যে উনুন জ্বেলে বসলে তা-ও না-হয় বোঝা গেল, ওই বসার ভঙ্গিটাই একটা প্রতিবাদ, কিন্তু শুধু চন্দ্রপুলি কেন, পাটিসাপটা কেন নয়, পাতে বসেও আমার মনে মনে সেই যে আহত চিৎকার তুমি টের পেলে কি পেলে না জানিনা, কিন্তু আমাকে ভরপেট শুধু পুলিই খাওয়ালে। আমি লোভীর মত চেটেপুটে খাচ্ছিলাম, চুকচুক শব্দ করছিলাম, মুখে বলছিলাম, 'ভীষণ ভালো', কিন্তু কেউ বুঝল না, না তুমি না

সুধীর মামা, ওই উবুড় হয়ে খাওয়াটাই একটা হাহাকার, চন্দ্রপুলি দাদা ভালবাসত, তাই তুমি মাথা হেলিয়ে আমাকে দেখছিলে, সুধীর-মামাকে বলছিলে আস্তে আস্তে 'সে-ও ঠিক এইভাবে খেত।' একটিও পাটিসাপটা পেলাম না।

তার মত, তার মত, যে আমাকে একলা পড়ার টেবিলে উদাস করে দিত, সেই আবার বিছে হয়ে কামড়াল, আশ্চর্য আমি কি নিজেই না-বুঝে একটা মরা মানুষকে হিংসা করছি!

স্কুল খুলেছে, সেই কোটটা পরে যাচ্ছি, তুমি ঝেড়েঝুড়ে দিলে, না মরা পোকাগুলোর একটাও আর নেই, ন্যাপথলিনের একটা ঝিমঝিম নির্জীব গন্ধ শুধু লেগে আছে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, 'ঠিক ওর মত লাগছে' বললে থুতনি ছুঁয়ে, কী স্নেহ, কী স্নেহ, তখন পর্যন্ত ছবিতেই দেখা ঝরনার মত, কিন্তু আমার থুতনি পুড়ছিল! ওর চেয়ে আমি বুদ্ধিতে কম, গায়েও কালো, বরাবর এই শুনে আসছি, সেদিন হঠাৎ তারই মত দেখতে হয়েছি শুনে, কই, বুক ফুলে দশহাত হল না তো! তার মত, তার মত কেন, তার হয়ে তার প্রাপ্য স্নেহ আমি নেব কেন, নিলে হবে নাম ভাঁড়ানো, আমি আমার মতো। যে যেমন, সে সেই মতো। অন্য কেউ হতে ভালো লাগে খালি থিয়েটারে জমকালো পার্ট পেলে, কিন্তু জীবনে? না, কক্ষনো না।

মরা মানুষকে হিংসা করছি, শুধু তা-ই নয়, ওই কোট পরে মনে হত আমি একটা মরা মানুষও হয়ে গেছি, কোটের তলায় তার শরীরকে টেনে চলছি। কিন্তু তারও তলায় বিস্মিত আহত আর-একজন তো থাকত! সে মানত না, বিকল্প একটি সত্তা হয়ে যাওয়া-টাকে বিলকুল বরদাস্ত করতে চাইত না।

কোটটাকে মাটিতে ফেলে একদিন চটকাচ্ছিলাম, সে কবে? বোধ হয় সরস্বতী পূজার সকালে, আসলে অবচেতন স্বার্থ কী সেয়ানা ছ্যাখো, দুর্জয় শীতকালটাকে পার করে তবে সে কোটটাকে খারিজ করে দিতে চাইছিল! কোটটার দুর্দশা দেখে তুমি শিউরে উঠেছিলে, তোমার

চোখে যা ফুটেছিল তার নাম শুধু ক্রোধ নয়, আতঙ্কও, ঝলসাচ্ছিল তোমার চোখ তুটি, না মা, আমার গায়ে তুমি হাত তোলোনি, কিন্তু চাউনি দিয়ে চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছিলে, সেই মুহূর্তে যেন স্নেহের ক্ষীর কেটে কেটে ঘৃণা হয়ে গেল, নীচু হয়ে আলগোছে কোটটা কুড়িয়ে নিলে, ধুলো ঝাড়লে, ঝাড়লে না তো, যেন হাত বুলিয়ে আদর করলে, কোটটাকে, না আর কাউকে, অপ্রত্যক্ষ সে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হল, আমার মতো সে-ও চেয়ে চেয়ে দেখল, ঝেড়ে পুঁছে কোটটাকে তুমি ফের টিনের বড় বাক্সটায় ভাঁজ করে শুইয়ে দিচ্ছ।

কোটটা আবার মিশে গেল অন্ধকারে, পড়ে রইল ন্যাপথলিনের বিকট গন্ধে ম'ম' এক অবশ জগতে, কত কাল কে জানে, অথবা মরা কতিপয় সেই পোকারা প্রাণ ফিরে পেয়ে কি কোটটাকে ধীরে ধীরে খুঁটে খেয়েছিল ?

জানি না। ওই কোট আমি আর পরিনি। পরের শীতে সুধীর-মামা আমাকে আর একটা কিনে দিয়েছিলেন, যদিও সেটা ছিটের।

তিন

ওই শোক কখনও শান্ত-সংযত থাকত, কখনও বা মাত্রা ছাড়াত, দিনের পর দিন এই দেখেছি। শীতের দিন তবু চট করে ফুরিয়ে যেত, কিন্তু গরমের লম্বা দিন আর কাটতে চাইত না। খুব ধুলো উড়িয়ে দোলের দিন এল গেল, কত রঙ মাখামাখি, কত ঢোলক, রাস্তায় কী উৎকট চিৎকার আর মাতামাতি, কিন্তু আমাদের বাড়িটা তার বিরস বিধবার চেহারা ধরেই রইল, একটু আবির কিনে এনে তোমাকে প্রণাম করব যে, আমার সেই সাহসও হল না। শেষে দুপুরের পরে, সবাই যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম, "মা, একটু রঙ কিনে আনি?" তুমি যেন ভয় পেলে।—"খেলবি?"—"না, তোমার পায়ে দেব শুধু।" আমি তাকিয়ে আছি, তুমিও কিছু বলছ না, অনেক পরে আস্তে আস্তে বললে, "যা।" টাকা হাতে দিয়ে বললে, "ওই সঙ্গে বাজার থেকে ঘি রঙের কয়েক গাছি ডি এম সি সুতো কিনে আনিস।"

তোমার হাতে বোনা চমৎকার কারুকার্য করা লেখাটা কত দিন আমাদের ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল বলো তো। ধবধবে এক খণ্ড পাট পাট করা লংক্লথ আমাদের বাড়িতেই ছিল, আমি রেশমী সুতো এনে দিলাম, তুমি সেদিনই বোধ হয় ছুঁচ নিয়ে বসলে। তোমার বয়স তখন কত আর—হিসাব করে দেখছি তিরিশ কি বত্রিশ। চশমা লাগত না।

চার পাশে লতা-পাতার নক্‌শা হল, কোণে কোণে পাখি। বিকালে সুধীর মামা এলেন।

"ওটা কী করছ?"

একটু অপ্রতিভ হলে বোধ করি। নক্‌শাটা টানটান করে ধরে বললে, "কেমন হয়েছে বলো না।"

লাঠির উপরে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে সুধীর মামা বললেন, "চমৎকার। কিন্তু কেন। কার জন্যে, তা-তো বললে না।"

"দিন যে কাটতে চায় না, সুধীরদা। তাই ভাবছিলাম, ওর জন্যে, ওর কথা ভেবে একটা কিছু করি।"

(দাদার একটা নাম ছিল, কিন্তু সে চলে যাবার পর
তার নামটা তুমি সহজে মুখে আনতে চাইতে না, হয়ত
তোমার জিভের ডগা জ্বলত।)

সান্ত্বনার স্বরে, যেন সান্ত্বনা নয় একটা মলম, আর কথাগুলো আঙুল, সেইভাবে প্রলেপ দিতে দিতে সুধীর মামা বললেন, "ভুলতে পারছ না ?"

মাথা নাড়ছিলে তুমি। মানে, বলা হয়ে গেল, একদম না। "ভোলা সম্ভব না। ভুলে থাকতে যদি পারি।"

তখনই বুঝি কী খেয়াল হল তোমার, গলায় আঁচল ফিরিয়ে প্রণাম করলে সুধীরমামাকে। ওঁর পায়ে বাজার থেকে যে আবির কিনে এনেছিলাম, তার প্রায় সবটাই ঢেলে দিলে।

পরে নকশাকাটা কাপড়টার মাঝখানটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "এইখানে ওর উদ্দেশে কিছু লিখে দেওয়া যায় না ? তুমি তো অনেক পড়েছ সুধীরদা, কয়েকটা লাইন বলে দাও না, কোনও কবিতার গোটা কয়েক উপযুক্ত লাইন ?"

সুধীর মামা পরদিন এনে দিলেন একখানা বই। তারই একটা পাতা থেকে

হেথা হতে দূরে দূরে
স্বরগে, অমরপুরে
হৃদয়ের ধন মম কত দিন গিয়েছে।

না, না, না, যায়নি সে তো,
তারা ধরে নিয়েছে॥

সে-সব মরমে রোক
আমারি পরাণে শোক,
সে-আগুন এ-হৃদয়ে জ্বলিতেছে জ্বলিবে
কাজ কি দেখায়ে পরে, কার বুকে বাজিবে ॥

মনে আছে, বইটার নাম "কাব্যকুসুমাঞ্জলি।" স্বামীবিরহাতুরা নারীর ব্যথাকে পুত্রশোকাধীরা মাতার কথা করে তুলতে একটু বদলে নিতে হয়েছিল।

তারপর দাদার একটা ফটোও না খুব কড়া করে বাঁধানো হল! রোজ টাট্‌কা ফুলের মালা দেওয়া হত তাতে, ফুল আমি আনতাম, তুমি গেঁথে তুলতে। সুধীর মামা আসতেন, দেখতেন। মাথা নাড়তেন, যেন তোমার বেদনা স্পর্শ করছে তাঁকে। বলতেন, "একটুও ভুলতে পারছ না?"

তুমি চমকে উঠে বলতে "না, না!" হিংসায় নয়, তখন সমব্যথায় আমিও আর্ত হয়ে পড়তাম। আজ কিন্তু একটু খটকা লাগছে মা। "না—না" বলে কী অস্বীকার করতে তুমি? ভুলতে না পারাটা, নাকি একটু-একটু করে যে ভুলতে শুরু করেছিলে, সেই কথাটা? শোকের গাঢ় রক্ত কি একটু ফিকে হয়ে আসছিল, তাই কি স্মৃতি নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটি, ফ্রেমে বাঁধিয়ে উঁচু করে ধরা, মন্ত্রজপের মাত্রা বাড়ানো দরকার হয়ে পড়ছিল?

তখন বুঝিনি তাই জিজ্ঞাসা করিনি। আজ ধারণাটা কেন্নোর মত নড়ছে, কিন্তু জেনে নেবার উপায় নেই, উপায় তুমি রাখোনি।

বাবাকে বোধহয় তার দিন কয়েক পরেই দেখা গেল।

সে-ও হঠাৎ। শীতকালে যেমন শরীরের চামড়া ফাটে, আর প্রখর জ্যৈষ্ঠে মাঠ, আমাদের সংসারেও তখন থেকেই তেমনই কেমন-কেমন সব ফাট ধরতে থাকল, অন্তত তুমি যেভাবেই ছ্যাখো, আমি ওই ভাবেই দেখেছিলাম। ভালো হোক মন্দ হোক,

এতদিন একভাবে চলছিল, সেই ধরনটাই জানতাম অভ্যাস, সেই ধরনটাই জানতাম নিয়ম, কিন্তু বাবা আসতে কী যেন বদলে গেল, একটু আলাদা রকম, আমি সবটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

(মা, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি জনান্তিকে এখানে বাবাকে কিছু লিখি! এইভাবে লিখতে ইচ্ছে করছে যে, বাবা, তোমার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই। তার মধ্যে প্রথম অপরাধ তো তোমাকে গ্রহণ করতে না-পারা। এই অক্ষমতা তৈরি হয়েছিল অদর্শনে, অনভ্যাসে। আমার শৈশবে, বাল্যেরও দীর্ঘকাল জুড়ে, আমার জীবনে তোমার এক রকম কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ক্বচিৎ এসেছ তুমি, ক্বচিৎ তোমার চিঠি দেখেছি, তাও হাতে লেখা খামের ঠিকানাটাই শুধু, মাকে লেখা সে-সব চিঠি মা লুকিয়ে ফেলত, কোনদিন পড়তে দিত না, দেওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। আমাদের ঘরে তোমার নাম উল্লেখ করা হত আভাসে, শুনে শুনে যে-ছবিটা আন্দাজে তৈরী হয়ে গিয়েছিল মনে, সে-ছবি এক নির্বিকার বাইরের জনের, যে সংসারের দায় নেয় না, পুত্র-পরিজনের প্রতি যার স্নেহ নয় যথোচিত, সর্বদাই সে হয় রাজবন্দী নয় ভবঘুরে, মাঝে মাঝে কখনও কখনও বছরের পর বছর পাড়ি দিয়ে, বিদ্যুৎ-চমকের মত সহসা ঝলসে যেত, নিজের পরিবারে নিজের জন্য বিশেষ কোনও আসন তার জন্যে রক্ষিত ছিল না, অন্তত আমি দেখিনি, কোনোকালে যদিও বা থেকে থাকে, আমি তখন জন্মাইনি।

সধবা থেকেও যিনি জীবন যাপন করেছেন যেন শূন্য-শুভ্র এক বিধবা, যার কপালটা ছিল যখনও সূর্য

ওঠেনি, শুকতারা জ্বলছে সেই শীতল স্নিগ্ধ আকাশের মত, তিনি ব্যবহারিক শুচিতায় তোমার জন্যে, বাবা, সবখানি যদি সন্তর্পণে সংরক্ষিত করেও থাকেন, তাঁর অন্তরের কথা আমি জানি না। দীঘি নিরন্তর কাটা না হলে ধীরে ধীরে বুঁজে আসে, আর আমারটা তো কখনো কাটাই হয়নি, বোজাই ছিল। নিরামিষে অভ্যস্ত যে, সে যেমন পাতে হঠাৎ মাছ দেখলে অরুচিতে আক্রান্ত হয়। তার চেয়েও বরং একটা তুলনা দিয়ে বলি, কর্ণের প্রাণে যেমন তার প্রকৃত মাতার জন্যে হাহাকার ফুরিয়ে এসেছিল, প্রয়োজন এসেছিল শুকিয়ে, আমারও তাই। বাবা ক্ষমা কোরো, তোমার আকৃতি প্রকৃতি কিছুই তখন আমার গ্রহণীয় মনে হয় নি, তুমি যেন উৎপাতের মত একটা অবাঞ্ছিত অনাবশ্যকতা, কারণ একটি প্রতিরোধ, একটি বিরোধিতা আগে থেকেই লালিত ছিল।)

খুব ঝড়জল হয়েছিল সেদিন মাঝ রাতে, ভিজে সকালটা চোখ খুলতেই চাইছিল না, আর ঝড়ের সময় খুঁটিসমেত আমাদের টিনের চালাটা দুলছিল বলে যেহেতু আমাদেরও ঘুম ছিল না, ঠায় বসেছিলাম বিছানায়, উত্তাল মশারির তলায়, জানালার একটা পাল্লা সেদিনই আবিষ্কার করা গেল যে, আলগা, ওর ঠক ঠক কাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল আমাদের হাড়ে, বায়বীয় ভয় হয়ে আমাদের মনেও, আর বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ তো না, যেন ডাকাতেরা আকাশটাকে ফালাফালা করে কাটছিল, আগুনের রঙ লালঘেঁষা হল্‌দে হয় তো! আমি বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখছিলাম রক্তের ফিনকি, কালো রাতটার গা-চুইয়ে পড়া রক্ত।

শেষ রাতে ওই হাওয়াই আবার মৃদু হয়ে এসেছিল, কালোয়াতী কসরতের মাতামাতির পর যেন তার করুণ রেশ, মৃদু হাওয়ার স্নেহ-শীতল আঙুলের ছোঁয়ায় আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার ঘুম ভাঙল যখন, তখন সকালটা অনেক আর্ত পাখির—পরে দেখেছি কারও বাসা ডাল ভেঙে ঝুলছে, গাছের গোড়ায় ছড়ানো থ্যাঁতলানো কাঁচা ডিম—অনেক আর্ত পাখির গলায় সকালটা ডাকছে। কাঁচা ডিমের কুসুমের রঙের মতই রোদ্দুর, রোদ্দুরটাও ভাঙা ডিমের মতই আঁটা-আঁটা, বিছানায় পড়তেই তুমি ধড়মড় করে বসলে। রোজ তুমি উঠে সকালের সূর্যের ঘুম ভাঙাও, সেদিন সূর্যই তোমার ঘুম ভাঙালো।

মা, তুমি উঠোনের স্তূপাকার পাতাগুলো জড়ো করে রাখছিলে এক পাশে, শুকনো ডালপালা আর পাতায় উনুনের আগুন হবে, তার পরেই সুধীরমামা এলেন, তাঁর লাঠির ঠকঠকে তাঁকে চেনা গেল, মাথাটা একবার তুলে আমি দেখলুম তাঁর মাথাটা সুদ্ধ আজ ঢাকা-দেওয়া কমফরটার, তখনও নিমের গ্লাস পাননি, তাই কালকের ঝড় আর আজকের সকালটার বিষয়ে তোমার সঙ্গে মৃদু স্বরে দু' চারটে কথা বলছিলেন, তেমন দরকারী কথা নয় অবশ্য, শুধু চুপচাপ অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যেই কথা।

তখন আরও একবার বাইরের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা শোনা গেল, কি কাজে তুমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলে, সেই জন্যেই বোধ হয় উঠতে হল সুধীরমামাকেই, আমিও তখন বিছানায় উঠে বসেছি, খিল খোলা হল, সঙ্গে সঙ্গে সুধীরমামার গলায়, "আরে আপনি! আসুন আসুন", যাকে বলা হল তিনি প্রত্যুত্তরে ঘড়ঘড়ে গলায় কী বললেন বোঝা গেল না, হয়ত বলেননি কিছুই, খালি একবার আড়চোখে চেয়েছেন, তারপর পাশ কাটিয়ে সোজা এসে উঠেছেন শোবার ঘরে, যেখানে আমি তখনও বিছানায়।

আমি চোখ বিস্ফারিত করে দেখছিলাম তাঁকে, এমন-কী সুধীর-মামার পাশ কাটিয়ে যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখনই তাঁর চেহারাটা

টোকা হয়ে গিয়েছে। মাথায় খাটো, বোধ হয় সুধীরমামার কাঁধের চেয়ে উঁচু না, কিন্তু মজবুত, ভারী ভারী পা ফেলার ধরন, এক পাশে লাঠিতে ঝুঁকে দাঁড়ানো কৃশ, দুর্বল, বেখাপ্পা লম্বা সুধীর মামার চেহারাটা এমন কুণ্ঠিত, বিসদৃশ ঠেকছিল।

চৌকাট পেরিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন, বিছানার সামনে, ছড়ানো ছায়ায় আমাকে ঢেকে অন্ধকার করে দিয়ে, খুব উৎসুক, তীব্র, স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। আমি দেখলাম একটি মোটা কোর্তা, পানজাবি নয় ফতুয়া, চওড়া কাঁধ, রোমশ-বলিষ্ঠ দুটি হাত, যেন দুটি থাবা, ঘন ভুরুর মাঝখানে একটা প্রায় আব্-সাইজের আঁচিল।

বেশিক্ষণ তাকাতে পারিনি, চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন, গম্গম গলায় বলে উঠেছিলেন, "কই এদিকে এসো। গল্প বন্ধ হল না এখনও? ও জানে না যে আমি ওর বাবা? গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, শেখাওনি?"

দরজার আড়ালে একটি ছায়া পড়েছিল—তোমার। সেই ছায়াকে আগে ঘরে পাঠিয়ে পিছু-পিছু এলে তুমি। চাপা গলায় বললে, "বাবা যে, কী-করে জানবে, কথাটা গায়ে লেখা থাকে না তো!"

সেই গম্ভীর গলা হেসে উঠল, মজা পেয়ে, না বিদ্রূপে, বলা যায় না, হো-হো ধ্বনির পর শোনা গেল, "ঠিক বলেছ, গায়ে লেখা থাকে না, পরিচয় থাকে রক্তে, শিরায় শিরায়, রগে রগে।"

ততক্ষণে আমি প্রণাম করেছি, তিনি আমাকে তুলে নিয়েছেন দু'হাতে সাপটে, চেপে ধরেছেন আমাকে ওঁর বুকে, আমার মাথাটা ওঁর জামার যেখানে মাঝের বোতামটা, ঠিক সেইখানে, কপালে লাগছিল, মোটা—না-জানি কতদিন না-কাচা ধুলোয় ভর্তি ফতুয়াটার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছিল, তবু একটি শিহরণ, একটি রোমাঞ্চ, একটি ভয়, দুর্বোধ্য সেই অনুভূতি আর আবেশটাকে, মা, এতদিন পরে কথায় কী করে ফোটাব!

একবার মনে হয়েছিল ছাড়লে বাঁচি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না, তা-

ছাড়া উনি ধরে রেখেছিলেন কতক্ষণ আর। আসলে সেকেন্ড কয়েক তো মাত্র, তারপর মাথা তুলেই খড়খড়ে চিবুকটা এগিয়ে আড়চোখে তাকাতেই তোমাকে দেখলাম, মা!

অল্প একটু ঘোমটা তুলে তুমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলে। মাথায় ঘোমটা-তোলা তোমাকে সেই প্রথম দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক একটু ত্রস্তে চেয়ে তুমিও গড় হয়ে প্রণাম করলে।

তিনি বললেন, "থাক, থাক", তুমি উঠে দাঁড়ালে যখন, দেখি তোমার মুখ হাসি-কান্নাতে ভেজা-ভেজা, আজ ভোরের ধোয়া চিকচিকে গাছের পাতার মতন। পুরনো কথাটার খেই ধরে ধরে তুমি বলছিলে, "কী করে চিনবে, সেই একেবারে যখন ছোট্টটি, তখন দেখেছে তো! বরং চিনতে যে পারত, সে তো—"

মা, এতক্ষণ এই কথাটা বলার জন্যেই বুঝি তোমার মুখ টসটসে হয়ে ছিল, "যে চিনলেও চিনতে পারত, সে তো—" শেষ হতে না হতেই তোমার মুখে যেটুকু-বা রোদ ছিল, সব মুছে আষাঢ়ের বর্ষা নামল। দরজার কাঁপা-কাঁপা কবাটটা ছেড়ে তুমি দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় অসহায় বসে পড়লে। আজও তোমার সেই ফোঁপানি শুনতে পাচ্ছি।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছিলেন তিনি, এই মাত্র জেনেছি যিনি আমার বাবা। ইতিমধ্যেই তিনি অসহিষ্ণু, অব্যক্ত কোনও অপরাধ-ভারে অস্বস্তিগ্রস্ত, তোমার কথা শুনছেন না, অথবা চাইছেন না শুনতে।

"তুমি খবর পাওনি? তুমি জানতে না?" নম্র অথচ অকম্পিত তোমার কণ্ঠ, বাবাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। ওই ভারী-ভারিক্কী মানুষটি কেমন যেন জেরার মুখে বিপাকে পড়ে অসংলগ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন।—"জানতাম কিনা? না, জানলাম কই আর, যখন খবর পেলাম, তখন তো চলে গিয়েছি অনেক দূরে, ছাড়া পেয়েই গিয়েছিলাম হরিদ্বার, কনখল, তারপর হৃষীকেশে, সেখান থেকে কোথায়

কোথায়, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, তুমি নামও জানো না। নেপালের তরাই হয়ে নেমে এসেছি বিহারে, শোনপুরে হরিহরছত্রের মেলায়, সে যে কী বিরাট ব্যাপার, তুমি কল্পনাও করতে পারো না। সে সব গল্প করব আর একদিন, হাতি ঘোড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ, তার পরে আর একটু পশ্চিমে গিয়ে সরযূ নদীতে স্নান, ভরা অমাবস্যা, মাঘের শীত, কী কনকনে জল, টলটলে, কী জানো, এবার জেল থেকে বেরিয়ে কেমন বিবাগী-বিবাগী লাগছিল, মনে হল, দেশের কাজ করব যে, তার আগে দেশটাকে তো জানা চাই, দেখলাম এই দেশটা ছড়িয়ে আছে তার তীর্থে তীর্থে, কোটি কোটি মানুষের সহজ জীবনধারায়, সরল, বিশ্বাসী মুখের রেখায়, তাকে চিনতে চেষ্টা করলাম।"

"শুধু তোমার নিজের পরিবারকে জানতে চিনতে পারলে না" তুমি বললে মৃদু স্বরে। "দেখাশোনা করে কে, সংসার চলে কী করে—"

এইবার বাবা যেন রেগে উঠলেন, রাগটার মাথা থাবড়ে, গোঁ-গোঁ ডাকা কুকুরকে লোকে যেমন নিরস্ত করে, ফোটালেন একটা ঠাট্টার হাসি, "তোমরা স্ত্রীলোক শুধু ঘরের কোণটুকুই বোঝো। দেখাশোনার কথা বলছ?" একটু বাঁকা ভঙ্গি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে, বাইরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখাশোনার লোকের তোমার অভাব ছিল নাকি! মনে তো হয় না।"

তখনই কেমন একটা দম-আটকানো আওয়াজ এলো বাইরের দাওয়া থেকে। বরাদ্দ নিমের গ্লাসটি সেদিনও বাদ পড়েনি, কিন্তু তেতো রসটা হঠাৎ বুঝি গলায় আটকে গেছে।

আমরা সকলেই এসে দাঁড়ালাম বাইরে। সুধীরমামা ততক্ষণে লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বাবার দিকে তাকিয়ে কেমন বোকার মত হাসলেন; হাসলেন তোমার দিকে চেয়েও, শেষে চোখ সরিয়ে বললেন "আমি যাই আনু, বেলা হয়ে গেল, দেখি প্রণববাবুর জন্যে যদি মাছ-টাছ—"

অপসৃত দীর্ঘ দেহটা দেখতে পাচ্ছি, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া, সুধীরমামা চলে যাচ্ছেন।

বাবা উঠোনে নেমে নেতিয়ে-পড়া একটা গাঁদাফুলের গাছ তুললেন। —"উপড়ে ফেললে ?" তুমি যেন ভয় পেয়ে বললে।

"ফেললাম" বাবা বললেন অনায়াসে ; হাত থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে, "ফেললাম। শুকিয়ে গিয়েছিল। জঙ্গল হয়েছিল। আর ফুল ধরত না।"

"কিন্তু আসছে বছরের বীজ যে ও থেকেই—"

"আবার হবে", বাবা একেবারে নির্বিকার গলায় বললেন। ওপড়ানো গাছটাকে পা দিয়ে শুট করে ছুড়ে দিলেন বেড়ার গায়ে।

বাবাকে তখন ঘৃণা করলাম।

আজ স্বীকার করছি, পরবর্তী অনেক বছরে উপরে যতই আস্তর পড়ুক, ওঁর প্রতি আমার অনুভূতির তলায় বিরাগ কিংবা ঘৃণাই ছিল মূল উপাদান। ওঁর প্রতি সুবিচার আমি করতে পারিনি, কিন্তু নিয়তির দ্যাখো, কী ক্রূর বিধান! বাবার আকৃতি, শক্ত-সমর্থ চওড়া কাঁধ, জোড়া ঘন ভ্রূ, ভুরুর আঁচিল, গলার ঠিক উপরে থুতনির দু'তিনটে ভাঁজ, হাঁক-ডাক বাজ-ডাকা কণ্ঠস্বর—সেদিন কিচ্ছু আমার পছন্দ হয়নি, কেন না আমি তখন হালকা, পল্‌কা, হলদেটে, রোগা, নিজেকে কবি-কবি ভাবা, সবই অভ্যাসে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আজ কিন্তু আয়নাকে সাক্ষী দাঁড় করালে তার মুখে হুবহু বাবার তখনকার চেহারার বর্ণনাই শুনতে পাই। কড়কড়ে চামড়া, ভারী গাল, জোড়া চিবুক, গাঁটা-গোট্টা গর্দানাঘাড়, দেখে চমকে উঠি। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে, উত্তরাধিকার সুদ-আসল সমেত আমার প্রাপ্য আমার সর্বাঙ্গে চাপিয়ে দিয়েছে। ওই আকৃতির সঙ্গে কবে থেকে আমি নিয়ত বসবাস করি, বহন করি শরীরকে, যে শরীর আমার অস্তিত্বেরও

প্রত্যক্ষ রূপ, যে আজ স্বীকৃত সর্বস্বত্বে আমার। বাবার প্রতি ঘৃণা-বিরাগের মাশুল চুপেচুপে উশুল হয়ে গেছে।

ঘৃণা সেদিন মা, করেছিলাম তোমাকেও, একটু পরে, একটুখানি। তুমি হঠাৎ কেন সুন্দর হয়ে উঠেছিলে। পুকুরে ডুব দিয়ে এলে, রোজই যাও, সেটা কিছু না, কিন্তু ফিরে এসে সেদিন বাক্স থেকে বের করে নিলে একটা তুলে-রাখা শাড়ি। হলদে জমি, পাড় লাল। রঙীন শাড়ি পরতে তোমাকে আগে কখনও দেখিনি, কী চমৎকার যে লাগছিল, কী খারাপ যে লাগছিল! ভালো লাগা আর খারাপ লাগা একটা কাটারির মত আমাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগল, ফিনকি দেওয়া রক্তে মন ধুয়ে যেতে থাকল, তার রঙও লাল। আগে পূজোয় যখন বসতে তুমি, তখনও যে শাড়ি পরেছ, তার পাড়ও টকটকে লাল, কিন্তু সাদা জমি, সাদায় লালে ঘিরে থাকা তোমাকে অপরূপ লাগত, যে দেবীমূর্তির পায়ে তুমি ফুল দিচ্ছ, মহিমায় তাকেও যেন যেতে ছাড়িয়ে, লালপেড়ে সাদামাটা সেই শাড়ি আমার নয়নে প্রগাঢ় পবিত্র। কিন্তু রঙ আঁকত, আমার অবচেতনে সেদিনকার ওই শাড়িটা তোমার মহিমা চুরি করে বিনিময়ে নিশ্চয়ই একটা ছটা দিল, নইলে আমি অনিমেষ চেয়ে ছিলাম কেন, ভঙ্গিতে একটা ঘূর্ণির ছন্দ, না থাকুক তোমার সেই দিব্য দ্যুতি, মা, তুমি এত কোমল, এত অপরূপ, এত সলজ্জ হতে পারো, জানতাম না তো। সলজ্জ সৌন্দর্য আমাকে প্রবল মায়ায় টানছিল, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন নিহিত একটা অলজ্জতা আমাকে তেতো করে দিচ্ছিল।

খেতে বসে বাবা জেনে নিলেন আমি কী পড়ি, পাশাপাশিই বসলাম দু'জনে, তুমি মাথায় অল্প একটু কাপড় তুলে পরিবেশন করছিলে, অনভ্যস্ত ঘোমটা খুলে খুলে পড়ছিল, বিড়ম্বিত তুমি হাতের প্রিঠ দিয়ে সেটাকে বারবার যথাস্থানে ন্যস্ত করছিলে, এই

সব দেখতে দেখতে ভালো লাগা-না-লাগায় অস্থির হতে হতে মুখে গ্রাস তুলছিলাম, বাবা যা জানতে চাইছেন, যতটা পারি গুছিয়ে তার উত্তর দিচ্ছিলাম।

স্নানের পর বাবাও একটু আলাদা যেন, সেই খোঁচা-খোঁচা ভাবটা মুখে বা কথায় নেই, সব ধুয়ে মুছে গেছে যেন, একটু কমনীয়, একটু ক্লান্তও, আমাকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করছেন, যেন পরীক্ষক, আমি সাবধান, সচেতন, যথাসাধ্য তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি।

খাবার পর শোনাতে হল আবৃত্তি। 'আজি কী তোমার মধুর মূরতি' ধরতেই বললেন "ন্যাকামি। 'বিদ্রোহী' জানিস না?' বলে নিজেই দু লাইন পড়লেন, 'বল বীর/বল উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!' শুনিসনি?"

কাঠের পুতুলের মত মাথা নেড়ে বললাম—"না।"

—"ওই মধুর মূরতি কবিতাটা তোকে কে শিখিয়েছে? পড়ার বইয়ে আছে?"

বললাম, "হ্যাঁ!"

—"কিন্তু এভাবে ঢঙ করে পড়তে শিখিয়েছে কে?"

—"সুধীরমামা।"

—"কে? ও। তোকে পড়ায় বুঝি?"

—"হ্যাঁ"—

—"বলতে হয় 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। রোজ পড়ায়?"

—"রোজই।"

—"তুই যাস?"

—"উনি আসেন।"

—"ও।"

কিছুক্ষণ বাবা আর-কিছু বললেন না, নিঝুম হয়ে থাকলেন। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটা যে ভুল, তা টের পেলাম পা-টিপে বেরিয়ে আসতে গিয়ে।

—"কোথায় যাচ্ছিস ?"—"এই এমনি। বেশি দূর যাব না, স্কুলের মাঠ অবধি। ব্রতচারী স্যার ডেকেছেন।"

বলে একটু অপেক্ষা করলাম। অল্প পরেই ওঁর নাক থেকে ভোঁস ভোঁস শব্দ বেরুতে থাকল, শোনার অভ্যাস নেই, কেমন অদ্ভুত, বিশ্রী লাগছিল। ওঁর তলপেট তালে তালে উঠছে নামছে, প্রবল পরাক্রান্ত মানুষটা এখন অবসন্ন, দুর্বল—সেদিন এই দৃশ্যটাও ঠেকছিল হাস্যকর। আজ তো জানি, আমারও নাক ডাকে, অনেক দিন থেকেই ডাকে।

বেরিয়ে দেখলাম, মা তোমাকে। দাওয়ার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পা ধুয়ে ঘরে উঠছ। থমকে দাঁড়ালাম, ভাবলাম বকবে। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তাই জোরে জোরে বলে উঠলাম, "স্কুলে যাচ্ছি। ব্যায়াম স্যার ডেকেছেন।"

"আজ না ছুটি ?" এই প্রত্যাশিত প্রশ্নটা কিন্তু শুনতে হল না, যদিও ঠা-ঠা রোদ্দুরে ঝলসানো আকাশটার দিকে চেয়ে, উত্তরের ভিটের নারকেল গাছটার মরা ডালে দুটো কাকের হাহাকার শুনতে শুনতে অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর দৌড়ে সদর দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে বেপরোয়া খিল খুললাম, তখন রোখ চাপল, সাহস বাড়ল। যেন দরজাটাকেই উদ্দেশ করে আরও চিৎকার করে বললাম "যাচ্ছি। বিকেলের আগে ফিরব না।" কিন্তু "টো-টো করিস না, মাথা ধরবে" পিছন থেকে কেউ বলল না।

সারা দুপুর, তুমি জানো না, সেদিন ঘুরলাম। প্রথমে সঙ্গী ছিল ভয়, পরে কখন দেখি, যেই দীঘির জলে মুখ নোয়ালাম, দাদাও এল। ঝুঁকে হাত দিয়ে জল সরাতেই দেখি, সে নেই। জল থিতিয়ে যেতেই সে আবার এল। সে এল, গেল, এল, আমি জল নাড়ি আর থামি, তাকে অনেক কথা বললাম, বাবার আসার খবর, আমার বিতৃষ্ণা, আমার অভিমান। সে সব বুঝল, যেন ঘাড় নেড়ে সায় দিল, বিশেষ করে যখন বললাম, "তুই তো চলে গিয়ে বেঁচেছিস", সে নিশ্চয়ই

হালকা হাসল, নইলে ঠিক তখনই বোষ্টম দীঘির পাড়ে যে গাছতলায় বসেছিলাম, তার ডাল থেকে টুপটুপ কয়েকটা পাতা আমার মাথায় খসে পড়বে কেন। একটা বক কেবলই উড়ে উড়ে দীঘির জলে ডুব দিচ্ছিল, কলমী দাম অল্প অল্প কাঁপছিল, একটা দুধ-ধবল শঙ্খচিল যখন হা হা করে উড়ে গেল, তখনও আমি বসে, আমি কি আরও এই সব দেখব, কিংবা বকটা দীঘির জলের তলে কী খুঁজছে আমিও কি নেমে ওকে সাহায্য করব, করা উচিত হবে নাকি, এইসব ভাবছিলাম। ভয়? না, তখন আমি আছি আর দাদা আছে, ভয়-টয় কিচ্ছু ছিল না।

প্রায়ই বেরুতে থাকলাম যখনই একটু ফাঁক, তখনই, স্কুল ছুটির পর বিকালেও। বকুনি খাব বলে তৈরি, জবাব কী দেব তাও ঠিকঠাক করে রেখেছি, কারণ ঢুকেই দেখেছি তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে, তার মানে সন্ধ্যা, তার মানে আকাশের এখানে-ওখানে তারার পাহারা, সব এড়িয়ে যখন ঘরে ঢুকতাম তখন পালা পড়া হচ্ছে। বাবা পড়ছেন, তুমি গালে হাত দিয়ে শুনছ। বাবার পড়ার ধরনটা অস্বাভাবিক, কোনওখানটা পড়ছেন থিয়েটারি কায়দায়, হঠাৎ আবার গলা নামিয়ে আনছেন, আর ওই ভরাট গলায় মেয়েদের অংশ বলতে গিয়ে যখন স্বরটা সরু করতে চাইতেন, যেন ভোঁতা পেনসিলটা চেঁছে ছুঁচলো করা হচ্ছে, তখন কী-যে অদ্ভুত শোনাত। কখনও বা একটু সুর দিয়ে গেয়ে উঠতেন, সে কী মজার গলা কাঁপানো, নিজের পায়ে হাত থাবড়ে থাবড়ে দিতেন তাল। বুঝতাম না কিছুই, হয়ত বুঝতাম না বলেই ভালোও লাগত না।

তবু শুনলে বাবা খুশী হতেন, গোঁয়ার গোঁয়ার মুখখানা এক ধরনের আহ্লাদে ঝিলিক দিত। তুমি উশখুশ করছ হয়ত, বলছ "যাই, রান্না চাপাই", বাবা হাত ধরে টেনে বসাতেন, "আহা শোন আর-একটু শোনই না! এই জায়গাটা খুব মন দিয়ে লিখেছি।"

তোমার হাত যে ছাড়িয়ে আনব, তখন আমার অত জোর কই মা, আক্রোশ আর অক্ষমতা আমাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত। যে অনিচ্ছুক তাকে জোর করে লেখা পড়ে শোনানো—জোর ? জোর কিসের, এ-তো হ্যাংলামি।

(সেই হ্যাংলামি আমাকেও যে একদিন করুণার পাত্র করে তুলবে, তখন কি জানি !)

তুমি বলতে, "তুই পড়তে বোস গে।"

জর্জর রাগে বলতাম "একটাই যে লণ্ঠন।"

পাতা থেকে চোখ তুলে বাবা বলতেন, "কাল থেকে ওকে আলাদা একটা লম্ফ জ্বালিয়ে দিও, ও ওই কোণে বসে পড়বে। আজ বরং এই পালাটাই শুনুক।" বাবা বলতেন অম্লান বদনে।

ফের শুরু হত পাঠ। একটানা অনেকখানি পড়ে বাবা বললেন, "বুঝতে পেরেছ কী বলতে চাইছি। দেবযানীকে নিয়ে লেখা তো, তিনি হলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। ভালোবাসলেন পিতৃশিষ্য দেবপুত্র কচকে। ভালোবাসা পেলেন না, তখন অভিশাপ দিলেন যাকে চেয়েছিলেন তাকে। কিন্তু পরকে অভিশাপ দিলে নিজের দুঃখ কি যায় ! যায় না। দেবযানীর বিয়ে হল, রাজা যযাতি স্বামী। মনে হল এইবার বুঝি দুঃখের শেষ, কিন্তু সেখানেও সপত্নী। ঈর্ষায় কাতর দেবযানীর ইচ্ছায় নির্বাসিতা শর্মিষ্ঠা, কিন্তু তবু দেবযানী জয়ী হতে পারলেন কি ? বিশেষ করে যখন জানলেন যে, স্বামী চলে যান সেই নির্বাসন-স্থানে, নির্বাসিতা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন গোপনে, তখন যে দাউ দাউ চিতা জ্বলে উঠল দেবযানীর মনে, সেই অসহ্য যন্ত্রণার কথা ভাবাও যায় না। আবার অভিশাপ, এবার স্বামীকে। কিন্তু সেই অভিশাপে কি নিজে যে অভিশপ্ত, তার জ্বালা ঘোচে ? বারবার যে ভালোবাসল, কিন্তু জীবনে সত্যকার ভালোবাসা কারও কাছে পেল না, সেই নারীর বেদনা এই পালাটায় আমি বুঝতে, বোঝাতে চেয়েছি।"

মা, তখন তুমি আড়চোখে চেয়ে দেখেছ, আমি শুনছি কিনা, বুঝছি কিনা। তখন অতটা বুঝিনি ঠিকই, কিন্তু গিলেছি, কথাগুলো সেই বয়সে কেমন অনায়াসে মনে গেঁথে যেত, তাই তাদের সারাংশটা আজ উগরে দেওয়া অসম্ভব হল না।

দেবযানীর বেদনা বুঝতে চেয়েছি, চেয়েছি বোঝাতেও—বাবা এই বলে যেই শেষ করলেন, তখনই দেখলাম, মা, তুমি আস্তে আস্তে উঠে পড়লে। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছ, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে কেমন যেন বদলানো গলায় বলছ, "অন্য সব মেয়ের দুঃখই তুমি বোঝো। একটুও দেরী হয় না।"

ওই গ্রীবাভঙ্গি আর ওই উচ্চারণে কাকে দেখলাম মা, কাকে। তার নাম কী। অভিশাপ দেয় যে, সেকি সেই দেবযানী ?

চার

পরদিন তুমি সন্ধ্যা থেকেই ছিলে রান্নাঘরে, বাবা সেদিন কিছু শোনাচ্ছিলেন না, লণ্ঠনের সামনে খাতা খুলে বসেছিলেন, হয়ত-বা লিখছিলেন একটা নতুন পালা, আমার জন্যে আলাদা একটা ছোট্ট হারিকেন এসেছিল, আমি বিছানার আর-এক কোণে বসে ঘাড় গুঁজে অঙ্ক কষছিলাম, কারণ জোরে কিছু পড়লে বাবার আবার ব্যাঘাত যদি ঘটে, বাবা কিন্তু লিখতে লিখতেই সুর করে খানিকটা লেখা পড়ে নিচ্ছিলেন, কখনও যেন আপন গন্ধে আমোদিত, নিজেই হাসছিলেন, একটা অঙ্কও ঠিক হচ্ছিল না, শেষে খাতা-পেনসিল রেখে, মা, গেলাম তোমার কাছে। উনুনের সামনে বসে কড়ায় কী নাড়ছ, তোমার পিঠের উপরে, এখন তোমার ঘোমটা নেই, চুল খোলা, উপুড় হয়ে কাঁধে গাল ঘষে, বেশ কয়েক দিন পরে আধো-আদর, আধো-আবদারের সুরে বললাম, "কানের কাছে অত জোরে জোরে কেউ চেঁচাতে থাকলে, বলো তো, অঙ্ক মাথায় আসে ?"

তুমি কিছু বললে না। কড়া-খুন্‌তিতে অত মনোযোগ দেবার কী ছিল কে জানে। বললাম, "নির্ঘাত ফেল করব টারমিন্যাল পরীক্ষায়। তার চেয়ে ধরো যদি অন্য কোথাও সন্ধ্যার পর পড়তে যাই ?"

মুখ তুলে তুমি বললে, "কোথায় ?"

"ধরো", ফশ্‌ করে বলে ফেললাম, "সুধীরমামার বাসায় ? সুধীরমামা তো অনেক দিন আসেন না।"

তুমি মাথা নেড়ে সায় দিলে—"না।"

"কোনও অসুখ-টসুখ হয়নি তো ?"

"বোধ হয় না। মাছ তো একদিন দুদিন পরে পরে ঠিক ঠিক পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

কড়াটা খুব ছাঁকছাঁক করছিল, খুব শুকনো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছিল ছড়িয়ে, তোমার মুখ ঢেকে গেল, ঝুঁকে পড়ে ফুঁ দিতে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়লে।

তবু আমি বলতে থাকলাম, "যাবো, মা?"

ফুঁ দিতে দিতেই মুখ ফিরিয়ে তুমি বললে, "উনি যদি বকেন?"

"বকবেন না। বলে নেব। তাছাড়া বাবারও তো সুবিধে হবে। যখন লেখেন, তখন পাশে কেউ থাকলে—দেখো, বাবা রাজী হয়ে যাবেন।"

তুমি আর কিছু বললে না।

বাবাকে বলব বলে ঘরে গেলাম, বলতে কিন্তু তখনই সাহস হয়নি, কারণ ছুই ভুরু কুঁচকে ঠিক মধ্যিখানে একটা আঙুল রেখে উনি কী-যেন ভাবছিলেন। পা টিপে টিপে উঠলাম খাটে।

সুধীর মামা আসছিলেন না। বারো ভূঁইয়ার শেষ গল্প ঈশা খাঁর কাহিনীটা শেষ পর্যন্ত শোনা হয়নি, ভাবলাম সেই জন্যেই বুঝি মনটা কেমন-কেমন, দিনগুলো আলুনি। পরে ভেবে বুঝেছি, ওটা কারণই নয়, ওটা আমি আবিষ্কার করে নিয়েছিলাম, ঈশা খাঁর গল্পের শেষটা জানার জন্যে এমন কিছু মরে যাচ্ছিলাম না, আসলে কাঁটার মত যেটা ফুটছিল সেটা শূন্যতা, একটা অভাবের জন্য অস্বস্তি। রাস্তার ধারের নিমগাছের পাতাগুলো প্রথম ফাল্গুনের ধুলোয় ভরে যাচ্ছিল, কত দিন পাড়া হয় না, কেন না, যার দরকার সে আসে না। কিছুকাল আগে একটি সত্যিকার মৃত্যুকে জেনেছি, তখন আবার যেন নিজে-নিজেই টের পেলাম, অনুপস্থিতিও একটা মৃত্যু, মৃত্যুর মতই। আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে কয়েকদিন ধরে আসছিল না, তার সঙ্গে আমার তেমন ভাব নয়, তবু বেন্‌চে তার নির্দিষ্ট আসনটা ফাঁকা দেখে কেমন খালি-খালি লাগত, ঠিক সাত বছরে প্রথম দাঁত পড়লে যেমন লাগছিল, জিভটা বৃথাই ঘুরে ঘুরে কিছু খুঁজত। একদিন

জানা গেল সেই ক্লাস-ফ্রেণ্ড আর আসবে না, তার বাবা চাকরি করতেন কলকাতায়, সেখানে মারা গেছেন, ওর মা প্রথমে কলকাতায়, সেখান থেকে পরে সবাইকে নিয়ে ওদের মামার বাড়ি চলে গেছেন। তার মামাই একদিন এসে ট্র্যান্সফার সারটিফিকেট নিয়ে গেল।

প্রায়ই শুনতাম বাবার সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটি, বিশ্রী লাগত। আমাদের সংসারে আগে এ-সব ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ এসে-পড়ে যখন দেখেছি তোমরা হাসি-গল্প করছ, তখনও কিন্তু চমকে যেতাম, মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকত।

সেদিন বিকালে খেলার মাঠ থেকে ফিরে থমকে গেছি। তোমার মুখে আঁচল চাপা, খুশিতে চোখ উপছানো, তুমিও তবে হাসতে জানো, সব তবে মিথ্যে মিথ্যে—মিথ্যে তোমার সকালের স্তব, সূর্যপ্রণামমন্ত্র, শোকটা শুধু মুখোস, কেবল আমাকে ঠকানো।

আমাকে দেখে একটু সরে গিয়েছিলে—ওই ভঙ্গি আমি চিনি, কেন না আচারের বয়ম খুলতে খুলতে কত দুপুরে ধরা পড়ে গিয়েছি —বাবা ফের পুঁথি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তুলসীতলায় সেদিন প্রদীপ জ্বলছিল না, নারকেল গাছটার মাথায় বিশ্রী-বিকট কাঁচিকাটা একটা চাঁদ ঝুলছিল বলে তার পাতায় আবাসিক ভুতুম পাখিটা অন্য দিন থেকে অনেক আগেই 'বুঝি বুঝি সব বুঝি' গলায় ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

বিরস গলায় বললাম, "দীঘির পাড়ে মস্ত একটা শামিয়ানা পড়েছে মা, শুনলাম ম্যাজিক-লণ্ঠন হবে দেখতে যাবে?"

"আমি? ন্-নাঃ। তুই যাবি? যা না, দেখে আয়।"

"বাবা যদি—"

"আমি ওঁকে বলছি।"

বাবা খাতার উপর ঝুঁকে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কোনও কথাই যেন তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চট করে অনুমতি, আমি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চলতে থাকলাম, তুমি এগিয়ে এসে খিল দিলে, কিন্তু 'বেশি ঠাণ্ডা লাগাসনে, এখনও হিম পড়ে' এই শেষ কথাটি শুনতে চেয়েছিলাম, পেলাম না।

প্রতারিত, প্রতারিত আমি রাস্তায় পড়ে ছুটছিলাম, ঠিক ভয়ে নয়, যদিও তখন সন্ধ্যা, এ অন্য-কিছু, ক্লাসের গুণ্ডাগোছের মানিক নামে ছেলেটা একবার আমার পকেট ঝেড়েঝুড়ে সব মারবেল-গুলি, লাট্টু, এমন-কী হাতের গুলতিটাসুদ্ধু কেড়ে নিয়েছিল, বাধা দিতে পারিনি, জোর নেই কিনা তাই চোখে জল, ঠোঁট নোন্‌তা, ভেবেছি আমার সব গেল, আমি রোগা, আমি দুর্বল, কিছুই আর ধরে রাখতে পারি না, এই দিনও দীঘির পাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে ঠিক সেই রকমই লাগছিল, দৃষ্টি ঝাপসা, আমি ভাবছি, যাবে, যাবে, এইভাবেই সব যাবে, দাদা গেছে, সুধীরমামাও দূরে সরে, তুমি, তোমরা দুজনেই, আমাকে আজ বাড়ি থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে দিলে, দিয়ে যেন বেঁচে গেলে, খুঁজছিলে এই অছিলাটাই, আমার মা নেই, ভাই নেই, ভাবতে ভাবতে সত্যি ভয় করছিল, সামনের রাস্তাটা এত ফাঁকা কেন, সব যখন যায় তখন এইভাবেই কি খালি হয়ে যায়, থাকার মধ্যে শুধু আমি আর বুকের মধ্যে দম ভর্তি করে-নেওয়া বাতাস, আর কিচ্ছু না?

(সেদিনের অনুভূতি আজ কেমন উলটে গেছে, ছ্যাখো, যখন ক্লান্ত, প্রস্তুত আমি টের পেয়েছি, আমিই যাব, আর সব ঠিক ঠিক থাকবে। এই গাছগুলো থাকবে ঠায় খাড়া, যত ঘাস শুকিয়ে আবার মাটি ছেয়ে ছেয়ে দেবে, উড়বে ধুলো, মরা-মরা জ্যোৎস্না ফুটবে, সকালের সূর্য বরাবর হবে রক্তের ফোয়ারা। যে-সীটে বসে প্রেক্ষাঘরে রইলাম এততক্ষণ, সেই সীট পরের 'শো'-য়ে অন্য লোক বসাবে। যা-কিছু ছুঁয়েছি, ছেনেছি, মেখেছি যত কাদা, সব পরে এসে অপরেরা ছানবে, মাখবে। আমি থাকব না।

কিন্তু সেইদিন এই জ্ঞান ছিল না।)

ভাবিনি সুধীরমামাকে ওখানে দেখতে পাব। সন্ধ্যার পর উনি পড়াশোনা নিয়ে ঘরেই থাকেন জানতাম, ঠাণ্ডার ভয়ে বের হন না। সেই সুধীরমামা আজ বসে আছেন আসরের এক কোণে, দুই হাঁটু জড়ো করে ঠেকানো ওঁর মাথা, কিন্তু কোথায় গেল সেই কমফরটা-রটা? আমাকে দেখে প্রথম অবাক, সুধীরমামা পরে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিলেন। মুখে কেমন বোকা বোকা হাসি, আসলে উনিও একটু অপ্রতিভ, এতদিন দেখা হয়নি কিনা, তাই। গাল আরও যেন তোবড়ানো, চোখ বসে গেছে, রগ-ওঠা রোগা-রোগা হাতে খড়ি উড়ছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু কমফরটারটা?

বেশি কথা হল না, যদিও তখনও আলোয় ছায়াছবি দেখানো শুরু হয়নি, একবার বুঝি বললেন সুধীরমামা "আনু কেমন আছে", আর-একবার "তোকে একা আসতে দিল?"

"আপনি এখানে?"

সুধীরমামা হাসলেন। কথার তুবড়ি ছোটাতেন যিনি দেখা হলে, শীর্ণ কণ্ঠ থেকে কলকল কথা বেরিয়ে আসত, কত প্রশ্ন, কত উত্তর

> ('আনু, তোমার এই ছেলেকে আমি মানুষের মত মানুষ করে দেব।'—'আমার ছেলে?'—'না, না এক হিসেবে তো আমারও, ওকে সেই মতই দেখি, এই নিয়েই তো আছি')—

সেই সুধীরমামা কেমন চুপচাপ, ম্রিয়মান গ্যাসের আলোয় তাঁর মাথাটি হাঁটুতে হেলিয়ে বসে আছেন। "কিন্তু কমফরটারটা?"

সুধীরমামা বললেন "ভুলে গেছি। তাছাড়া তেমন ঠাণ্ডা তো নেই। আর, একটু-আধটু ঠাণ্ডা লাগলেই বা কী।"

সাধারণ কথা, সেদিন অবাক লাগছিল, আজ লাগছে না। "ঘরে

পড়ার মত বই নেই, ফুরিয়ে গিয়েছে”, সুধীরমামা বলছিলেন, “তাই ভাবলাম এই ল্যান্টারন্ লেকচারটাই শুনি। শুনেছি এটা শিক্ষামূলক, দেশের কথা আছে। মন দিয়ে ছাখ, তুইও শেখার অনেক কিছু পাবি।”

না, কমফরটারটা আনেননি, ভুলে গেছেন। আরে দূর ঠাণ্ডা নেই, ঠাণ্ডা লাগবে না। তা-ছাড়া লাগলেই বা কী, বড় জোর বিছানায় হু'দিন, সে তো ভালোই, খানিকটা বিশ্রাম।

লাগলেই বা কী। অস্পষ্টভাবে হলেও সেদিন যদি চেষ্টা করতাম, কথাটার ঠিক মানেটা বুঝতে পারতাম। সুধীরমামা যে-জন্যে এসেছেন, আমিও তো সেইজন্যই। পরাস্ত, প্রহৃত, প্রতারিত, পরিত্যক্ত, ‘প’-য়ের পর ‘প’—যেখানে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, হু'জনকে ঠিক সেই এক জায়গায় এনে ফেলেছে।

সুধীরমামা আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আসলে ঠিক দরজা পর্যন্ত কিছুতেই এলেন না, সদর রাস্তার ঠিক মুখ থেকেই চলে গেলেন। তুমি যদি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে মা, দেখতে পেতে। কিংবা আমি যেই গিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম, চাপা গলায় ডাকলাম “মা, মা, মা,” যদি তখনই খিল খুলে দিতে, তা-হলে শীর্ণ-দীর্ঘ একটি দেহ, তখন ছায়াকার, লম্বা লম্বা পা ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই তাড়াতাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে অন্ধকারে মিশে যেতে চাইছে দেখতে পেতে। অন্ধকার ঠিকই, কারণ তখন রাত, কিন্তু ফাল্গুনের উতলা বাতাস পুরনো ঘি-রঙের জ্যোৎস্নার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে তো ছিল।

তবু আমি কিন্তু বলেছিলাম, “আসুন না সুধীরমামা, আসবেন না?” বেশ সহজেই বলতে পেরেছিলাম, কেন না ফেরার সমস্ত রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়গুলো জোনাকির চোখ জ্বেলে পিটপিট জ্বলছিল বটে, হাওয়ায় দৈবাত ফাটা লুকনো কুঁড়িগুলো গন্ধে ব্যাকুল

হয়ে ছিল, যদিও একটু-একটু অদ্ভুত কষ্টও পাচ্ছিলাম, ফাল্গুন মাস কী-জানি কেন তখন থেকেই আমার বড় কষ্টের, ওই আধো-অন্ধকারে ফুলের গন্ধটাই যেন কাটা হয়ে যায়, অহেতুক ফুটতে থাকে শরীর অথবা মনের না-দেখা কোন্‌খানে ঠিক ঠিক জানিনে, যাই হোক সেদিন আমার ভয় ছিল না, বিশেষত একজন যখন সঙ্গী আছে, যাকে এতকাল সমীহ করতাম, কিন্তু এখন যার সঙ্গে আমি স্বচ্ছন্দ, এই হেতু যে উভয়ের মধ্যে একটা সাঁকো তৈরী হয়ে গেছে। তাই বলতে পেরেছিলাম, “আসুন না, সুধীরমামা, আসবেন না ?”

উনি ইতস্তত করলেন, এক লহমা, তার পর বললেন “না, থাক। আনু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।” আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, “আমার মা এত তাড়াতাড়ি কখনও ঘুমোয় না।”

কিন্তু তুমি তো ঘুমিয়েছিলে ! চাপা গলায় কতবার ডাকলাম, “মা, মা, মা,” তবে তো শুনতে পেলে। যেন নিশির ডাক ডাকছি, সাড়া দিতে নেই, তুমি সাড়া দেবে না। একটি ছায়ামূর্তি জোলো জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার পা ক্রমশ-অবশ, “মা—মা” ডাকতে গিয়ে গলা কাঁপছে।

আমার মা এত তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না। বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো ঘুমিয়েছিলে। একটা লম্ফ হাতে খিল খুলে দিতে এলে, তার কালো-লালে মেশা পিঙ্গল আলোয় দেখলাম তোমার ফোলা ফোলা চোখ, সারা কপালে সিঁদুর—খুব বড় করে টিপ পরো কিনা ইদানীং, তাই বেশি করে ছড়ানো—আলগা কাপড়টা তোমাকে জড়িয়ে কোন-মতে। দেখেই বুঝলাম ঘুমিয়েছিলে। তোমার কোল ঘেঁষে, বুকের গন্ধে ভোর হয়ে চিরকাল ঘুমিয়েছি, তোমার ওই চেহারা আমি চিনি না ?

সোজা নিয়ে গেলে রান্নাঘরে। খাবার ঢাকা ছিল, বেড়ে দিল। হাই তুলছিল লুকিয়ে টের পাচ্ছিলাম, তোমার যাতে বেশি কষ্ট না-হয় তাই তাড়াতাড়ি খেলাম। একটু নতুন ধরণ বৈকি, পিঁড়িতে বসে

আমি ঢুলতে থাকব, আর তুমি মুখে জোর করে গ্রাস ঢুকিয়ে দেবে বরং এই তো ছিল নিয়ম, সেই নিয়মটা আজ কি হঠাৎ উলটে গেছে ?

খেয়ে উঠেই এক দৌড়ে বিছানা, যে-বিছানা তোমার-আমার, টান টান করে পাতা চাদর, মনে মনে ঠিক যেন মিলছে না, বালিশে মাখামাখি তোমার মাথার তেলের গন্ধ ছাপ কিছু নেই, তাতে তেমন-কিছু বিস্ময় নেই, কারণ তোমার রুক্ষ চুল, সবটাই খোলা, সেদিন, বোধ হয় তেল মাখোনি, কিন্তু বালিশটাই যে নেই, বিস্ময় সেইটেই।

বাবার ওদিকটা আবছায়া-অন্ধকার, কিন্তু ওঁর নাক ডাকছিল না, তবে ঘুমোননি ? তা নিয়ে বিশেষ ভাবছিলাম না, তুমি ঘুমিয়েছিলে কি ছিলে না, এই ভাবতে ভাবতে আমি নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটু একটু করে সব যে বদলাচ্ছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম। বদলাচ্ছে আকাশের রঙ, গরম বাড়ছে, তালপাখা কিনে আনা হল, সকালের রোদ্দুর দেখতে দেখতে রাগী হয়ে যায়, সমস্ত দুপুরটা তামাটে। এক-একটা বিকেল আবার ঘোলাটে হয়ে যায়, যখন হা-হা করতে করতে এক-একটা ঝড় রাক্ষসের মত ছুটে আসে, কাঁপায় কাঁপায় সব কাঁপায়, আমাদের ঘরের চাল আর খুঁটিসুদ্ধ থর-থরিয়ে দেয়। রাত্রে ছটফট সাপ গর্ত করে বেরিয়ে, দাওয়ায় কি উঠোনে এসে কুণ্ডলী পাকায়, অন্ধকারে সরসর করে রাস্তার এপার-ওপার হাঁটে।

এক-একটা ঋতু তখন এক-একটা ছাপ ফেলত, যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই বর্ষাও, তার বড় বড় ফোঁটা মনের মাটিতে গেঁথে যেত।

বর্ষার একটু আগেই বোধ হয় বাবার বড় রকমের অসুখটা হল। কাশি তো ছিলই সেই সঙ্গে বুকের ব্যথাটা। জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছিল না, চোখ সারা দিন লাল, বাবাকে কেমন অন্যরকম লাগত। যখন চোখ বোজা থাকত বাবার, তখন ঠোঁট, দেখতাম, নড়ছে। কণ্ঠস্বরও চিরে গিয়ে চিকণ, বিড়বিড় কথাগুলো সব বোঝা যায় না,

কখনও শুনতাম "এখানে থাকব না, আমি এর পর ছত্রিশগড় যাবো ঠিক ছিল যে! সেখান থেকে আরও দূরে, পশ্চিমে, একেবারে দ্বারকা, এই বলো না, আমি সেরে উঠব তো। উঠব না?"

কাছে ডেকে কখনও আমার মাথায় হাত রাখছেন, কড়া-পড়া হাত, কিন্তু শিথিল দুর্বল, তবু তাতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কখনও-দৌড়ে ওষুধ আনতে ছুটছি, কখনও-বা দেখছি চৌকাটে দাঁড়িয়ে, তুমি নিশ্চল একটি মূর্তি বাবার শিয়রে। তাপ নিচ্ছ, বুকে হাত রেখে, কপালে ঠাণ্ডা জলপটি, বাবা যদি উপুড় হয়ে শুয়ে, তবে ঘরেই বালতি বালতি জল এনে, ওঁর মাথায় ঢালছ, মুছিয়ে দিচ্ছ গামছায় আল-গোছে, মাথাটা বালিশে তুলে দিলে সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে যখন হাত পাখা নাড়ছ তখন যেন একটি মেঘের মত মমতা তুমি! অপলক, ঘন-নিঃশ্বসিত তোমাকে কখনও ক্লান্ত, ওখানেই এক পাশে এলিয়ে পড়তে দেখতাম।

কিন্তু, আশ্চর্য লাগত না। নতুন বর্ষা আমাকেও নরম করে ফেলছিল।

আশ্চর্য, সুধীরমামাও ঠিক ওই সময়েই কাবু হয়ে পড়লেন। ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে ছিপ হাতে বেরিয়ে পড়তাম আমি, আগেই বলেছি ইতিমধ্যে দুজনের মধ্যে একটা সহমর্মী সখ্য হয়ে গেছে যদিও আমরা অসম-বয়সী, তাই যখন ক্লাস নেই, ঘরেও আমার করার মতো কিছু কাজ নেই, তখন সোজা চলে যেতাম ওঁর ওখানে, সেখান থেকে মাঠঘাট পেরিয়ে ঘন শরবনের ছায়ায় কোমল নিমাই রায়ের বিল, সেখানে পাশাপাশি একটানা অনেকক্ষণ। ফাতনা ভাসছে, উঠছে, কিন্তু আড়চোখে চেয়ে টের পেতাম, সুধীরমামার লক্ষ্য নেই, আসলে মনই নেই ওখানে, মাছধরা-টরা তো সুধীরমামার নেশা নয়, কোনও দিন ছিল না, বুঝতে পারতাম উনি নতুন একটা অভ্যাসে প্রবেশ করতে চাইছেন।

হু-একটা কথা হত মাত্র! কথার কোনও দরকার ছিল না। আমরা হু'জন হু'জনকে বুঝতে পারতাম। যেদিন হয়ত একটাও মাছ উঠল না, সেদিন শেষবেলায় সুতোটুতো সব গুটিয়ে সুধীরমামা ওঁর নড়বড়ে শরীরটা নিয়ে উঠছেন, হাড়েহাড়ে-লাগা ঠোকাঠুকিরও যেন আওয়াজ পাচ্ছি, বলেছেন, "আসলে কেন আসি জানিস? মাছ ধরাটা হল ধৈর্যের পরীক্ষা। এখানে বসে বসে সহিষ্ণুতা শিখি।"

কেন যে আসতেন, আমি জানতাম।

একদিন কিন্তু আসতে পারলেন না। ওঁর বাসায় গিয়ে দেখি, শুয়ে আছেন, আগাগোড়া চাদরমুড়ি, জানালা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। পায়ের শব্দ পেতে মুড়ি সরিয়ে বললেন, "খুব মাথা ধরেছে রে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, কম্প দিচ্ছে, আমাকে চেপে ধরবি? একবারটি চেপে ধর।"

চেপে ধরলাম, উনি যেন তৃষ্ণার্তের মত আমার মাথার ঘ্রাণ পান করলেন, যেন শুষে নিতে চাইছিলেন আমাকে, আমার সত্তাকে।

আঁকড়ে-ধরা হাত হুটো আপনা থেকেই এক সময়ে শিথিল হয়ে এল, আমি মাথা তুললাম, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু তপ্ত শ্বাস তখনও গালে লাগছিল, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম।

তোমাকে বললাম, "সুধীরমামারও অসুখ। খুব জ্বর দেখে এসেছি।"

তুমি চেয়ে রইলে, যেন চোখ দিয়ে শুনলে, তোমার মুখে ভাবলেশ ছিল না, তখনই কিছু বললে না।

বললে, পরদিন হুপুরে, পুকুরঘাটে।

—"কেমন আছে রে?"

—"আজ তো যাইনি!"

—"যাবি না?"

—"বলো তো যাব।"—বলো তো কথাটা একটু ঝোঁক দিয়ে বললাম! সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম তুমি বলছ "আমাকে নিয়ে যাবি?"

"বাড়ি ছেড়ে? ঘরে বাবা একা—"

"উনি তো এখন একটু ভালোর দিকে। পথ্য দিয়ে এসেছি। তা-ছাড়া এখন তো আমার চান করার সময়—যাবো আর আসব, বেশি দেরি হবে না।"

সেই জানালা-বন্ধ ঘর, এবার আমি সাক্ষী। সুধীরমামা ঘুমোচ্ছিলেন, গলা অবধি ঢাকা, বিছানার সঙ্গে রোগা মানুষটি আরো যেন লেপ্‌টে।

আমি শুধু দেখছি। তোমাকে এগিয়ে যেতে দেখলাম, আঁচল থেকে বের করলে একটি শাঁখা-করুণ হাত, খুব আলগোছে সেই হাতের পিঠ ওঁর কপালে একবার না-ছোঁয়ার মত ছোঁয়ালে। ব্যস, আর কিছু না! আমার দিকে ফিরে বললে, "এখনও তো বেশ জ্বর।" ব্যস, আর কিচ্ছু না। জলপটি না, হাতপাখা না, শুধু কলসী থেকে গড়িয়ে ওঁর শিয়রের কাছে রেখে দিলে এক গ্লাস জল। বললে "এবার চল্।" যেমন চুপিচুপি এসেছিলে তেমনই চুপিচুপি বেরিয়ে এলে।

আর কিছু না কেন, বাবার শিয়রেও তো মূর্তিমতী শুশ্রূষা, সেবা, উৎকণ্ঠা আর মায়া তোমাকে দেখেছি, এখানে এই কৃপণ-কৃচ্ছ্র, নীরব নিঃস্পৃহতা, এই বৈপরীত্য ভালো লাগছিল না। সারা রাস্তা তোমার সঙ্গে একটা কথা বলিনি।

(সেদিন যাকে ভেবেছি অমানুষী নির্মমতা, পরে তার মানে জেনেছি। একই জিনিসের দু'পিঠ—কোথাও সব ঢেলে দিয়েও মনে হয় আরও দিই, কোথাও হাত থাকে শামুকের মুখের মত গুটিয়ে, কিছু না-দেওয়া, দিতে না-চাওয়া বা না-পারাটাও সব দেওয়া।)

বাবা জেগে গিয়েছিলেন। উঠে এসে বসেছিলেন দাওয়ায়, তুমি আঁতকে উঠেছ, "অসুখ-শরীর নিয়ে এ কী" প্রায় চিৎকারের মত শুনিয়েছে তোমার গলা, কিন্তু বাবার চোখ তখন একেবারে ঠাণ্ডা, ভীষণ মসৃণ-সমতল কণ্ঠে বলেছেন, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

পুকুরঘাটে যে নয়, তোমাকে দেখে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, পেয়ারা গাছ থেকে তরতর নেমে এসে দুটো কাঠবিড়ালি উঠোনে কী খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। তারা দৌড়ে পালাল। একটু থমকে দাঁড়ালে—এক মুহূর্তমাত্র, তারপর যেন বাবারই নিস্তরঙ্গ সমতল কণ্ঠস্বর নকল করে বললে, "সুধীরদার ওখানে।"

বাঁচলে তুমি, মা, একটা-কিছু যে বানিয়ে বলোনি তখনই, তাতে সেই দিন আমার কাছে তুমি বেঁচে গেলে। আমি দম ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। যেই তোমার উত্তরটা শোনা গেল, অমনই একটা বেঁজী খিড়কির দিক থেকে খালি কুতকুতে চোখে উঁকি দিচ্ছিল, একটা লাঠি নিয়ে সেটাকে তাড়া করে গেলাম।

"ওখানে কেন ?"

"সুধীরদারও জ্বর।"

"খবর আনল কে ?"

হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলে তুমি। সত্য অস্বস্তির, কিন্তু তার রঙ যে কী-সাদা, এই উঠোনের উপরকার খোলা আকাশটার মত, তখনই টের পেলাম।

দেখলাম, বাবা উঠছেন কাঁপতে কাঁপতে, খুঁটিটা ধরে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে ঢুকলেন ঘরে, ফের সেই অসুখের বিছানায়।

সেদিন বিকালেই বাবার বোধহয় আবার জ্বর এল।

আর সেদিন রাত্রে ? হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভয় পেয়েছিলাম, মুখের উপর গরম বাতাস, কার তপ্ত শ্বাস। একটা নিবু-নিবু আলো জ্বলছিল, বাবার অসুখের সময় থেকে রোজই জ্বালা থাকত, বুঝতে দেরি হল না সেই শ্বাস কার। অনেক দিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ, ঘন ভ্রূ,

বাবাকে চেনা গেল সহজেই। সেই দাড়ি-ভুরুর জঙ্গলে বাঘের মত জ্বলছিল এক জোড়া চোখ—বাঘ, না, সে-দৃষ্টি পাগলের—আমাকে খড়খড়ে জিহ্বা দিয়ে লেহন করছে, মা, ও মা, তুমি এখনও কেন খাটের একপাশে যেন লুটানো লতা, তোমার ঘুম ভাঙে না কেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলেছি, যেন দেখিনি এই ভান, ঘুমের ভানের চেয়ে ঘুমিয়ে-পড়া কত সহজ, কিন্তু আমি তো ঘুমোব না, জেগে, থাকব, সব নড়া-চড়া নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে, সেকেণ্ড কাটছে, এক, দুই, তিন, কত সেকেণ্ডে এক মিনিট, কত মিনিটে, হে ভগবান, একটা গোটা রাত? তারপর চোখ বুজেই টের পেয়েছি, শিকারী ব্যগ্র একাগ্র চাউনিটা সরে গেছে, যেতে যেতে একটা পা লণ্ঠনটা দিয়েছে উলটিয়ে। তেল গড়াচ্ছে নিশ্চয়ই, কাল সকালে নিশ্চয় মেঝের উপরে কালো একটা দাগ দেখতে পাব, ফিতের মত, ফিতে কিংবা জবজবে একটা বেণী, ঘামে নেয়ে উঠতে উঠতে আমি এইসব কল্পনা করলাম। ঘামের কুলুকুলু ধারাও কখনও কখনও শোনা যায়।

আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবতে থাকলাম, খালি ভেবে পেলাম না, ঝুঁকে পড়ে বাবা কী দেখছিলেন আমার মুখে, অত ঘন ঘন ওঁর শ্বাস পড়ছিল কেন।

পরদিন সকালে উঠে শুনতে পেলাম বাবা বলছেন তোমাকে, "আমি এবার যাব।"

দুজনেই বারান্দায়, বাবার গলা মৃদু, যেন আলাদা মানুষ, একবার হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন, বোধহয় একটা গামছা দিতে, আমার দিকে তাকাননি, তবু দেখতে পেলাম, এরই মধ্যে বাবা কখন দাড়িটাড়ি কামিয়ে দিব্যি।

আসলে শেষ রাত্রের ঘুম তো, আমিই বোধহয় বেলা করে উঠেছিলাম।

আবার বাবা বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়, তোমাকে বললেন, "যাব কাল কি পরশু।" তুমি বললে শুনলাম, "সে কি, শরীর এখনও

সারেনি", বাবা তৎক্ষণাৎ "আমার অসুখ কি সারবার, তুমি কী বলো?" গলা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাবা হাসছেন মিষ্টি-মিষ্টি, চমৎকার, কী মধুর, কিন্তু মা তুমি ছাড়ছো না, গলা আরও নামিয়ে বলছ "কিন্তু আমার এই অবস্থায়"—

"ভয় পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"ঠিক জেনেছ একেবারে?"

"একেবারে ঠিক কী করে বলি আর। তবে আর-আর বারের মতই সব কিছু—এক-একবার তুমি আসো, আর এই হয়। তোমরা কী দায়হীন, দয়াহীন একটা দস্যু—" মা তুমি যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলে না।

হো-হো করে নির্মল হাসতে শুনতে পেলাম বাবাকে, যেন নিজের মজা-পাওয়া গলায় নিজেই মজে গেছেন, "ভালোই তো হল, তুমি ভাবছ কেন, এরাই তো দেশের ভাবী সংগ্রামের এক-একজন সৈনিক—"

"তা হয় না। হবে না।" মা, তুমি হাঁপাচ্ছ, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে তোমার দাঁতে দাঁত গেছে চেপে, "হয় না, হবে না।"

"হবে না কেন।"

"কে টানবে এত, কে মানুষ করবে?"

হা-হা-হা-হা, অনাবিল অকুণ্ঠ হাসি বাবার, কিন্তু বলছেন আস্তে আস্তে, "কেন, টানবার লোক তো আছে, মানুষ করা? সেটা ঠিক জানি না।"

"মানে?"

"না যদি জানো তো বলব না। কিন্তু ছাখো, যেটা আছে, সেটা ঠিক মানুষ হচ্ছে না।" এইবার বাবা সেই সাংঘাতিক কথা বললেন, "ভাবছি ওকে আমি নিয়ে যাব। এখানে রাখব না। এখানে ও বরং খারাপ প্রভাবে অমানুষ হচ্ছে। ওকে আমার কাছে রেখে মানুষ করে গড়ে তুলব।"

ওকে, মানে আমাকে। কাঠ হয়ে শুনছিলাম। মা, রুদ্ধশ্বাসে তোমাকে বলতে শুনলাম, "বলছ কী ?"

"ভেবে-চিন্তেই বলছি।"

"তুমি রাক্ষস, তুমিই বলতে পারো এ-কথা।"

"একেবারে ঘাবড়ে যেও না।" দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি, বাবা চোখ টিপছেন—"ওকে আবার ফেরত পাঠাতেও পারি।"

"মানে ?"

"বলছি। তার আগে তুমি হিসেবটা আর-একবার ভালো করে বলো তো ? আমি সেই একবার এলাম, কোন্ সালে যেন, বছরটা মনে করিয়ে দাও। তারপরে এলাম যেবার, সে কবছর পরে ? বোধহয় দুই-কি-তিন। ওকে দেখলাম, তুমি বললে ওরও ঠিক দু'বছর পূর্ণ হয়েছে। সত্যি বলো তো, ও কি তখন দু'বছরেরই ছিল, তার চেয়ে কমটম নয় তো ?"

তোমার মুখে কথা ছিল না। কান্না, রাগ, ঘেন্না সব মিশিয়ে যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল, "নির্লজ্জ, বদমাস, ইতর ?" খুঁটি ধরে সামলে এই তিনটি শব্দই খালি বলতে পেরেছিলে।

"আ-হা-হা গালাগাল পরে, আগে শোনোই না। কথাগুলো চটপট বলে ফেললেই তো খটকা মিটে যায়। সোনামণি, আমার দিকটা তুমি কেন দেখছ না। জানো, আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে নিজের মুখটা মিলিয়ে দেখি ? তারপর নিজেকে দেখি আয়নায়। কোনো-কোনো রাতে, ও যখন ঘুমিয়ে, দেখি, দেখতেই থাকি, আমার যন্ত্রণাটা তুমি বুঝছ না ?"

তোমার মুখে কথা ছিল না, চোখের মণি ঠিকরে বাইরে আসতে চাইছিল, কিন্তু সারা মুখ ছিল অসম্ভব সাদা। কোনমতে টেনে টেনে, কিন্তু তীব্রস্বরে, তুমি বললে—"তুমি—চলে—যাও।"

"যাবোই তো। বলো তো আজই। তবে একেবারে এইভাবে বিদায় দেবে ? পাঁজি খুলে যাত্রা শুভ-টুভো কিনা একবার দেখে দেবে না ?"

উত্তর নেই।

"বলেছি তো, ওকেও নিয়ে যাব। কলকাতায় আজকাল অনেক রকম পরীক্ষা হয়েছে, ব্লাড টেস্ট, কখনও শুনেছ? রক্তের সঙ্গে রক্ত মেলানো। কথাটা যখন উঠেছে, তখন যাকে নিজ হাতে মানুষ করব, তার সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হওয়াই তো ভালো।"

হাতের কাছে কী-একটা পেয়ে তুমি ছুড়ে মেরেছিলে বাবাকে। সমস্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। খালি আমার কান দুটোয় প্রতিটি শব্দ ঢুকছিল। সেই ভয়ংকর সকালটাকে আজও ভুলিনি। অনেক কথা, অনেক ইঙ্গিত সেদিন ছিল অস্বচ্ছ, কিন্তু কথাগুলো যে ভয়ানক, সেটা সেই অবোধ বয়সের সহজাত বোধেও গেঁথে গিয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

সেই ছুপুরটাও কাটল। সময়ের একটা মহৎ স্বভাব, সে কেটে যায়। যদি না কাটত, যদি জমে যেত হঠাৎ একখানে—আমরা চলতে চলতে ভিড়-টিড় দেখে মজা পেয়ে যেমন দাঁড়াই! সে একটা ছুঃসহ অবস্থা হত, জমে-ওঠা জঞ্জাল বিকট গন্ধ ছাড়ত, পচা-গলা যত আঁশ, কাঁটা আর নাড়িভুঁড়ি, কলতলার ঝাঁঝরি বন্ধ হয়ে, পরে কলকাতায় দেখেছ তো মা, কী নোংরা, কী ঘেন্না, এঁটো বাসন, শালপাতা, নারকোলের ছোবড়া আর ছাই, সব থৈ-থৈ। সময়ের মস্ত গুণ, তার চরিত্রে থামা নেই, সে বয়ে যাচ্ছে, সব সাফ করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, জলের তোড়ে কেবলই ধুয়ে যাওয়া, সময় কি এক শুচিবাই বিধবা?

কিংবা সে বুঝি এক অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবা, এই ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে, এক-একটা ঋতুতেই ছাখো না, মনে হয় ডুবে গেল বন্যায়, তার পরেই চিকচিকে রোদে পিঠ মেলে দিল নীল-নিবিড় আকাশে, কাঁপতে থাকল বাঁশঝাড়ের ফেটে-পড়া স্থির-সবুজ তুবড়িতে, আর অজস্র ছড়ানো ফুলে ফুলে সৌরভে মুহ্যমান পড়ে রইল। এই সে কুয়াশায় কানার মত হাতড়ে হাতড়ে হাঁটে, তখন সময়ের হাতে একটি নুড়িও যেন দেখতে পাই, তার খানিক পরেই, চৈত্রের ঊর্ধ্বশ্বাস ধুলোয় আর পাতায় সময় সওয়ার হয়ে ছুটছে।

আমাদের বাড়িতেও সেদিন সময় বৈরাগীর মত "ভিক্ষে দাও গো" বলে হাত পেতে বসে ধুঁকতে থাকল না। আর সেই জন্যেই সব সহজ হল।

মা, তুমি আর বাবা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলে না, লক্ষ্য করছিলাম। একটা পরদা পড়ে গেছে মাঝখানে, তবু কাজকর্ম

চলছে। তুমি ঠিক সময়েই উনুনে আঁচ দিলে, চা হল, বাবা চুমুকও দিলেন, সময় মত তাঁর শিয়রে তুমি দাগ-মাপা ওষুধের শিশি-গ্লাসও রেখে এলে। এরই মধ্যে বাবা ওঁর টুকটাক জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, ফতুয়ার বোতাম নেই কেন বলে গজগজ করতে থাকলেন খানিক, কখন নিজেই ছুঁচসূতো জোগাড় করে নিজেই বসে গেলেন রিফু করতে। সন্ধ্যা হতেই রোজকার মত শাঁখ বেজে উঠল, বড় বাড়ির মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টা পিটে পিটে ঘরে-ফেরা শেষ পাখিদের আরও ভয়ার্ত করে তুলল, এই সময়টা আকাশটায় এমন পোড়া লোহার মত নিত্যি জং ধরে যায়! এই সময়েই মন্দিরের ঘণ্টা সরব হয় কেন, ওরা কি রাত্রির বন্দনা করে, নাকি আলোর শেষ রেশটুকুকেও যেয়ো না বলে—আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

যেহেতু আমি সেদিন কিছুর মানে বুঝতে পারিনি, হিস-হিস গলার কথাকাটাকাটিই শুনেছি, এবং বুঝতে পেরেছি যে ব্যাপারটা বিশ্রী, কিন্তু ঘণ্টার ঢং ঢং আঘাতে মনে হচ্ছিল, কেটে যাচ্ছে, যা ছিল সব আবার তাই হবে, আমি তোমার পাশটিতে শুয়ে তোমাকে জড়াব, তোমার শরীরের উষ্ণতা পাব, শিকড় যেমন শুষে নেয় মাটির গভীরকে, তোমার প্রগাঢ় মমতা তেমনই শুষে নেব, যেহেতু আমি ব্যাকুল হয়ে ভাবছিলাম সব মিটে যাক, তাই আরও কী-কী ঘটনা আগামী এক প্রহরের সাজঘরে তৈরী হচ্ছে, আমি জানতাম না।

নিজের ব্যাগ গোছানো শেষ, বাবা হঠাৎ চমকে দিয়ে বললেন, "তুই কী নিবি গুছিয়ে নিলিনে ?"

আমি ? হ্যাঁ, বাবা যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই। স্থির স্বরে তিনি বলছেন, "তুই-ও যাবি। একবার আমি যা ঠিক করি তার আর নড়চড় হয় না। আজ রাত্রেই গাড়ি আছে, বোধ হয় ন'টায়। তৈরী হয়ে নে।"

তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে। আমি যেখানে, সেখানেই।

বাবারও বাক্স গোছানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে ফিরে চেয়ে মনে হয় যেন একটি দৃশ্য, যাদের পার্ট সেই তিনজন তিনটি স্থানে প্রোথিত, প্রত্যেকে তার পার্ট ভুলে গিয়ে নির্নিমেষ, কেউ কারও দিকে একচুল এগোতে পারছে না।

সেই সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে একটা নাটক আমাদেরই বাড়িতে অভিনীত হচ্ছিল। আমার নির্মমতম কয়েকটি স্মৃতির মধ্যে এটি অন্যতম।

না, কোনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। একটা হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। বাবা একবার কেমন জড়িত অদ্ভুত গলায় বলে উঠলেন, "কই তোর কী-কী নেবার আছে, আনলি না ?"

পুরনো টাইম্‌পিস্‌ ঘড়িটা প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে, সেদিন ঠিক টিকটিক, একটানা চলছিল।

সেই ফুল-আঁকা ছোট্ট টিনের স্যুটকেসটা তোমাকে মনে করিয়ে দেব, মা ? ছ'তিনটে কাপড়-জামা, বই-টই দিয়ে তুমি ভরে দিচ্ছিলে। যেন মড়া সাজানো, যেন দাদার মৃত্যুর মত আর-একটা রাত্রি ফিরে এসেছিল। শুধু তফাত—তোমার শুকনো চোখে কান্না ছিল না।

সেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য সময়ে কাটাকাটা ফালি হয়ে আমরা কী করছিলাম ? মুখে ভাত গুঁজছিলাম, কিংবা তুমিই কি একটির পর একটি গ্রাস মুখে তুলে তুলে দিচ্ছিলে ?

আমি তৈরী হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, এবার যাব, তুমি মৃদু স্বরে একবার বললে, "চুলটা আঁচড়ে নিবি না ?"—ওই একটিমাত্র সাধারণ একটা নিরুত্তাপ কুণ্ঠিত কথা, বাবা বলে উঠলেন, "না, রাত্তিরে আয়নায় মুখ দেখে না।" তুমি বললে, "তবে ফিতে বাঁধা জুতোটা পরে নে", বাবা বললেন, "না, বাবুগিরির দরকার নেই, চটিটাই দিব্যি আছে," তারপর তোমার দিকে তাকিয়ে "তুমি বুঝতে পারোনি যে, ও তোমার কথা মত আর চলবে না, তোমার হুকুম খাটবে না ?"

তুমি শুনলে। আমি শুনলাম। যে নখগুলো কাকে যেন ছিঁড়তে চায়, কিন্তু পারে না, না পারুক, কিন্তু সমস্ত জীবন ভেবেছি, তারা তখন নিজেরই ভিতরটাকে হিংস্রভাবে আঁচড়াতে থাকে কেন।

দাদাকে মনে মনে বললাম, যাচ্ছি। তোমাকে প্রণাম করছি। কোথায় যাচ্ছি, কত দিনের জন্যে, জানি না। প্রণাম করছি। তুমি হাত বাড়িয়ে ছুঁলে, সেই স্পর্শে সাড়া ছিল না, বাইরে অন্ধকার, দূরে দূরে দু' একটা আলো। ওরা জেগে আছে, কিন্তু জানছে না কে চলে যাচ্ছে, তবু আশ্চর্য, শোক নেই, অন্তত বাইরে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই পাড়াটা আমার যেন আর-এক মা, সে-ও সেদিন যেন, মা, তোমার মতই হঠাৎ-পাথর, স্তব্ধ। সোজাসুজিই বলে দিই, আমার বুক ঠেলে কান্না, ভয়, উঠে আসছিল। অন্ধকার হলেও আমার চেনা রাস্তা, এর প্রত্যেকটা ভাঙা-চোরা-গর্ত আমি জানি, তবু হোঁচট খাচ্ছি, আর আগে-আগে হেঁটে বাবা তাড়া দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি চল্, তাড়াতাড়ি।

যাচ্ছি তো, কিন্তু এ ভাবে কেউ যায়, এই রকম চোরের মতো? কালও সকাল হবে, পাড়াটা কি তখন টের পাবে, কে ছিল, কে নেই, তাকে আর এখানে দেখা যাবে না? আমার পকেটটা একবার ছেঁড়া ছিল, তখন টের পাইনি, দুটো পয়সা পড়ে যায়। তবু তো আমি সেদিনই একটু পরে টের পাই, হারানো পয়সা দু'টো আঁতি-পাঁতি করে খুঁজি! এই পাড়াটায় কি ততটুকু সাড়াও পড়বে না, এদিক-ওদিক চোখ মেলে আমাকে সে খুঁজবে না। আমার কি দু'টো পয়সার মত দামও না? কান্না পাচ্ছিল।

পাড়া ছেড়ে তাকালাম আকাশে, না, ওখানে ওরা আছে, হাজার-হাজার জ্বলজ্বলে চোখে একজনের চলে-যাওয়া দেখছে! সাহস পেলাম, ভরসা এল। যেখানেই যাই, ভয় কী। যেখানেই যাই

না কেন, চোখ বুজে অবাক আকাশটাকে বললাম, যেখানেই যাই সেখানে তোমরা থেকো।

তুমি হয়ত বিছানায় লুটিয়ে ছিলে, অথবা গেঁথেই গিয়েছিলে দরজাটায়, কবাটের মত, তুমি জানতে পারোনি, কত জনের কাছে সেদিন মনে মনে বিদায় নিতে নিতে যাচ্ছিলাম। এক-একবার এক-একজনকে বলি, আর সকলকে সরিয়ে দিয়ে বারবারই ভেসে ওঠো তুমি। তোমাকে কী বলব, তোমাকে কিন্তু কিছুই বলা হয় না।

সেই মজা কুয়োটা, রাস্তা যেখানে বাঁক নিতে গিয়ে পা পিছলে মাঠে পড়ল, মেঠো-রাস্তার মোড়ের পাহারা সেই ইঁদারায় ঝুঁকে পড়ে কথা বলা ছিল একটা মজা। ইঁদারায় কিছু ফেলে দিলে, টপ্ করে ডুবে যায়, আর ওঠে না, অথচ তার বুকে মুখ রেখে যা-খুশি বলো, প্রত্যেকটা শব্দ সে দশগুণ ছড়িয়ে বাড়িয়ে উপরে ছুঁড়ে দেবে। চমৎকার সেই খেলাটা, হারানো কথা ফিরে পাওয়া, শেষ বারের মত খেলতে ইচ্ছা হল। ভাবলাম ওর বুকে মুখ ডোবাই, ডোবাই, ডুবিয়ে অনেকক্ষণ থাকি, শেষে হঠাৎ বলে ফেলি, 'আমি যাচ্ছি, আর হয়ত আসব না।'

"আসব না", মেঠো রাস্তাটা শর্টকাট, ওপারে স্টেশনের রাস্তার মুখেই যে অশথ গাছ, অন্ধকারে দূর থেকে যাকে বাব্‌রি-চুল ডাকাত ভেবে কেঁপে উঠতাম, আজ বিশ্বস্ত-পরিচিতের মত তাকেও সেই কথা বললাম।

কয়েকটা লাইন কেবলই মনে পড়ছিল, সেই সীতাহরণের জায়গাটা, সুর করে পড়তে পড়তে যেখানটায় গলা ধরে যেত, তোমার, আমার। এইখানেই সেই দীঘিটা, যার ওপারে সেই বাসাটা। আজ দুপুরেও গিয়েছি। মাথার কাছে রাখা গ্লাসটা থেকে এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই জল খেয়েছেন? তিনিও কিছু জানেন না। তাঁর জ্বর কি এখনও আছে, না ছেড়ে গেছে? আমি ছেলে, তবু নিজেকে

ভাবছিলাম ওই জানকী। সীতা তো যেতে যেতে, কত-কী ছড়িয়ে ফেলেছিল, যাতে চিহ্ন থাকে, যাতে রাম-লক্ষ্মণ জানতে পারে, চিনতে পায়, কিন্তু, হার, কাঁকন-কেয়ূর, কিছুই তো আমার নেই, আমি কোন্ চিহ্ন রেখে যাব ?

বাবা একটু এগিয়ে, আমি একটু পিছিয়ে, এক সেকেণ্ড দাঁড়ালাম। পকেটে ক্লিপ-লাগানো স্টাইলো-কলম, সুধীরমামা দিয়েছিলেন, টুপ করে সেটাকে ফেলে দিলাম। রাস্তার ধারে। বাবা ধমক দিলেন, "কী হল, পা চালিয়ে আয়," ফের তাড়াতাড়ি চলতে থাকলাম। খুব আস্তে আস্তে কাকে যেন বলছিলাম, "ওঁর যেন জ্বর সেরে গিয়ে থাকে, রোজ 'মর্নিং ওয়াক' করা তো ওঁর অভ্যেস, কালও খুব সকালে যেন বেরিয়ে পড়েন। যেন দেখতে পান। ওঁরই দেওয়া জিনিস তো, নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন কলমটাকে, কুড়িয়ে নেবেন। কলমটা সব বলে দেবে, সুধীরমামা জানবেন।

চারপাশে সব চুপচাপ, নিথর, কিন্তু স্টেশনটা সরগরম। আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কারা সব শুয়ে আছে, গোটা দুই ছ্যাকরা গাড়ি, আর-একটা সেই কাপড়ের ঘোমটা-দেওয়া ট্যাক্সি, যেটা গাড়ি এলেই যত পারে প্যাসেঞ্জার লুঠ করে, আমাদের ওই মফস্বলের শহর থেকে জেলাসদরের দিকে ধোঁয়া ধুলোয় গা-ঢাকা দিয়ে ছুটতে থাকে। জেলা-সদরে রেল নেই।

তখনও গাড়ি আসেনি, আমরা গেলাম, আর ঢং ঢং করে প্রথম ঘন্টা পড়ল। তার মানে গাড়ি আসতে এখনও মিনিট পনেরো দেরি। গ্যাসের আলো জ্বেলে বুড়ো পানওয়ালা পান সেজে চলেছে, গাড়ি এলেই ছুটবে প্লাটফরমে—পাঁন-বিড়ি-সিগ্রেইট—আমি ওর গলা ফার্শ-ক্লাস নকল করতে পারি—বাবা টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়ালেন,

ভিতরে ঘটাং ঘটাং শব্দ, ঝোলানো টেলিফোনের একটা দিক কানে তুলে চোঙে মুখ রেখে স্টেশনবাবু দূরের কাকে বলছেন "হ্যালো হ্যালো", মাঝে মাঝে খটখট টরেটক্কা, নিশ্চুপ চারধারের নদীতে এই স্টেশনটা তার গম্‌গম্‌, আলো, চাঞ্চল্য আর ব্যস্ততা নিয়ে চরের মতো জেগে আছে।

বাইরে প্লাটফরমটা অনেকটা ঠাণ্ডা, পড়ে-থাকা পাথরে বাঁধানো, উপর দিয়ে কালো একটা ওভার-ব্রিজ, ওই ভারী জিনিসটা বুকে নিয়েও সে নির্বিকার, সারকাসে পালোয়ানের বুকে অনায়াসে নেওয়া যেন প্রকাণ্ড এক হাতি। প্লাটফরমের সীমানার ঠিক শেষে সিগন্যালের খুঁটি, টিমটিমে আলো, অন্ধকারে হঠাৎ উঁচু, যেন ফশ্‌ করে তারা হয়ে উঠে যেতে চাইছে আকাশে, কার্তিক মাসের আকাশপ্রদীপও যেমন চায়, কিন্তু পারে না, এই সিগন্যালের আলোগুলোও পারছে না, ইচ্ছেটা সামলে চকচকে চোখে চেয়ে আছে।

যে-ল্যাম্পপোস্টগুলোর কাচে স্টেশনের নাম লেখা তারই একটার নীচে দাঁড়ালাম, পাশে একটা করবী গাছের ঝাড়, খুব নীচু হয়ে নুয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলছে, সেই হাওয়ায় হালকা একটা গন্ধও যেন টের পেলাম।

বাবার মুখটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, যদিও তিনিও পাশেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু মুখ অন্য দিকে ঘোরানো, ওই দিক থেকেই বুঝি গাড়ি আসবে, তাই মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, অস্পষ্ট, অন্ধকার, সেই ফেরানো মুখ, সহসা টের পেলাম, কী বলছে। কান পাততেই বোঝা গেল, একটা জিজ্ঞাসা, আমাকেই।—"আমাকে তোর কী মনে হচ্ছে রে? বদরাগী, খেয়ালী, তাই না? তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবা চেপে ধরেছেন আমার মুঠি, ওঁর হাত কাঁপা কাঁপা, আমারও শরীর কাঁপছে। এ আলাদা একটি মানুষ, একেবারে আলাদা গলা। আমি চিনি না। ওই মায়াবী মনোরম আলোয় অভিসারী সিগন্যালটা সাক্ষী রেখে তিনি কি বদলে গেলেন!

এখনও ঠিক বুঝি না, সেই মুহূর্তে ওঁর ভিতরে ভিতরে কী ঘটছিল, কেন হাত কাঁপছিল শক্ত সমর্থ মানুষটার, আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জেনেও কেন, আমরা দু'জনে যেই একলা অমনই অন্য লোক হয়ে যেতে চাইছিলেন।

"আমাকে তুই চিনিস না। আগে দেখিসনি, দেখলেও মনে রাখিসনি। বল তো আমি কে?"

"বাবা তো।" পুতুলের মত বললাম।

"কিন্তু কী করি, আমি কে?"

কী করেন, তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই যা মনে এল তাই বলে ফেললাম, "আপনি পালা লেখেন না?"

"পালাগান?" করবীর ঝাড়ের নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আর একটি নিশ্বাস নিঃশব্দ হল।—"লিখি। কিন্তু সে-কথা ক'জন আর জানে। কে পড়ে? দু'একজনকে ডেকে শোনাই, এই যা। নইলে সব তো বাক্‌স-বন্দী হয়েই রইল। অনেকগুলোর পাতা হলদে। ছিঁড়ে আসছে।"

"প্লে হয় না?" বলে ফেললাম।

"কারা করবে। দল চাই, টাকা চাই।"

হঠাৎ যেন মাথায় বুদ্ধি এল, বললাম, "বাবা, বই ছাপালে তো অনেক টাকা হয়, এই পালাগুলোকে বই করা যায় না?"

"বই, মানে ছাপানো বই?"

আমার কাছে তখন বই মানেই তাই। বাবা বললেন, "দূর। ছাপতেও অনেক টাকা চাই। টাকা কোথায় আমার? টো-টো করে ঘুরি, কোথাও বাঁধা পড়ি না, হাতে যা আসে সব খরচ হয়ে যায়, সারা জীবনে কিছু কি আর জমাতে পারলাম!" বাবা টেনে টেনে বলছিলেন, বলার সময় কোথায় যেন ওঁর লাগছে, সেই কষ্টটা আমার গায়েও হাওয়ার ঝাপটার মত লাগছিল—"জমা কিছু নেই। কেউ চেনে না, নিজে থেকে অন্য কে এ সব আগ্রহ করে ছাপবে?

এ-সব ব্যাপার তুই জানিস না। আমি—আমি শুধু লিখব, লিখে যাব। ছাপা হবে না।"

আমারই মুখে চোখ রেখে কথা বলছেন, বাবার মুখ এখন আর ঘোরানো নেই, সবটা দেখা যাচ্ছে, ভারী গাল, গলা, ভাঁজ ভাঁজ চিবুক, জোড়া ভুরুর মাঝখানে হঠাৎ-প্রদীপ্ত দু'টি চোখ। তিনি যা বলছিলেন, এখনও শুনতে পাচ্ছি।

—"ছাপা হবে না, কিন্তু থাকবে। রেখে তো যাব। তুই বড়ো হয়ে পড়ে দেখিস। আর—আর" ওঁর স্বর শুকোতে দেওয়া কাপড়ের মতো তারে কাঁপছিল, "আর—আর, তোকে যদি মানুষের মতো মানুষ করতে পারি, যদি তোর কোনোদিন টাকা হয়, তবে তুই ছাপতে দিস।"

খুব ক্লান্ত, তাই বাবা থেমে বুক ভরে বাতাস নিলেন।—"একটা স্মৃতি। কী রকম জানিস, তুই কি বুঝবি ? পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজ, পেরেক কিংবা ছেঁড়া দড়ি, এক্ষুনি কোনও কাজে লাগছে না, তবু অনেকে কুড়িয়ে নেয়, তুলে রাখে যদি হঠাৎ কখনও কাজে লাগে ! এই পালাগুলোও ধর, তেমনিই। আজ হয়ত এতে কারও কোনও দরকার নেই, তাই কেউ চেয়েও দেখছে না, কিন্তু, বলা তো যায় না, অনেক অনেক দিন পরে কারও হয়ত নজর পড়ল, আজ যা খারিজ করছে, হঠাৎ কখনও পৃথিবীর কাছে তাই দরকারী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তোলা থাকবে, তবে তো ?"

তখন দ্বিতীয় ঘণ্টাটা বাজছে, তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি, গাড়ি এসে পড়ল বলে, বাবার মূর্তি অসহায়, কিন্তু চোখ ধক্-ধক্ জ্বলছে, ইনজিনের গনগনে আগুনকে ওইভাবে জ্বলতে দেখেছি, খুব তাড়াতাড়ি, লোহার যে-প্রকাণ্ড ডাণ্ডিটা সামনের চাকাগুলোকে ঠেলে, সেইভাবে, অস্থির অথচ সহসা শক্তিমান বাবা ব্যাকুল কণ্ঠে বলছেন "কথা দে, যে-দিন পারবি, সে-দিন তুই লেখাগুলো ছাপবি ?"

'কথা দে, কথা দে'—ওঁর না-কাটা নখগুলো আমার হাতে ফুটছে,

সেই যন্ত্রণায় নয়, এমনিই কেন জানি আমি চিৎকার করে উঠতে চাইছি, ধস ধস, ধস ধস, কয়লার ধুলোয় মিটমিটে আলোগুলো চোখ বুজে ফেলল, গাড়ি এসে পড়েছে। ঠেলাঠেলি, কামরায় কামরায় বন্ধ দরজায় ধাক্কা, একটা দরজা বুঝি খোলা পাওয়া গেল হুড়মুড় হুড়হুড়, সবাই ঢুকতে চাইছে, আমার হাত বাবার মুঠিতে, সবার শেষে উঠে তিনি দরজার হাতল ধরে হাঁপাচ্ছেন, আমিও উঠতে যাব, তখনই শুনলাম বাবা বলছেন, "থাক।"

থাক, মানে উঠব না? ওঁর হাত আলগা হয়ে গেছে, জানালা দিয়ে আমার বাক্সটা ফের আমার হাতে তুলে দিলেন। স্তম্ভিত আমি কী শুনছি?—"তুই থাক।" গলা বাড়িয়ে বাবা যেন আমার কানে কানে বলছেন, "আমি একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। আমি বাউণ্ডুলে, মুসাফির, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, তোকেও তাই করতে চাই-ছিলাম। তুইও আমার মতো হলে—কী করে ওগুলো ছাপবি?"

যেন আমি চলে গেলে ওই বইগুলো ছাপবে কে, সেইজন্যেই বাবা আমাকে গচ্ছিত রেখে যেতে চাইছেন। আর কোনও কারণ নেই।

ইনজিন জল নিচ্ছিল, গাড়ি ছাড়তে দেরি হচ্ছিল, কখন দেখি উনি টুপ করে নেমে এসেছেন নীচে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলছেন, "জীবনে কাউকে সুখী করতে পারিনি, তোর মাকেও না। তোকেও কেড়ে নিলে ওর থাকবে কী। দিতে না-ই পারি, কিন্তু নেব না। তুই থাক, তুই ফিরে যা।"

কী-রকম করুণ একটা হাসি ওঁর মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, সিগন্যালের রক্তচক্ষু তখনই নরম হয়ে গেল, উনি আস্তে আস্তে আবার পা-দানিতে উঠলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "মাকে বলিস—কী বলবি? তোর খামখেয়ালী বাবার আর-একটা কাণ্ড না? না-হয় তাই বলে দিস। কিন্তু এত রাতে তোর একা-একা ফিরতে ভয় করবে না?"

ভাঙা গলার একটা বাঁশি ওঁর কথাগুলোর উপরে জোয়ারের মত আছড়ে পড়ল, সব ডুবে যাচ্ছে, এই লোকজন, ওই ওভারব্রিজ, ধোঁয়ার কুয়াশায় ঢেকে সব পলকে ঝাপসা। বিরাটকায় একটা অজগর ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলেছে, বাবা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কি না জানি না, চোখে কয়লার গুঁড়ো লাগছে দেখব কী করে, ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না। টিনের বাক্সটা হাঁটুতে লাগছে ঠকঠক করে, আমি গেটের দিকে এগোতে থাকলাম।

ভয়, দূর, ভয় কোথায়! কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, জীবনে সেই বোধ হয় আমি নির্ভয়ে প্রথম একা এতটা পথ পাড়ি দিলাম, এত দীর্ঘ পথ পার হলাম এত তাড়াতাড়ি।

একটা গোটা দিন আমাকে একটা বলের মত লোফালুফি করে ছেড়ে দিল। ভয় ছিল না।

ছয়

মা, এখান থেকে লেখার কালিটা একটু আলাদা, কী করে হয়ে গেল বলোতো। মাঝখানে কয়েকটা দিন ফাঁক গেছে, সেই কলমটাও আজ পাচ্ছি না খুঁজে। যখন লিখতে বসি, তখন ভাবিনি, এত কথা লেখার আছে। কাজটা তুলে নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, এটা একটা কৃত্য, একটা সমাপন। প্রত্যহ প্রত্যূষে হস্তপদ প্রক্ষালনের পর আসন পেতে আহ্নিকে বসার মতো, সজ্ঞানে একটি-দুটি পুষ্প নিবেদন করে যাব, এই তো স্থির করেছিলাম? কিছু অপরাধ স্বীকার করে নেব, শোনো-শোনো বলে ডেকে আত্মউন্মোচন—না, উন্মোচন নয় তো, শুধু নিজেকে মোচন—তাপে-সন্তাপে বয়সের এই হিমঋতুতে হাত-পা সেঁকে নেব, ভেবেছিলাম। কিন্তু তর্পণের সেই পরিকল্পনা খাটছে না, দিব্য দেখতে পাচ্ছি, পাতার পর পাতা ভরে যাচ্ছে, অথচ আমি লিখছি না, অথবা কেউ লিখিয়ে নিচ্ছে আমাকে দিয়ে, যেন লেখার ডেস্কো নয়, এটা প্ল্যানচেট, অনুভব করছি, অদৃশ্য, অমোঘ এক শক্তির ভর, তারই অঙ্গুলি-সংকেত, কী আশ্চর্য ছাখো, এত দিন ধরে এত যে কলাবিদ্যা শিখেছি, আয়ত্ত করেছি কত বাকচাতুরী, সে-সব কোনও কাজে আসছে না তো, মনে হচ্ছে, হায়, সব ভুলতে পারাই ভালো, সব ভুলতেই তো হল, কেউ শক্ত হাতে ধরেছে আমার কব্‌জি, দেখিয়ে দিচ্ছে অক্ষরের পর অক্ষর এঁকে যেতে হয় কী-করে, যেন প্রথম বর্ণ-পরিচয়, সেই গোড়াকার হাতে খড়ি।

এত কথা বলার আছে, কাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার কাতরতা, কাদের ক্ষমা করতে না-পারার লজ্জা আর অক্ষমতা—সেদিন অনুধ্যায়ী কোনও সুহৃদ্‌ বলে দিল যে, শ্রদ্ধায় যাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারো না, তাদের সঙ্গে ঘৃণাতেই বা যুক্ত থাকবে কেন—এইসব কথা, লেখাটার

ধাঁচ-ধরন সব বদলে দিচ্ছে। তাছাড়া আছে ক্লান্তি, রোজ একটি-দু'টি করে উৎসর্গপত্র রচনা সম্ভব হচ্ছে না।

তা-ছাড়া আবার অসুখে পড়লাম যে, কলম ক'দিন বন্ধ রইল। এ-ও দৈব, নইলে একে আর কী বলা যায় বলো, আমি যে আমি, নিজেকে যে লোহার শরীর ভাবত, নিজের সেই শরীরটাকে যেন করে গেছে ধর্ষণ, প্রবল সেই অনিয়মের ফণাও আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে। অন্যের অসুস্থতাও যার কাছে অসহ্য, বরাবর রুগ্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ যাকে দিত পীড়া, সে নিজেই শয্যালীন হয়ে আজ সাহচর্য প্রার্থনা করছে, ছিটে-ফোঁটা করুণা, অনুকম্পা ইত্যাদির মুষ্টিভিক্ষা চাইছে। সময়ের শোধ—একটি চক্রবৃত্ত ঘুরে এসে ঠিক একটি নির্ধারিত বিন্দুতে আঘাত করছে।

মধ্যবয়সের মধ্যরাত্রি কী ভীষণ, এখন মর্মে-মর্মে টের পাচ্ছি, মা! শাস্তি? প্রায়শ্চিত্ত? জানি না! এই মধ্যরাত্রিগুলি হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন জেগে উঠে কোলাহল করে ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে দেয় ঘুমন্তকে, তারপর শুধু পুড়েই-চলা চোখের পাতা, স্মৃতি, মরা পাতা, আর ইতিহাস, কুঁজো উপুড় করে ঢক ঢক জলের গ্লাস, অবশেষে গ্লাস ঠনঠন, ঘনঘন ক্রমান্বয় সিগারেট। হরিধ্বনি দিতে দিতে যে শব-বাহীরা পালকি-কাহারের মতো ছুটে যায়, তারা এত কর্কশ ত্রাহি ত্রাহি চেঁচায় কেন? আসলে ওরাও ভয় পায়, মৃত্যুভয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভয়টা তাড়াতে চায়। আজ আমি জানি, পথ-চলতি ট্যাকসি অযথা ক্রমাগত ভেঁপু বাজায় কেন, কেনই-বা রাত্রির চৌকিদার শান-বাঁধানো ফুটপাতে জোরে জোরে লাঠি ঠুকে জানান দেয়। ভিতু, হিংসুক—ও একা জেগে আছে কিনা, তাই সকলকে তুলে দিয়ে তুমুল হয়ে যায়।

তখন গোরুর গাড়ির টুংটুং ঘন্টা, আড়তদার আর পাইকারেরা ছইয়ের সঙ্গে এক-একটা লণ্ঠন ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝিমোতে

ঝিমোতে যায়। কিন্তু ঘণ্টাটা কেন? একটু আওয়াজ, তালে তালে ঘুমতাড়ানি, নতুবা ওরা স্তব্ধতার কালীদহে ডুবে যেত।

এইসব আমি এখন জানি, জানতে থাকি। নিঃসাড় নিশীথে প্রতিটি সূচীপতন শুনি। আজ মুখহীন, কিন্তু কোনোদিন-জানা নানা মানুষেরা ভিড় করে আসে। বিশ্বরহস্য একটা কবরের ঢাকনায় ঢাকা, একমাত্র মানুষকেই তিনি মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে একটু-একটু দেখান। অর্জুনকে যেমন দেখিয়েছিলেন। একা অর্জুনকেই তো নয়, বিশ্বরূপ কোনো না কোনো প্রহরে প্রত্যক্ষ হয় প্রত্যেকটি মানুষের কাছে, ব্যক্ত হয়। যেটুকু তখন ভরতে পারি, তারই খানিক আমরা কেউ-কেউ পরে কাত করে ঢালি—"শ্রীভগবান উবাচ", ওই উদ্গীতির একটা ব্যাখ্যা আমার কাছে এই।

পাগল হয়ে যাব? পাগল হওয়াও তো সহজ না। যারা হয়, তাদের আজ ঈর্ষা করি। ওরা অস্তিত্বের অন্যতর একটা ছায়ায় জুড়োচ্ছে, স্থান-কালের খড়ি-আঁকা গণ্ডীর বাইরে।

জানো মা, ওই স্থানকালের আপেক্ষিকতার দিশা, আমিও বুঝি, সেই বয়স থেকেই অল্প অল্প পেতে শুরু করেছি। ধরো, সেদিন সেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে যখন হঠাৎ দেখলাম, একটি সময়, একটি স্থান একটি মানুষকে বদলে দিল। বাবাকে আলাদা হয়ে যেতে দেখলাম। কথা দিলাম, মানে মনে মনে, ওঁর পালাগুলো ছাপব।

মা, এইখানে একটি স্বীকারোক্তি করতে দাও, একটি স্খলন। নইলে এ-লেখার কোনও অর্থ হবে না। বাবার ওই লেখাগুলো আমি ছাপিনি, যদিও সঙ্গতি ছিল। ওঁর পুরনো বাক্সটায় পুঁথিগুলি ছিল, তারপর ক্রমাগত জায়গাবদল, বাসাবদলের ঘটায় কবে হারিয়ে গেল! আমি হারিয়ে যেতে দিলাম। কারণ বয়সের অহংকারে— সেই স্থান-কাল!—আমি জেনে ফেলেছিলাম কিনা যে, ওগুলো কিছু না, সেকেলে, পুরণো, ব্যর্থ।

সেদিন অলক্ষ্যে নিশ্চয় কেউ হেসেছিল। আজ নিজেও প্রায় বরবাদ হতে বসে ওই অহমিকা কত ভয়ানক বুঝতে পারি। যেন গচ্ছিত তহবিল এক অছি তছরূপ করল। এক অভিভাবক যেন হত্যা করল তার কাছে পালনের জন্য সমর্পিত কারও সন্তানকে। দত্তবাক্যকে হত্যার সেই পাপবোধ অশরীরীর কঙ্কালের মত আমাকে অনুসরণ করে।—“এই! আমার লেখা!” “কোথায় রেখেছিস, ফেলেছিস কোথায়” কখনও-ব্যাকুল, কখনও-নির্মম প্রশ্নের পর প্রশ্ন কর্ণ-পটাহে আঘাত করে। মা, আমি যন্ত্রণায় কান চেপে ধরি, তবু এক অট্টহাস্য শুনি, প্রশ্নকর্তার সঙ্গে সময়ের স্বর মিশে গেছে। সময় বাবার পাশে একটানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাকে, তাঁর পুঁথির পাশে আমার সৃষ্টিকেও কুঁকড়ে উড়ে যেতে দেখে শিউরে উঠি। এক হাতে মাপা বিচার—সেদিন কি জানতাম আমিও একদিন হব পরিত্যক্ত, জীর্ণ, পুরণো? অমোঘ দৈব—সময় মানে হল মৃত্যু-মৃত্যুতে ভরে-ওঠা এক ভাগাড়।

সেই রাত্রে দরজায় ঘন ঘন ঘা দেওয়ার পরে অবাক তোমাকে কী বলেছিলাম? হাঁপাতে হাঁপাতে একটি কথা কি শুধু—“ফিরে এলাম।” তুমি কি বিশ্বাসে অবিশ্বাসে চোখ কচলে কচলে দেখছিলে, নিজেকে চিমটি কেটে পরখ করছিলে, সত্য কিনা? চাপা স্বরে একবার বলেছ বুঝি “উনি কোথায়”, উঁকিও দিয়েছ।

“বাবা আসেননি, আমি একা।”

আর তখনই সেই বিস্ফোরণ ঘটল! ঠায় দাঁড়ানো তুমি হঠাৎ এগিয়ে আমাকে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মারলে। “একা এসেছিস, ফিরে এসেছিস, তুই একা—একা!” বলে উঠলে অপ্রীতির কণ্ঠে, তারপর, একী, তোমাকে দেখছি দু'হাতে মুখ চেপে পাগলের মত ফুঁপিয়ে উঠতে।

চড়ের দাগ গালে বসে যাচ্ছিল, আমার লাগছিল। মিথ্যে কথা, লাগছিল না। তুমি কাঁদছিলে আমি কাঁদিনি। সহর্ষ, সর্বাঙ্গ দিয়ে বরং জানতে পেরেছি সেদিন আমি আমিই, আমি দাদা বা অন্য কারও ডুপ্লিকেট না।

পরদিন সকালে এক ছুটে সেইখানে, যেখানে কলমটাকে ফেলে এসেছিলাম, সেখান থেকে সুধীরমামার ওখানে। না, সেরে ওঠেননি, বিছানায় উঠে বসেছেন শুধু, তবু মুখে কথা নেই একরকম টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়ি।

উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন সুধীরমামা, আমি মহোৎসাহে নিমপাতা পাড়ছি, সব ঠিক আগের মতন লাগছে, সব ঠিক আগের মত হয়ে যাবে, মাঝের এই ক'টা দিন যে কিছু না আর মিছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু ঠিক আগের মত হল না তো। মা, তুমি কথা বলতে পারছিলে না, সুধীরমামাও না। উনি ফিরে গেলেন, পরদিন আবার অবশ্য এলেন, গেলেন, এলেন। এলেন গেলেন। যাওয়া-আসাটা আগের মত কথায় কথায় ভরে উঠেছিল না।

সে-ও তবু ভালো ছিল। কথা না-বলা। কিন্তু একদিন, বোধ হয় মাসখানেক পরে, কেননা তখন দিনমান জুড়ে আকাশ মেঘে ছেয়ে থাকত, সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ অকস্মাৎ হয়ে উঠত, তুমি কী বললে সুধীর-মামাকে যে, ওঁর মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল, কেমন যেন অপ্রস্তুত, আহত, আচমকা কিছুর সঙ্গে যেন ঠোক্কর খেলেন? তুমি বললে, না ওঁর চোখে নিজে থেকেই কিছু ধরা পড়ে গেল?

দেখতে পাচ্ছি শুধু ওঁর মুখ নয়, স্বরও কখনও বিবর্ণ হয়ে যায়, তখন তো হয়ে গেল, উনি বলছেন, "কী বলছ তুমি আনু?" "এবারও? আবার?" দুর্বোধ্য সংক্ষিপ্ত, সাংকেতিক কোনও ভাষা।

তুমি দাওয়ায় বসে, দু'হাঁটুর মাঝখানে তোমার মুখ একেবারে ডুবে গেছে, সেই মুখ আস্তে আস্তে তুললে। কেমন অস্থির সুধীরমামা,

ছটফট করছেন, ওঁর জ্বর ফিরে এল নাকি, তীব্র, ওঁর পক্ষে অস্বাভাবিক স্বরে বলে উঠলেন, "এ আমি ভাবতেও পারি না, ছি-ছি-ছি!"

এই বিনম্র তুমি, হঠাৎ জ্বলে উঠলে কেন, দেখতে পাচ্ছি তোমার দু'টি চোখ তখন আর চোখ না, তেল-ফুরনো কোনও প্রদীপ, দপদপ জ্বলছে, সব জোর দিয়ে মরীয়া হয়ে সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে তুমি সহসা একটা চিৎকার হয়ে গেলে—"তোমার—তোমার কী?"

"আমার?" মাথা নীচু সুধীরমামার, থরথর হাত-পা নাড়ছেন, যেন লজ্জা একটুকরো কাপড়, তুমি এইমাত্র তোমারটা ছুঁড়ে দিলে ওঁর গায়ে, সেই কাপড় জড়িয়ে গেল ওঁর মুখে, চোখ নাক থেকে সেটা সরাতে সরাতে বললেন "আমার? না, আমার কী আর। কিছু না। কিন্তু ভেবে দেখো এটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কিনা—" সুধীর-মামা এখানে দাদার নাম করলেন, রোগা মানুষটা এখন হাঁপাচ্ছেন, ওঁকে এত রেগে যেতে কখনও দেখিনি, সতত শান্ত চোখ দুটো যেন ছোট্ট হয়ে গেছে, রাগলে লোকে দেখতে হঠাৎ বিশ্রী, রাগ বড়ো বিশ্রী, মা, তুমিও এক্ষুনি রেগে উঠবে নাকি, পায়ে পড়ি, মা, তোমার চোখ দুটো দপ করে উঠেই মরা-মরা ছাই হয়ে উড়ছে কেন, দুটো বিড়াল কি সময় বুঝে ঠিক এখনই বাড়ির পিছনে ঝগড়া করছে—আঃ।

এই তো একটু আগে কেমন অপরাধী, লাজুক-লাজুক দেখছিলাম তোমায়, সেই লজ্জাই কি বেপরোয়া ভঙ্গি হয়ে গেল নাকি, এত চট করে যায়?

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উঠছে কী-করে, বলেছি তো, একটা ভুল, একটা জবরদস্তি—"

"শুধু জবরদস্তি?" সুধীরমামা কেমন-গলায় বলছেন, রোগা, রোগা, আর রাগী, ওঁর হাতের লাঠিটার মতই শুকনো যেন একটা মরা ডাল, সুধীরমামা দেখতে এত খারাপ যেন সেদিনই প্রথম বুঝলাম।

—"তোমাকে একটু আলাদা ভেবেছিলাম আনু।" গলায় যখন রাগ-রাগ ভাব, চোখ দু'টো তখনই ছাখ, কী করুণ, পৃথিবীর মত

দুঃখী, মেঘ যেন ওখানে জমছে। ওঁর রাগটা কেড়ে নিয়ে তুমি বললে, "আমি যা আমি তা-ই।"

সুধীরমামা আর দাঁড়ালেন না।

কিছু বুঝলাম না। কিছু বুঝলাম না তাই দু'জনের কারও দিকেই যেতে পারছিলাম না, আমার হয়েছিল সেই মুশকিল। আমি কার দিকে ?

কুয়োতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল ঢেলে এলে, এখন অনেক শান্ত, কিন্তু সেদিনই তোমাকে খুব শুকনো দেখলাম মা, চোখে কালি। কী রোগা হয়ে গেছ, গালের হাড় তোমার এত উঁচু কখনও ছিল না তো।

একটু টলছিলে। দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা গোটানো মাদুর, সেটা দাওয়াতেই বিছিয়ে শুয়ে পড়লে, মুখ অল্প একটু 'হাঁ,' এইটুকুতেই হাঁপাচ্ছ কেন, তোমার চোখের কোণে রক্তের একটু ছিটে নেই, আমি ছুটে এসে ধপ করে তোমার পাশে বসলাম। নেতিয়ে রয়েছে, তবু যে কৌতূহলটা কুরে কুরে খাচ্ছে, তাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না।

"তুই আজ চাল ধুয়ে আনতে পারবি ?" তুমি আস্তে আস্তে বললে।

"পারব, মা।"

"আমিই ফুটিয়ে দেব। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে, তারপর। আলুভাতে, কুমড়ো ভাতে, আর বেগুন-পোড়া। খেতে পারবি না ?"

বললাম, "খু-উ-ব।"

"লক্ষ্মী ছেলে। না-হয় ডাল ভাতেও দিয়ে দেব।" তুমি হাত বাড়িয়ে আমার কপাল ছুঁলে, ঠাণ্ডা, কিন্তু সেই নরম, বিশ্বস্ত হাত—

ঝুঁকে পড়ে বললাম, "সুধীরমামা কী বলছিলেন মা? কী যেন বিশ্বাস-টিশ্বাস—"

"তুই শুনেছিস?"

"এখানেই তো ছিলাম।"

একটু কি কেঁপে উঠলো, তুমি, না তোমার ঠোঁট দুটি? কী যেন বলতে পারছ না? না, বলছ। চোখ বুজে আমাকে বলছ, "আমার অসুখ কিনা, তাই বলছিল।"

অসুখ ঠিক, কিন্তু কারও অসুখের সঙ্গে বিশ্বাস ভাঙার-টাঙার সম্পর্ক কী, তাই ভাবছিলাম।

"আমার খুব অসুখ, জানিস, আরও বড় অসুখ হবে। সারাদিন গলা জ্বলে, অম্বল, গা গুলোয়, মাথা ঘোরে—"

"তুমি একটু ঘুমোও মা। আমি এক্ষুনি চাল ধুয়ে আনছি।"

"দাঁড়া, বেছে দিই।" তুমি উঠে বসলে, তখনও শ্বাস টানছ, চোখ নামিয়ে থামানো কথাটার খেই টেনে বলছ, "বিশ্বাস! বিশ্বাস ভাঙা-টাঙার কথা ওঠে কী করে? ও ওইরকম বলে, তোর সুধীর-মামা। বরাবর মুখচোরা, কিছু কোনও দিন বলল না, করল না, আজ এখন মুখ ফুটছে।"

কাকে শোনাচ্ছ তুমি, আমাকে না নিজেকে?

"মানে হয় না, মানে হয় না",

(মা, এ-সব কথার অর্থ কী)

"ওরা সবাই এমনি অবুঝ, হিংসুক—যেমন তোর বাবা, তেমনি ওই সুধীরমামা।"

তুমি বলছ কিনা, তাই আমারও সাহস বাড়ছে, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছি। "কিন্তু সুধীরমামা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলেন, চট করে চলে গেলেন, নিমের রসটসও কিছু খাননি।"

"একটু জল এনে দে।" আনলাম। খেয়ে ঠোঁট মুছলে। দেখলাম। তারপরই হঠাৎ—"জানিস! তোর দাদা ফিরে আসছে।"

কী—কী—কী, আমার কান, আমার না অন্য কারও, তোমার গলাই তো, না অন্য কারও—কী শুনছি, কী শুনছি আমি। অসম্ভব একটা ঘোষণা করছ, কিন্তু করছই যদি, মা, তোমার চোখ হাতের ডালায় নামানো কেন।

"আসছে।" তুমি বললে আর-একবার। এবার বিশ্বাসের সুর।

"আর যাবে না?"

"তাই যেন হয়, প্রার্থনা কর।" উপরের দিকে চেয়ে তুমিই যেন একটিবার প্রার্থনা করে নিলে, "যেন আর না যায়। যেন ভালোভাবে আসতে পারে।"

আর কিছু শোনার দরকার নেই তো, আমি একটা লাফ দিয়ে এক ছুট্টে ঘরে, দাঁড়ালাম দাদার ফটোটা যেখানে। খুব মজা পেয়ে হাসছিল সে, যেন ওই ফ্রেমটার মধ্যে আটকে থাকতে চাইছে না, পারলে এখুনি নেমে আসে। এলে আমি কী করব ঠিক করতে পারছি না, গলা জড়িয়ে ধরব, যেমন ধরতাম, পায়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে ওর কানে মুখ রেখে এ-কথাও কি বলব যে, "তবে ওরা যে বলত তুই স্বর্গে আছিস, দেবতাদের সঙ্গে, তুইও নাকি দেবতা হয়ে গেছিস?"

"কে বলত, মা, আর সুধীরমামা?" দাদার ঠোঁট-নড়ায় যেন শুনতে পাচ্ছি "ওরা ভুল বলত।"

"বলুক গে।" রুদ্ধশ্বাসে, চাপা খুশিতে, ওকে ভরসা দিতে, বলেই ফেললাম কথাটা "দাদা, তুই দেবতা ছিলি, আবার মানুষ হবি।"

আর, সারাদিন উন্মনা কেটে যাওয়ার পর সেদিন রাত্রে? তুমি একটু আগেই শুয়ে পড়েছ, আমি বিছানায় লাফ দিয়ে প্রথমেই কী করব কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, হঠাৎ মুখ গুঁজে দিলাম তোমার বুকে, কেন না, তোমার শরীর খারাপ, এখন আর কোনও কথা না,

দাদা-বাবা-মামা, কারও বিষয়ে কোনও আলোচনা না, তোমাকে জড়িয়ে শুধু, তোমাকে জড়িয়ে তবু, একটাই প্রশ্ন করতে পারলাম, অদ্ভুত সেই প্রশ্ন—"মা দাদা এলে তোমার কোন্ দিকটাতে শোবে?"

বাবার চিঠি এল, হঠাৎ একদিন একটা পোস্টকার্ড—এবার আমার নামে। আমার নাম-লেখা, আমাকে লেখা সেই প্রথম চিঠি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ-ওপিঠ, কতবার যে পড়লাম। তোমাকেও দিয়েছিলাম, তুমি চোখ বুলিয়ে একবার দেখলে শুধু, পাশে রেখে দিলে। তারিখের উপরে ছিল "জব্বলপুর"—সে কতদূর, ম্যাপে মিলিয়ে নিলাম, আঙুল দেখিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম, "ছাখো, এইখানে।" চিঠিতে বিশেষ কিছু ছিল না, নতুন কোনও পালা-টালা লিখছেন কিনা সে-সব কথা একদম না, কেবল কেমন আছি, তোমার শরীর কেমন, ভালো হয়ে থেকো, মানুষ হতে হবে, এইসব। নর্মদা নদী, মারবেল রক নিয়েও একটা লাইন ছিল বোধহয়, কিংবা আমি ভূগোলের বইয়ে যা পড়েছিলাম তখন-তখন, তার সঙ্গেও মিলিয়ে ফেলতে পারি। স্মৃতি যেমন আলাদা-আলাদা বাটিতে অনেক কিছু রাখে, অনেক-কিছু আবার সিরাপ-বরফ-জলের মত একই গেলাসে ঢেলে মেলায় কখন-কখনও।

চিঠিতে কিন্তু ঠিকানা ছিল না, চিঠি দিতে হলে কোথায় দেব, তার কোনও উল্লেখ না। ওইটাতে একটু খচখচ করছিল, প্রথম চিঠি পেলাম অথচ তার উত্তর দেবার উপায় নেই, বাবা যেন কেমন! আবার একটু দূর-দূর পর-পর লাগছিল ওঁকে, নিজের খবর পাঠিয়েই খুশি, আমরা কী-রকম আছি সে-সব যেন জানবার দরকার নেই, ধরো যদি মরে যাই, দাদা যেমন গিয়েছিল, ওঁকে জানানো যাবে না, জানার জন্যে উনিও এমন-কিছু উতলা থাকছেন না—নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। মনে মনে সাব্যস্ত করলাম, তুমিই ঠিক, ওঁর সম্পর্কে যা

বলতে তা একেবারে খাঁটি—বাবা নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর, আর স্বার্থপর।

এরই মধ্যে বুড়ো ডাক্তার একদিন দেখে গেল, তোমার বুক-পেট টোকা-ঠোকা দিয়ে বলল, "এখনও অনেক দেরি আছে।" ওই বুকে মাথা পেতে, ওই পেটে কান পেতে, যখনই তুমি মেঝেয়-শোওয়া, কষি-ঢিল শিথিল, তখনই ওই পেটে কান পেতে আমি কী-জানি কী শুনতে চাই। শুনি। দাদা আর ফটোতে নেই তো, ওইখানে আছে।

ও-পাড়ার বুড়ি দাই একদিন খবর নিয়ে গেল। কোমরে হাত রেখে, একটু বাঁকা হয়ে, সে তেরছা চোখে তোমাকে দেখল। মিশি-মেশানো থুথু ফেলে বলল, "দূ-উ-র! এ-তো মোটে ছ'-আড়াই মাস দেখছি। এতেই এত কাবু, বাছা, তুমি বিয়োবে কী করে?"

আমি ওর পিছু নিলাম। পুকুর পাড়ে ধরে ফেলে বললাম, "কত দেরি?"

ভুরু কুঁচকে সে বলল, "কিসের?"

"মানে, মানে" ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না, হাঁপাচ্ছিলাম।

"তোর মা কবে বিয়োবে, তাই জানতে চাইছিস?" কী বিশ্রী কথার ধাঁচ বুড়িটার, শব্দটা ওর মুখের মিশি-মেশানো থুথুর মতো, সেই দিনই দু'দুবার শুনলাম। বুড়ি বলল, "তা বাকী আছে অন্তত পাক্কা সাত মাস, কি সাড়ে ছয় মাস তো বটেই।"

"তুমি যেন হাত গুনতে জানো।"

"পেত্যয় হচ্ছে না? আমি জানি না? কত বউঝি এই হাতে পার করলাম, তোকেও খালাস করেছিল কে রে? আমি।" নিজের বুকে বুড়ি আঙুল দিয়ে দেখাল। "মাগীরা তো পেটে ধরেই খালাস, তোদের খালাস করি আমি।"

রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, খারাপ সব গালাগালি শুনে,

যা, মা, তোমাকেও স্পর্শ করছে। বললাম, জোরে মাথা নাড়িয়ে, "না অতো দেরি নেই, কক্ষনো নেই।"

"তর সইছে না বুঝি! দেখি, দেখি, ব্যাটার মুখখানা দেখি!" বুড়ি যেন ঠেকার দিয়ে বলল, "ব্যাটা, হেদিয়ে মরছিস কেন, যে-শত্তুরটা আসছে, এলে যে সে তোরটাতে ভাগ বসাবে!"

ওকে মনে মনে তখন আমিও একটা খারাপ গালাগালি দিলাম। ও জানে না যে দাদা আসছে। মারব, মারব ওকে আমি। একটা ঢিল তুললাম।

হাত তুলে বুড়ি মাথা বাঁচাল, যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে বলে গেল, "তোর মা কাঁচা-পোয়াতি, রোজ-রোজ পলতা-পাতা তুলে এনে খেতে দিবি, বুঝলি? থু-থু।"

পাক্কা সাত মাস কি সাড়ে ছয়, তার মানে পুজো-টুজো পেরিয়ে সেই শীতকাল? একটু ছমছম করে উঠল গা-টা, দাদা যে গিয়েছিল, সে-ও তো সেই শীতকালেই? শীতে গিয়েছিল, শীতেই আসছে। দাদা-ই যে ফিরছে, আমি তখন একেবারে নিঃসংশয় হলাম।

ডাক্তারখানা থেকে মাঝে মাঝে মিকশ্চার আনি, যে-দিন তুমি একটু বেশী কাবু হয়ে পড়ো, সেদিন। গাঙ্গুলীবাড়ির পিসীমা সেদিন এসে রান্না করে দিয়ে যান। আঁচলে ঢেকে নিয়ে আসেন আচার। তুমি খাও, আমি খাই, তুমিই বারে বারে, বেশি-বেশি। সবাই আসছেন, কিন্তু সুধীরমামা কোথায়, তিনি আসা বন্ধ করেছেন কেন।

বাবা গেলেন, তবু, কই, সব ঠিক আগের মত হল না?

একটু ভালো থাকলেই কাঁথা নিয়ে বসতে তুমি, আমার জন্যে নয়, সে-আমি বুঝেছিলাম, আমাকে অতটুকুতে ধরবে কেন। কথা নেই, তবু তোমার পাশে বসতাম। ফিরে ফিরে সেই একই কথা, তাই বারে বারে, "দাদা আসছে মা?"

ঘাড় হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলতে তুমি।

"তার মানে আমরা আবার তিনজন ?"

"তিনজন।" সায় দিয়েই বলেছ, "কিন্তু সে আসছে ছোট্টটি হয়ে"—কাঁথাটা দেখিয়ে—"এইটাতে সে শোবে।"

"ছোট্টটি হয়ে ?"

"ছোট্টটি।"

আর চেপে রাখতে পারছিলাম না নিজেকে, মনে যে আন্দাজটা এসেছিল, সেইটাই যাচাই করে নিতে চাইলাম তোমার মুখ থেকে। —"ছোট্টটি, মানে আমি হব—"

"দাদা।" আমার গালে আলতো একটি টোকা দিয়ে বলেছ "আর এবার সে হবে তোর ছোট্ট ভাইটি।"

একেবারে উলটে যাবে, বুঝেছি, তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, যা ছিল তাই, তবু একটু অন্যরকম, কী মজা, মনের সুখে শোধ—আগের বারের শোধ তোলা যাবে। ভালবাসব, ঠিকই, কিন্তু ধরো, যখন দুষ্টুমি করছে কি পড়তে চাইছে না, তখন—তখন কি ওকে আমি বকব ? কিংবা সুযোগ পেলেই ফস করে একটু কানমলা—কী ?—ভ্যা করে কাঁদবে ? তো বয়েই গেল। কিন্তু যদি সে-ও ফিরে তেড়ে আসে, চোখ পাকিয়ে, কি ছলছল করে, বলে "অ্যাই! আমি আর জন্মে তোর দাদা ছিলাম না!" মা, ও মা, তোমাকে বলতাম, কী হলে কী হবে তুমি একটু বুঝিয়ে দাও না।

কিন্তু সুধীরমামা আসা বন্ধ করেছেন কেন। দাদা-ই যে আসছে তা হয়ত উনি বোঝেননি, জানেন না। মনে হল ওঁকে জানানো দরকার, খুবই দরকার, তাই, তা-ছাড়া রথেরও মেলা এসে পড়েছে, একা যাব কী-করে, সে-জন্যেও, এক দিন—কত দিন, কত দিন পরে—দৌড়ে, পার হলাম সেই মাঠটা, দৌড়ে।

সাত

চেনা বাড়ি, চেনা ঘর, কিন্তু কী দেখলাম সেদিন ? তখনকার ভাষা দিয়ে তা ফোটানো কঠিন, যা বুঝেছিলাম তখনকার বোঝা দিয়ে তা বোঝানো—সে তো কঠিন আরও। কিন্তু একটা কিছু বুঝেছিলাম। সেদিন ফিরে এসে তোমাকে বলিনি, বলিনি বোধ হয় কোনদিনই।

সুধীরমামা শুয়ে নেই, বসে আছেন একটা হেলানো চেয়ারে, একটু দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম, আর বুক থেকে একটা ভার নেমে গিয়েছিল। কারণ সারা রাস্তা যদিও তাড়াতাড়ি পা চালিয়েই এসেছি তবু অনেকদিন পরে তো, একটু বাধো-বাধোও লাগছিল। কী দেখব গিয়ে, ওঁর আবার অসুখ ? শুয়ে আছেন, এক হাতে মাথা টিপে ? ওঁর মাথার কাছে কেউ জল রেখে যায়নি ? কিংবা, হে ভগবান, যদি ভালো থাকেন, কী বলবেন আমাকে দেখে, খুশিতে মুখ ভেসে যাবে ? হাত বাড়িয়ে বলবেন, "আয়, এত দিন আসিসনি যে" আমি তখন যা বলব তা-ও মনে মনে তৈরী, বলব যে "আপনিও তো যাননি" তার পরে ? কাছে টেনে নিয়ে যদি ঘ্রাণ নিতে শুরু করেন, তা হলে কিন্তু কেমন করবে যেন, আমার ওতে সুড়সুড়ি লাগে, যদি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন—ভাবতে ভাবতেই আমি সেখানে।

হেলানো চেয়ারে সুধীরমামা, পায়ের সাড়া পেয়ে ঘাড় ফেরালেন, আলগা একবার হাসলেন শুধু, কিন্তু বললেন না তো "আয় ?" আমি পাপোষে পা ঘষছি, না ডাকতেও একটু একটু এগোচ্ছি, কারণ নেই, তবু একটু অচেনা লাগছে, সুধীরমামা, সুধীরমামাই তো ? ফিনফিনে একটা লুঙ্গি, গায়ে জালিকাটা গেঞ্জি, আগে কখনও ওঁর এই বেশ দেখিনি। হাতে একটা আয়না, আর-একটা ছোট্ট কাঁচি, দেখলাম

সুধীরমামা এ কয় দিন একটু গোঁফও রেখেছেন সেটাই কি ছাটছেন যত্ন করে ? ওঁর পাতলা চুল, তবু টেড়ি, নিজের ঘরে সর্বদা বইয়ে যে মুখ ডুবিয়ে থাকত, সেই মানুষটি কোথায় গেল ? একটু বাবুয়ানির গন্ধ পাচ্ছি। একবার ভাবলাম তা নয়, আসলে সুধীরমামা তেমন হাসছেন না, বিশেষ কথা বলছেন না, সেই জন্যেই হয়ত ঠেকছে আলাদা-রকম, নতুন-নতুন, আমি আরও উদাস, এলোমেলো-চুল, আরও রোগা হয়ে যাওয়া সুধীরমামাকে দেখতে চেয়েছিলাম। পাশে অবশ্যই রাখা ছিল একটা বই, বাঁধানো, মোটা, কিন্তু আমি কাছাকাছি যেতেই তিনি চমকে উঠে সেটাকে চাপা দিলেন কেন, কী আছে ওই বইয়ে, জানবার জন্য আমি মরে যেতে থাকলাম।

আর-একটু অবাক হতে বাকী ছিল, ওদিকে ঘুরে গিয়ে যখন দেখি, সুধীরমামার বাঁ-দিকের চুলগুলো, কানের পাশে যা কাঁচা পাকা ছিল, এখন একদম কালো। আর, চুল বেশ ছাঁটা, ঘাড় কামানো। সব বিশ্রী, সব অন্য রকম। উনি নিশ্চয় চুল ছাঁটিয়েছেন, বাবুইপাখিরা উড়ে গেছে, আগে তো তুমি কতদিন হেসে বলেছ তাদের বাসা ছিল ওই মাথায়,

('ওরা খুঁটে খুঁটে কী খায়, সুধীরদা, তোমার বিল ?

মাথা তো বিদ্যে-বুদ্ধিতে ঠাসা একেবারে')

তাই কি আলাদা ? পাকা চুলগুলো কালো হল কী করে, একটা শিশি দেখতে পাচ্ছি, তার পাশেই একটা তুলি, তুলিটার মুখে কালো রঙ মাখা। কাঁচা চুলের রহস্য ওরই মধ্যে আছে কিনা জানব বলে যেই ঝুঁকে পড়েছি, সুধীরমামা অমনই সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। তাড়াতাড়ি, আজ ওঁর সবতা'তেই তাড়াতাড়ি, খালি পিছন-ফেরা, খালি লুকোনো, নিজেকেও। পিছন ফিরে আমিও একটা চিরুনি আমার চুলে বসিয়ে জোরে জোরে টানছি, মাথা বেশি আঁচড়ালে উনি বকতেন, সেদিন যেন বুঝতেই পেরেছিলাম—বকবেন না, তাই জোরে জোরে চিরুনি চালাচ্ছি। লাগছিল। বকলেন না বলে ব্যথা পাচ্ছিলাম।

তাকে-রাখা বইগুলোর পাশে একটা কৌটো, পাউডারের, একটা লাল রঙের তেলের শিশি। না-চেনা গন্ধ, চেনা শুধু বিস্‌কুটের সেই টিনটাই, খুলে মুখে পুরলাম, কড়মড় শব্দ হল, উনি ফিরে তাকালেন, কিছু বললেন না। বলেছেন কি, "খাচ্ছিস, আর-একটা খা?" তা-ও না।

বলছেন না, কিছু বলছেন না, অথচ এমনিতে বেশ স্বাভাবিক, কেমন আছি, কেমন ছিলাম, কে কেমন, কিচ্ছু না, যেন রোজই আসি আজও এসেছি, মাঝখানে কিছু নেই কিছু হয়নি, বাইরে একটু শব্দ হলেই কিন্তু চমকে উঠছেন, একবার তো ভিতরের বারান্দায় বেরিয়ে উঁকি দিয়েও এলেন, কিছু বলছেন না, তার মানে উনি কি আর কারও অপেক্ষা করছেন, কে আসবে, আসতে পারে কে, ওঁর তো তেমন কেউ বন্ধু নেই, কিছু বলছেন না, খাটে ছড়ানো তাস, ওগুলো কার, সেই তুলি আর শিশিটা লুকিয়ে ফেলেছেন এখন কোথায়, ওটায় কী আছে আমি দেখব, বলছেন না একেবারে কিচ্ছু না, আমি আর একটা বিস্কুট খাব, আমি—আমি চলে যাব।

দাদাই যে আসছে, সুধীরমামাকে বলা হল না।

আমি তোমাকে বলিনি, বলতে চাইনি, কেন না বলার মতো কিছু তো ছিলও না। তবু, মা, ধরা পড়ে গেলাম, কী-করে তার কোনও বিশ্বাস্য ব্যাখ্যা আজও দিতে পারব না। মুখের কথা ছাড়াও আমাদের দু'জনের মধ্যে কি একটা সাংকেতিক, কূট-গূঢ় কোনও ভাব-চালাচালির আলাদা ভাষা ছিল, চোখে-চোখেও হত বলাবলি? লুকোনো যেত না কিছুই, লুকোনো থাকত না, যেমন আমার মুখ দেখেই তুমি বলে দিতে পারতে কী হয়েছে সেদিন ইস্কুলে, বকুনি খেলাম কি খাইনি, এমন-কী একদিন তো বাইরে মশলা-সুপুরি খেয়ে এসেও তোমার নজর এড়াতে পারলাম না। অনেক দিন পর্যন্ত, আমার অনেক বয়স পর্যন্ত এই

অলৌকিক শক্তি ছিল তোমার, যেন মন্ত্রবল, আজ আমি যেমন যে-কোনও শক্ত বই অন্তত পড়ে ফেলতে পারি, তখন ছেলের মুখ দেখামাত্র পড়ে ফেলা অসাধ্য ছিল না তোমার। মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম, গর্বের সঙ্গে ভয়ও ছিল যেন একটু—আমার মা জাদু জানে ; এমন-কী কবে কোন্ মাঠ থেকে ঘুরে এসেছি, ঠিকঠিক বলে দিতে পারে পায়ের ধুলো থেকে। পাঠোদ্ধার করার সেই ক্ষমতা তোমার কবে লুপ্ত হয়ে গেল, তোমার বেশি বয়স কেড়ে নিল তা কি, নাকি সেটা কেড়ে নিয়েছিল আমারই বয়স, বড় হয়ে নিজেই চালাকি করে আস্তে আস্তে নতুন, তোমার অজানা, এক লিপিতে লিখে নিলাম আমার চোখের চাউনি আর মুখের রেখাগুলিকে, যখন উপরের ঠোঁটে অল্প-অল্প গোঁফ, থুতনিতে দু'এক গাছি সদ্য-দাড়ি, চোখ বসা, চোয়াল শক্ত আর উঁচু, আর গাল-ভরতি দগদগে ব্রণ। প্রথম দিকে নতুন পাঠ তৈরী হবার সূত্রপাতে, নিজেই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম, যেদিন গলার স্বর হঠাৎ কেমন ভাঙা কিন্তু ভরা-ভরা অন্যরকম হয়ে গেল। ওটাও যেন একটা অপরাধ, আমারই অপরাধ, ভেবেছিলাম, আদা-নুন গরম জল দিয়ে গলাখাঁকারি দিলে বুঝি সারবে। দূর, কিছু হল না, তুমি বললে, ওতে কিন্তু ভয় নেই, বড় হলে সকলেরই হয়। বড় হওয়ার প্রথম দাম বুঝি কণ্ঠস্বর, যা নিয়ে জন্মেছি তার অনেক কিছুই যেমন একে একে খোয়া যায়, ক্রমশ থাকে না, যেমন গোড়াকার দাঁত, তেমনই স্বর, আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে নানা বিশ্বাস, ভরসা, ভালবাসা ইত্যাদি।

যাক এসব কথা আসবে অনেক জোয়ার অনেক ভাঁটা খেলে যাওয়ার পরে, সেদিন কিন্তু তুমি ধরে ফেলেছিলে।

"কী বলল রে ?"

"কে ?"

"তোর সুধীরমামা।"

"কিছু না।"

"কথাই বলল না ?"

একেবারে কিছু না বললে তো কথা ছিল না, কিন্তু সুধীরমামা কথা বলেছিলও যে, ওই তো গোলমাল, কিন্তু কথার মত কথা কিছু না, যেমন এত দিন আসিনি কেন, উনিই-বা কেন আসেননি, আগের মত করে একটা কথাও যদি বলতেন, আগের মত একটা কিছুও যদি দেখতে পেতাম, তবে সেদিন আমার ভিতরে ভিতরে বিনা ভাষায় যে-সব জিনিস উথলে উঠছিল, তার কিছুই দেখা যেত না। নিজেই যা বুঝিনি, তা কী করে বোঝাব।

তুমি কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বের করে নিচ্ছিলে।

"কিছু খেয়ে এসেছিস ওখানে ?"

বললাম, "বিসকুট !" মুখের কোণে গুঁড়ো লেগেও ছিল।

"নিজে থেকেই দিল ?"

উত্তর দিলাম না। তুমি তখন ছুঁচ সুতো কাঁথার কাপড় সরিয়ে রাখলে।—"কী করছিল ?"

"কী আবার করবেন। বই পড়ছিলেন।"

সুধীরমামার ব্যাপারে চেনা ওই একটা ব্যাপার শুনে তুমি যেন একটু হাঁপ ছেড়ে সহজ হয়ে বসলে।—"ওই তো স্বভাব ওর। বইয়ের পোকা। তোকে কিছু পড়ে শোনাল ? মানে বুঝিয়ে দিল ?"

"না তো।"

একটু অবাক, বাজারের হিসেব না মিললে তুমি যেমন উশখুশ কর, তুমি নড়াচড়া করলে। ছুঁচটা ফের তুলে নিয়ে বললে "বোধ হয় খুব শক্ত বই, তোকে শোনাবার মত না !"

মা, তোমাকে সেদিন বলিনি বইটার ব্যাপারে পুরো ব্যাপারটা। সুধীরমামা একটুখানির জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন তো, ঠিক তক্ষুনি যে ঝুঁকে পড়ে পাতা উলটে ফেলেছিলাম বইটার। শক্ত কিনা জানি না, কিন্তু ওই ছবি, ছবির পর ছবি ! মা, তখন আমি চান

করার সময়েও যে গামছা পরে নিই, তুমি হঠাৎ সেখানে কিছু ধুতে এসে পড়েছ কি অমনই চলে গেছি কুয়োর আড়ালে, হাত নেড়ে নেড়ে অস্থির বলছি "চলে যাও সরে যাও তুমি", কিংবা পুকুরঘাটে তোমাকে দেখে, মা, তোমাকে দেখেও, তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি, ভিতরে ভিতরে তখনই কী-একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে এই সব ঘটছে, ওই ছবি, ছবির পর ছবি, অবাক কী যে, আমার চোখের পাতা পুড়িয়ে জিভসুদ্ধ শুকনো করে দেবে! তোমার পেটের চেনা আড়াআড়ি দাগগুলো পর্যন্ত তখন চোখ মেলে দেখতে পারি না, আর না-চেনা ওই সব লাজলজ্জাহীন চেহারা আর ভঙ্গি, সহজাত যে ভাষাহীন, ব্যাখ্যাহীন, বোধশক্তি অবোলা প্রাণীরও থাকে, আমিও সেই বয়সে তো প্রাণীই, তবু টের পেয়েছি ওই ভঙ্গিটা বিশ্রী, ওদের চাউনি অন্তত তোমার মতো নয় কখনও, কানে হাত দিয়ে দেখি গরম গরম, কী ঘন থুথু, ছিঃ। আমার জ্বর হল নাকি! ভাগ্যিস সেকেন্ড কয়েকই মোটে, সুধীর-মামা ফিরে এসেছিলেন, তার আগেই আমি মুড়ে ফেলেছি বইটা, অবিকল যেমন ছিল তেমনই, অবিকল ছিলাম না একমাত্র আমি।

সুধীরমামা তবে একা-একা এই বই পড়েন, পড়েন তো না দেখেন, দেখেন মানে আগে দেখতেন না, দেখছেন; এই বইটা আগে কখনও দেখিনি।

সেদিন তুমি যদি অত কথার পর কথার ফোঁড় না দিয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে একবারটি আমার কপাল ছুঁতে, দেখতে তখনও ছ্যাঁক ছ্যাঁক, ঘোলাটে, জ্বর-জ্বর ভাব, তা-ছাড়া ওই চুলের রঙ ফেরানোর শিশি, তুলিটার মুখে কালি, কালি সুধীরমামার সারা মুখে, তাকে ছড়ানো পাউডার, গন্ধ তেল, মা, আমার গা কেমন-কেমন করছিল, বমি, বমি করব নাকি আমি, ঠেকিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল।

তোমাকে বলতে পারিনি। কারণ, ওই যে বলেছি, টন্‌টনে অবোধ একটা বোধ, বলে দিচ্ছিল, তোমাকে কেন জানি না, ও-সব বলা যায় না, উচিত হবে না, তুমি কষ্ট পাবে, কষ্টটাকে আমি একাই

বরং মেখে থাকি। কোনও ছেলে কোনও বয়সে আমাদের কালে মাকে ও-সব কথা বলতে পারে না তো, এমন কী বলা যায় না বড় হয়েও, অথচ পটপট করে তোমাকে যে খোলাখুলি লিখে দেওয়া গেল, সেই জিনিসটার কথা, যেটা শক্ত, শুকনো, শিরশিরে, যার নাম পরে জেনেছি যৌনবোধ, সজ্ঞানে আমার প্রথম যৌন বোধ, তার কারণ, লিখে দেওয়া সহজ, পাকা হয়ে আমরা কম বয়সের বন্ধুরা, অনেক খারাপ কথা যেমন প্রকাশ্যেই বলাবলি করেছি সাঁটে, কিংবা মজা করে বানান করে করে, অথবা অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দে বা ইংরাজীতে। এই লেখা তুমি পড়লেও শরীর দিয়ে পড়ছ না, আজ আমার সেটাও একটা সুবিধে।

(স্তব, স্তব করা তোমার বন্ধ থাকেনি, বোনা আসনটি পেতে বসা ছিল নিত্য। আমি মানে বুঝতাম না, শরীর যখন খারাপ, তখনও কেন রোজ ভোর বেলাতেই স্নান করে ঠাণ্ডা লাগানো, তা-ছাড়া দাদা যাবার পরেই তো এর আরম্ভ, সেই দাদাই যখন ফিরে আসছে, তখন আর এ-সব কেন। অথবা, আমার পরের বয়সের একটা কঠিন সন্দেহের কথা বলি, তুমি জানতে দাদা সত্যি-সত্যিই তো কিছু আসছে না, খালি আমাকে ছেলে-ভুলিয়েছিলে, তাই দাদার কল্যাণে মন্ত্রপাঠ কাঁথা বোনার পাশাপাশি চলেছিল। এ-সব, বলেছি তো, পরবর্তী সময়ের হিসাবী গদ্য, তখন অবশ্য সবই ভাবে-বিশ্বাসে ঢলঢল পদ্য।)

আমি বললাম না, কিন্তু কানাঘুষাতে চাপাই কি কিছু রইল! আমি না-হয় নির্বোধ সহানুভূতিতে ঠিক করেছিলাম, কষ্টটা কোনও

ভাগ না দিয়ে একাই সহ্য করব, একা কষ্ট পাওয়া, কিংবা কষ্টে একা হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকেই শিকড় গাঁথছিল, অনেক বেদনা আছে যা কাউকে বলা যায় না, বললেও লাভ হয় না কোনও। তাই বিচার করে দেখেছি, আমার চরিত্রের একটা দিক মেলে দেওয়া, বহির্মুখী, উচ্ছল, চপল, আর একটা দিক গুটিয়ে-নেওয়া, অন্তর্মুখী, যেমন আয়না—একটা দিকে ঝকঝকে কাচ কিন্তু পিছন দিকটা পারা দিয়ে লেপা, অ্যবক্ত। হয়ত অনেকেরই।

আমি সুধীরমামার ওখানে যেতাম, যেতে থাকলাম, কী-একটা অন্ধ টান থেকে থেকেই আমাকে ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। না, ওই ঘরের ভিতরে নয়, বাইরে রাস্তায়, কাছাকাছি কোথাও। দাঁড়াতাম, দেখতাম, যেটুকু-বা দেখা যায়, একটি মানুষ কী-করে আলাদা হয়ে গেল, আমাকে, আমাদের বাড়িটা ছেড়ে, আর কী পেল, অথবা সে কি আলাদাই ছিল, এখন যে-রকম? যে-মানুষটা লুঙ্গি পরে, ওইসব ছবির বই রাখে, ছাঁটা চুল, চুলে টেড়ি, রঙ ফেরানো, ও কি চৈত্র মাসের সঙ, ও কি বহুরূপী? গুনগুন করে সে সুর ভাঁজে, কীর্তন তো নয়, অন্য গান, এ-সব গান, কি ওঁর আগে থেকেই জানা ছিল?

ঘরেও যেতে পারতাম, যাইনি। সেদিন উনি তো আমায় বকেননি, কিন্তু সেই না-বকাটাই ভাবলেশহীন নির্বিকার যেন কিছুই হয়নি সেই মুখ, একদম কিছু রেখা-পাত হয়নি এমনই একটা সাদা কাগজ, বাধা হয়ে দাঁড়াল। ভালবাসেন না, আমাকে আর ভালবাসেন না, বাসেন না যে তার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই, কিন্তু প্রমাণ না থাকাটাও যেন ওঁর অন্যায়, আমার ভিতরটাকে দোলাতে থাকত। যেন আমাদের খেলার টীম থেকে একজন অন্য টীমে চলে গেছে। বিশ্বাস ভাঙা-টাঙা না কী যেন সেইদিন বলেছিলেন সুধীরমামা? ওঁর এই বদলে যাওয়াটা তো একরকম বিশ্বাস ভাঙা, এই তো ক'দিন আগে, বাবা যখন এখানে, না বলে ক'য়ে, মা, তুমি আর বাবা

এক দলে হয়ে গেলে, আমি আর সুধীরমামা আর এক দলে, যেন মুখোমুখি দুটো টীম, কিন্তু এখন কী হল, আমার দলে কেউ রইল না, কী করব, আমি একা, নাকি মনে মনে চলে যাচ্ছি বাবার দলে, তুমিও আছ অবশ্য, কিন্তু তুমি তো মেয়ে! যে বন্ধু হতে পারে, সঙ্গী হতে পারে, ছেলেদের যে সেই রকম অন্তত একজন ছেলেও চাই।

ওই যে মানুষটাকে দেখছি, যে সুধীরমামা, কিন্তু সুধীরমামা তো না! এতদিন অন্যরূপে ছিল, কোথায় চাপা ছিল এই রূপ, ওঁকে আর তেমন স্থির স্থিত দুঃখী মনে হয় না তো, বেশ তো ফুর্তিবাজ, তেমন রোগাও আর ঠেকে না, আর অসহায় নয়, দিব্যি শক্ত মজবুত একটি মানুষ। প্রমাণ নেই, তবু ওই ধারণাটা গড়ে তুলছিলাম, আমি তখনই যেন পোটোপাড়ার সেই বুড়ো কুমোর, যে কাদা দিয়ে মূর্তি গড়ে, মনোমত না হলে ভাঙে, আমিও তেমনই একটি মূর্তি ভেঙে একেবারে কাদার তাল করে, আর-একটা তৈরি করে নিচ্ছিলাম, তার মূর্তি, যে আসলে আলাদা, কিন্তু সেটা লুকিয়ে রেখেছিল। সে আমাকে ঠকিয়েছিল, সেই বহুরূপীটা।

কিন্তু বলেছি তো, কিছুই লুকোনো থাকত না তোমার চোখে। তুমি কি গল্পের সেই জাদুকরী, যে হাতের ফটিকে নজর রেখে সব বলে দিতে পারে? ঠিক তৃতীয় একটা চোখ দিয়ে তুমি টের পেতে, কোথায় আমি ফাঁক পেলেই ছুটে যাই, গায়ে ঘাম, পায়ে ধুলো, এইমাত্র ছুটে ফিরে আসছি কোথা থেকে।

কিন্তু সেদিন মা, তুমি মিছিমিছি আমার চুলের মুঠি ধরলে, তোমার না শরীর খারাপ! হাই তুলছ আর গড়াচ্ছ, কুয়োতলায় ঘনঘন গিয়ে চোখে দিচ্ছ জলের ঝাপটা, হঠাৎ এত রেগে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। ভাবাই যায় না, আমার গায়ে হাত তুলছ তুমি। অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম, তাই সময়মত মাথাটা সরাতে

পারিনি। মুঠি করে ধরেছ, ঝাঁকানি দিচ্ছ বারে বারে, কুল পাড়তে আমরা যেমন ডালে নাড়া দিই, যন্ত্রণায় আমি বোবা, শরীরের যন্ত্রণা তো বটেই, একটা অসম্ভব ঘটনা বলে মনেও। কোলে বসিয়ে ঝিনুকে দুধ খাওয়াতে যখন মারতে—মারোনি কি আর—কিংবা না-ঘুমোলে ছড়া থামিয়ে রেগে চড় মারতে—মেরেছ নিশ্চয়ই—সে-সব তো আমার মনে নেই, ও-সব ঘটে থাকে মানুষের চিরতরে জলের তলে তলিয়ে যাওয়া বয়সে, কিন্তু জ্ঞান হয়ে কোনদিন তোমার হাতের আলতো চাপড়ি খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। স্টেশন থেকে হঠাৎ ফিরে যে-রাত্রে আসি, সেই রাত্রির চড়টা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে-তো মার নয়, নিজের অবিশ্বাস্য আহ্লাদে ফুলঝুরি হয়ে যাওয়া!

(নিজেই যে পড়ে পড়ে মার খায় ভাগ্যের হাতে, সে তো নিয়ত মিশে আছে মাটিতে অথবা উঠে গেছে উপাসনায়, সে আবার অন্যকে মারবে কী!)

তাই সেদিন বেজেছিল। চেয়ে ছিলাম। সুধীরমামার মতো তুমিও আলাদা হয়ে গেলে নাকি, যে-মাকে জানি তুমি কি সেই মা নও! সবই কি বদলে যাচ্ছে, সক্কলে?

—"কেন যাস, কেন যাস ওখানে তুই, সে-কি তোকেও জাদু করেছে?" দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, ঠোঁটের কোণে ফেনা, যেন অনেকগুলো মারবেল তোমার মুখে, একটার পর একটা ঠিকরে আমার চোখে মুখে লাগছে।

"যাই না তো, দাঁড়িয়ে থাকি। রাস্তায়।"

"যাস না? দাঁড়িয়ে থাকিস? তা-হলেও তো সে তোকে তুক করেছে।" চুলের মুঠি ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

"কে? সুধীরমামা?"

তুমি অপলক তাকিয়ে ছিলে। ক্লান্ত, একটু একটু নেতিয়ে পড়ছ।—"না। সেই—সেই খারাপ মেয়েটা। তুই তাকে নিশ্চয় দেখেছিস।"

বলে উঠলাম, "আমি কাউকে দেখিনি মা।"

কানাঘুষা তোমার কানেও এসেছিল। ক্লাসে এই সব নিয়ে বলাবলি হত, সব কথা তখন আমি বুঝতাম না। আমাদের মধ্যে মাথায়-বড় যে-মাণিক, সে একদিন কেমন রসিয়ে রসিয়ে বলছিল, শুনছিল ওর প্রাণের বন্ধুরা, কেউ কেউ আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। একজন আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কী রে, তোর সুধীরমামা তোদের বাড়ি আসছেন তো, রোজ? আসছেন না?" বলেছি "না"। সে বলল, "একদম বন্ধ?" মাথা নাড়লাম। তখন "হুঁ-হুঁ, আসবে কী করে, শামুকে পা কেটেছে যে!" শামুকটা কী, বুঝিনি, বোকার মত আমি ভেবেছিলাম, সুধীরমামার পায়ে, কই, শামুক-টামুকের কোনও দাগ তো দেখিনি!

কানে কানে ফিরে কথাটা তোমার কানেও এসেছিল।—"দেখিসনি, তুই তাকে দেখিসনি?"

"কই না তো", বলে দিলাম এক নিশ্বাসে।

কিন্তু মা, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, তাকে আমি দেখেছি।

মুখে মিথ্যে, চোখে তখন এক ঝোপ থেকে আর-এক ঝোপে এক-একটা খরগোস যেমন তরতর ছুটে যায়, তেমনই পর-পর এক-একটা ছবি : সুধীরমামা বের হচ্ছেন, আমি একটা গাছের আড়ালে চট করে চলে গেছি। খিল খোলার পর দু' পা বেরিয়ে এসেই হঠাৎ পিছিয়ে গেল কে, একে তো আমি আগে দেখিনি। যে-বুড়ি ওঁর জল তুলে দেয়, উনুন সাজায়, জল তুলে আনে, তাকে তো আমি চিনি, কালিদাসী। আবছা যাকে দেখা গেল সে অন্য, মার চেয়ে ময়লা, কিন্তু বয়সে মারই মতো বরং একটু ছোট, সবাই এখন বদলাচ্ছে জানি, তবু একটা ভোল পালটানো বুড়ি কালিদাসীর পক্ষে কি সম্ভব? বোধ হয় না।

"বাজে মেয়ে, খারাপ মেয়ে", উঠোনেই বসে পড়ে মুখ ঢেকে তুমি বলছ, "লোকের কথায় আর কান পাতা যায় না।"

আমি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে কখন রাস্তায় গুটি গুটি এগিয়ে একটা খোলা জানলার সামনে। শিকে মুখ রেখে—এই তো সে। খিল খুলে যে বেরিয়ে এসেছিল সেই না? মস্ত কালো পেড়ে একটা শাড়ি, ভরা ভরা-গাল একটা মুখ, চোখ ফোলাফোলা, কিন্তু চোখ কি কারও অত কালো হয়, তাই বলো, কাজল-টানা, কাজল তো পরে বাচ্চারা, আমার চেয়েও যারা বাচ্চা, তারা, বড় মেয়েরা আবার কাজল পরে নাকি, আমি তখনও অন্তত দেখিনি। কিন্তু ময়লা, মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, আমারই তো, গোলগাল মুখটা নীচের দিকে ক্রমশ সরু, কেমন ওই মুখটা, কেমন যেন?—ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে, তাসে-দেখা ইসকাবনের মতো। "শুনেছি তো দেখতে একটা কোলা ব্যাঙ, একটা বাচ্চা হাতি", মা, কে বলছে কথাগুলো, তুমি? তুমি যদি, তবে কোথায় আমি, আমি এখন কোথায়, কার গলা শুনছি, কিন্তু, ওই, ওইযে, দ্যাখো, এক্ষুনি আমায় ডাকছে। দাঁত দিয়ে কালো ফিতে টেপা, এক হাতে কেমন দু' আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুকের সামনে এনে পাকাচ্ছে বেণী, অন্য হাতটা হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি যাচ্ছি। ডাকলেন কেন। তুই কে। কেন ওখানে দাঁড়িয়েছিস। সুধীরমামা বাড়ি নেই? উনি আমার মামা। তোর মামা? তার মানে তোর মা, ওর বোন, বোন না দিদি, কেমন বোন হয় রে। তাতো জানি না, উনি আমার মামা, সুধীরমামা, আপনাকে তো আগে দেখিনি। আমি? আমি এসেছি, এখানে থাকি, থাকছি। কিন্তু কালিদাসী? দূর করে দিয়েছি কবে, দু' জন তো মোটে মানুষ, এমন আর কাজ কী, আমি একাই পারি, ফুঁঃ, আমার কবজি, হাত কী মোটা দেখেছিস, তোর সুধীরমামাও মচকাতে পারে না, বরং ওর হাতই একদিন পুট করে মচকে গিয়েছিল, কিন্তু এত কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস, দেখতে তো

মেনিমুখো, কিন্তু তুই ছোঁড়া তো খুব পাকা রে, পেটে পেটে ফন্দী, আমার পেট থেকে কথা টেনে বের করতে চাইছিস। যাঃ, এবার পালা, না দাঁড়া, ছুটে ওই দোকান থেকে আমার জন্যে দোক্তা এনে দে, এই নে, দু' আনা, হাত পাত, আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি, হাত পাত না! "সব সময়েই মুখে নাকি পানের খিলি, এ দিকে তো শুনি, বিধবা।" মা একটু থামো, থামো না, দু' রকম গলায় আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, দেখছ না, দোক্তা পাতা নিয়ে দৌড়ে এসে আমি এখন হাঁপাচ্ছি?—জানালাটা উঁচু, ওখান থেকে দিবি কি করে, এই ছোঁড়া, ওরে কড়ে আঙুল, তার চেয়ে ভেতরে আয়, আয় না, খিল খুলে দিচ্ছি, ও মা, মোটে এই ক'টি, বোকা পেয়ে তোকে ঠকিয়েছে, তোকে যা ভেবেছিলুম তুই তা-তো না—একদম সেয়ানা না, দোকানদারটা ঠগ, ও আসুক, ওকে বলব। "ও—ওকে" বললেন কেন। কথা শোনো, কী বলব তবে। কেন, সুধীরদা! দ্দাঃ? দা-টা ও আমার হল কবে, ও আমার দাদা-টাদা কিচ্ছু না। তবে কী। বললে কি তুই বুঝবি, ওর মামাতো এক ভাই, লতায়-পাতায় কেমন ভাই কে জানে রে বাবা, ওর এক মামাতো না কী-তুতো ভাই হল গিয়ে আমার ভাসুর। "আপনার বিয়ে হয়েছে?" কপালটা সাদা দেখে বলছিস, এই বয়সে তুই তো দেখছি সব কিছু জেনে বসে আছিস, বিয়ে? তা হয়েছে, মানে হয়েছিল, আমি বিধবা।—"ছি, ছি, এই বয়সে, যাকে ভাবতাম গোবরগণেশ যেন ঠাকুরটি, গণেশ তো নয় ইঁদুর, গণেশের বাহন ইঁদুর, তা-ও খড়ে তৈরী" —কে বলছে আমি বুঝছি না, শুনতে চাইছি না, দেখছ না উনি আমার গাল দুটো এইমাত্র টিপে দিলেন, নাকের ডগাও।—ইস, টিপলে এখনও দুধ গলে, দোক্তা এনে দিলি, তোকে কী দিই বল্ তো, বাতাসা খাবি, বাতাসা? আর তার সঙ্গে নেয়ে উঠেছিস যে, ঠাণ্ডা জল, নাকি নেবু-মেশানো চিনির সরবৎ? কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা, তোমরা কেউ এখন কথা বোলো না, ঠাণ্ডা! কুলুকুলু বয়ে যাচ্ছে, বুকের তলা দিয়ে। "কী বলে ডাকব আপনাকে?" মামী, মামী বলতে পারিস,

না, মামী না, কে আবার কী বলবে, বরং বলিস, মাসী, আর দোক্তা পাতা আমার যখন-তখন ফুরিয়ে যায়, এনে দিবি বুঝলি, আর রোজ আসিস।

তোমাকে এ-সব কিচ্ছু বলিনি, মা, সেদিন মুখ ফসকে মিথ্যে কথাটা বেরিয়ে গেল কেন যে! বলিনি, আবার বলেছি-ও। রাত্রে, শুতে গিয়ে, মনে মনে, হয়ত বা ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে। তাকে আমি দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি। তার হাতের সরবৎ খেয়েছি। এর পর আরও দু' দিন ফুট-ফরমাস, একদিন সেই দোক্তা, আর-একটি চুলের ফিতে। সব তোমাকে ওইভাবে বলে ফেলে হালকা হয়ে গিয়েছি। তুমি শুনতে না-ই বা পেলে, না বলে দিলে আমি সেদিন ঘুমোতাম কী-করে!

আর তুমি? প্রথমে চুলের মুঠি ধরেছ, ঠাসঠাস করে মারলে। কিন্তু আমি কাঁদিনি তো, তুমি নিজেই বরং কড়া করে জবানবন্দী নিতে নিতে, ঝাঁঝ আর ঝাল মিশিয়ে কত কী বলতে বলতে, হঠাৎ চোখ ভাসিয়ে ফেললে। হু-হু, হু-হু, থামেই না, এ-যেন নদীর পাড়ের হিমেল হাওয়া শুধু, কী আশ্চর্য, মা, আমার কান্নাটা আমার হয়ে তুমিই কাঁদলে?

আর মাঝে মাঝে এক-একটা ওই কথা, ছপছপ জলে পা ফেলার মতো! তুমি ভাবছিলে ওগুলো স্বগত, কেউ শুনছে না, কিন্তু শুনেছে। সেদিন বোঝেনি, পরে, একদিন সবখানি মানের ডালা তার কাছে খুলে গেছে।

"এইভাবে শোধ নিচ্ছে ও, এইভাবে," মাথা নীচু, স্বর আরও নীচু, তুমি বলছিলে। "না-হয় পাড়ার বাইরে, তবু এই সাহস, এই সাহস, শরীর খারাপের ছুতো করে কাকে আনল, আর তাকে রেখে দিল?" তুমি ফুঁসছিলে, "রেখে" কথাটাকে অত বিশ্রীভাবে ঝোঁক দিয়ে বলারই বা কী মানে ছিল?

"হেরে গেছি", একেবারে শেষে তুমি বলেছ আস্তে আস্তে, "আমি হেরে গেছি, ও সইতে পারল না, তাই শোধ নিল, আমাকে হারিয়ে দিল।"

সেদিন পারিনি, এখন "কর-খল-জল,"-এর মতো সোজা বাক্য-গুলো পড়ছি। সেদিন পড়তে পারতাম যদি, তবে তক্ষুনি তোমাকে বলে দিতাম, মা—জানি না, উনি কী সইতে পারেননি, কিন্তু শোধ, কোথায় শোধ? তুমি হারোনি, একেবারে হেরে গেছেন সুধীরমামা। দোক্তায় আসক্ত একজনকে যে আনতে হল—ষোল-আনা জিত তো তোমারই।

আট

কিন্তু তুমি ক্রমে ক্রমে আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলে। আজ মনে হয়, দিচ্ছিলে ইচ্ছা করে। এক-একটা সময় আসে যখন বেঁচে থাকাটাকে মনে হয় একটা বুদ্বুদ, ফুঁ দিলেই ফটাস। তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, কারও না, যে যায় তারও না, কারণ বুদ্বুদটার মানে নেই, বরং ওই অর্থহীনতাকে টিকিয়ে রাখাটাই যন্ত্রণা। যেন অনেক কষ্ট করে কষা অঙ্কটার পাশে মাস্টারমশাই ঢ্যাড়া এঁকে দিলেন, বসিয়ে দিলেন একটা গোল্লা।

তোমার মুখেও ফিনফিনে সাদা একটা ছায়া পড়তে দেখেছি, শুকানো ঘায়ের উপরে নতুন চামড়ার আস্তর পড়লে দেখায় যেমন। লক্ষ্য করেছি ভালো করে খাচ্ছ না, গাঙ্গুলীবাড়ির পিসীমা বলতেন, 'তোমার এত অরুচি! ওষুধ আনিয়ে খাও।' ওষুধ আনা হত, তুমি খেতে না, দু'চার গ্রাস মুখে যা তুলেছ সে শুধু আমার খাতিরে।

ও-বাড়ির পিসীমার মতো সত্যি-সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি যে, তোমাকে কিছুতে ভর করেছে, ওঝা-টোঝা ডাকা একদম বাড়াবাড়ি, তা-ছাড়া ঝাড়াঝাড়ির গল্প-টল্প যা শুনেছি, এই শরীরে তোমার সহ্য হবে না। তবু জল-পড়া এনে দিলাম, পিসীমার কথামত একদিন বড়বাড়ির মন্দিরের পিছনে গিয়ে এক টুকরো নুড়ি বেঁধে দিয়ে এলাম। ওদিকটায় ঝোপঝাড় ফণিমনসা, সাপখোপ, শেয়াল, যাদের কটা চোখ জ্বলজ্বল করে, ধূর্ত-ধূসর নেউল, তা-ছাড়া এখানে ওখানে লুকোনো বিছুটি, খালি পায়ে গেলে চুলকোয়, জ্বালা করে, তবু তোমার জন্যে কোথায় না যেতে পারি, পাশের বাড়ির পিসীমা শিখিয়ে দিয়েছিল মানত করতে, কী-ভাবে তা করে আমি কি জানতাম, মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঠাকুরকে বলা 'মাকে সারিয়ে দাও,' এই তো! শুদ্ধমত

করা না হলে কি পাপ হবে, হয় হোক গে, হলে তো আমার হবে, কিন্তু মা যেন যা ছিল আবার তা-ই হয়ে যায়।

মানত করে ফিরছি, সন্ধ্যা লেগেছে কি লাগেনি, ঘরে ঢুকতে যেতেই এ কী, খোলা চুল একেবারে ছড়ানো, চৌকাটের ঠিক ওপাশে তুমি চিত হয়ে পড়ে, কাপড়চোপড় এলোমেলো, মা, তোমার বুকটাও যে ওঠাপড়া করছে না!

ভীষণ চিৎকার করে আমিও উবুড় হয়ে পড়েছি তোমার বুকের উপরে, ফুঁ দিচ্ছি, জলের গ্লাস কাত করে তোমার চোখে ঝাপটা। এ-সব করতে কে বলে দিল জানিনে, হয়ত ফিটের ব্যামোয় সাড় ফেরাতে এইসব করে কোথাও দেখে থাকব, সেই জ্ঞান উপরে ছিল না, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তলা থেকে মাথা ঠেলে উঠে এল। ভর করেছে? সেইটেই তবে বোধ হয় ঠিক, নইলে সর্‌সর্ সর্‌সর্ চার পাশে শুনছি কেন, ঝিঁঝি পোকারা একসঙ্গে ডেকে উঠেছে, বাইরে নয়, আমার মাথার মধ্যে, নারকেল গাছটার ছায়া প্রকাণ্ড কচ্ছপের মত মুখ নেড়ে এগিয়ে আসছে, তোমাকে ঢেকে দেবে, ওঠো, বলছি এক্ষুনি উঠে পড়ো! নইলে আমিও ঠিক তোমার পাশে ফিট হয়ে পড়ে যাব।

কত পরে, কত পরে দেখলাম যে, তুমি চোখ মেলছ। একটা হাত কাত হয়ে পড়ল আমার কপালে, চোখের ইসারায় তুমি আমাকে উঠে বসতে বলছ। চোখেরই ইসারা বুঝে গ্লাসে নতুন করে জল ভরে তোমাকে দিলাম, তোমার হাত কাঁপছে, কিন্তু ঢক্‌ঢক্ করে এক চুমুকে সবটা শেষ করে দিলে।

"ওখানে স্বর্ণসিন্দুর আছে, খলটাও আছে, মেড়ে এনে দিতে পারবি?" জেগে উঠে সেই তোমার প্রথম কণ্ঠস্বর। পারব না! তুমি ফিরে এলে, কোথায় না কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলে, পুকুরঘাটে মাঝে মাঝে যেমন ডুব দাও, অনেকক্ষণ আর মাথা তোলো না, জলের নীচে আমি তোমার গোল হয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠা কাপড়ের আভাস

দেখি, উঠছ না, এখনও উঠছ না কেন, ডুব দিয়ে তুমি কি তুলে আনতে চাও তলাকার মাটি, কিন্তু তলায় যে অনেক শ্যাওলা, ওর মধ্যে জড়িয়ে গেলে তুমি আর উঠবে না। হাতে তোমারই শুকনো একটা কাপড়, বদলে যেটা পরার কথা, সেই গচ্ছিত কাপড়টা হাতে নিয়ে আমি কাঁপতে থাকি।

সেই ডুব দিয়ে ভয় পাওয়ানোর মজার খেলাটাই অন্যভাবে আজ তুমি খেললে নাকি, খেলেছ বেশ করেছ, এখন তুমি ক্লান্ত, তোমার মুখে গাঁজলা, হাঁপরের মত শ্বাস নিচ্ছ, কিন্তু ফিরে তো এসেছ! তুমি পেরেছ ফিরে আসতে, আর আমি সামান্য একটু স্বর্ণসিন্দুর খলে করে মেড়ে আনা, এটুকুও পারব না? ঘরের কাজে আমি আনাড়ি, ঠিক, কিন্তু এক-একটা বিপাক আমাকে কাজ শিখিয়ে দিচ্ছে, এক-একটা ঘটনা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আমাকে দিচ্ছে বড় করে। ইস্কুলে একবার এক ভেলকিওয়ালার হাতের ঢেউয়ের মত ওঠানামায় যেমন একটা টবের চারাগাছকে তরতর করে বেড়ে উঠতে দেখেছি।

আমি বড় হচ্ছি। এবার রথের মেলায় একদিনও যাইনি, না-গিয়ে থাকতে পারলাম, দেখলে না?

বড় হয়েও হঠাৎ-হঠাৎ বোকা-বোকা এক-একটা কথা বলে ফেলার স্বভাবটা কিন্তু আমার গেল না। ওই সেদিনই তো, তুমি খল থেকে স্বর্ণসিন্দুরটা চেটে চেটে খাবার পরে আমি ওরা যেন শুনতে না পায় এমনি গলায় বললাম, "মা, ওরা ভর করল কেন। দাদা আসছে বলে হিংসে? সইতে পারছে না?"

তুমি হেসেছ; মনে পড়ছে সে-হাসি পাণ্ডুর, মধুর, মৃত্যুরই মতো। খলটা নামিয়ে রেখে বলেছ, "আমি বোধহয় এবার আর বাঁচব না রে। সে আসবে না, আমাকেই বুঝি নিয়ে যাবে।"

তোমার মুখে হাত-চাপা দিয়ে বলেছি, "চুপ, চুপ বলছি। চুপ করো", আর হাত সরিয়ে তুমি, "কিন্তু আমার মন যে কেবলই তাই

বলছে। নইলে কোনও বার তো এরকম হয় না! শরীর একেবারে ভাঙা, এই মূর্ছা যাওয়া, ভয়ভয় রোগ!"

"চুপ করলে না তুমি? এক্ষুনি যদি না থামো, ওসব বাজে অলক্ষুণে কথা বলে চল, তবে আমি খাবো না, শোবো না, এই রাত্তিরে শ্যাওড়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াব, তারপর ভূত-পেত্নী সব নেমে আসুক, আসুক না, আমি কেয়ার করি না। তুমি তো তা-ই চাইছ?"

বসে বসেই, হাতে ভর দিয়ে, আরও কাছে এসেছ তুমি।—"সত্যি বলছি, সত্যি, ওই ছাখ টিকটিকিটা ডেকে উঠল। বল্ না, কী হবে যদি মরে যাই!"

তার মানে দাদার কাছেই যেতে চাও, আমি তোমার কেউ না, অভিমানে ফোলা ঠোঁটে, টসটসে চোখে এইসব কথা, শব্দ করে নয়, যেন লেখা হয়ে যাচ্ছিল। আমার পিঠে হাত রেখেছ তুমি, চাই না, চাই না ওই আদর, সরিয়ে নাও, সরে যাও—যাও এক্ষুনি।

হাত বুলিয়ে তবু বলছিলে, সে কি আমাকে আরও কষ্ট দিতে, না নিজের কষ্ট ঢাকতে? বলছিলে "মরে যাই-ই যদি, ভগবান যদি টেনেই নেন, তবে তোর আর কী

(না আমার কিচ্ছু না),

তোর বাবা এসে তোকে নিয়ে যাবে, লেখাপড়া শিখবি, বড় হবি, তোর টুকটুকে একটা বউ হবে

(বউ, বউ, তোমাকে বাদ দিয়ে; কিন্তু তোমারই মত মিষ্টি আর একজনের ছবি তুমি তখন থেকেই তৈরী করে দিচ্ছিলে, দ্বিতীয় একটি অনুভূতি; তখনও কামনা না, শুধু সুন্দর একটি কল্পনা),

তখন, তখন আমাকে ভুলে যাবি তো?

"গেলি তো গেলি", তখন তুমি সামলে উঠে হালকা গলায় হাসতেও পারছ, ঠাট্টা দিয়ে শরীর-মনের ব্যথার উপরে চাদর টেনে দেওয়া—"গেলি তো গেলি, আমি তখন কোথায়, দেখতে তো আসব

না! দেখি, মুখখানা দেখি। উঁহুঁ, একটু-একটু মনে পড়বে, না রে? মাঝে মাঝে। কী মনে পড়বে, একটা মা ছিল, সেই তোর গল্পের বইয়ের দুয়োরানী, ঘুঁটেকুড়ুনি যে খালি সকলকে দুঃখই দিয়ে গেল, জ্বালালো সব্বাইকে, তোকে, তোর বাবাকে—সুধীরমামাকে জ্বালালো, নিজেও জ্বলে-পুড়ে শেষ হল

(মিথ্যে, মিথ্যে, আমার কিচ্ছু মনে পড়বে না)।

"মনে পড়বে রে, পড়বে। যে তোকে ভালো করে খেতে দিত না, কেমন? তোকে চুলের মুঠি ধরে মারত, কেমন? শীতের দিনেও জোর করে ধরে নাওয়াত, মাছের কাঁটা ঠিকমত বেছে দিত না বলে গলায় কাঁটা ফুটত, আর কী-কী, সব এই বেলাবেলিই বলে দে, জেনে যাই, তখন তো আর জানব না! এই! চোখ মোছ বলছি, দেখিসনি তোর বাবা কেমন চলে-ফেরে গট্‌গট্ করে, তার ছেলে হয়ে তুই ছিচকাঁদুনি, ছি, তোকেই দেখছি বউ সাজিয়ে বিয়ে দিতে হবে, নাকে নোলক, মাথায় ঘোমটা, দেখি দেখি কেমন মানাবে"

(খবরদার বলছি, তোমার আঁচল আমার মাথায় ফেলে দিয়ে ঘোমটা বানাতে এসো না)।

লাফ দিয়ে সরে গেছি, দরজায় পিঠ দিয়ে আঙুল তুলে তোমাকে শাসাচ্ছি, কাঁদছি কোথায়, এই মিথ্যেবাদী, তোমার চোখের দুষ্টুমির খানিকটা আমার চোখে ভরে নিয়ে এই তো আমিও হেসে উঠেছি, দেখছ না?

দোক্তা পাতাগুলো হাতে নিয়ে সে বলল, "এই শেষ, তোকে আর বোধ হয় আমার জন্যে দোকানে ছুটোছুটি করতে হবে না।"

"ছেড়ে দেবেন?"

খিলখিল হেসে সে বলল, "এই জায়গাটাই ছেড়ে যাব। এখানে আর টেঁকা যাচ্ছে না।"

তার মানে বলছে, ও চলে যাবে, তার মানে কি যা ছিল ফের ঠিক তেমনই হবে? আমার ভিতরটা লাফাচ্ছিল, তার কতটা সত্যি-সত্যি আহ্লাদে, কতটা একটু মুষড়ে পড়ে, তোমাকে বোঝাতে পারব না। এখন কিন্তু বেশ বুঝি, আমার একটা ভাগ খুশী হয়েছিল নিশ্চয়, যে মনে মনে চাইত কিনা যে 'চলে যাক, ও চলে যাক,' তোমার সেই কাটাকাটা কথার ছিটে আমার সেই ভাগটার গায়েও লেগেছিল, তাই "ও চলে গেলেই সুধীরমামা আবার আমাদের হবে" এই আশাটার উপরে মন উড়ে উড়ে গিয়ে পড়ছিল, পায়রা পাখি বারে বারে এই চালে এই খোপে ঢুকে ডিমের উপর পাখা ছড়িয়ে যেমন বসে।

(এটাও সেই বয়সের আর-একটা বোকামি, প্রকৃতিতে যা দেখি, জীবনেও তাই প্রার্থনা করা; কুয়াশা কাটলে যেমন গাছপালা আবার স্পষ্ট, ঢল নেমে গেলে মাঠ-ক্ষেত-দাওয়া যে-কে-সেই, বৃষ্টি থামল তো আকাশ আবার রোদ্দুরে থৈথৈ হল, তেমনই, সব তেমনই। একটা কিছু ঘটে কিছু-কিছু অন্য রকম করে দেয়, সে সরে যাক, অমনই দেখবে চেনা ব্যাপারগুলো তাদের পুরণো চেহারা ফিরে পাবে। পরে দেখে দেখে বুঝেছি, জীবনে তা হয় না, অনেক জিনিস আছে যা যায় তা চলেই যায়, জোড়া আর লাগে না একবার যদি ভেঙে যায়। ধাক্কা খেয়ে যে স্রোত নেমে গেছে নীচের দিকে সে আর কখনো পিছনের পাড়ে ফিরে আসবে না। একটা ভাগ তবু চাইছিল ও চলে যাক, এত কিছু পাবার আছে মন তখন জানত না তো, জানত না, পেতে পেতে আর হারাতে হারাতে জীবনে চলতে হয়; তাই যা ছিল তার সবটুকুকে সেদিন সে আঁকড়ে রাখতে চাইত,

যা ভাঙছে তাকে জোড়া দেবে কী করে ভেবে ভেবে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ত।)

আর-একটা ভাগ, মা তোমাকে বলিনি, আমারই মনের আর একটা ভাগ, অন্য একটা মজা পেয়েছিল যে, সে বলছিল, থাকুক না ও, কী আসে-যায়, ওই যে দোক্তাপাতা আনা, চুলের ফিতে কেনা, নেবু-চিনির সরবৎ, বুকের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া বিনুনি, এ-সব কিছুরই একটা আলাদা স্বাদ, বড় হলে এরই নাম দেওয়া যেত নেশা, অবচেতন একটা আসক্তি। অবচেতন, কারণ শরীরের আঁটসাট গড়নে তোমার সঙ্গে তার যে-তফাত, সেটা ওই বয়সে সজ্ঞানে সে ধরতে পারে নি। আহা, সেই ভাগ, যে চপল, যে লোভী, সে জানে না কেন যে, অন্য রকম লাগে কেন। উচিত, অনুচিত? ভালো, মন্দ? এ-সব বাছবিচার টনটনে বয়সেই হয় না, আর তখন তো চোখ না ফোটা পাখির বাচ্চা, অন্ধ।

(অন্ধ যে, সে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে তমসায়, মানুষের গভীর দার্শনিক উপলব্ধিও এই কথা বলেছে, পরে পড়েছি। আলোকের সীমা ছেড়ে সে যে অন্ধকারে চলে গেল তা কি অনুভব করে?)

পায়েসের পাত্রটি আছেই, থাক, তবু ঝোঁক যায় আচারের বয়মের দিকেও। তোমার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় অংশের একটা আলো-আঁধারি লুকোচুরি চলছিল।

দ্যাখো মা, ধারাবিবরণীকে খানিকক্ষণ "তিষ্ঠ" বলে তোমাকে অকপটে সাফসাফ কয়েকটা কথা এখনই বলে ফেলি, পরে, যখন জীবনের জটিলতর অধ্যায়ে প্রবেশ করব, তখন কাজটা সহজ হবে। হ্যাঁ, যে লুকোচুরিটার কথা বলছিলাম, ওটা সকলেরই থাকে, গোচরে বা অগোচরে, প্রীতি-অপ্রীতি, অনুভূতির নানা স্তরে। সবচেয়ে বড়ো একটিমাত্র মনোহারী দোকান থেকেও তো সব জিনিস কেনা যায় না, সর্বোত্তম বা সর্বোত্তমাকে দিয়েও সব চাহিদা চিরতরে মেটে

না। প্রত্যেক মানুষ, নর কিংবা নারী, এর খানিকটা গ্রহণ করে, ওর খানিকটা, ভিতরের-বাইরের, স্থূল-সূক্ষ্ম, বিবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অসংখ্য ব্যক্তির জন্য স্থান আছে। তা ছাড়া কেউ গতকালের, কেউ আজকের, কেউ আগামীকালের। প্রিয়তমাকে পাশে বসিয়েও পটপটিয়সীর অভিনয়-নৈপুণ্যের, এমন কী শারীর রেখা-টেখারও তারিফ করতে কারও বাধে না ; অতি বিশ্বস্ত কুলবতীও তুখোড় খেলোয়াড়ের চাতুর্যে, পটু নটের মাধুর্যে, অস্ফুট হর্ষধ্বনি করে ওঠেন, জননায়কের নিমেষ-দর্শনের আশায় কুতূহলী বাতায়নে দাঁড়ান। মনের মৌচাকে আলাদা আলাদা সব খোপ আছে, নির্জ্ঞানে যাই থাক, সজ্ঞানে কোনোটার সঙ্গে কোনোটার বিরোধ নেই, অদ্ভুত এক সন্ধি আর সমন্বয়, রক্তপাত নেই, অশ্রুও না, দিব্য এক শান্তি ; কিন্তু খোপে খোপে যদি কখনও একাকার সেই অঘটনও ঘটে, প্রায়ই ঘটতে চায়, তখনই বিপত্তি, ভাঙে সেই চমৎকার সামঞ্জস্য, তখনই অশ্রু, রক্ত, এমন-কি প্রাণপাত। তার চেয়ে অগোচর মন যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেয়, তার কোনও লেখাপড়া থাকে না বটে, কিন্তু সেটাই নির্ঝঞ্ঝাট, কেন না তার অনেকটাই যে না-জেনে। মা, তুমিও তো না জেনেই এমনই কয়েকটা খোপ তৈরী করে নিয়েছিলে ? —কোনোটা আমার, কোনোটা বাবার, কোনোটা সুধীরমামার। সুধীরমামার—তাঁর পূর্ব পর্বের কথা বলছি—নীরক্ত—নিরাসক্ত নিষ্পত্র মা-ফলেষু ঋজুতাকে শ্রদ্ধা করেছ, তাই বলে বাবার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকেও প্রতিহত করার বেড়াও তোমার শক্ত ছিল না, তদুপরি ভগবানেও ভক্তি ছিল খাঁটি আর অচলা, ছাখো, মন কেমন ভারসাম্যের বাঁধা তার, একের পর এক ভর সয়েও টানটান থাকে, কেউ হেলে যায়, কেউ টলে পড়ে, কিন্তু পড়বেই যে এমন কোনও কথা নেই। মা, এতদিন পরে আমার সেদিনকার দ্বিমুখী টানের এই সাফাই ; আমার, অর্থাৎ আমার একাংশের। অন্য ভাগের কথা আগেই বলেছি।

এইবার খেই ধরে যা বলছিলাম, সেই বিবরণে ফিরে আসি।

সে বলছিল, "এখানে আর থাকা যাবে না, ছেড়ে যাব। রোজ ঢিল পড়ছে, উঠোনে, টিনের ছাদে। সাঁঝের আঁধারে টিউ-কলের পাশের গাছটায় কারা চড়ে বসে।"

"ভূত ?"

সে হাসল। "ভূত ঠিকই তবে মানুষ-ভূত।" বলতে বলতে সে কৌটো খুলে টপ্ করে একটা লেবেঞ্চুস গালে ফেলল, একটা আমার মুখে গুঁজে দিল, একটু টক, একটু মিষ্টি, একই সঙ্গে দু'রকম। তাছাড়া সে আঁচলটার খানিক খুলে উড়িয়ে উড়িয়ে নিজেকে বাতাস করছিল। আমাকে অবাক দেখে তাকাল যেন কেমন একটু করে, রেগে গেলে তুমি যেমন চোখ সরু আর ছুঁচলো করো, কতকটা তেমনই, তবে সে করছিল কৌতুকে। বলল, "থাকিই না একটুখানি এমনি, যা গরম! তোর সুধীরমামা তো আর দেখছে না।"

তা ঠিক। সুধীরমামা যখন নেই, তখনই যাওয়াটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমার অভ্যাসে। দেখা না হতে হতে ক্রমে এসে গেল একটা আড়ষ্টতা, মনে হত মুখোমুখি হলেই সর্বনাশ, কী বলব, কোথা দিয়ে পালাব? সুধীরমামাও নিশ্চয় জানতেন আমি যাই-আসি। উনিও কি চাইতেন আমাকে এড়াতে?

সে বলছিল "ওই গাছটায় ওরা চড়ে বসে, কলতলায় উঁকি মারে, ভেবে ছাখ তখন হয়ত আমার গায়ে কাপড় নেই। পরশু যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম, ও একটু এগিয়ে পড়েছিল, কারা আমার পিছু নিল। ধপ্ ধপ্, ধপ্ ধপ্ পায়ের শব্দ, বাপ্ রে ভাবলেও এখন বুক ধপধপ করে। শুনিয়ে শুনিয়ে কী শিস্ আর কত বাহারের গান! বাড়ির কাছাকাছি আসতে একেবারে যা-হয়-তা-হবে বলে তো একটা দৌড় দিলাম। খিল তুলে দিয়েছি, তবু কাঁপছি। ওরা জানালার বাইরে দিয়ে যেতে যেতে, হাড়-হাবাতের দল, জোরে জোরে বলে

গেল, 'তুমি ওকে গুণ করেছ, তোমার ভাগ আমরা চাই'—তুই এ-সব সাঁটমারা কথার মানে বুঝিস ?"

আলগোছ খোঁপাটাকে হঠাৎ সে খুলে দিল, ঘামাচি নেই তবু যে কেন কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নীচটা চুলকোচ্ছিল!—"তোর সুধীরমামাকে বললাম সব। ও কেমন মেনিমুখো জানিস তো, একদিন মজা করে কলপের শিশিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, কী দুর্দশা বেচারার! পরদিন চুলগুলো সব নতুন-ওঠা আমের পাতার মতো তামাটে. সে যা ছিরি হল, যদি একবার দেখতিস! ঘুরে ঘুরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে 'দাও দাও' বলে আমাকে সাধাসাধি আর-কী, ওই যাত্রায় কেষ্ট রাধার কাছে হাঁটু মুড়ে যেমন করছিল। যাক, এমন যে মেনিমুখো, ও-ও কিন্তু সব শুনে বলল, "ভামতী, আমরা এখানে থাকব না।"

ভামতী, ওর নাম ভামতী। আমাকে ভামী-মাসী বলে ডাকতে বলত।

ছোট্ট ছোট্ট হাই তুলে সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া নাড়ছিল, ঘাটে বসে হাত দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে জল নাড়ার মতো। বলছিল, "এখানে কাছারির কাজটা অবিশ্যি ভালোই ছিল, ছুটিই তো দেখি বেশি, তা-ছাড়া আগে নাকি ডেকে ডেকে ছেলে পড়াত, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর পাগলামিটা ঘুচেছে ভালোই হয়েছে। যাক গে, ব্যাটা ছেলে, লেখাপড়াও শিখেছে, অন্য জায়গায় গিয়েও চালিয়ে নিতে পারবে, দুটো তো পেট মোটে! না পারে তো আমার কী, আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাব।"

"ফিরে যাবেন, সুধীরমামার কাছে থাকবেন না ?"

"না রাখতে পারে যদি, কী করা। এখানে পাজী লোকেরা পিছু নিয়েছে, শিস দিচ্ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, হ্যাঁরে, ও যে বলে ঢিল যারা ছোড়ে তাদের মধ্যে ইস্কুলেরও গোটা কয়েক ছেলেও আছে ?"

"হবে।" আমি বললাম।

"একদিন হেডমাস্টারকে বলবে বলে বেরোলো। কিন্তু ফিরে

এল মুখ চুন করে। বল্ তো কেন? আগে খেয়াল করে নি, খানিকটা যেতে টের পেল, বলবে কী, তা হলে আমি যে কে, তা-ও তো বলতে হয়, তা-হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসে যে।" সে, যার নাম ভামতী, একটু আগে যে-আঁচল হয়েছিল তার হাতপাখা, সেটাই মুখে পুরে হাসি সামলে নিচ্ছিল। —"কেঁচো খুড়তে তা-হলে, সাপ বেরোবে, হি-হি", হাসিটাকে কমা সেমিকোলনের মতো ব্যবহার করছিল সে, কিন্তু তার চোখ চকচকে হয়ে উঠেছিল। হাসি থামাতে গেলে চোখ এ-রকম চকচকে হয়ে যায়, বিশেষ করে পেট থেকে হাওয়া বেরিয়ে যায় কিনা তাই কষ্ট হয়, আমাদের সকলেরই হয়, চোখের তারা তখন যেন ঠিকরে আসে, যেন ভাসতে চায়, অল্প জলে চক্‌চকে পুঁটিমাছ যেমন, ভামতীর চোখের মণিও ভাসছিল।

"বুঝেছিস, তোর সুধীরমামা তাই ফিরে এসে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, উপায় নেই, আমাদের চোরের মার খেতেই হবে, উপায় নেই। নইলে আমরা শেষ পর্যন্ত না-হয় চলেই যাব।"

'চোরের মার' কথাটা বলতে বলতে তার মুখটা হঠাৎ কেমন করুণ হয়ে গেল, গলাটাও ধরা-ধরা, যদিও তখনও সে হাসছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চোখে-চোখে তাকিয়ে আমি ধরতে পারছিলাম না, চক্‌চক্ করছে কেন; এর সবটাই কি ফাজলামো আর ফুর্তি, নাকি পেটে খিল ধরেছিল বলে কষ্ট, অথবা এই কষ্টটা ফুটছিল শরীরের আর-একটা অংশে, যেটা পেটের বেশ খানিকটা উপরে, যেখানটা দেখতে আমরা আলতো ভাবে শুধু একটা আঙুল ছোঁয়াই? আর তাই ওর গলায় হঠাৎ অন্য সুর লেগে গেল।

এ-সব আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, মা, তাই আমারও কেমন কষ্ট হচ্ছিল। ওই হাসিখুশী ভামতী, চাল-চলন তোমার বিপরীত বলেই যার ছিল আলাদা অদ্ভুত একটা আকর্ষণ, পলকে যেন তাকে তুমি হয়ে যেতে দেখলাম, তোমার মতন। তার মুখে

তোমার ছায়া পড়ছিল, কোথা থেকে এসে তুমি তাকে ঢেকে দিচ্ছিলে, ফুটফুটে চাঁদের উপরে পাতলা একটা মেঘের আবরণ, ওরও তবে চোখ ছলছল করে, কী-আশ্চর্য, ভামতীরও ?

সারা জীবন, পরে এরকম কত ধূপছায়া ব্যাপার দেখেছি মানুষের পর মানুষে, কাউকে সব সময় একটা ধারণার পাত্রে বসিয়ে রাখতে পারি নি। শ্রদ্ধার লোকটির আকস্মিক একটা অন্ধকার দিক দেখতে পেয়ে শিউরে উঠি, যাকে ঘৃণা করি, হঠাৎ কোনও কোনও ক্ষণে, তার কোমল মায়াবী অন্য একটা পিঠ দেখে চমকে উঠি ; আরে, এ-তো ঘৃণ্য না ! তার সেইটুকুকে তখন বুঝতে, ভালবাসতে চেষ্টা করি, যতক্ষণ-না সে আবার ছকের দানের মত উলটো পিঠে ঘুরে যায়। এইভাবে ক্রমাগত লেপা-পোছা আবার লেখা চলে, প্রথমবার পার্বত্য উপত্যকায় গিয়ে যথা সবিস্ময় দেখি এই রৌদ্র, এই ছায়া, এই বুঝি কুয়াসা কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, প্রত্যেক মানুষও তেমনই বুঝি বহুরূপী ; না না, বহুরূপী কেউ না, আমরা তাদের বহুরূপে দেখি। সম্পর্কের বড়জোর শুধু বাইরের দিকটা স্থায়ী ; ভিতরের সম্পর্কে কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। ভাঁটা, জোয়ার, আবার ভাঁটা।

এই দর্শনের সূচনা বয়সের সকালেই ঘটে, শুধু তখন এ-ভাবে চিরে দেখার চোখ থাকে না, আমারও ঘটছিল, কত ফকির তাদের ছাইরঙা জামার তলা থেকে হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে দিল ঝিকমিকে এক ফটিক, কত কুহকিনীর অন্তর্বাসের দুর্গন্ধ ভক্ করে নাকে লেগে মুখ ফেরাতে হল। বাইবেলের সেই গল্পটা তুমি জানো না, ছিল সৌল, হল পৌল, সেই গল্প। আসলে সৌল যে, সে হয়ত বা সৌল-ই থাকে, তাকে "পৌল" বলে দ্যাখে অন্য লোক।

এইভাবেই, বাবা একদিন ইস্টিশানের ছায়া ছায়া আলোয় কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন, খানিকক্ষণের জন্যে, কত ঢঙ , কত রঙ্গ-জানা থপ্‌থপে ভামতীও কৃষ-করুণ হয়ে, তোমারই আদল নকল করে আমাকে হঠাৎ ছলাৎ করে দিল—সে-ও হয়ত খানিকক্ষণের জন্যে।

মনটা যেন বরফ-ভরা কাচের গ্লাস, ঠাণ্ডা হাওয়ার একটু ছোঁয়া পেলেই তার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে, সে-জল আবার শুকিয়েও যায়।

তবু ওই যে বাবাকে, যাঁর সঙ্গে তোমার আড়াআড়ি তাঁকে, সহসা আর্দ্র চোখে দেখা, ভামতীর কষ্টে ভিতরটা একটু কেঁপে যাওয়া, এর মধ্যে, স্পষ্ট টের না পেলেও প্রচ্ছন্ন ছিল কি কোনও অন্যায়বোধ, তোমার প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ করে ফেলেছি ? বলা মুশকিল। ইচ্ছা করে ভাঙি না। বিশ্বাস যত্রতত্র ছড়ানো থাকে, খোলামকুচির মতো, সারাজন্ম না-জেনে অহরহ মাড়াই, পায়ের চাপে মুচমুচ করে ভাঙে, মানুষ তার কী করবে বলো, মানুষ নাচার।

সুধীরমামার জন্যেও সেদিন একটু কষ্ট হচ্ছিল বৈকি, ভামতীর মুখে শুনে। হেডমাস্টারকে বলতে গিয়ে মুখ লুকিয়ে ফিরে এসেছেন। যিনি ছেড়ে যাবেন, ছেড়ে যাচ্ছেন, তুলে দিচ্ছেন এখানকার পাট, সেই সুধীরমামা! মাথায় কমফরটার, নিমের গেলাস, লাঠিতে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা, সুপরিগাছের মতো রোগা কিন্তু সোজা, এখন না-হয় কী কারণে কে জানে, অন্তরিত অন্য জীবনে। কিন্তু ওঁর সেই আগের ছবিটাই তো বেছে রেখেছি। চোখ বুজলে আজও সেইটাই দেখি। তিনি চলে যাবেন, আর কাছে পাব না, কত পড়ানো, মেলায় মেলায় ঘোরানো, ম্যাজিক লণ্ঠনের সেই আসর, ঝিলে-বিলে মাছধরার চুপচাপ কয়েকটি দুপুর, সব শেষ, উপড়ে যাবে, বাবা যেমন একদিন উপড়ে ফেলেছিলেন উঠোনের গাঁদা ফুলের গাছ। সুধীরমামা। ওঁর বাবা আর তোমার বাবা, মানে আমার দাদু সেই কত বচ্ছর আগে এখানে আসেন এক সঙ্গে, ছোট্ট কী সম্পর্ক ছিল জানি না, তখনকার দিনে ঘনিষ্ঠতার জন্যে রক্ত-সম্পর্কের বিশেষ দরকারও হত না—এখন তো রক্ত-সম্পর্কের মানুষও তো একসঙ্গে কিংবা কাছাকাছি থাকে না, রক্ত

বুঝি আর ঘন নেই জলের চেয়ে—তখন কিন্তু একটু লতায়-পাতায় আত্মীয়তা থাকলেই যথেষ্ট হত। ওঁরা এসেছিলেন, সত্তর আশি কি তারও বেশি বছর আগে, তখন এখানে শুনেছি রেল ছিল না, বড় গাঙ থেকে যে খালটা বেরিয়ে এসেছে তার ঘাটে নৌকো ভিড়ত, একজন কাজ নিয়ে এলেন সেরেস্তায়, মানে আমার দাছু, আর সুধীরমামার বাবা নাকি চাঁদসির চিকিৎসা করতেন, মলম-টলম এইসব আর কী। দু'জনেই তখন নবযুবা, অবিবাহিত, সুতরাং চোখে স্বপ্ন, চোখে আশা, সেই চোখ, উপনিবেশে বসতি করতে-আসা প্রথম মানুষদের দৃষ্টিতে যে-ঔজ্জ্বল্য থাকে। একটু-একটু করে ডালপালা দেখা দিল, শিকড় ছড়ালো, নরম মাটি, তার পরতের পর পরতের মায়ায়, প্রাণের গভীরে।

সব উপড়ে যাবে। ভিতরটা হু-হু হয়ে যাচ্ছিল, ভামতীর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তখন ও-তো ভামতী নয়, সুধীরমামার প্রতিনিধি। তোমাকে একটু আগে ভুল বলেছি মা, ওই যে ভামতীর অন্তস্বাদের আকর্ষণ-টনের কথা যখন বললাম। শুধু তার জন্যে তো নয়, সুধীরমামার টানেও যে এখানে আসি, এই ঘরে তাঁর উপস্থিতি, এই ঘরে তাঁর স্মৃতি ছড়ানো, আজকের সুবাসের পিছনে ধুলো-মলিন সেই পুরু চাদরটা, চাদর মুড়ি, নয় তো লেপমুড়ি, রবিবার দুপুরে আমাকে নিয়ে, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলে জুটিয়ে ক্লাস—গ্রিমের গল্প, আসছে বছর ল্যাম্ নামে কার লেখা থেকে বিলিতি নাটকেরও গল্প পড়ে শোনানোর কথা ছিল। সব মুছে যাচ্ছে।

সব মুছে যাচ্ছে, ওঁর জ্বর, মাথার কাছে জলের গেলাস, সব। বারান্দার টাঙানো দড়িটা ছিঁড়ে গেলে যেমন ঝুলতে থাকে, রাত্রে ভয়-দেখানো হয়ে যায়। শুধু ভামতীর টানে আসি না তো, আমার খুব ইচ্ছা করে, আমাকে—আমাদের নিয়ে উনি কী বলেন, এখনও সে-সব মনে রেখেছেন কিনা, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেই।

জিজ্ঞাসা করা হয় না, ঠোঁটে কী-যেন আটকে যায়, তাই জেনে নেব প্রতিজ্ঞা করে আবার আসি।

ভামতী এখন খাওয়া লজেন্‌স্‌টার স্মৃতি ঠোঁট দিয়ে চাটছে, চোখে সেই দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।—"চলে যাব ঠিকই। তবে ওকেও ছেড়ে যেতে পারি তোকে একটু আগে বলেছিলাম না! সব ঠাট্টা। রোগা জিরজিরে, একদম দুর্বল যে, আমাকে বলেছে কোনোদিন কারু কাছে কিচ্ছু পায়নি, বাচ্চার মত এখন আঁকড়ে আছে আমাকে। আমিও গেলে ওর থাকবে কী?"

এতদিন বুঝিনি, তখনই যেন বোঝা হয়ে গেল ভামতী ওঁর কে। মনে মনে বলতে থাকলাম, "না, না, তুমি যেও না।"

'খুব দুর্বল, ও খুব দুর্বল', ভামতী বারবারই বলছিল বটে, কিন্তু ওর অত বেশি-বেশি করে বলায় চোখের সামনে দেখছিলাম যে, দুর্বল কি একা সুধীরমামাই?—না।

নয়

আজ বিকেলে, আজ বিকেলেই, ক্লাসের ক্যাপ্‌টেন জগন্নাথ, আর মাণিক এরা টিফিনের সময় গোল হয়ে কী বলাবলি করছিল, আমাকে দেখে ওরা চোখে চোখে ইসারা করে চুপ হয়ে গেল। আমাকে ওরা বিশেষ ডাকত না, ওরা বয়সে আর মাথাতেও বড়, ওদের দু'তিন জন তো প্রোমোশন না পেয়ে এক ক্লাসেই আটকে আছে। জগন্নাথ বলত, 'আমরা হলাম গিয়ে রেলের পয়েনট্‌সম্যান, এক কেবিনে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে গাড়ি পাস করিয়ে দি'।

সেই জগন্নাথ, আমি যখন সরে যাচ্ছি, তখন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল। ডাকল, ওরা মত বদলে থাকবে, অথচ আমাকে সরাসরি কিছু বলল না, কুড়মুড় ভাজার খানিকটা ভাগ দিয়ে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে থাকল, "মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছি, আজ চাক ভাঙব। ডুবে ডুবে জল খাওয়া বের করছি।"

"ডুবে ডুবে কোথায়," আর-একজন ফোড়ন কাটল, "একেবারে খটখটে আলোয়, পাড়ায় বসে —"

"পাড়ায় বসে বের করছি। মাথা মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালব, গাধার টুপি পরিয়ে, কিংবা বেড়াল-পার। বস্তায় পুরে কত বেড়াল দূরে দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসেছি, আর এই একটা হুলো আর একটা মেনিকে পারব না?"

"হুলো আবার কে, দুটোই মেনি", মাণিক বলল মূল গায়েনের ঢঙ-এ, আর বাকী সকলে হাসির দোহার ধরল।

"বাজারের শ্যাম পোদ্দার, ওই যে যার বাসায় হরিসভা বসে, সে আমাদের পাঁচটাকা দিয়েছে। যদি পার করতে পারি, তবে বলেছে আরও পাঁচ টাকা দেবে, কড়কড়ে, তা-ছাড়া একদিন পাঁঠার মোচ্ছব

দেবে জুত করে।"—ওরা ঝন্‌ঝন্ করে পাওয়া-টাকা বাজাচ্ছিল, একজন ঠং করে টস্ করছিল এক-একটা টাকা, বুড়ো আর দ্বিতীয় আঙুলে, অন্যেরা হুমড়ি খেয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছিল সেটা কিংবা লুফে নিচ্ছিল কায়দা করে।

টেরচা চোখে আমার দিকে চেয়ে জগন্নাথ বলল, "তুই তো ওখানে ঘুরঘুর করিস। আজ বিকেলের পরে চলে আসিস, বত্রিশ মজা দেখতে পাবি, দেখবি সে কী খেল্, বাছাধনকে চূড়ান্ত জব্দ করব!"

মা, আমার ভয় করছিল, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। টিফিন পিরিয়ডের পরও ক্লাসে গেলাম, কিন্তু স্যারের অনুমতি নিয়ে বার দুই বাইরে এলাম, জালা থেকে তুলে তুলে জল খেলাম। আজ বিকালে, আজ বিকালে—কী? একটা মজার খেল, ওরা বলছিল। সত্যিই কি ওরা ওইসব করবে, যা-সব বলাবলি করছিল, ঘোল, গাধার টুপি, এইসব? লীডারি করবে জগন্নাথ, সেবার ফেল করার পরে সুধীরমামা নিজে যেচে যাকে পড়াতে শুরু করেছিলেন?

ওরা যখন ওইসব করবে, ঢিল, কাদার তাল, এই সব—আমি, আমি তখন করব কী, ঠেকাব যে গায়ে সে জোর কই। তবে কি গা-ঢাকা দিয়ে দেখতে থাকব, দেখে যাব, গাছের আড়াল থেকে আর ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে? ভীরু, ভীরু কোথাকার। কিছুই করতে পারব না এই কথা স্থির জেনে নিজেকেই মনে মনে থুথু দিতে থাকলাম, তাকেও চড়ালাম গাধার পিঠে, ঢিলে ঢিলে ঘায়েল করতে থাকলাম, আমাকে আমি, কেন পারি না, কেন কিচ্ছু খুঁজে পাই না—জোর, সাহস, কিচ্ছু না?

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যায় আমি শেষ পর্যন্ত ওখানে যাইনি। কেন, মা তুমি তো তা জানো। সেদিন বিকেলটা এল খুব তাড়াতাড়ি,

দেখতে দেখতে রোদ মিলিয়ে গেল, সময়ের আগেই যেন বুড়ো দারোয়ান শেষ ঢংঢং-টা বাজিয়ে দিল ঘটা করে, পিলপিল করে বেরিয়ে আসছি সকলে, কিন্তু আমি কেন পিছিয়ে, পা টলছে, খাঁতা বই বার দুই খসে পড়ল হাত থেকে, ধুলো, ধুলো, কী ধুলো, ঝেড়ে মুছে বইগুলো তুললাম, তবু দাঁত কিচকিচ, মুখে নাকে বালি, কেননা বিকেল থেকেই সেদিন ধুলোর ঝড় বইছে, কেননা সেদিন দেখতে দেখতে রোদ মুছে আসছে, যদি বলি আমার ডান চোখের পাতাও নাচছে সেটা হবে বানানো, কারণ "বামে সর্প দেখিলেন, দক্ষিণে শৃগাল," প্রকৃতি এ-সব ঘটিয়ে দিত সেকালে, সেই ত্রেতাযুগে, রামচন্দ্র যখন মারীচকে মেরে ফিরছিলেন, এখন সে-সব আর হয় না, তবু বুকের ভিতরে কে যেন পুট্ করে টিপে দিচ্ছিল একটা টিপকল, ওরা, জগন্নাথ আর মাণিকের দল অনেকটা এগিয়ে গেছে, দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি ওদের "হুর্‌রে," ভয়ার্ত আমি ভাবছি, আজ একটা সর্বনাশ হবে। কিন্তু—

একটা সর্বনাশ যে ঘটে গেছে, তার একটুও আভাস পাইনি।

দরজা খোলা, উঠোনে পাড়া-প্রতিবেশী মাসিমারা কয়েকজন, ফিসফিস করে কথা বলছেন, ঘরের ভিতরটা কেউ ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছেন। থমকে গেছি, হাত থেকে বই-খাতা খসে পড়েছে আবার, এবার আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে এক ছুটে ঘরে। মা, আমার মা, তুমি বিছানায় ওভাবে কেন, চাদরটা রক্তে ভাসাভাসি, তোমার চোখ সাদা, ওখানে মণিই নেই যেন, আকাশ থেকে অস্ত গেছে সন্ধ্যাতারা। বিছানা রক্তে মাখামাখি, তুমি মাখামাখি, আমাকে ভয় দেখাতেই কি এইসব দেখাচ্ছ? তুমি জানো না, রক্ত দেখলে আমি কত ভয় পাই, আঙুলটাও কাটলে চোখ বুজে ঠোঁটে সেখানটা জোর করে চেপে ধরি, যে-বার বারোয়ারী কালীতলায় রাত জেগে বলিদান দেখি, সেবার অন্তত মাস দু'য়েক মাংস মুখে তুলতে পারিনে? তুমি

জানো সব জানো—তবু। মা, চোখ খোলো, বলো, কী হয়েছে। তোমার শিয়রে বসে গাঙ্গুলীবাড়ির পিসী, একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে আছেন। কী বলছেন উনি, আমাকেই কি, আমাকে যদি তবে অত চাপা গলায় কেন, বলছেন কি যে, তুমি পুকুরঘাটের পৈঠা থেকে হঠাৎ পা পিছলে—এ-সবের অর্থ কী, আমি শুনতে পাচ্ছি না, মাথামুণ্ডু বুঝছি না। আমি শুধু ওই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ব, তোমার ঘ্রাণ নেব, এলানো চুলের, নিথর বুকের, তোমার আর-একটি হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, কী? চেপে ধরে, আবার কী!—ব্যাস, ঘুমিয়ে পড়ব।

"কখন হল, আমাকে ইস্কুলে কেন খবর পাঠাননি?"—বোকার মত এ-সব কী বলছি আমি, পিসীমার দিকে চোখ পাকিয়ে, এখন, এই ঘরে, এ-সব হট্টগোলের কোনও মানে হয়?

"এই তো মোটে ঘন্টাখানেক আগে, ভাগ্যিস ঘাটে ও-পাড়ার ওরা ছিল, ছুটে গিয়ে ধরাধরি করে ঘরে তুলল! তুই বাচ্চা, তোকে খবর দিলে কী হত, তখন আগে দরকার ছিল ডাক্তার ডাকা। ডাক্তারবাবু এইমাত্র দেখে গেলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, ওষুধ ইনজেকশন সব পড়েছে, জ্ঞান ফিরেছে দেখে তবে উনি বেরিয়ে গেলেন। এখন একটু শান্তি। ও ঘুমোচ্ছে, মাঝে মাঝে জাগছে। জানিই তো, এক্ষুনি ইস্কুল ছুটি হবে, তুই এসে পড়বি, আগে এলে তো তোকে নিয়েই আর এক ঝঞ্ঝাট হত, কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিতি। যা এখন বাইরে যা। নিজেই নামিয়ে চিঁড়েমুড়ি যা আছে খেয়ে নে, ইস, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, যা বাইরে যা। এ-সব দেখতে নেই, মা-র এই অবস্থায় ছেলেরা ঘরে থাকে না। ওকে আমি একটু পরে তুলব, মোছাব।"

গাঙ্গুলী পিসীমা বলছেন আদেশ করার মতো সুরে, কিন্তু আমি রোঁয়া ফুলিয়ে গোঁয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছি, চট করে নড়ছি না।

(চোখ খোলো মা, শোনো, একটা কথা শোনো, ওরা আজ সুধীরমামাকে তাড়াবে। সুধীরমামা, সুধীরমামা, শুনতে পাচ্ছ ?)

পিসীমা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তোমার মাথায়, তুমি চোখ দিয়ে ওঁকে বলে দিলে, আর দরকার নেই।

(মা, ওই ছাখ ওরা এতক্ষণে ওখানে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একজন উঠেছে গাছে, ঢিল ছুঁড়ছে। কে একজন এইমাত্র ভেঁপু বাজাল। ওটা সংকেত। সুধীরমামা নয়, প্রথমে বেরিয়ে এসেছে ভামতী, তার কপালে একটা ইঁট—তাতে তোমার কী ? তা অবশ্য, ভামতীকে তো তুমি দেখতে পারো না।)

পিসীমা উঠলেন, তোমার মুখটা বালিশেই কাত করে কাপ্-এ একটু জল ধরলেন। তুমি অস্ফুট গলায় বলে উঠলে "উঃ !"

('উঃ' কেন মা, সুধীরমামাও যে বেরিয়ে এসেছেন, ওঁর মাথাতেও যে তাক করে মারা একটা ঝামা এসে লাগল, তুমিও বুঝি তাই দেখতে পেলে ? গাছ থেকে ওরা নেমে আসছে সর্-সর্, ভামতী টেনে হিঁচড়ে ফের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সুধীরমামাকে, ভামতীর এখন গাছকোমর, গলার পরদা চড়িয়ে বলছে, "কে আসবি আয়, একবার এগিয়ে আয় দেখি !" এবার সুধীরমামা ওকে ঠেকাচ্ছেন। ভামতী কি চাট্টিখানি, ও হল গিয়ে বাঘিনী।)

তোমার বুক ওঠা-পড়া করছে, তুমি ও-রকম আঁ-আঁ করছ কেন। পিসীমা তোমার ঠোঁটের কষ মুছিয়ে দিচ্ছেন।

(বড় রাস্তার গাছের তলায় একটা ছায়া, বলো তো কে ? বাজারের শ্যাম পোদ্দার। উনি সামনে আসেননি, পিছন থেকে সাপের মত করছেন

হিস-হিস, ছায়ায় মিলিয়ে থেকেই ওদের লড়িয়ে দিচ্ছেন। মাণিকের পকেটে ঝন্‌ঝন্‌ টাকা—কার? শ্যাম পোদ্দারের। উনিই দিয়েছেন। পরে পাঁঠাও খাওয়াবেন! তাঁরও পিছনে আর একজন ও কে? চিনতে পারছ না? ও তো তোমার ছেলে, এই যে আমি! ভীরু, কেঁচো, ছোট্টটি।)

পিসীমা গলা থেকে ডলে দিচ্ছেন তোমার বুক, ঝুঁকে পড়ে বলছেন, "খুব কি কষ্ট?"

(কষ্ট হবে না? সুধীরমামা আজ চলে যাচ্ছেন যে। ওরা খারাপ একটা ছড়া পড়ছিল, উনি দু'হাতে কান ঢাকলেন। তারপর আতঙ্কিত মুখ, সামনে যারা ছিল, তাদের জনচারেককে ডাকলেন।—"কী চাও, কী চাও তোমরা?" ঠাণ্ডা স্বর। "চাকের মধু ঝরিয়ে দিতে চাই", পিছনের জন বলল, আর-একটা গলা: "পাখির বাসা পাড়ব, ডিম-ফিম ভেঙে দেব।" "তাই দাও" উনি বলছেন মাথার চুল চিমটি করে ধরে, "কিন্তু হাঙ্গামার দরকার কী। আমি তো তৈরী।" আমি তো তৈরী, আঃ, কী সুন্দর বাতাসের মতো কথাটা, সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক'জন বলতে পারে "আমি তৈরী"? সুধীরমামা পেরেছেন! ওরা এখন ঘরের ভিতরে। পোঁটলা-পুঁটলি তো আগেই বাঁধা। ভামতী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, ওঁর কপালে আজ আবার একটা কাচপোকার টিপ, কালোর উপরে সবুজ, যাবার সাজ, দৃষ্টি স্থির, কিন্তু কাঁপছেন সুধীরমামা, চুল কাঁচাপাকা, দূর কলপ-টলপ উপে গেছে, হাত বাড়িয়ে উনি খেতে গেলেন জল, কিন্তু ইস গ্লাসটা পড়ে যে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল। ভামতী নীচু হয়ে

কুড়িয়ে তুলছে কাচের টুকরো, এটা কি সেই গ্লাস, তুমি চুপে চুপে একদিন যেটা ভরে দিয়ে এসেছিলে ?)

আমাকে পিসীমা এখানে আর থাকতে দেবেন না, তোমাকে প্রথম একটু গরম দুধ, পরে আর-এক ডোজ ওষুধ খাওয়ানো হলেই আমাকে সরিয়ে দেবেন। সেই ওষুধ, পিসীমা বলছেন, যা খেলে ব্যথা একটু কমে, ঘুম এসে যায়।

("আজই যাব", ওদের বলছেন সুধীরমামা, "আজ রাত্রেই"। এখন আর কাঁপা কাঁপা নয়, শান্ত কণ্ঠস্বর। পোঁটলা পুঁটলি জড়ো করে বাইরে রাখছেন। তবু দূর থেকে পিছনের কারা এখনও ঢিল ছুঁড়ছে, মজার খেলা, মজার খেলা, ওরা একটা মজা পেয়ে গেছে যে। আমি কী করব, ছায়া হয়ে লুকিয়ে আছি যে আমি ? আমিও একটু মজা পাব নাকি, দু'একটা ঢিল আমিও ছুঁড়ব ? না, তো। ভীরু হলেও তোমার ছেলে ইতর নয় মা, সে বরং ভাবছে এগিয়ে গিয়ে একটা পোঁটলা বয়ে দিয়ে আসবে কিনা, কিন্তু সে-সাহসই কি ওর হবে ?)

আমি এখন বাইরে, উঠোনে। পিসীমা এইমাত্র আমাকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। চাদর-টাদর পালটে তোমাকে সাফ করবেন। করুন, আমি এখন উঠোনে। পুকুরপাড়ে কারা পাটে 'জাগ' দিয়েছে, তার পচা-পচা গন্ধ, কিন্তু আকাশে অনেক তারা, কোনো কোনো তারা আবার রাত্তিরেই এদিক থেকে ওদিক হাঁটা চলা করে। এক-একটা আকস্মিক খসে পড়ে। তুমি এখন ঘুমোবে। তুমি ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেই—

(ওই দ্যাখ, সুধীরমামারা রওনা হয়েছেন। সুধীর-মামা আর ভামতী। সুধীরমামাও তারা দেখছেন।

তারা দেখছেন কিনা, তাই এখন আর কিছু শুনছেন না। আমরা যখন তারা দেখি, তখন চিৎকার হট্টগোল টিটকারি, এ-সব কিছু শুনি না। গাছের আড়ালে চোর আমি, ভিতু আমি, আমাকেও উনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এখন ওঁর মাথা সোজা, টানটান, কই হাতের লাঠির উপরে তো ঝুঁকে পড়লেন না ?)

মা, তুমি এখন ঘুমের মধ্যে চলে যাচ্ছ, জলের তলায় যেন ডুব সাঁতারে। সেই সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন আর-একজন, কাল সকালেই ভেসে উঠবে তুমি, ফিরে আসবে, কিন্তু ফিরবেন না উনি, ফিরে আসবেন না। তোমার এই আচ্ছন্ন তন্দ্রাঘোরে তোমার অগোচরে ভীষণ একটা ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু ভগবান তোমাকে বাঁচালেন, কিচ্ছু জানতে দিলেন না।

কিন্তু আমি জানলাম। শুধু ওই ঘটনাটা নয়, ভীষণতর আর-একটা, অন্তত আমার কাছে। তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম যখন, কী-জানি ওই ফ্যাকাশে মুখ, রক্তাক্ত চাদর নির্বাক স্বরে আমার কানে অমোঘ বাক্যটি উচ্চারণ করেছে : দাদাও আর আসছে না।

মিছিমিছি তবে এতদিন তার অপেক্ষা করেছি, ফটোর দিকে তাকিয়ে আশায় আশায় দিন গুনেছি, সে-সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার এল, ডাক্তার গেল, খুঁটি ধরে ধরে তুমি একদিন দাওয়াতেও এসে বসলে, তখন নিয়মিত সেই চারটে চড়ুই-ও এল, ডালপালা ছাড়িয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ল, চান করার পরে মাথা মোছা শেষ হলে তোমার ধোয়া মুখ যেমন গামছার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, এই রোদ তেমনই, এই রোদ তোমার মুখের মতো, আমি একা-একা আবার বেরোতে থাকলাম। সেই দীঘির ধারে, যেখানে দাদার সঙ্গে জলে

মুখ রাখলেই দেখা হত, একটা দুপুরে গিয়ে তাকে বললাম, "আসবি না যখন, তখন কেন আশা দিয়েছিলি? মাকে ঠকালি, আমাকেও।"

গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে, পিঁপড়েদের বলাবলি শুনতে শুনতে চোখ জড়িয়ে আসত, একটা কাঠঠোকরা উপরের ডাল ঠোকরাতেই থাকত। আর ঘুঘু পাখি, তার ডাকে, আঃ কী ক্লান্তি, কী ক্লান্তি, দীঘি-পাড়ের চষা ক্ষেতটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, সব ফাঁকা, শূন্য। যে চলে গেছে, আর যে এলই না, তারা হয়ত একজন, হয়ত দু'জন—দু'জনেই আমাকে ঠকাল। আমি না রইলাম কারও ভাই, কারও দাদা হওয়াও হল না—আমি একা।

একা, পরে জেনেছি সব মানুষই আসলে একা, ভিতরে একটা জায়গা আছে যেখানে কাছে-পিঠে কেউ নেই, পাশে দাঁড়িয়ে কেউ ছায়া ফেলে না; কিন্তু তখন তো এ-সব জ্ঞান ছিল না। পুরণো দাদা তো কবে থেকেই নেই, নতুন হয়েও সে আসছে না, কোথায় চলে গেছেন সুধীরমামা, কোন্ দূর-দূর ঠিকানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাবা—তখন, সেই সব শুকনো নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে যেত।

এইভাবে, মা, আমার সেই সকালের প্রথম বেলাটি শেষ হল।

মা, তাড়াতাড়ি, একটু তাড়াতাড়ি। তোমার এখন আর তাড়া নেই, অফুরান সময়ের সাজি কোলে নিয়ে বসে আছ, যেন কোনও চির-শরৎকালের শিউলিতলার ছবিটি, ফুল ঝরছে, ঝরছে, ফুল তো নয় সময়ের ফুল্‌কি, তাকে ইচ্ছে হলে গেঁথে তোলো, ইচ্ছে হল না তো দাও ছড়িয়ে, তোমার চারপাশে, তারা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠল তো কী এল গেল, সব তাড়ার পাড়ে তুমি, তোমার অবসর তো এখন অনন্ত।

কিন্তু তাড়া আছে আমার। আমি এখনও যে পড়ে আছি, তোমার ছেলেটি এখনও স্থানকালের গরাদখানার কয়েদী, খুব দুষ্টুমি করছিল বলে তুমি তাকে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে ঘরের-মধ্যে বসিয়ে রেখে গেছ, শাস্তি, এই তার শাস্তি, মা, শিকল খুলে দেবে না ?

তবু আমি জানি, এর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ভালভাবে বাস করলে কয়েদীদের দণ্ডভোগের মেয়াদ কমে যায়, জানো তো ? শেষ ক'টা বছর অত্যন্ত সদ্ভাবে বাস করেছি বলে, বাকী কালটা আরও সদ্ভাবে বাস করব স্থির করেছি বলে তোমারও উপরে যিনি, তিনি একটু তাড়াতাড়িই মেয়াদটা মুকুব করে দিচ্ছেন। আমি টের পেয়ে গেছি। ফুরিয়ে আসছে, এখানকার পালা ফুরিয়ে আসছে।

তার চিহ্ন—ফুরিয়ে আসছি আমি। আমি, আমার সব স্বপ্ন, সব শক্তি, সব আসক্তি আর বাসনা নিয়ে ফুরোচ্ছি। আগে পড়তাম ভীষণ কোনও জলপ্রপাতের মতো শব্দ করে, যেন এক নায়গারা, যেন হুনড্রু অথবা কোনও উশ্রী, আজ পিছল কোনও চৌবাচ্চার নালা দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছি।

একে একে সব যাবে। আমার আশা, আমার সাধনা

> (কিসের সাধনা, একটা কিছু হব বলে ? দূর দূর, কেউ কি কিছু হতে পারে, কোনোদিন পেরেছে—কেউ না। শুধু হতে চাওয়ার সাধটা ফুটতে থাকে, বড় জোর সাধের সঙ্গে যুক্ত হয় সাধনা)

সব নিঃশেষে মিশে যাচ্ছে, সবাইকে একে একে রওনা করে দিচ্ছি, সাধ আশার সঙ্গে সঙ্গে যত নেশা, যত ভালবাসা, সবাইকে তুলে দিয়ে আমি উঠে পড়ব সব শেষে, কাচ্চাবাচ্চা বউকে বাসে তুলে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে পা-দানিতে পা রাখেন গৃহস্বামী, তেমনই।

> (পরিজনদের প্রসঙ্গে, মা, আমার কবেলেখা কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে :

"তার মৃত্যুকালে ওরা সকলে
পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছিল,
তার যত পরিজন,
তার আশা, তার ভালবাসা।
সুর করে করে ইনিয়ে বিনিয়ে
বলছিল, 'আমাদের কী দিয়ে
গেলে। আমাদের জন্যে কিছু
রেখে গেলে না?")

যাব। রেখে যাব। যাব বলেই তো যাবার আগে কলম নিয়ে বসেছি, একটু আগে কয়েদীর মেয়াদ-টানার কথা বলছিলাম না? শেষ ঘানিটা বারকয়েক ঘুরিয়ে তবে নিষ্কৃতি। একে একে অনেককে চিঠি। যাকে যা বলতে চেয়েছি বলা হয়নি, মনে-মনে পুষে-রাখা অনেক পাখি উড়িয়ে দিয়ে হালকা হব; শুধু পাখিই না, খাঁচা খুলে ছেড়ে দেব হিংস্র কিছু প্রাণীও, যারা বিষাক্ত, যারা জিভের লালায় এতকাল আমারই ভিতরের দেওয়ালগুলো চেটেছে, কিংবা আঁচড়েছে ধারালো নখরে, তারা এবার ছাড়া পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক সকলের উপরে—পড়ুক, পড়ুক না! কাউকে কামড়াক, কারও গা লেহন করুক একান্ত বশংবদ ধরনে, তপ্ত কিংবা হিমশ্বাস, হা-হা করে ফেলে চলুক, যত পারে।

এই সব করে, তবে আমার ছুটি। কিছু হতে পারা আর কিছু হতে না পারা যখন একাকার হয়ে গেছে, তখনও এই একটুখানি মোহ এককোঁটা টসটসে রক্তের মত জমিয়ে রেখেছি।

কিন্তু মা, একটি প্রণামেই এতখানি সময় কেটে যায় যদি, তবে চোখ তুলে বাকী সকলের দিকে তাকাব কখন, তাকাব কী-করে। ওদের খুঁজে পেতে আনতে আনতেও সময় ফুরিয়ে যাবে না?

"শ্রীচরণেষু মাকে" বলে একটি পর্ব শেষ করব ভেবেছিলাম, আর একটি পর্ব হবে "সুচরিতাসু তোমাকে"। 'তুমি' এই একটি মন্ত্রে

আবাহন সকলকে, অর্চিত যারা, যারা বিসর্জিত, যারা বাঞ্ছিত। "মাকে আর তোমাকে।"—এই সামগ্রিক পরিকল্পনাটাকে, পায়ে পড়ি মা, এলোমেলো করে দিও না। সবখানি তুমি একাই কেন ঢেকে রাখছ শ্রাবণের সর্বব্যাপী মেঘের মতো?

তাই বলছি, মা, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বড় হতে দাও, সেই বয়সে যখন আমি তোমার আবরণ, তোমার কুসুম ভেঙে ফুটে বের হচ্ছি।

আচ্ছা, আমিই একটু খেই ধরিয়ে দিচ্ছি। বাবার একটা চিঠি এল, মনে পড়ছে এবার? কত দিন পরে, কতদিন পরে, মা? তখন তুমি অনেকটা ঠিক হয়ে গেছ, মানে তোমার শরীরটা, যদিও চোখের তারা যেমন মরা-মরা হয়ে গিয়েছিল, তেমনই রইল, সজীব ঝিকিমিকি আর ফিরে এল না, মাথাটাও ঠকঠক করে এদিক-ওদিক ঘুরত, যেন স্প্রিং-লাগানো জোড় দেওয়া একটা পুতুল, মেলায় যা বিক্রী হত, হয়ত-বা এখনও হয়, কেষ্টনগর না কোথাকার আমদানি; তুমি নড়ছ, চড়ছ, অথচ একটু যান্ত্রিক, কথা বলতে বলতে কী বলছ তাই গুলিয়ে ফেলে থেমে যাচ্ছ, তাকাচ্ছ আমার দিকে, চোখে কাকুতি, 'ধরিয়ে দে না, ধরিয়ে দে না একটু'—তবু সজ্‌নে গাছটায় নতুন করে ফুল ধরছিল, যত পাখি উড়ে গিয়েছিল, তারা ফের ফিরে ডাকাডাকি শুরু করেছিল পাতার আধো-অন্ধকারে—সারা দুপুর, সারা দুপুর, আকাশের রঙ সোনা, কাঁসা, অভ্র, আবির, সিঁদুর সীসে, সব বদলে যাচ্ছিল পরে পরে, যেমন যায়, যেমন বরাবর যেত, তাই মনে হত তুমিও যেন সেরে উঠছ, সামলে গেছ ধাক্কাটা,

> (সব ধাক্কাই সামলানো যায়, যে গেল তার শোক যেমন সামলে নিয়েছিলে একবার, তেমনই, যে এল না, তার শোকও কি সামলে নিলে?)

কত দিন কেটে গেল হিসেব নেই। মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, কিন্তু বাবার চিঠি হঠাৎ একদিন এল মনে আছে।

নিবারণ, ডাকপিওন, আমরা বলতাম নিবারণদা, ওর পুরু খাকি রঙের থলেটা সম্পর্কে ছিল একটা সকৌতুক লোভ, সব অজ্ঞাত রহস্য বিষয়েই ওই বয়সে যেমন থাকে, একদিন দেখলাম সে বড় সড়ক ছেড়ে আমাদের বাড়ির দিকের রাস্তাটা ধরেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "মা, নিবারণদা আসছে, এ-দিকেই।"

উত্তেজনার মত ঘটনা বৈকি। এদিকে আসত এক সুধীরমামা; সে চলে যাবার পরে, ডাক-পিওন তো দূরে থাক, বিশেষ কেউ আমাদের বাড়ির দিকে আসে না।

"নিবারণদা, আসছে মা।"

তুমি নিরুৎসুক গলায় বললে, 'আসুক গে"। আঙুলের কর গুনে গুনে তোমার নাম-জপ চলছিল, চলতে থাকল। আমি কিন্তু পারলাম না, ছুটতে থাকলাম নিবারণদার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে, মাঝপথে ওকে রুখে হাত পেতে বললাম, "দাও।" সে মিটিমিটি হাসছিল।—"কী দেব, বলো দেখি।"

"কী আবার•চিঠি।"

সে বলল, "উঁহু, চিঠির চেয়ে ভারী আর বেশী। এর নাম ইন্‌সিওর, ভেতরে তিরিশ টাকা আছে। মার নামে, মার সই লাগবে।"

তখন আমি ছুটতে থাকলাম নিবারণদার আগে আগে। তুমি তো "আসুক গে" বলে ঢুকে গেছ হয়ত রান্নাঘরে, তোমাকে তো খুঁজে বের করে আনতে হবে!

দরজা আলগাই ছিল, যেহেতু আমি দাঁড়াইনি, তখনও দৌড়চ্ছি, সুতরাং কবাট খুলে গেল ঝপাং করে, কে যেন অস্ফুট গলায় বলে উঠল "উঃ!"

তোমার লেগেছে। আগে কি জানি, "আসুক গে" বলে যে সরে গেছে, দম বন্ধ করে সে-ও কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে!

দৌড়ে ঘরে গিয়ে আমি নিয়ে এলাম দোয়াত, ধরে রইলাম, কলম নিবারণদার কাছেই ছিল, সে বাড়িয়ে দিল, থরথর হাতে তুমি সই করলে, কেমন গোটা-গোটা অক্ষর তোমার, অথচ সেদিন কেঁপে কেঁপে বেঁকে গেল।

রসিদটা মুড়ে রেখে নিবারণদা বলছিল "মা, পার্বণী চাই কিন্তু", তুমি রক্তলেশশূন্য, আঁচলের গিঁট খুলে তাকে কত দিলে, সিকি না দুয়ানি, আজ মনে নেই।

কী আশ্চর্য, নিজের হাতে খামটাও কি খুলবে না তুমি? নিবারণদা ফিরে যাচ্ছে, দরজায় খিল তুলতে তুলতে খামটাই খসে পড়ল মাটিতে, আমি কুড়িয়ে তুলে খামটা ছিঁড়লাম। তিনটে দশ টাকার নোট, আর কী? একটা চিঠি। চোখ বুলিয়ে তুমি পড়লে কি পড়লে না, টাকা সুদ্ধ খামটা আমার হাতে দিলে। টাকা, খাম, একটা চিঠি।

দশ

তোমাকে লেখা, বাবার চিঠি। তুমি কি এতই সুদূর নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছিলে মা, যে, চিঠিটার পাঠ যে ছিল "প্রাণাধিকাসু", তা-ও খেয়াল করলে না, ওটা আমার হাতে দিতে একটুও কি সংকোচ হল না ?

তখন অত সব বুঝিনি বা তলিয়ে দেখিনি, বুক ঢিপ্ ঢিপ্, মুঠোর মধ্যে দোমড়ানো নোট—আমি জড়ানো অক্ষরের জট ছাড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি পড়ছি। পড়া শেষ হল, চিঠিটা মস্ত খবরের মতো মুঠিতে ধরাই রইল, আমার চোখ দপ্ দপ্ করছিল, কথা ভীষণ উত্তেজনায় জড়ানো, অস্পষ্ট ; বললাম, "মা, আমরা এখান থেকে চলে যাব। বাবা যেতে লিখেছেন।"

তুমি নিস্পৃহ, যেন তখনও বোঝনি, এইভাবে বললে "কোথায়।"

"কলকাতায়। সেইখান থেকেই তো বাবা লিখেছেন। চাকরি পেয়েছেন, লিখেছেন। মানে নিয়েছেন।"

"কোথায়।"

বিরাট শব্দভাণ্ডারের ওই একটিমাত্র কথাই কি জানা তোমার, "কোথায়", শুধু "কোথায়।"

জোর দিয়ে বললাম, "থিয়েটারে, মুন থিয়েটারে। মুন থিয়েটার বুঝি খুব বড় থিয়েটার, মা ?"

"জানি না।"

"পড়োই না। আচ্ছা, আমি পড়ছি, তুমি শোনো। বাবা লিখছেন, 'দক্ষিণে যাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পুরীর পরে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। জ্বরে পড়িলাম। তার চেয়েও সর্বনাশ. ধর্মশালায় পড়িয়া ছিলাম, একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, সঙ্গে

সামান্য যে-কয়টি টাকা ছিল, তাহা নাই। আমার জ্বর-বিকারের সুযোগে কে বা কাহারা লইয়া পলাইয়াছে। ভাগ্যে আলাদা করিয়া ফতুয়ার পকেটে পাঁচ টাকার একখানি নোট রাখা ছিল, উহারা বোধ করি সন্ধান পায় নাই। অর্থশোক নহে, যাহা গিয়াছে, তাহা তো সামান্য, গিয়াছে বেশ হইয়াছে, আমি সেইদিন চক্রতীর্থের সৈকতে দাড়াইয়া সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করিয়া আনু, নূতন এক ভাবে আবিষ্ট হইলাম। জ্বর হঠাৎ সেদিনই যেন একেবারে ছাড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে ছাড়িয়া গেল আমার অনেক দিনের কতগুলি ধারণা আর সংস্কারের ভূত। সঞ্চয়টুকু গেল, কিন্তু অন্য এক অনুভূতির সঞ্চয় যেন শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া যাইতে থাকিল। আনু, তোমাকে কি তাহা বুঝাইতে পারিব, তুমি কি তাহা বুঝিবে ?

'আমার সম্মুখে সমুদ্র! এতদিন সমুদ্রকে দেখিতাম যেন বাধা-বন্ধনহীন সদাহাস্যময়—টুথপাউডারে দাঁত মার্জনা করিলে যেমন ফেনা হয়। আজ দেখিলাম সাদা নয়, লালও আছে—ফেনার সঙ্গে যেন দাঁতের গোড়ার রক্ত মিশিয়াছে। আসলে অবশ্য সকালের সূর্য ঢেউয়ের জলে নিজের ছায়া দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া আপনাকে শতগুণ করিয়া গুলাইয়া ফেলিতেছিল বলিয়াই ওই দৃষ্টিভ্রম।

'দৃষ্টিভ্রম ? ভ্রমই বা কী করিয়া বলি। নূতন দৃষ্টি! আগে ভাবিতাম সমুদ্র মোহহীন, উদাসীন, ওই রক্ত দেখিয়া মনে হইল সমুদ্রেরও তবে কষ্ট আছে। আগে দেখিতাম সে মুঠা মুঠা ভরিয়া ঝিনুক ইত্যাদি যাহা কিছু তীরে ফেলিয়া ফিরিয়া যায়, চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু সেদিন দেখিলাম, তাহা তো নয়, সে বারে বারে পাগলের মত ফিরিয়াও আসে, আছড়াইয়া পড়ে, ভাঙে আকুল হইয়া। তাহার কাছে অন্তরীক্ষের চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ যতটা সত্য, স্থির, তীরভূমির টানও ঠিক ততটাই সত্য। হয়ত যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে আবার কুড়াইয়া লইতে চায়, হয়ত নিজেকে উজাড় করিয়া আরও দিতে চায়। তীরভূমি যে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, বরং

নিজেই ক্ষইয়া ক্ষইয়া গলিয়া যায়, সেই ব্যর্থতা তীরভূমির নিজের। নহিলে অলক্ষ্য আকর্ষণে অস্থির সমুদ্র তো ধরা দিবে বলিয়াই, আপনাকে সমর্পণ করিবে বলিয়াই, আশ্রয় আর সান্ত্বনার আশায় ক্রমাগত তীরের বুকে মুখ গোঁজে।

'সমুদ্রের বৈরাগ্য দেখিয়াছি। সেদিন প্রভাতের রক্তিমা দেখাইয়া দিল তাহার আসক্তি। যে ধীবরেরা ডিঙ্গি বাহিয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরে দূরে ছায়াসম হইয়া গিয়াছিল, দেখিলাম তাহারা ছড়ানো জাল গুটাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

'তখন স্থির করিলাম, আমিও ফিরিব। আমাকেও জাল গুটাইতে হইবে, ফিরিতে হইবে পাড়ে—ওই দৃশ্য তাহারই ইঙ্গিত। পাথেয় যা ছিল হিজলী অবধি আসিতেই ফুরাইল। সেখান হইতে গ্রাম গ্রামান্তর পাড়ি দিয়া, এখানে নদী, ওখানে বন, পার হইয়া, গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে পদব্রজে অবশেষে কলিকাতা।

'শিরোনামার ঠিকানা দেখিয়াছ তো? আনু, আমি কাজ লইয়াছি মুন থিয়েটারে। ঠিক থিয়েটারে নয় অবশ্য, থিয়েটার-সংলগ্ন ছাপাখানায়, উহাদের নিজেদেরই ছাপাখানা। থিয়েটারের পোস্টার, হ্যান্ডবিল, প্রোগ্রাম, এমন কী কখনও কখনও নাটক-টাটকও এখানেই ছাপা হয়। অগত্যা এখানেই। কেন না, অন্যান্য জায়গায়ও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সুবিধা হয় নাই। যে-সব ব্যবসায় আমার সহায়তা আর উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে, ধরো ইনডিয়ান ট্রাঙ্ক কোমপানি, এখনও যাহারা স্বদেশীর নাম ভাঙাইয়া দিব্য ফলাও ব্যবসায় ফাঁদিয়া লইয়াছে, দেখিলাম আমাকে তাহারা আর চিনিতেই চায় না।

'কিংবা, তোমার মনে আছে তো, সেই ন্যাশনাল সোডা, সেই মিসেলেনিয়াস ইনডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোমপানি—সংক্ষেপে এম-আই-এম অর্থাৎ "মিম্", আমারই প্রতিষ্ঠিত, টাকাটা অবশ্য এক বন্ধু সঞ্জীব রায়ের, আর চাঁদা তোলা, কিন্তু শ্রম আমার—

সেই "মিম্"-এ প্রথম তৈয়ারি হইল "নবীন লেমোনেড" আর "মধু লেমনস্কোয়াশ"

(কারণ দেখিয়াছিলাম কিনা যে বিলাতী সব কয়টি সোডা ইত্যাদিরই কবির নামে নাম, বায়রণ, মিলটন বা স্পেনসার, তাই আমাদের পণ্যেরও দেশীয় কবিদের নামে নামকরণ করিয়াছিলাম)

—ভাবিতাম স্বদেশী জাগরণের হেতু খুব চলিবে, রোজ গড়ের মাঠে, র‍্যামপার্টের আশেপাশে পাঠাইতাম, কত বন্ধুবান্ধব যে নিত্য আসিয়া খাইয়া যাইত, দাম দিত না, কেবল হিসাবটা টোকা থাকিত জাবেদা খাতায়—আরও কত কী তৈয়ারী করিব সাধ ছিল, কিন্তু জেলে গেলাম, বাহির হইয়া আসিয়া ভারত ভ্রমণে, আসিয়া দেখি, কোথায় সেই স্বদেশী শিল্প "মিম্‌কো"? কারবার আগেই বেহাত হইয়া গিয়াছে, এখন তালা ঝুলিতেছে।

'তারপর সেই "কবরীকল্যাণ তেল", তোমাকে একশিশি দিয়াছিলাম, মনে পড়ে? আর ছিল "সৌন্দর্য মলম" (ইংরাজীতে বিউটি বাম), জোর চলিতেছে, কিন্তু যাহারা গুছাইয়া লইয়াছে তাহারা আমাকে স্থান দিল না। বাড়তি ভাগীদার আর চায় না। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর এখন আন্দোলন বন্ধ যে। ভাবিতেছি ইহার চেয়ে বরং বিপ্লবী হওয়া শ্রেয় ছিল, না-হয় দ্বীপান্তরই হইত, কিংবা ফাঁসি, কিন্তু বিশ্বাসী বন্ধুদের এই প্রতারণা!

'অবশ্য ইহাও হইতে পারে, আমিই ভুল বুঝিতেছি। যে-অশান্ত প্রণবকুমারকে ইহারা চিনিত, আমি তো আর সে নই। শ্রান্ত, আশ্রয়প্রার্থী এই প্রণবকে দিয়া ইহাদের প্রয়োজন নাই।

'তাই মুন থিয়েটার—অগত্যা। কাজটা খারাপ নয়, আমাকে মোটামুটি এই প্রেসটার ম্যানেজারই বলা চলে, বেতন আপাতত পঞ্চাশ। বাহিরের কাজ আনিতে পারিলে কমিশন। তা-ছাড়া থিয়েটারমহলের সঙ্গে, জানাশোনা মঞ্চের সঙ্গে, একটু সংযোগ, বলা

যায় না, ইহাতে ভবিষ্যতে আমার বোধ হয় সুবিধাই হইবে। কী সুবিধা, চিঠিতে তাহা আর খুলিয়া লিখিলাম না। এখানে তোমরা আসিলে বলিব।

তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিও। ত্রিশ টাকা পাঠাইলাম। রেলভাড়া তো পাঁচ টাকার মতন। বাকিটায় যাহার যা পাওনা চুকাইয়া দিয়া আসিও—যত শীঘ্র পারো। যাত্রার দিন ঠিক হইলে জানাইও, স্টেশনে থাকিব।

'মোটের উপর আর পারিতেছি না। বয়স হইতেছে, পাইস হোটেলের খাওয়া আর সহে না। তা-ছাড়া, একটু বিশ্রাম চাই। একটি বাসা দেখিয়া রাখিয়াছি, তোমাদের পত্র পাইলেই ঠিক করিয়া ফেলিব। আনু, এতদিন পরে নিজেদের একটি নীড় রচনা করার স্বপ্ন তুমি নিশ্চয়ই সফল করিয়া তুলিবে। তুলিবে না?"

চিঠিতে আরও কয়েক ছত্র ছিল, আমার সম্পর্কে প্রশ্ন, শুভাশীর্বাদ ইত্যাদি। কিন্তু যে-ই আমার এই পর্যন্ত পড়া হল 'তুলিবে না?—' অমনই মা তুমি ছিনিয়ে নিলে কাগজ কয়টি, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বললে "মিথ্যে কথা।"

কী শুকনো গলা তোমার, কী অপ্রত্যয় দীপ্ত চোখে অনির্বাণ হয়ে উঠছিল। বললে "মিথ্যে কথা। বিশ্রাম, শ্রান্তি ওসব কিছু না। শুধু কথার চালাকি। যে-ভাষায় ও পালা লেখে সেই পালারই কয়েকটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে পাঠিয়েছে।"

উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাঁচা মুগের উপরে কয়েকটা চিল ছায়া ফেলছিল। ডালাটায় ডালগুলো তুলে ফেলতে ফেলতে আরও কঠিন হয়ে উঠলে তুমি। বলে উঠলে "যাব না, কিছুতেই না। সব হবে ওর ইচ্ছেমত? চিরদিন আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে করেছে, সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। সমুদ্র-টমুদ্র ও-সব দু'দিনের খেয়াল, হঠাৎ যা মনে হল তাই লিখেছে। এখানে তবু যা-হোক একটা স্থির জায়গায়

আছি, মাথা গুঁজে আছি নিজের বাড়িতে, কলকাতায় সবসুদ্ধ টেনে নিয়ে গিয়ে আবার কোন্ বিপদের মধ্যে ফেলবে কে জানে। যদি ও আবার পালায়? সমুদ্র না-হয় এবার ফিরিয়ে দিয়েছে, যদি ঝড় ডাক দেয়? ত্থাখ, ও-সব কাব্য করতে আমিও জানি। আমি ওকে চিনি। আমি যাব না। আমাকে পুরোপুরি ও নিজের কবলে নিতে চাইছে—আমি বুঝি না?"

বলতে বলতে মা, তুমি চিঠিটা ছিঁড়লে কুটি কুটি করে। কী ভাগ্য যে ঝোঁকের মাথায় নোট ক'টাকে যে ছেঁড়োনি

(শুধু তোমার নয়, সব মানুষেরই বরাবর দেখেছি এক রীতি। তার একটা ভাগ অন্ধ, বেহিসেবী, অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা নেই তার—আর একটা অংশ ওরই মধ্যে সঙ্গোপনে সতর্ক সাবধানী)।

"যাব না কিছুতেই," ওটাও কিন্তু তোমার শেষ কথা নয় মা। যে নিয়মে চিঠি ছিঁড়েও নোটগুলো তুমি বাঁচিয়েছ, সেই বিচিত্র নিয়মেরই একটা রকমফেরে কলকাতায় যেতেও তো তুমি চেয়েছ। না, শুধু ওখানে একটা বাসা বাঁধার লোভে নয়। আসলে এই জায়গাটা ক্রমশ কেমন শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। দাদা—নেই। সুধীরমামার প্রস্থান—অভ্যস্ততায় আর একটা ছেদ। তুমি আর-একটা অভ্যাসে পৌছনো যায় কিনা, মনে মনে তারই জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছিলে, তখনই বাবার চিঠি। অতো জোরে জোরে যে বলেছ 'না—না—না' সে কি ওই আকুলতাই চাপা দিতে? হায় মন, হায় তার তত্ত্ব। আমি তার কিছু যদি-বা বুঝি, বেশিটাই বুঝি না।

না, একা আমাকে নিয়ে তুমি পূর্ণ হয়ে উঠছিলে না। দাদার জন্যে হা-হুতাশ, আমার জন্যে স্নেহ, একটি আগন্তুক সম্ভাবনার বিনষ্টি, বাবার অদর্শন, সুধীরমামার অন্তর্ধান এ-সব মিলেও তোমাকে

সর্বক্ষণের জন্য ব্যাপৃত করে রাখতে পারেনি, কেন না এত রেখে ঢেকে বলে আর কাজ কী মা, তুমি তখনও যুবতী।

তুমি তখনও অবিগতবয়সী, সেটা আমি এখন হিসাব করে খতিয়ে দেখে বলছি। নইলে, এই চিঠির গোড়ার দিকেই তো বলেছি, তোমাকে কোনও বয়সেই আমি যুবতী ভাবতে পারিনি। মা—আমার কাছে শুধুই মা—যিনি মা, তিনি নিজে যে আবার যুবতী হতে পারেন, অন্তত হতে পারতেন, এই সব চমকলাগানো রূঢ় শলাকা সেই বায়বীয় বয়সের ধারণাকে বিদ্ধ করেনি। অথচ দ্যাখো, তোমার তখন যে বয়স, সেই বয়সের নারীদের আমি পরবর্তীকালে প্রার্থনা, এমন কী কামনা করেছি। বয়স শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, দেখার ভঙ্গিটাকেও বদলে ফেলে। মার্জনা কোরো, যদি অসহ্য লাগে এই স্বীকারোক্তি।

শুধু শোকে নয়, শুধু বাৎসল্যে নয়, তখন কত রাত্রি তোমার ঘুম হত না। শরশয্যার গল্পটা মহাভারতের লেখক কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানি না, আমি তো পরে জেনেছি, বিনিদ্র অন্ধকার রাত্রির নামই শরশয্যা, প্রত্যেকটা তারা এক একটা তীক্ষ্ণ তীর, শুধু কি পিঠে ?—বুকেও বেঁধে।

তখন জানতাম না, তোমার শরশয্যায় শয়ন প্রত্যেক রাতে, সেখানে আমি নেই, আমি না, আমরা কেউই-ই কিছু না।

কিন্তু মা, তুমিও কি আমার কাছে ক্রমে-ক্রমে কিছু-না হয়ে উঠছিলে ? ঠিক কবে থেকে, মনে পড়ে না। একটু চঞ্চল হতে শুরু করেছি, সে তো কলকাতায় গিয়ে। রিনরিনে গলা শুনলেই মাথা ঝিনঝিন করা, গালে ফুসকুড়ি, চোখে গর্ত—এ-সব অনেক পরে। লজ্জার বালাইটুকু বিলিয়ে দিয়ে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন সকালে বিছানা তোলার সময়ে আমার চাদরে একটা দাগ দেখতে পেলে, মনে পড়ে ? খুব যখন ছোট, তখনও বিছানা ভিজিয়েছি—সে অন্য রকম। তখন বকুনি খেতাম। সেদিন বকুনি খেলাম না তো,

তুমি যেন কী রকম চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলে। আমি বড় হয়ে উঠছি, সেই ভয়ে ?

এ-সব কথার দিন তো পড়ে আছে, আগে তখনকার পালা শেষ করি। আমাদের ওখানকার পাট তোলার কথা বলি।

তুমি কলকাতা যেতে চাওনি, আবার ওখানে থাকতেও পারছ না, তলে তলে অস্থির হয়ে উঠেছ, এই পর্যন্ত বলেছি। সেই তুমি। আমি, সুধীরমামা আর বাবা, এই ত্রয়ীকে নিয়ে তুমি। একজনকে ভালবাসো ঃ একজন ভালবাসত তোমাকে, আর-একজন তোমাকে তীব্রভাবে টানছে—এই টানা-পোড়েনে বিশৃঙ্খল তোমাকে আমূল অসহায় দেখেছি।

চলে যাবে, মুছে যাবে এখানকার স্মৃতি, এখানকার সব কিছু মুছে দিয়ে যাবে। আমরা তৈরী হচ্ছি। কলকাতায় চিঠি গেছে। আমার নামে। বাবাকে। যেন স্টেশনে থাকে। বাঁধাছাঁদা সারা। কী আশ্চর্য দাদার সেই ফটোটা ? মা, ওটা নামিয়ে নিতে অত দেরি করলে কেন তুমি, তোমার হাত কেন কাঁপছিল, সেটা না-হয় বুঝলাম —স্নায়বিক অধীরতা। কিন্তু—

পাড়তে গিয়ে কাচ কেন ভেঙে গেল খান্ খান্ হয়ে, অবাক অবোধ আমি তার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। এ কি অসতর্কতা ? এ কি—এখনকার কালো পরকলা পরে ব্যাপারটা দেখে জিজ্ঞাসা করছি—এ কি দৈব অথবা ইচ্ছাকৃত ? তার ইচ্ছা, আমরা যাকে অবচেতন বলে থাকি। এ কী এখানকার চিহ্ন লোপ করে নির্জ্ঞানে নতুন হবার বাসনা ? ফটোর কাচগুলো আমার চোখে ফুটছিল। আর ছবিটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখি, উই ধরে ঝরঝরে। মা, এতদিন তোমার কি লক্ষ্য ছিল না, অথবা সময়ের দস্যুতার মুখে আমরা সবাই ফতুর, সব ঝুরঝুর, ফটোর কাগজ, দেয়ালের চুন-বালি-আস্তর, সব ?

অতএব দাদা আমাদের সঙ্গে গেল না।

সেই স্টেশন, যেখান থেকে একদিন ফিরে এসেছিলাম। সেই ট্রেন, যে ট্রেনে সেদিন বাবাকে তুলে দিলাম। গাড়িটা দুলে উঠল, গাড়িটা ছাড়ল, টের পেলাম, আমরা সব ছেড়ে যাচ্ছি, আমরা দুজনে, দাদাকে, এখানকার সব কিছুকে। অথবা রেখে যাচ্ছি—আমাদের দুজনকেও।

আসলে আমরা, পরে জেনেছি মা, কিছুই কখনও সঙ্গে নিই না, নিজেকেও না। সব রেখে রেখে ফেলে ফেলে যাই, অথচ ভাবি বুঝি কিছুটা নিলাম। যা নিই, তার নাম স্মৃতি, বিবর্ণ একটি ছবি, মৃত, দীর্ঘকাল পরে যার পাঠোদ্ধারও করা যায় না, এমন বিবর্ণ কোনও প্রাচীন লিপি।

আমরাও সেদিন ওখানে সব কিছুকে রেখেই চলে এসেছিলাম। বাঁধাটাধা অতএব সব মিথ্যে, বাক্স-পুঁটুলি সব ভূয়া বোঝা, নিজেকে ঠকানো। আজ তো জানি, প্রতি যাত্রাই এক অর্থে শবযাত্রা, কোনও শব কোনও দিন কি সাদা আবরণ-বস্ত্র, পুষ্প প্রভৃতি সঙ্গে নেয়? ওগুলো শুধু মন সাজানো।

আমরা যাচ্ছি, কিন্তু যে-আমরা ছিলাম তারা থেকেই যাচ্ছি যদিও। যারা চলল তারা নতুন কিছু হতে চলল। চলল নতুন কিছু তৈরী করে নেবে বলে।

আগের বারে, যখন যাওয়া হল না তখন কত কেঁদেছিলাম। আর এবারে, সত্যি-সত্যি যখন বিদায় নিলাম, তখন আশ্চর্য, চোখে এক ফোঁটা জল এল না। লিখেই ভাবছি ওই 'আশ্চর্য' কথাটা কেটে দিই। আশ্চর্য আবার কী, কিছুই আশ্চর্য নয়। মানুষের জীবনে সব কিছুর বরাদ্দ রেশনের চাল-চিনির "কোটা"র মতো মাপা থাকে—হাসি-কান্না, প্রেম প্রভৃতি সব কিছুর। নির্দিষ্ট মাত্রা পূর্ণ হলে পরের জন্যে কিছু বাঁচে না। যেমন, মা, তুমি সেবার পাড়ার দলের সঙ্গে চূড়ামণি যোগে

স্নান করতে গিয়েছিলে, যে-দিন ফেরার কথা সেদিন ফেরোনি বলে পিসীমাদের ঘরে শুয়ে আমি কত কান্না কেঁদেছি। যখন তোমাদের ফেরার কথা ফিরলে না, যেদিন আসার কথা ছিল সেদিনও পেরিয়ে গেল। প্রতিটি পায়ের শব্দে আমি চমকে উঠছি, বারে বারে দৌড়ে যাচ্ছি বাইরে, ফিরে এসে ছটফট ছটফট আর চোখ ছাপিয়ে জল।

ওটা তখন অপর্যাপ্ত ছিল। ক'দিন তোমাকে দেখতে পাইনি বলে সেবার কত চোখের জল ফেললাম, আর এই তো ক' বছর আগে, যেদিন জানলাম, আর কোনোদিন দেখতে পাব না?—তার সিকির সিকিও না। জানি না মা, তুমি উপর থেকে সেটা দেখতে পেয়েছ কি না। ক্ষমা করেছ? যদি না করে থাকো, তবে দোহাই, আমাকে নয়, দায়ী করো, আমার পরের বয়সকে, যখন আঙুলের গিঁটে গিঁটে কড়া পড়ার মতো মনেরও গিঁটে গিঁটে কড়া পড়ে। জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ওই যে বলেছি, রেশনের মাপা বরাদ্দ, কান্নার কোটা! ওটা আমাদের, অধিকাংশ পুরুষের বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় কিনা! বেহিসাবী বাবুদের মতো চোখের জলের পুঁজি কম বয়সেই খরচ করে ফেলি, বাকী জীবনের জন্যে কিছুই বাঁচে না, তখন শুধু ফুটিফাটা মাঠের বুক চিরে বেরিয়ে আসা বাতাস, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠা, বিনা তেলের পলতের মতো চোখের শুকনো পাতা পোড়ানো—কিন্তু কান্না না। পরিণত কাল সকলের পক্ষেই নিঃসঙ্গ, নিস্তৃণ, শূন্য, কিন্তু পুরুষদের পক্ষে আরও বেশি, একটা নিরশ্রু অস্তিত্ব।

তাই মা, আমার প্রগাঢ় যৌবনে তোমার মৃত্যু হল, কিন্তু তেমন করে কাঁদতে পারলাম না।

ট্রেন চলছে। তুমি একটানা জপ করে চলেছ। মাঝে মাঝে দোলানিতে আমার গায়ে এসে পড়ছ। জপ থামিয়ে আঙুল দিয়ে

দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলে বাইরের যা-কিছু আমাদের সঙ্গে চলছিল বা পাল্লা দিতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছিল। কোনোটার মানে কী জানতে চাইছিলে। দূরের বক, কাছের ধানের ক্ষেত, লাইনের ধারের নালায় ফোটা ফুল, আলের রাস্তায় হুমহুম পালকি, অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের চেনা হয়ে যাচ্ছিল। ডাকগাড়ি, সব স্টেশনে দাঁড়ায় না, যেখানে না দাঁড়ায় সেখানকার মানুষেরা কেমন নির্বাক নালিশ নিয়ে চেয়ে থাকে।

এইভাবে বিকেল এল। কোন্ একটা বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন লোক একটা বালতি আর পিতলের জগ্ নিয়ে "হিন্দু পানি হিন্দু পানি" বলে হেঁকে গেল, চা সিগারেট, নানা সুরে হাঁকাহাঁকি আরও কত কী। একটা লোক যখন গাড়িতে উঠে যেখানটায় লেখা আছে "কুড়িজন বসিবেক" সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকল তখন মজায় আমোদে তোমার চোখ জুল জুল, ঘোমটা একটু সরিয়ে তুমি দেখছিলে। তখন তোমাকে লাগছিল নতুন-বিয়ে-হওয়া লাজুক বউটির মতো। কামরায় অনেক লোক, তাই ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললে, "ওর ঝুলিতে কী রে? কী বলছে এত ছড়া কেটে কেটে?"

"মিষ্টি মশলা, মা"

এ-গাড়িতে আমিও নতুন, তবু আমি সব জানি। তোমার তুলনায় তখনই আমি বড় হয়ে গেছি। "ব্যাটাছেলে যে!" আমার গাল টিপে তুমি আদর করে বললে।

লোকটা দেখছিল, ভরসা পেয়ে এগিয়ে এল—"নেবেন মা? নিন না। এক প্যাকেট এক পয়সা, তিনটে নিলে দু পয়সা।"

তুমি আঁচলের খুঁট খুললে। মশলাটা এক রতি মুখে পুরে বললে "কী ঠাণ্ডা রে! যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মিষ্টি। আমরা পানের সঙ্গে অবিশ্যি জৈত্রী, জায়ফল এলাচ, এইসব খেয়েছি। কিন্তু এর কাছে কিছু লাগে না।"

লোকটা খুশি হয়ে বলল "আর দেব মা?" তুমি ফের আঁচল খুলে কিনে ফেললে পুরো এক আনার। ফলে একটু পরে একটা অন্ধ ছেলে যখন গাইতে থাকল "অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে রে—" তখন তুমি চোখ মুছে বললে "থিয়েটারে এ-গান শুনেছি। কোন্ পালাটায় যেন? তোর বাবা জানে। কিন্তু আমার কাছে আর তো ভাঙানি নেই রে, তোর কাছে কিছু আছে?"

আমি সব স্টেশনের নাম পড়তে পড়তে যাচ্ছিলাম, চেষ্টা করছিলাম যাতে মুখস্থ থাকে। সে কি সহজ ব্যাপার। ধরে রাখতে পারি না, যেন পিছলে পিছলে যায়। একটা ছবি মনে গেঁথে গেল। একটা স্টেশনে সবে সন্ধ্যা হল। রোদ্দুরের শেষ রেশ টালির ছাতের ইঁট-রঙের সঙ্গে এক হয়ে ছিল। দু'একটা ফুল ছিল তারের বেড়ার সঙ্গে লেপটে থাকা গাছে। গেট পেরিয়ে নীচু জমি, একটাই মেঠো পথ। সেখানে মোটে একজনই নেমেছিল। নেমে এসে টিকিটবাবুর পাশ কাটিয়ে মাটির রাস্তাটা ধরেছে, আর পিছন ফিরে সেই টিকিটবাবু চেঁচাচ্ছেন, "ও মশাই, কই চলছেন, শুনছেন—ও মশাই।" শেষ বেলায় দুপুরের পাতিহাঁসকে ডাঙ্গায় তোলার জন্য মেয়েরা যেমন সার করে করে ডাকে—চৈ-চৈ-চৈ, ঠিক সেইরকম গলা।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। টিকিটবাবু লোকটার নাগাল পেয়েছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু সামান্য ওই ব্যাপারটা কাঠখোদাই ছবি হয়ে আছে। কেমন যেন, আমরা ইদানীং যাকে বলি প্রতীক, তার মতো। এখনও যদি ট্রেনে চড়ি আর কোনও একটা স্টেশনে হঠাৎ সন্ধ্যা নামে ভারী লোভ হয় নেমে পড়ি—আচ্ছা নেমেই যদি পড়ি অজানা এই জায়গাতে? ধূসর পরিবেশের ভিতর দিয়ে ছুটছি, ঠিক নেই কোন্ দিকে যাচ্ছি, লোভ হয়, ভারী লোভ হয়, তা-হলে? পিছন থেকে কোনও টিকিটবাবু কি হেঁকে হেঁকে ডাকবেন, শুনছেন ও মশাই শুনছেন? তিনি ডেকেই চলেছেন আর আমি ছায়ার পুকুরে সাঁতরে

সাঁতরে যাচ্ছি, আমি অনির্দিষ্ট কোনও সন্ধ্যায় আকস্মিক নেমে-পড়া এক যাত্রী, নিজের এই ছবিটা সম্মোহিত হয়ে দেখি। জানি, ওটা শুধু স্বপ্ন, ওটা শুধু সাধ, এই মাপা-জোকা হিসাবী জীবনে ওই অসম্ভব সাধ কখনও পূর্ণ হবে না।

এগারো

সূর্যাস্তের আলো যত পিছিয়ে গেল, ট্রেনটা মরীয়া হয়ে উঠল তত। একটা কমলা রঙের বল যত ফসকে ফসকে গড়িয়ে যাচ্ছে, একপাল শিকারী কুকুর ক্ষেপে উঠে তাড়া করছে তত।

রেলে চড়ে যতবার পশ্চিমে গেছি, ততবারই সন্ধ্যার মুখে মুখে এই ব্যাপার ঘটতে দেখেছি।

সেদিন বাইরে হঠাৎ একটা বাঁকের পরে দেখলাম মালা, তারার পর তারার মালা। আকাশটা চৈত্র মাসের বকুল গাছ হয়ে গেছে নাকি? হাওয়ায় হাওয়ায় সব ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে নীচে? না। তারা তো নয়, আলো। বিজলীর আলো—তীব্র; চোখ ধাঁধানো। কলকাতা কাছে এসে পড়েছে।

এতক্ষণ তুমি কেমন একটু উদাস, হয়ত-বা খানিকটা উৎফুল্লই ছিলে, হঠাৎ দেখি তুমি ধীরে ধীরে আবার শক্ত হয়ে উঠছ। এক সময়ে দেখি জোরে আমার কাঁধ চেপে টেনে আনছ। টিনের ছাদে টপ টপ বৃষ্টি পড়ার মত তোমার এক-একটা কথা শুনছি।—"এই, সাবধান। ওখানে ও কেন আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে জানি না। আমার ভীষণ ভয় করছে, মনে হচ্ছে কোনদিন আর ফিরব না। তোকে—তোকেও হয়ত ও গুণ করে ফেলবে, তুই—তুই ওর হয়ে যাবি, আলাদা হয়ে যাবি। এই ছাখ আমার শরীর কাঁপছে, ধড়ফড় করছে বুক, হাতটা জোর করে চেপে ধর। ধরে থাক থাক না! আমাকে ছুঁয়ে বল যাই ঘটুক, যাই আসুক, আমি আর তুই একই থাকব, আমাকে কোনোদিন ছাড়বি না?"

না বুঝে বলেছিলাম "ছাড়ব না।"

"মার ছেলেই থাকবি, বাবার হবি না, বাবার মতো তো কখনই না।"

প্রতিজ্ঞা করলাম, "কখনো না।"

কিন্তু মা, সেই প্রতিজ্ঞা থাকে নি। সেদিন তুমি জানতে না, আমিও বুঝি নি। বুঝি নি যে, আমি তোমারও থাকব না, বাবারও হব না, আমি হয়ে যাব আর-একজনের—কলকাতার। তার মমতা, মর্ম, হৃদয় এসব আছে কিনা জানিনে, কিন্তু খর আবর্ত, প্রখর রূপ আর অহরহ মুখরতা আছে। তুমি নও, বাবাও না, সেই বিশালাকার ঘনশ্বাস বিলাসিনী আমাকে তার রূপ-রসগন্ধমোহের দহে নিমজ্জিত করবে।

সেই রূপ! আর দেখি না। সেই গন্ধ! আর পাই না। আমার চোখ গেল আর নাক গেল, না সেই রূপ আর গন্ধ উবে গেল? তখন কিন্তু পেতাম। চুন-বালি, নর্দমার ঝাঁঝরি, আলোয় আলোয় বিজ্ঞাপিত লেখা কালো পীচের সপাং বিনুনি সব ঝিম ধরিয়ে দিত, অবশ করত, যদিও এবং যখনও নগরজীবনের গভীরে ডুব মারি নি। সবে উন্মোচিত হচ্ছে মাত্র, সবে স্বাদ পাচ্ছি।

জমকালো স্টেশনে বাবাই এসেছিলেন। তুমি ঘোমটা-টানা জবুথবু, ওখানেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে।

বাবা বললেন, 'উহুঁহু, এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে রাস্তা-ঘাটে লোকের সামনে কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। লোকে হাসে। চেয়ে থাকে। তাছাড়া উপুড় হয়েছ কি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। দেখছ না, কী ভিড়, কী ভীড়! অ্যাই কুলি—উধর নেহি, ইধর ইধর—'

বাবা একটু বদলে গেছেন। আমাদের সেই দেশের বাড়িতে যেমন দেখেছি, তার চেয়ে একটু রোগা, কিন্তু অন্য দিকে আলাদা, যেন কমবয়সী, বলতে কী সেই হৃষ্টপুষ্ট ভাবটা কেটে যেতে বাবাকে

একটু কম রাগীরাগী লাগছিল। জোড়া ভুরুর মাঝখানে আঁচিলটা আছে কিনা আমি লক্ষ্য করছিলাম।

বাবা এক হাতে আমাকে ধরেছিলেন, অন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন তোমার দিকে, তুমি সরে যেতে গিয়ে ঠোক্কর খেলে, বাবা বললেন, "ধরো ধরো, এখানে ও-রকম কলাবউটি হয়ে থাকলে চাপের তলায় চেপটে যাবে।"

কিন্তু মা, তুমি তো কলা-বউটি ছিলে না। তোমার ঘোমটা নিজে থেকেই কখন অন্যমনস্ক, ঘাড় তুলে তুলে, মুখ এদিক-ওদিক ফিরিয়ে তুমি অবাক হয়ে চাইছিলে।

বাবা তাড়া দিলেন, "সামনের দিকে তাকিয়ে চলো, নইলে হোঁচট খাবে, এখানে তাই নিয়ম।"

আমি কিন্তু শক্ত করে ধরেছিলাম বাবার কব্‌জি। কোন্‌টা নিয়ম? সামনে চেয়ে চলা, না হোঁচট খাওয়া ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

মা, তুমি খালি আড়চোখে তাকাচ্ছ আমি কোথায়, আমাকে ইসারায় বলছ তোমার কাছ ঘেঁষে চলতে, বাবা ধরেছেন তোমার হাত, আর আমি ধরব বলে খুঁজছি বাবারটা, এইভাবে তিনজনে মিলে কলকাতায় আমাদের প্রথম পথ-চলা শুরু হল।

আজ পিছন ফিরে ভাবছি, ওটাও একটা প্রতীক না-তো! সজ্ঞানে মা, সেই কি প্রথম আমি তোমার হাত ছাড়লাম, খুঁজলাম আর-এক-জনের? টিনের দোচালার ঠিক নীচে প্রচণ্ড একটা শক্তিকে হেঁইও বলে কষেরাখা ইঞ্জিন, তার ধোঁয়া—অন্তরের কালিমা; তার সোঁ-সোঁ বাষ্প—ভিতরের জ্বালা, এই সব নিয়ে শহরটার চেহারা ফুটছিল, আর সেই গম্‌গম ঘরে সর্বক্ষণ একটা অদ্ভুত আওয়াজ, যা-বাড়ে কমে, কিন্তু কখনও থামে না, তার গোপন কোনও প্রাণকেন্দ্র থেকে অবিরত উত্থিত হচ্ছিল।

এই শব্দ আমি দীর্ঘকাল ধরে শুনেছি, অনেক রাত্রে কান পেতে

পেতে, যখন শেষ ট্রামও চলে গেছে তখন মাটির তলাকার ঝঝর ধারায়। গ্রামে যেমন ঝিঁঝি পোকা, রাত্রের কোনও রাত-জাগা পাখি, দূরের শেয়াল, খালপাড়ের আটচালায় সংকীর্তন, এই শহরের তেমনই নিজস্ব কিছু সর্গম আছে, অনর্গল একটা স্রোত, তার সঙ্গীতের আকার অন্যরকম।

মা, তুমি মৃদুস্বরে বলছিলে, "ঈস্, আগেও তো এসেছি, সেই যে মামীমাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় একবার। তখনও মানুষে গিজগিজ করত, কিন্তু এখন আর চেনা যায় না। এখানে কত লোক হবে—দশ হাজার?"

"দশ হাজার কী বলছ, তার একশো গুণ কি দু'শো গুণ কি তারও বেশি। আন্দাজ করো। তখন স্রোত ছিল, এখন সমুদ্র।"

"তোমার সেই সমুদ্র!" তুমি ম্রিয়মান হাসলে।—"সমুদ্র আমি দেখি নি, একবার দেখব।"

. "কুলি, কুলি, অ্যাই কুলি", বাবা এগিয়ে গেছেন কুলিটাকে ধরতে। এখানে ওঁকে আলাদা লাগছে কেন এবার বোঝা যাচ্ছিল, এই শহর বিরাট বটে, কিন্তু এখানে বাবাও সপ্রতিভ, কী চটপটে, চতুর, অনায়াসে সব কিছুর মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছেন, আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

> (তখন কি জানি, এ-সব কিছুই না, তুড়ি মেরে শহুরেপনার চূড়ায় চড়া যায়, কিন্তু চড়ার পরে আর মজা থাকে না, আমিও তো চড়ে দেখেছি, এখনকার শল্যবিদ্যার ভাষায় কৃত্রিম হৃদয় সংযোজন করে তার স্পন্দন শুনেছি, কিন্তু হৃৎপিণ্ড আর প্রাণ এক না। ও কেবল একটা কথার ঘরানা, হাসির চালাকি, পালিশের ঝকমকি, জুতো থেকে কণ্ঠবন্ধনীতে জুতসই একটা চৌকস ব্যক্তিত্ব, প্রয়োজনের পর প্রয়োজন বাড়ানো, তৃপ্তিকে চিতায় চড়িয়ে তৃষ্ণার শূন্য কলসীটি

আছড়ে স্নেহহীন পাথর আর কাঁকর আর ঝুটো মোতি, পোশাকের পর পোশাক, আঃ পোশাক তো নয় যেন পেঁয়াজের খোসা, পেঁয়াজে চোখ জ্বালা করে, পেঁয়াজে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, কিন্তু সেদিন—

সেদিন আমি মোটরের ভেঁপু, ট্রামের টিকিতে বিজলীর ঝলক, মেওয়ার দোকানে কাটা নাসপাতির গন্ধে, বাঁধানো রাস্তায় ফিটন গাড়ির ঠকাঠক শুনে ভরপুর হয়েছিলাম। একই সঙ্গে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল বিস্ময় আর দীনতা, দীনতা আর বিস্ময়, নিজের সরলতাকে অতিক্রম করব, গ্রামীণতাকে অস্বীকার করে শহুরে হব, সব ভঙ্গি, সব নাগরিক নৈপুণ্য আয়ত্ত হবে আমার, আয়ত্ত করতেই হবে— এই সংকল্প ভ্রূণাকরে গঠিত হচ্ছিল মনে। আর তাই—

তাই বুঝি মা, কলকাতার মাটিতে—মাটিই বা বলি কেন, শান; পাথর আর শান; এখানে তো মাটিও কেনা-বেচা হয়—কলকাতায় পা দিয়ে তোমার হাত ছাড়লাম। যদিও তোমার অসহায় সরু আঙুলগুলো তখনও আমাকে খুঁজছিল।

তখন কি জানি, শহুরে অভ্যাস, ভাব-ভঙ্গি, ভান এসব হল মেক্-আপের মতো, প্রলিপ্ত করতে বেশি সময় লাগে না, একেবারে অন্য চেহারা হয়ে যায়, কিন্তু মুশকিল ঘটে যখন ফিরতে চাই স্বরূপে। তখন বাটি বাটি গরম জল আর কষে কষে রগড়ালেও প্রলেপ যেতে চায় না, এই যে আমি গত কত বছর ধরে তো চোখের জলে, সে জলও গরমই তো, সব ধুয়ে ফেলতে চাইলাম, তবু টাইয়ের ফাঁস গলায় সেঁটেই রইল,

কোন্ পরতের তলায় চাপা পড়ে আছে আমার আপন স্বরূপ, ঘষে ঘষে বরং রক্ত বের হল, তবু সেই ধুলোমলিন বিস্ফারিত গ্রামীণ চামড়া তো আর ফুটে বেরোল না !)

দশ হাজারের দু' তিন শ' গুণ কত তার আন্দাজ ছিল না, তবু কিন্তু সেদিন ওই সংখ্যাটাই সম্ভ্রম এনে দিয়েছিল মনে। আড়চোখে বাবার দিকে চাইছিলাম। উনি কি সত্যিই একটু মায়াবী, একটু আলাদা হয়ে গেছেন, ভাবছিলাম, নাকি এই যে চোখ-ধাঁধানো নীল আলোই ওঁকে এমন নরম মরমী অন্যরকম করে দিল ? সচেতনভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে বোধ করছিলাম, এই চড়া আলোরও অবদান কিছু আছে, আমার অভিভূতভাব ক্রমেই বাড়ছিল, ঘোড়ার গাড়ির ঘেরাটোপে বসেও অনেকক্ষণ আমি বাক্যহারাই ছিলাম। শুনেছিলাম চাবুকের শিস, চোখে কানে গয়নার সাজসজ্জা পরা তেজীয়ান টগবগে ঘোড়ার সঙ্গে তার গাড়োয়ানের দুর্বোধ্য ভাষায় কথোপকথন, অথবা বলা উচিত কথা, একতরফা—শুধুই কথন !

গাড়ি গড়াচ্ছিল, ভিতরটা অন্ধকার, তুমি-আমি একপাশে, বাবা ও-পাশে। উঁকি দিয়ে দেখছিলাম একটা আলো জ্বলে জ্বলে কী লিখে ফের নিবে যাচ্ছে, বললাম, "বাবা, ও কী বিদ্যুৎ ?"

"বিদ্যুৎ ?" বাবা কি ভাবলেন। "ঠিক বিদ্যুৎ নয়, গ্যাস। নিয়ন। বিদ্যুতের মতো দেখায়।"

('মতো দেখায়'—তখন যদি চোখকান অভিজ্ঞ হত, এই শহরটার চরিত্রের আর একটা দিক দেখা যেত। এখানে যে জিনিস যেমন দেখায়, সবটাই তাই নয়, এক জিনিস অন্য জিনিসের চেহারা নিয়েও বেরিয়ে আসে।)

গাড়ি চলছিল। বাবা তোমার পায়ে আলগোছে রাখলেন একটা হাত, টের পাচ্ছি, বলছেন "তার পর ?"

"কিসের পর। পরে যা তা তো তোমার হাতে। সব তো চুকিয়ে দিয়েই এসেছি।"

"সে তো বটেই।" বাবা একটু কি কাশলেন ? "চুকিয়ে দিয়েই তো এলে। বলছি যে, তা-হলে এলে ?"

"এলাম।"

"দু'জনে ?"

"দুজন, শুধু দু'জন।" একটা শ্বাস চাপতে তুমি বাইরের দিকে মুখ ফেরালে কিনা জানিনে। মা, তোমার কি লাগছিল ? আস্তে আস্তে বাবার হাতটা ঠেলে কেন দিচ্ছিলে ?

"তিনজন হতে পারত।" বাবা বললেন, কতকটা স্বগত স্বরে।

"সে তো চলে গেছে।"

"ক'জন ?"

"জানি না।"

"এখন দু'জন ? তিনজন হল না কেন ?

পায়ে পড়ি, তোমরা একটু সহজ ভাষায় কথা বলো না, যাতে আমি বুঝতে পারি।

"হল না। ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না।"

"ভগবানের, না তোমার ? ঠিক বলো তো, সে এল না, না তুমি ইচ্ছে করেই আসতে দিলে না ?"

তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে। মাথা বাড়িয়ে দিলে গাড়ির বাইরে, হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া। তখন আমি, মা, মরীয়া হয়ে আমি বোকার মতো বলে উঠলাম, "কেন, আমরা তিনজনই তো। আমি মা আর আপনি। আপনাকে নিয়ে তিনজন।"

"হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে।" বাবা অন্যমনস্ক ভাবে সায় দিলেন, তার

পরেই সোজা হয়ে—"ও হো, ভুলে গিয়েছিলাম। আরও একজন তো ছিল?"

তুমি, মা, চমকে বললে, "কে?"

বাবা সোজা উত্তর দিলেন না। নিজের হাঁটুতেই টোকা দিতে দিতে বললেন, "ছিল তো! সেই যে একজন! সে তোমাকে আসতে দিল?"

তুমি তো অনায়াসে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারতে। তবু কেন যে আবার কঠিন হয়ে উঠছিলে! ওই অস্পষ্ট আলোতেও তোমার চোয়ালের দৃঢ়তা ধরা পড়ছিল। তারপরই, মা, সহসা তোমাকে নরম হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। দু' হাতে মুখ ঢেকেছ তুমি, অনুনয় এমন-কী প্রার্থনার সুরে বলছ "এখানেও ওসব কথার জের টেনে আনছ কেন। সমুদ্র-টমুদ্র—এই বুঝি তোমার নতুন হওয়া? চিঠিতে তবে বুঝি সব বাজে কথা লিখেছিলে? আমাদের নিয়ে এসেছ নতুন করে সব শুরু করবে বলে নয়, ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠিতে কত-কী লিখেছিলে শুধু ভোলাতে।"

বাবা কিছু বলছিলেন না!

আর সেই সময় একটা বোকার মতো কাজ করলাম আমি। আমি যে বড় হয়েছি, আমার যে বুদ্ধি আছে, বাবার কাছে যেন সেটাই জাহির করতে ফশ্ করে বলে বসলাম "সুধীরমামা নেই তো। চলে গেছেন।"

বাবা এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। পলক পড়ছিল না। মাঝের আঁচিলটাকে সাক্ষী রেখে ভুরু দুটো আবার কি জুড়ে গেল? এই শহরে এত আলো অথচ এই গাড়িটার ভিতরে কত অন্ধকার, রক্ত শুকিয়ে যেমন চাপচাপ কালো হয়ে যায়, তেমনই শুকনো ছোপ ছোপ অন্ধকার, একটা ভয়ংকর ঘর্ঘর তুলে ঘোড়ার গাড়িটা ছুটছিল।

"কী ভাবছ।" তুমি বললে আস্তে আস্তে, সন্তর্পণে, যেন ভয়ে

ভয়ে, নিজে থেকেই এবার বুঝি বাবার পায়ে আন্দাজে একটা হাত রাখলে।

"ভাবছি।"

"তোমার নতুন কোনও পালা ?"

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বাবা ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ, এই আমাদের নতুন পালা।"

তার কত পরে বাবা বাইরে গলা বাড়িয়ে বলেছেন, "এই গাড়োয়ান রোখ্‌কে, না, না, ডাহিনা গলি, ডাহিনা গলি, যাও, যাও, আউর থোড়া, আচ্ছা এইবার, এইখানে—বিলকুল রোখ্‌কে।"

আমাদের দিকে চেয়ে বাবা বললেন "পৌঁছে গেছি।"

আর কত বছর তো কেটে গেছে, এখনও ঠিক বুঝতে পারি না, বাবা সেদিন যা বলেছিলেন তার অর্থ কী। কোথায় পৌঁছে গেছি। কখনও মনে হয়, অলীক অদ্ভুত একটা ধারণা, মনে হয়, সেদিন গাড়িটা ওখানে, ওই গলিতে বসতবাড়িটার সামনে সত্যি সত্যিই দাঁড়িয়েছিল তো ? সেখানে নিবু নিবু একটা গ্যাসের বাতি সাক্ষী ছিল ? কে জানে, হয়ত সবটাই ভ্রম, বাবা রোখ্‌কে বললেও গাড়িটা দাঁড়ায়নি, এ-গলি ও-গলি, কাঁথায় ছুঁচের মত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলেছেই, ক্রমাগত চলেছে, চাকা টলমল-টলমল, ক'টা রিক্‌শাকে সে ধাক্কা দিল কে জানে, তার পাশ কাটাতে গিয়ে কোন্ মোড়ে বেচাল বেহেড একটা লোকের মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে, একটা পা হড়কে পড়ল খোলা নালাতে, উবুড় ডাস্‌টবিনটার কিনারা জাপটে ধরে সে গোঙাতে থাকল ক্রমাগত, কী সে আর্ত গদগদ চিৎকার, এসব মিলিয়েই কলকাতা, কিন্তু সব কি সেদিনই ঘটেছিল, সেই প্রথম দিনে, যখন গাড়িটা একটুও না-থমকে না-থেমে বেপরোয়া ছুটছিল, খেয়াল করল না কী হল তার সওয়ারীদের, তারা কি হুমড়ি খেয়ে রইল

গাড়ির ভিতরেই, অথবা এক সময়ে ঝাঁপ দিল বাইরে কিংবা ছিটকে পড়ল ?

যে-কোচোয়ান অদৃশ্য কোচবাকসে বসে, কারও কথা শোনে না, থামে না, থামতে দেয় না, কাউকে পৌঁছে দেয় না কোথাও, কেবলই গাড়ি হাঁকায়, আমি প্রথম দিনের স্মৃতি থেকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বস্তিগ্রস্ত, তার ধরনধারণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আছি, থেকে থেকে তার চাবুকের সাঁ সাঁ শাঁসানি শুনি। হয়ত আমার ভ্রান্তি। কিন্তু আমি পুষে রেখেছি।

"এই বাড়ি ?"

"এই বাড়ি !"

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, তোমার যে প্রশ্ন, বাবারও সেই উত্তর।

প্যাসেজে আলো ছিল না, এই শহরটা, তখনই কি টের পেলাম, একই সঙ্গে উদাম আর গোপন, নানা স্থানে নানা রকম, এখানে আলো ওখানে আঁধারি, অনেককে নিয়ে তার অনেক ধরনের লুকোচুরি।

"এই বাড়ি।" বাবা বললেন, যেন অমোঘ কোনও নির্দেশ, হাত বাড়িয়ে প্রথমে নামালেন আমাকে, তুমি হাতল ধরে কোনক্রমে টাল সামলে নামলে।

আলো ছিল না, তাই বাবাকে দেশলাই জ্বালতে হল। মোটঘাট নামানো হল দেউড়িতে। পুরো একটা টাকা পেয়ে গাড়োয়ান খুশী হয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল, তার পায়ের চাপে একটা ঘন্টি টমটম বাজছিল। গলির মোড় যখন ঘুরে গেল গাড়িটা, তখনও তার মুখে হিন্দী একটা গানের কলি শুনছি—কাঁহে নজর বাঁচাকে হম্‌সে প্রিয়তম, ছিপাকে যাতে হো। এখন হাজারবার মাইকে শুনলেও কথাগুলো ধরতে পারি না, আর ওই বয়সে একবার শুনেই হিন্দী গানের একটা কলি মনে গেঁথে গেল।

"মাল আমি নেব পরে। তোমরা আগে চলো।" দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে বাবা চলেছেন আগে, আমরা পিছনে, পাশাপাশি জালঘেরা পর পর কয়েকটা জানালা, কিন্তু ঘরগুলো অন্ধকার, একটা খিলেনের তলা দিয়ে একটু এগোলে স্যাঁতসেঁতে একটা উঠোন, অল্প অল্প আলোতেও শ্যাওলা দেখা গেল, মনে হল কী পিছল, একটা কল ভালো করে বন্ধ হয়নি তাই চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে জল, টপ-টপ, টপ-টপ—আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে থাকলাম, বাবা তখন দেশলাইয়ের কাঠি ধরে তাড়া দিচ্ছেন, "দেখছিস কী, তাড়াতাড়ি চল", কাঠিটা নিবে গেল, তখন সামনে দেখা গেল একটা কাঠের সিঁড়ি, যেন কাত করে শোয়ানো একটা মইয়ের মতন, সিঁড়িটার একদিকে হাতল। কাঠিটা নিবে গেছে, অনেক দূরের লাল তারাটির মতো বাবার মুখে তখন জ্বলছে বিড়ি, উনি স্বদেশী কিনা তাই তখন সিগারেট খেতেন না, বিড়ির আলো কতটুকু আর, তবু আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল উঠোনটার পাশে ছিল শানবাঁধানো একটু উঁচু রক, তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে সিঁড়িটার মুখে পৌঁছনো গেল।

থরথর করে কাঁপছিল সেই সিঁড়ি, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চটে গিয়ে খচখচ শব্দ করছিল, সেই প্রথম ওঠা, তারপর কত ঝকঝকে সিঁড়ি দেখেছি জীবনে, এমন-কী বেলে-পাথর মারবেলেরও, কিন্তু কলকাতার প্রথম কাঠের সিঁড়িটা আজও থেকে থেকে কাঁপে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বিরক্তিতে, তবু নানা প্রসঙ্গে তার ফিরে ফিরে আসা শেষ হল না।

সিঁড়িতে পা দিতেই তার তলায় একটা কুকুর গোড়ায় ধমকে উঠে হঠাৎ কঁকিয়ে কঁকিয়ে অহেতুক কাঁদতে থাকল, উপরে কোথাও দুটো বিড়ালের চলছিল ঝুটোপুটি, সিঁড়িটার মাথায় ঠিক ওই উঠোনটার মাপে চৌকো করে কাটা আকাশ, একফালি কাটা চাদর যেন, আমাদের পায়ের শব্দে কোন্ এক চোরা ঘুলঘুলিতে কয়েকটা গোলা পায়রা ডানা ঝটফট করে উঠল, তারপর।

"এই ঘর ?"

"এই ঘর।"

"আলো নেই ?"

"জ্বালছি। লনঠন একটা আছে ওই কোণে। ছ্যাখো।"

আমাদের সাড়া পেয়ে কারা যেন এসেছিল, তারা ভিতরে এল না, খালি তাদের ছায়ারা চাপা গলায় কথা বলতে থাকল। বাবা বেরিয়ে গিয়ে কী বলে এল তাদের, তারপর আবার সব চুপচাপ। এই তো এইমাত্র দেখে এলাম সদর রাস্তায়, আলোগুলো সব জ্বলজ্বলে, শহরটা ঘুমোয়নি, একেবারে ড্যাবডেবে চোখে জেগে, অথচ এই গলিটা, গলিটার এই বাড়িটা কিনা এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

নীচের ঘরে কে কাশছিল, অন্য দিক থেকে একটা বেসুরো জড়ানো গলার চিৎকার ঝনঝন বেজে উঠল, সিঁড়িতে মচমচ, সেই সঙ্গে মিষ্টি একটা রিনিরিনি, যারা এসেছিল, তারা কারা, ওই মিষ্টি আওয়াজটা কি তাদের হাতের চুড়ির ?

কলকাতা, কলকাতা, এই সব মিলিয়ে প্রথম দিনের কলকাতা।

মা, তুমি কোমরে আঁচল বেঁধে ঘর সাফ করছিলে, একবার মুখ তুলে বাবাকে বললে, "কেমন ভ্যাপসা গন্ধ, না ?"

"প্রাসাদ কোথায় পাব। এই ঘরটারই ভাড়া কুড়ি টাকা, তা জানো ?"

তুমি একটা জানালা খুলতে যাচ্ছিলে, বাবা হাত তুলে ইসারায় মানা করলেন।—"ওই জানালাটা খুলো না।"

"খুলব না, সে কী !"

"কারণ জেনে কী হবে, ও দিকটা, মানে ওদিকটা ভালো না, আর কী। মানে জানতে চেও না। সেই যে এক রূপকথায় আছে উত্তরের জানালা খুলতে নিষেধ, তেমই ধরে নাও আর কী। পরে আস্তে আস্তে টের পাবে।"

"কিন্তু জানালা না খুললে গন্ধটা—"

"ইঁদুরে নোংরা করেছে। কালো কালো বাড়িগুলো দেখছ তো,

ওর মানে হল তাই। অনেক দিন কেউ বাস করেনি কিনা! পরে দেখো, সয়ে যাবে। যখন টের পাবে লোক এসেছে তখন আরশোলাগুলোও পালাবে।”

“আরশোলাও আছে বুঝি?”

“আছে, আছে, সব আছে। এই নিয়েই তো—”

সবটা না শুনেই আমি মনে মনে বললাম “কলকাতা।”

“সব জেনেশুনে তুমি এখানে—”

“এর চেয়ে ভালো পাব কোথা। তবু তো সতীশ রায় খবরটা দিয়েছিল, তাই। সতীশ কে জানো তো? আমাদের থিয়েটারে প্রম্‌ট করে, মানে আড়াল থেকে সব্‌বাইকে পার্টের খেই ধরিয়ে দেয় আর কী। সতীশও এখানে থাকে, সপরিবারে। চমৎকার লোক, কাল দেখবে।”

“ওর বউ?”

“আছে। একটি মেয়েও আছে, ফুটফুটে। ওরাই তো একটু আগে এসেছিল, খবরটবর নিয়ে গেল। কাল সকালে আবার আসছে।”

“দ্যাখো, এত কাজ থাকতে তুমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে—আমার যেন কেমন-কেমন লাগছে।”

“আমার জন্যে জজিয়াতি নিয়ে কে বসে আছে বলো তো। হাকিম করতে হয়, কোরো তোমার ছেলেকে।”

তুমি আমার মাথায় হাত রেখে বললে, “হাকিম হবে, হবেই তো। জানো, ও পড়াশুনোয় কত ভালো। এবার ইয়ারলি পরীক্ষায়—কত যেন পেয়েছিস রে?”

বললাম, “ছশো তিরিশ—সাতশোর মধ্যে।”

“ব্যাস্‌”, হেসে উঠলেন বাবা, “তবে তো হাকিম হবার আদ্ধেকটা রাস্তা পার হয়েই এসেছে। কিন্তু আমার কথা যদি খাটে, ও হাকিম হবে না। হাকিমী মানেও তো সাহেবদের গোলামী।”

"তবু সম্মান, স্থায়িত্ব, এই সব তো পাবে ?"

চোখ টেরচা করে বাবা বললেন, "তোমার সেই কী রকম দাদা যেন, সে যা পেয়েছিল ? সেরেস্তা না কোথায় কাজ করত না ? আসলে আমি জানি ও ছিল পুলিসের টিকটিকি। ছদ্মবেশী, ওর সবটাই ছদ্মবেশ। আমার ছেলে—" হাঁপাতে হাঁপাতে বাবা বললেন, ঈষৎ উত্তেজিত, "ও আমারই ছেলে যদি হয় তবে গোলাম কখনও হবে না। টিকটিকি ইঁদুর কিচ্ছু না। ও হবে বাঘ, বাঘের বাচ্চা বাঘ !"

এই বলে বাবা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

"বাঘ তো এখন থিয়েটারের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে। ছি-ছি, এত জেল-টেল খেটে শেষে"—

"চিঠিতে সব তো বুঝিয়ে লিখেছি। ছাখো, খোঁয়াড় বোলে না। কপালে থাকে তো ওই থিয়েটারই আমাকে তুলে ধরবে। হয়ত ওখানেই—" বলতে বলতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বাবার চোখ, নাকের ডগা স্ফীত, কপালের শিরাও ফুলে উঠেছে—"হয়ত ওখানেই একদিন আমার লেখা নাটকও প্লে হবে।"

"তোমার নাটক !"

"হতে তো পারে। সেই আশাতেই তো ঢুকেছি। ছুঁচ হয়ে। ছিদ্র পথে। সব্যসাচবীবাবু, নাম জানো ? এখনকার সবচেয়ে নামী অ্যাক্টর। তিনি কথা দিয়েছেন—"

"প্লে করবেন ?"

"না। ফুরসুত পেলে দু'-একটা পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখবেন। এক সঙ্গে উনি দু'টো বোর্ডে নামেন, ফী বেস্পতি, শনি আর রবিবারে, তা-ছাড়া টকি-স্টুডিও—নিঃশ্বাস ফেলারই বা সময় কই ?"

ঝাঁটা হাতে নিয়ে তুমি ছবির মত স্থির হয়ে চেয়ে রইলে। বোধ হয় আশা আর অবিশ্বাসের মধ্যে দুলছিলে।

"আজ আর বেশী কিছু কোরো না। আমি চট করে দোকান

থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। পুরী-তরকারি আর রাবড়ি, কিংবা দই, মিষ্টি দই। কলকাতার দই একেবারে আলাদা জিনিস, জানিস তো ?”

এই বলে বাবা আমার দিকে চোখ টিপে একটা লোভ-দেখানো ইসারা করে বেরিয়ে গেলেন।

বারো

সেই বাড়ি, সেই ঘর।

ঘর কেমন, তার চেহারা ফুটে উঠল পরদিন সকালে। সাঁতরে সাঁতরে আমরা যেমন দেশের পুকুরে ডুব জল থেকে পৌঁছে যেতাম পাড়ে, এই ঘরটাতেও, তেমনই, সকাল হতে না হতে এক-একটা জিনিস যেন অন্ধকার থেকে আকার নিয়ে পাড়ে উঠে আসছিল —ছোপ-ধরা দেওয়াল, মাথার উপরে উই-ধরা কড়ি, মরচে-ধরা জানালার শিক। রোদ একটুখানি ঠিকরে পড়ছিল অবশ্য, কিন্তু ঘরটা কিনা খুব লাজুক, কাউকে মুখ দেখাতেই চায় না, তাই ঘরে-ঘরে-ধরানো উনুনের ধোঁয়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলছিল। চোখে জ্বালা, আমি উঠে পড়লাম। দেখলাম তুমি উঠেছ তার আগেই। দেয়ালের একটা দিকে পেরেক না কী একটা ঠুকে বসাতে চাইছ।

বাবা একটু পরেই ফিরলেন থলেতে কাঁচা বাজার নিয়ে। "কী, করছ কী। এমনিতেই তো দেয়ালটার আস্তরখসা, চুনবালি সব ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লে বাড়িওয়ালা বলবে কী।"

—"আমি—আমি একটা জিনিস করব।"

—"কী করবে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।"

তোমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, হাওয়ায় চুনের গুঁড়ো তাই নাকে সুড়সুড়ি, তুমি স্পষ্টই বোঝা যায় কী-একটা গোপন করতে চাইছ।

—"তুমি যাও, তুমি যাও না। ফিরে এসে দেখবে।" কোনো দিকে না তাকিয়ে তুমি একমনে পেরেক ঠুকতে লাগলে, ঠোকার যন্ত্র তো ওই একটাই, ছোট্ট জাঁতি, পেরেক বসল না, কিন্তু একবার তোমার আঙুল থেঁতলে গেল, শুয়ে শুয়েই আমি দেখছি। বাবা

রাগ করে গেলেন বেরিয়ে।—"ফিরে এসে ভাত যেন পাই। রোজ বাজারের খাবার, এত বড়মানুষী পোষাবে না, তাই বলছি।"

—"ফিরে এসে দেখো।"

শেষ পর্যন্ত পেরেকটা বসল, যদিও তেমন মজবুত হল না, খানিকটা হেলেই রইল।

আমি দেখছি তুমি প্রথমে বের করলে রাধাকৃষ্ণের একটা পট, কোলে নিয়ে দেখলে। সেটা পাশে রেখে দিয়ে বের করলে আর-একটা—হরগৌরীর। না, সেটাও পছন্দ হল না। ততক্ষণে পা টিপে টিপে উঠে পড়েছি আমি, সবার নীচে সাবধানে ছিল যে-ছবিটা সেইটে টেনে বের করেছি। বলেছি ফিসফিস করে, একমাত্র ছেলেই মাকে ও-রকম অন্তরঙ্গ স্বরে বলতে পারে, "এইটে—এইটে টাঙাবে তো। এই নাও। কিন্তু টাঙাবে কী করে। যেমন তোমার দেয়াল, এই ছবিও তো ঠিক তাই। ভাঙা কাচ, খসে পড়ছে ঝুরঝুর করে।"

আর তখন যা ঘটবার তাই ঘটল। ফটোটা কেড়ে নিয়ে ঠাস করে একটা চড় মারলে আমাকে,—কেন?—তোমার মনের কথা টেনে বের করেছি বলে? কিন্তু সে জন্যে, মা, ওই ফটোটাকে বুকে চেপে কেঁদে ওঠার কী দরকার ছিল।

কিন্তু আজ ভেবে ছাখো, যা ভবিতব্য তাই তো ঘটল? দাদার ছবিটা পুরণো, ঝরঝরে, আনা হবে না হবে না করেও সেটা যদি বা এল, সেটা ফের চলে গেল বাক্সের তলাতে, কলকাতায় এসেছিলাম তুমি আর আমি, আমরা দু'জন, থেকেও তো গেলাম সেই দু'জনই? এখানে, এমন কী এখানকার দেওয়ালে ফটো হয়েও, দাদার স্থান হল না।

তাই কি ফটোটা বুকে চেপে কাঁদলে তুমি। দাদার জন্যে কলকাতা এসে সেই প্রথম আর এক রকম সেই শেষ।

সেকালে বিয়ে করতে যাবার আগে ছেলেরা যেমন বলত "অনুমতি দাও মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি", তেমনই মা, আমি, এতক্ষণ ধরে কলম টেনে টেনে ক্লান্ত, বুঝতে পারছ, এখন কী বলতে চাইছি ?—"অনুমতি দাও মা, সেই বয়সে প্রবেশ করি।"

কোন্ বয়স ? যে-বয়সে কলকাতা আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিচ্ছিল, হাত-গড়া রুটি যেভাবে উলটেপালটে চাপড়ে আগুনের তাতে সেঁকে নেয়, সেইভাবে, আমি ফেঁপে উঠছি, ভিতরে চাপা ভাপ, মুখে কথার তুবড়ি, আমাকে দেখে কে বলবে সেই ভিতু, রোগারোগা গ্রামের ছেলেটি ?

বন্ধ চালের হাঁড়িতে কলা যেমন তাড়াতাড়ি মজে, আমিও তেমনই মজে উঠছিলাম, যদিও স্কুলের শেষ পরীক্ষার তখনও অন্তত বছর দুয়েক বাকী। অতি ধীরে ধীরে সেই বৃত্তান্ত উন্মোচন করলে পরিসরে কুলোবে না, তা ছাড়া বয়সের ছাঁকুনি দিয়ে অনেক স্মৃতি গলে গেছে।

আমিও মজে উঠছিলাম, মজা পাচ্ছিলাম, নানা বই পড়ে, নানা লোকের কথায়, ঠারেঠোরে ইসারায়, তা ছাড়া বিবিধ পারিবারিক অভিজ্ঞতায়। আমিও!

একটু পাউডার নাকের কাছে ধরে কেমন কেমন লাগত, কেন যে ফাল্গুন পড়তে-না-পড়তে রাস্তার দু পাশের সংযমী গাছগুলো ওড়া ধুলোতে মস্ত্ হয়ে যেত! আমি তখন থেকেই দেখতাম।

হায়, পুরুষের বয়ঃসন্ধিকালের কথা কোনও কাব্যগ্রন্থে লেখেনি, পুরুষেরা জানতে পারে শুধু নিজেদের কঠিন কষ্টে, বিগলিত নিষ্কৃতিতে, আর—আর মেয়েদের অনুরূপ বয়সের বর্ণনার সঙ্গে আপনার যন্ত্রণা মিলিয়ে। আমিও জানছিলাম।

কলকাতা, মোটের উপর আমার ক্রমে ক্রমে রপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তোমার নয়। নতুন জুতোর কামড়-কাঁকর আমার সহ্য হয়ে এল, কিন্তু চটি জুতো পরে চলাফেরা কিছুতেই তোমার অভ্যাস হচ্ছিল না।

বাবা বলতেন, "তুমি সেই গেঁয়ো ভূতই হয়ে গেলে।"

তুমি : "রাতারাতি শহুরে পরী হব তাই কি ভেবেছিলে তুমি ?"

বাবা : "যাও না, তবে তিলক কেটে রোজ বুড়িদের মতো গঙ্গাচ্চান করো।"

তুমি : "করবই তো, করব। একেবারেই একদিন গঙ্গাযাত্রা করব। রাস্তাটা তুমি এক দিন দেখিয়ে দাও না।"

বাবা : "সোজা রাস্তা। পশ্চিমমুখো হেঁটে গেলে পুরো আধমাইলও না।"

এই রকম বিশ্রী কথা কাটাকাটি। আমি পালিয়ে যেতাম। বুলাদের ঘরে।

সেই যে যারা প্রথম দিন রাত্রে আমরা আসতেই ছায়ার মতো বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাই বুলা। বুলা আর বুলার মা। যে সতীশবাবু থিয়েটারে প্রমটার, এই বাড়ির খোঁজ বাবাকে দিয়েছিলেন যিনি, তিনিই বুলার বাবা।

মা, প্রথম দিকে তুমি কিন্তু ভুলে গিয়েছিলে। সেই ডুরে শাড়ি, চওড়া করে সিঁদূর পরা সব ফিরে এসেছিল। বাবাও রোজ সকালে বাজারে তো যেতেনই, সন্ধ্যার পর কোন-না-কোন মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে ফিরতেন। যেখানে বসে আমি পড়তাম, যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে লিখেছিলাম "পাঠ-পীঠ", মানে নেই, ওম্‌নি ওম্‌নি, তুমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে, 'সব থিয়েটার ঢঙ, নাটুকে', বাবা বলতেন, 'হবেই তো আমার ছেলে যে', সেই পাঠ-পীঠের সামনে বসে ঢুলছি, বাবা ঠেলে ঠেলে আমাকে তুলে দিতেন।

মা, তুমি এগিয়ে এসে আমার মুখে গুঁজে দিতে মিষ্টি। বাবা যখন মুখ ধুতে বাইরে গেছেন, তখন নিজেও একটু চেখে বলতে, "আমি ভুল করেছিলাম রে"—বলতে আস্তে আস্তে। কী ভুল ?

"তোর বাবা সত্যিই বদলে গেছে। আগের চেয়ে সংসারের ওপর ওর কত মায়া পড়েছে, দেখছিস ?"

দেখছি না ? দেখব কী, তখন তো হাতে হাতে আরও বড় প্রমাণ —চাখছি।

কিন্তু ক'দিন আর, ক্যালেনডারে তো দাগ দিয়ে রাখিনি। বাবার সকালে বাজার করা বন্ধ হল। থলে নিয়ে নীচে যেতেন ঠিকই, কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় উঠেও আসতেন, কিন্তু তুমি যা-যা আনতে বলে দিতে, ফর্দের সঙ্গে তার সবটা মিলত না। রাগে একদিন সব ছড়িয়ে দিলে, ফুঁসতে ফুঁসতে বললে "কী আনতে বললাম, আর তুমি এ এনেছ কী।"

বাবা চুপচাপ রইলেন, চোখে কেমন-একটা নিরর্থক দৃষ্টি। এখন ওই দৃষ্টির মানে আমি জানি—অপরাধীর।

অপরাধটা কী, সেটা একদিন ধরিয়ে দিল বুলা। একদিন নীচে থেকে বাজারের থলিটা সে-ই উপরে নিয়ে এল।

তুমি একটু অবাক হলে। বললে, "তুই ?"

"বাবা পাঠিয়ে দিল, মাসীমা।"

"বাবা—মানে তোর বাবা ? কেন তোর মেসোমশাই—"

"মেসোমশাই গল্প করছেন, মাসীমা।"

"বাজার থেকে ফিরে অমনই গল্প করতে বসে গেল ? আচ্ছা আক্কেল তো মানুষটার !"

"মেসোমশাই তো বাজারে যাননি মাসীমা।"

"বাজার আনল কে।"

"কেন বাবা ! বাবাই তো রোজ যান। মেসোমশাই নীচে গিয়ে রোজ করেন কী, বাবাকে টাকা ধরিয়ে দিয়েই গল্প করতে বসে যান।"

"গল্প ? কার সঙ্গে ?"

"কেন, আমার না নেই ? মা খুব ভাল চা বানাতে পারেন মাসীমা। খাবেন এক দিন ?" ফ্রকের কোণ মুখে তুলে বুলা হাসছিল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মা, আমার শরীরের যন্ত্রণার সেই শুরু, অথচ বুলার পা দুটো দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না, হাঁটুর কাছে কালচে দাগ, তার উপরে পাতলা চামড়ার পরতে নীল শিরা, আমার গা শিরশির করত।

মা, তুমিও কি লক্ষ্য করতে ? নইলে বলতে কেন, "বুলা জামা নামিয়ে দাঁড়াও, ও কী বিচ্ছিরি অভ্যেস।" খুন্তির ছ্যাক ছ্যাক শব্দ তোমার রাগটাকে চেঁচিয়ে বলে দিত।

বয়স কত ছিল বুলার, আমার চেয়ে বড়, না সমান ? তবে বুলার মা, যাকে আমিও বলতাম মাসি, লীলা মাসি, তোমার চেয়ে বোধ হয় ছোটই ছিল, অন্তত তাকে ছোট দেখাত। আসলে ছোট কি বড় জানি না, তাকে একেবারে আলাদা দেখাত। ঠিক সেই ভামতীকে দেখেই যেমন টের পেয়েছিলাম এ একেবারে অন্য ধরনের, লীলা মাসিকেও তেমনই। কারণ নিজের অজান্তে তোমাকেই আমি অনেক কাল ধরে স্বাভাবিকতার প্রমাণিক মাপ ভাবতাম কিনা।

ভামতী কালো ছিল, লীলা মাসি ফরসা, বোধ হয় তোমার চেয়েও ফরসা। কিংবা খুব সাজগোজ করে থাকত আর মুখে চটচটে কী-সব মাখত বলে তোমার চেয়ে দু'এক পোঁচ ফরসাই লাগত। তোমাকে একদিন সে কথা বলতে তুমি হঠাৎ রেগে গেলে। আয়না সামনে রেখে খোঁপা ঠিক করছিলে, দাঁতে কালো ফিতে চাপা, ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "মুখ ধুয়ে একদিন সকালে ওই লীলাকে আমার পাশে দাঁড়াতে বলিস, ওই সাদা মলম-টলম যেন না থাকে। তখন দেখা যাবে কে বেশি—" আর বলা হল না, মুখ থেকে ফিতেটা খসে পড়ল। প্রসাধনের ব্যাপার-ট্যাপারকে তুমি বলতে "মলম", তোমার সাজ-সজ্জা বলতে তো ছিল খালি সিঁদুর আর আলতা। পাউডার ? না, তা-ও মনে পড়ছে না।

ভামতী ছিল গোলগাল, মোটা, লীলা মাসি রোগা। গাল কেমন ভাঙাভাঙা, গলার হাড় তো আমি সর্বদাই দেখতে পেতাম, তা ছাড়া লীলা মাসির ব্লাউজের গলা ছিল তে-কোণা করে কাটা। আর তোমার? তুমি তো ব্লাউজই পরতে না। কলকাতা এসেও শুধু সেমিজই নিয়ে ছিলে।

বলতে "ও তো একটা বেহায়া। মেয়েটাকেও করে তুলছে তেমনি ধিঙ্গি। তুই ওদের সঙ্গে মিশিস না।"

মা, আমার মা, তুমি তো মা। তুমি কেন ওদের হিংসে করবে?

প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা লীলা মাসি ঘটা করে সাজসজ্জা সেরে কোথায় বেরুতো। ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত। ফিরত রিক্‌শা করে। কদাচিৎ-কখনও ট্যাকসিতে। আঃ, সেই ট্যাকসির ভেঁপু, পিছনে ছড়িয়ে যাওয়া ধোঁয়া, আমি ছুটে যেতাম, বুক ভরে তার গন্ধ নিতাম। কতদিন আর সেই গন্ধ পাই না। মোটরগাড়ির না, কোনও গাড়িরই না। আগে প্রত্যেকটা বাস ছেড়ে দেবার সময় শব্দ হত "ভোঁ-ও-ও" এখনও কি সেই চনমন-করা আওয়াজটা বাজে? বোধহয় না, অন্তত আমি শুনি না। অথচ আজকালকার বাস তো, কলকব্জা, চালানোর কায়দা সবই হয়ত বদলে গেছে।

লীলা মাসিকে যারা নামিয়ে দিয়ে যেত, তাদের মুখ কোনোদিন দেখতে পাইনি। ওদের মুখ ছিলও না সম্ভবত। ছিল অন্ধকারে আধো-ঢাকা শরীর। তাদের মুখ যদি-বা থাকে, সেই মুখে কথা ছিল না, ছিল অদ্ভুত এক ধরনের হাসি, খানিকটা খলখল, বোতল উপুড় করে তরল কিছু ঢাললে শোনায় যেমন—সেই তারা! লীলা মাসি নাকি কোন্ একটা গানের ইস্কুলে গান শেখাতে যায়। বুলার কাছে শুনেছিলাম। একটু অবাক লেগেছিল বৈকি। লীলা মাসির মুখ দেখে মনে হয় চামড়া তেল-তেলে, অথচ গলা কী-রকম খসখসে। ওই গলায় গান শেখানো যায়?

বুলার বাবা সতীশ রায়। তোমাকে বলতেন 'বউদি', কিন্তু তুমি আমল দিতে না। বলতে মেনিমুখো। বাবা বলতেন, "তুমি শুধু ওর মেয়েলি গলাই শুনেছ, ও বড় একটা অসুখে পড়েছিল যে, লিভারের অসুখ, সেই থেকে গলা ওইরকম হয়ে গেছে।"

"লিভারের অসুখে গলা খারাপ ?"

"হয়, হয়। কিন্তু লোকটার অনেক গুণ জানো, প্রাণ দিয়ে প্রম্‌ট্‌ করে, শুধু ওই গলা আর চেহারার জন্যেই কিছু হল না। নইলে যে-কোনো পার্ট ওর আগাগোড়া মুখস্থ, যে-কোনো নাটকের যে-কোনো পার্ট। শুনতে চাও তো একদিন, যেদিন থিয়েটার নেই, ডেকে শুনিয়ে দেব—আলেকজানডার চাও তো আলেকজানডার, আলমগীর বলো তো আলমগীর, নইলে আবন কি নাদির শাহ্‌ কি সিরাজ—"

"থাক, থাক, ওই গলায় বরং মেয়ের পার্টই মানাবে ভাল।"

"বেশ, তা-ও পারবে। সীতা, জনা, কৈকেয়ী—এমন ফীলিংস দিয়ে পড়বে যে সেকালের তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, চারুশীলারা কোথায় লাগে। লোকটা যে কী মজলিসী জমজমাটি, তুমি না শুনলে বুঝবে না।"

আড়চোখে চেয়ে তুমি বলেছ, "সেই জন্যেই ওখানে রোজ আড্ডা দাও বুঝি ?"

"সেই জন্যেই তো।"

"চুপ করো।" যেন তোপ পড়ল, যেন আমাদের নড়বড়ে দেওয়ালের চুনবালি আরও খসে যাবে। "তুমি যাও ওই পটের বিবির টানে।"

"কার কথা বলছ।" বাবার মুখে কথা ফুটছে না, আমি তখন ঠিক বাবাকেও তো দেখছি না, যেন ছোট্ট একটি পোকা, আরও ছোট্টটি হয়ে নিজের জুতোর তলাতেই সেঁধিয়ে যাবেন।

"কার কথা বলছি তুমি ভাল করেই জানো। রোজ যে চা খাওয়ায়, গল্প করে, বিকালে ফিটফাট হয়ে বের হয়—

"তখন তো আমি থাকি না।"

"সেইটেই আফশোস বুঝি।" ঘাড় হেলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে এত কথা বলতে কবে শিখলে তুমি মা! না কি কলকাতাই এত কম সময়ের মধ্যে শেখাল?

"সতীশের বউ, জানো, একেবারে ফেলনা নয়। ওর অনেক গুণ।"

"জানি না? নইলে তোমাকে গুণ করেছে?"

"বাজে কথা বোলো না। ও গান জানে, নাচও শিখছে, তা-ছাড়া ভালো প্লেও করতে পারে। খুব শীগগিরই চান্‌স্‌ পাবে একটা থিয়েটারে।"

"কোন্‌ থিয়েটারে?"

(আমার সামনেই আজকাল এইসব চলে, আমি যে আছি তোমাদের সে সম্পর্কে একটুও হুঁশ নেই কেন, মা, আমার মা, তোমাকে একটা রোঁয়া-ওঠা বিড়ালের মত লাগছে কেন, আর বাবাকে, লিখতেও বাধছে, সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘেউঘেউটার মতন, যে নিত্য কাঠের সিঁড়িটার নীচে শোয়, আর যত লোক আসে যায় সকলকে শাসায়, বিড়ালগুলোর সঙ্গে মাছের কাঁটা আর সক্‌ড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।)

"বলো, কোন্‌ থিয়েটারে?"

এবার বাবা থতমত খেলেন। —"ওই, যে-কোনও একটায়। তুমি আর ক'টার নাম জানো। মহলা চলছে, তা-ই তো ওকে রোজ বেরোতে হয়।"

"পাতাটি কেটে, চুনকাম করে, ঝলমল ঝলমল শাড়ি, জরি—মহারানীর পার্ট নাকি? তবে যে গান শেখাতে যায় শুনি? সেটা তবে মিথ্যে?"

বাবা আমতা আমতা করে, বললেন, "না, গান না, মানে, বোধহয় না। নাটক। হ্যাঁ, নাটকই তো।"

"কার নাটক—তোমার ?"

(তর্ক করতে হলে যে কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিতে হয়, সেটা, মা, তুমি শিখলে কোথায় ! কলকাতায় ? এই শহর শুধু আমাকে নয়, আমাদের প্রত্যেককে বদলে দিচ্ছিল, বাবাকে, তোমাকে ; অথচ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ সকালে চুল আঁচড়ানোর সময় আমরা টের পেতাম না কে কতটা বদলে গেলাম। সহজ সময়ে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়েও না। চুলের সিঁথিতে ও-সব পরিবর্তনের কথা লেখা থাকে না, কোন-কোনোটা এত ধীর এত সূক্ষ্ম যে ধরা পড়ে অনেক দিন কেটে গেলে তবে। রোজই তো দেয়ালে একটু-একটু দাগ পড়ে, ঘরের মেঝেয়, কোণে কোণে, সারাক্ষণই ধুলো জমে, আমরা কি টের পাই ?)

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে "কার নাটক, তোমার ?" আর বাবা অত্যন্ত কুণ্ঠিত, লজ্জিতের মতো বলেছিলেন "না, মানে এখনই না। এটার পরে, পরে হয়ত ওরা আমারটাও ধরবে।"

"বাঃ চমৎকার ! উনি নায়িকা আর তুমি নাট্যকার ! এই তো নাটক। আমাকে একটা পার্ট দেবে না ? বলো, আমার কী পার্ট, বলো, বলো !" হঠাৎ হিংস্র হয়ে বাবার কাঁধটা খামচে ধরেছিলে। ফতুয়া ছিঁড়ে একটা নখের দাগ ওঁর গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি বলছিলে, "কী পার্ট আমার, দেবে না একটা ? কোন্‌টা, বলো না, কোন্‌টা—বাঁদির ?"

বলতে নেই, লিখতেও নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে, তোমার উপরে ঠিক ওই সময়টাতে ঘৃণা হচ্ছিল বলে নিজের উপরই ঘৃণা—তখন তোমাকে সত্যি সত্যি কিন্তু তেমনি দেখাচ্ছিল, যে-শব্দটা তুমি উচ্চারণ করেছিলে।

বাবা আর কিছু বলছিলেন না। অসহায় অপ্রতিভ, পরাভূতের মত সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে গেলেন।

আর তুমি? সেমিজের কাঁধ ঢিলে, পিঠেও আঁচল নেই, কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় বসে পড়ে ভেঙে ভেঙে কাঁদতে থাকলে। আমি পিঠের কাছে দাঁড়ালাম। তুমি একবার মুখ তুলে দেখলে। হাত দিয়ে ঠেলে ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, "সরে যা, চলে যা এখান থেকে।" তারপর ওই দুটি হাতেই আবার ডুবিয়ে দিলে মুখ। সেদিন অভিমান হয়েছিল। আজ নেই। জানি কিনা, এমন অনেক মুহূর্ত আছে, তারা সারা দিনমানে কতবার যে ফিরে ফিরে আসে, যখন নিজেরই দুটি করতল ছাড়া মানুষ নিজেকে লুকোনোর কোনও আশ্রয়, কোনও বিশ্বস্ত সুহৃদ খুঁজে পায় না।

তবু আমি যাইনি। তোমারই কোলের কাছে ঝুপ করে বসে পড়লাম, সেই বসে পড়তাম যেমন আগে, কতকাল পরে আমার সেই শিউলি-শিশুকাল ফিরে এল। কলকাতায় শিউলি গাছ নেই?

অনেক পরে তোমার কাঁপুনি থামল, বুঝলাম তুমি আর কাঁদছ না, তখন তোমার পিঠে একটা হাত রাখলাম। তুমি মুখ তুললে। এই কয় মিনিটে কী ভয়ানক বিস্ফারিত হয়ে গেছে তোমার মুখ, চৌবাচ্চার জলে কোনও জিনিষ ডুবিয়ে ধরে থাকলে যেমন ছড়িয়ে-পড়া দেখায়।

আমার থুতনিটা তুলে ধরলে তুমি। খুব স্থির গলায় বললে, "এখানে থাকব না, এই নরকে। চল আমরা চলে যাই। ফিরে যাই সেখানে। তুই আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?"

কিছু বলছিলাম না। আমার ভিতরে যে ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছে, সে বলে দিচ্ছিল, চুপ করে থাকো, এখন শুধু শোনো, এ-সব সময়ে কথা বলতে নেই।

মাথা সোজা তুলে ম্রিয়মান দুটি চোখ অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছ, এই নোনা-ধরা দেওয়াল ভেদ করে চটের পর্দা উড়িয়ে দিয়ে চৌকো-

করে কাটা আকাশ আর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে চিলেকোঠা পেরিয়ে। অথবা সেখানেই পৌঁছে গেছ, অনেক দূর থেকে বলছ, অতি-মৃদু এক-একটি শব্দতরঙ্গ তোমার স্বর বয়ে নিয়ে আসছে, "ভুল বুঝেছিলাম। ও বদলায়নি। কলকাতায় এসে ওকে যখন একটু আলাদা দেখেছিলাম, জানিস, মনে হয়েছিল, ওই চিঠির কথাটাই বোধহয় ঠিক, সেই যে সমুদ্র-টমুদ্র কী সব লিখেছিল না? —ভালো করে বুঝিওনি। মনে হয়েছিল সত্যিই বুঝি ওর মন ফিরেছে সংসারের দিকে। তোর দিকে, আমার দিকে। এখন দেখছি", একটু থেমে বলতে থাকলে, "এখন দেখছি, কী দেখছি? কিচ্ছু না। সব মিথ্যে। বদলায়নি। কিংবা যদি-বা বদলেও থাকে, তোর জন্যে আমার জন্যে তো নয়। ওকে বদলে নিয়েছে অন্য জন। এর চেয়ে ও যখন জেলে জেলে থাকত নয়ত বিবাগী হয়ে ঘুরত, সে-ও যে ভালো ছিল। শেষে কিনা শামুকে পা কাটলে?"

বেশ তো আস্তে আস্তে বলছিলে মা, হঠাৎ আবার অস্থির হয়ে উঠলে কেন তুমি? কেন আমার হাতের কব্জিটা চেপে ধরে বললে, এইমাত্র মহীয়সী ছিলে, এক্ষুনি যেন ভিখারিনী, "চল আমরা চলে যাই।"

"কোথায়।"

"যেখান থেকে এসেছি, সেখানে। ফেরা যায় না? তুই তো এখন রাস্তা চিনিস, আমাকে নিয়ে যেতে পারবি না?"

মুহূর্তও না ভেবে বললাম, "পারব, মা।"

তুমি জানো না, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। কোথাও ফেরা যায় কিনা, ফেরা সম্ভব কিনা, এ-সব তত্ত্ব তখনও আমার বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করেনি ঠিক, কিন্তু তোমাকে বলতে পারতাম না, সেখানে ফেরার আগ্রহ-উৎসাহ আমারও আর ছিল না। আমারও মন বদলে গিয়েছিল। গাঢ় চিনির রসে মাছি যেমন, আমিও তেমনই লেপটে যাচ্ছিলাম।

তেরো

বুলা বলল, "আসবি ?"

কাঠের সিঁড়িটার মুখেই ওদের ঘর। উঠোনটা বেলা যেতে না যেতেই চক্রান্ত করে অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসে, বুলা উপরের চৌকাঠে হাত দুটি তুলে ঠিক ওদের ঘরের সমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, পকেটে এক রাশ চিনেবাদাম, তখন পকেটে চিনেবাদাম থাকলেই নিজেকে মনে হত স্বচ্ছল, বুলা কবাট ছেড়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, "আসবি ?"

দোনোমনায় আটকে গিয়েছিলাম। পকেটে বাদাম, মা, তোমাকে দেব। তা-ছাড়া সামনে পরীক্ষা, পড়তে বসব। বুলা বলল, "আয় না। মা গেছে বাইরে, বাবা থিয়েটারে। একা-একা কেমন ভয়-ভয় করে।"

আর কিছু বলার দরকার ছিল না। গেলাম।

ওদের ঘরখানা বড়, মাঝখানে পরদা, আলাদা-করা দুই ভাগ। বুলা আমাকে নিয়ে গেল ওই দিকে, আলো জ্বালল, ওদের লণ্ঠনটা ঝকঝকে, মাজা দাঁতের মতো, কালো ধাতু দিয়ে তৈরী, চিমনিটাও চমৎকার, পেটের কাছটায় বাতাবি নেবুর মতো গোল, উপরের দিকটা ফিকে রঙ-করা। আলো জ্বালল বুলা। কিন্তু ফিতেটাকে বাড়াল না, ওর খাটটায় বসে পা দোলাতে থাকল। একবার বলল, "কী দেখছিস ?" তারপরেই হাত বাড়িয়ে হঠাৎ—"কী খাচ্ছিস ?"

যে কটা চিনেবাদামের খোসা ছাড়ানো ছিল, ওর হাতে দিলাম। এনেছিলাম তোমার জন্যে।

বুলা দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে বাদামে কামড় বসাচ্ছিল, একবার বালি কিংবা ওই রকম কিছু মুখে লাগতে টুকটুকে জিভ বের করে

বলল, "থুঃ! দেখে শুনে কিনতে পারিস না! নাকি কিনিসনি, তোকে ওমনি দিয়েছে?"

আত্মসম্মানে ঘা লাগল, বললাম, "আমাকে কেউ ওমনি কিছু দেয় না। দস্তুর মতো পয়সা দিয়ে—"

বুলা আবার বলল, "থুঃ! আমাকে এমনিই দেয়। রিবন, চকোলেট, এমন কী ছোট্ট সেন্টের শিশি, মা-টা আবার ভাগ বসায়। তাই সেদিন যেটা পেলাম সেটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে আনলাম। গন্ধ পাচ্ছিস?"

না পেলেও আমার মাথায় ঝিম ধরছিল।

বুলা কী রকম চোখে হাসছিল, কী-রকম কী-রকম, চোখ যেন, ঠিক মনে পড়েছে, নীল রঙের মারবেলের মত চকচক করে, আঙুলের ডগায় কায়দা করে টিপ করে মারলে ঠিকরে গিয়ে লাগে। আমার লাগছিল।

বুলা বলছিল, "নিশ্বাস ছাড় না! এই যে এমনি করে—বুক ভরে বাতাস নিবি, তারপরেই হা—আ-আ—বুঝেছিস, নিশ্বাস ছাড়, তোর মুখে কেমন গন্ধ দেখি।"

ও যা যা বলছিল তা-ই তা-ই করছিলাম।

বুলা বলল, "থুঃ। বিশ্রী গন্ধ। তোদের মানে ছেলেদের মুখে। আমার মুখে নেই। বুকে না হয় সেন্ট মেখেছি, কিন্তু মুখে আমি সর্বদা এলাচ পুরে রাখি। একটা খাবি?"

এলাচ নয়, আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, জল খাই।

বুলা, ওর কড়ে আঙুলের বাড়তে-দেওয়া নখটা পোষা হলেও ধারালো গাল খুঁটছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরও তো ব্রণ উঠেছে রে। তা-হলে যত ন্যাকা সেজে থাকিস, তুই তা নোস? তুইও পাকা।"

বললাম, "বুলা আমি এবার যাই।"

"বোস্ না আর-একটু। বললাম না আমার একা ভয়-ভয় করে?

"আমারও ভয় করছে। মা বকবে।"

"বকবে না। মাসিমাকে বলবি, তুই বাড়িতে ফিরিসইনি। যদি টের পেয়ে থাকে, তবে বলবি আমাকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিলি।"

"আমার নিজের পড়াও আছে যে পরীক্ষার পড়া।

বুলা হাসছে, এতক্ষণ পা দোলাচ্ছিল, এবার বিনুনিসুদ্ধ মাথাটাও আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক দোলাতে শুরু করল, অল্প হাওয়ায় ফুলের ডাল যেমন দোলে, কিংবা বাঁশির সঙ্গে সাপের ফণা। কিন্তু যে-ই আমি উঠে পড়লাম অমনই সে-ও উঠে পড়ল টকাস, আমার হাত চেপে ধরল জোরে, টানছিলও কিনা বুঝতে পারছিলাম না। "বললাম না, বললাম না তোকে, একা-একা ঘরে খালি খালি লাগে, বসবি না, একটু বসবি না?" জল-ফোলা কেতলির ঢাকনার মতো ও কাঁপছিল, ওথলানো কড়ার গা বেয়ে ফেনা যেমন গড়ায়, ওর দু' গাল বেয়ে তেমনই কষ-কষ কী চুইয়ে পড়ছিল, গরম শ্বাস, আমার গালে ওর নাক ঠেকালো কি, কে জানে কেমন গন্ধ তার, বুকে-ছিটানো সেন্টের সঙ্গে মিশে আছে, মা তুমি কোথায়, কেন টের পাচ্ছ না, কেন কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে নেমে এসে আমাকে বাঁচাচ্ছ না।

অথচ, নির্জলা এই সত্যটাও শুনে রাখো, তুমি নেমে এলেও আমি কিন্তু তখন খুশী হতাম না।

"যদি বুলা", আমি কেবল ধরা-ধরা গলায় বলতে পারলাম, "যদি কেউ এসে পড়ে—সতীশ মেসোমশাই কিংবা মাসিমা—"

আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়াল বুলা, মাথাটা পিছনে হেলিয়ে শরীরটাকে করল ধনুকের মত, আর তাতে ওর দেহের রেখাটেখা খেলে গেল ছোট দীঘিতে ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো, বুলা হিল্লোলিত হাসছিল।

—"মেসোমশাই? মাসিমা? তার মানে বাবা আর মা?" হাতের বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বলছিল, "উহুঁ এক্ষুনি কেউ আসছে না। বলেছি না মা গেছে—কোথায় বল তো, আরে না, গান-

টানের স্কুলে না, হেঁড়ে গলায় ও আবার গান কী গাইবে, হি-হি, মা গেছে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে, অনিরুদ্ধ রায়দের সঙ্গে, ওরাও কী-একটা বই স্টেজে নামাবে, মাকে বলেছে, মাকে করবে হিরোইন, হি হি, ওই চিম্‌সে চেহারায় হিরোইন ? তবেই হয়েছে। সাত মণ তেল পুড়ছে না, রাধাও নাচছে না। নাচব বরং আমি, দেখবি আর-একটু বড় হলে স্টেজে নামছি আমি। অনিরুদ্ধ রায় আড়ালে আমাকে কথা দিয়েছেন। মাকে বলিনি, বেচারা মিছে কেন কষ্ট পাবে, রায় বলেছে, মাকে শুধু খেলাচ্ছে, ওদের আসল নজর আমার দিকে। আমি নাচ শিখছি, তিরছি নজর একটা গান আছে না ? সেই গানটার সঙ্গে।”

বলতে বলতে বুলার চাউনি এখনই তেরছা হয়ে গেল কি, সরু কোমরটা দু' হাতে ধরেছিল বলে দেখাল আরও সরু ? সে কি তালে তালে পা ফেলতেও শুরু করেছিল ? কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঘুরছিল।

বুলা বলছিল, “আর বাবা। বলেছি তো, সে এখন উইংস-এর পেছনে বই ধরে আর সবাইকে পার্ট বলাচ্ছে। সে আসছে না। এলেও”—বুলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, কী রকম ঘোরানো সেটা কথা দিয়ে ফোটানো যাবে না, মেয়েদের নাচ কি শুধু পায়ে ?—চোখের তারাতেও নাচ আছে সেই প্রথম দেখলাম। চোখ ঘুরিয়ে বুলা বলছিল, “এলেও বাবা কিছু বলবে না। সাহসই হবে না। দেখেছিস না, ওর চালচলন কেমন ভিতু-ভিতু, মিহি গলা, সর্বদা পিটপিট করে চোখের পাতা ? কিছু বলবে না, বরং যেন একটা সিগারেট নিতে এসেছিল এইভাবে ঘরে ঢুকে বিছানার তলা থেকে প্যাকেটটা হাতিয়ে সুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে, মা যখন বন্ধুদের সঙ্গে বসে বসে হাসি-গল্প-মসকরা করে, তখন যেমন বেরিয়ে যায় ; রকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকে কিন্তু কাশিটাও ভয়ে ভয়ে রাখে চেপে। দেখিসনি ?”

বুলা একটু থামল, দম নিতে না বুকটাকে সেই ছুতোয় আর-একটু

ফুলিয়ে দেখাতে, বলা শক্ত! শুরু করল ফের—"না চেপে করবেই বা কী। টো-ফোঁ করলে মা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ধরে দেবে না বের করে? ও সেটা জানে।"

"কেন, উনিও তো থিয়েটারে—"

বুলা এবার বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মুখেও বলল "কাঁচকলা। মাইনে পায় না। সব আপখোরাকী। বাবুদের মন জুগিয়ে, মন আরও কী-না-কী জুগিয়ে দু'চার পয়সা হাতায় অবিশ্যি, যাকে বলে বখশিস। যেমন মেসোমশাই, মানে তোর বাবা সকালে যখন মার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চালান, তখনও ও বেরিয়ে যায়। বাজারের ছুতোয়। আমাদেরটা করে আনে, তোদেরটাও। ভাবছিস মিনি-মাগনা? তা নয়, ও নিশ্চয় দু'চার পয়সা রোজ সরায়, ওর কমিশন। মার সঙ্গে তোর বাবার আড্ডা মারার দালালি নেয়। ওকি সোজা ঘুঘু! জানিস, একবার একটা সাইকেল রিক্‌শায় চড়িয়েছিল আমাকে, রিক্‌শা-ওলার পিঠে আমার হাঁটু ঠেকছিল বলে, লোকটাকে দরদস্তুর করে যা ঠিক হয়েছিল, তার চেয়ে দু-আনা কম দেবে বলে সে কী ঝুলোঝুলি! আমি লজ্জায় মরি। ওকে সোজা ঘুঘু ভাবিস না। ঘুঘু আর চোর।"

"ছি বুলা, তোমার না বাবা।"

দু' হাত ডালা ধরার মত চিত করে বুলা বলল, "বাবা না হাতি। বাবা বলি তাই। আমার আসল বাবা এখন কে জানে কোথায়, হয়ত স্বর্গে। আমি পরে জানতে পেরেছি। আমি যখন খুব ছোট্টটি, তখন মাকে নিয়ে ও পালিয়ে আসে। তাই তো বলছি, ও চোর।"

একটু থেমে বুলা বলল. "ভেবে ছ্যাখ একবার, ওই চেহারায়। মা কি তখন কানা হয়ে গিয়েছিল? তাই হবে হয়ত। কিংবা তখন হয়ত ওর এর চেয়ে একটু চেকনাই ছিল, জোয়ান বয়স তো! তারপর মদ খেয়ে লিভার পচাল, চেহারা হল হাড়গিলের মত, এখন সকলের

হাতভোলা কুড়িয়ে বেঁচে আছে, বে-চা-রা।" শেষ কথাটা বুলা টেনে টেনে বলল।

কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে সেদিন উপরে উঠতে কী-জানি ভয় করছিল। মচ-মচ, মচ-মচ, মনে হচ্ছিল, ধূর্ত বাচাল সিঁড়িটা তোমার চর, তোমাকে সব বলে দিচ্ছে। পায়ের জুতো খুলে নিলাম, সামনে জলকাদা পড়লে যেমন খুলি। কাদা, কাদাই তো, ঘিনঘিন করছিল, কাদা যেন সারা পায়ে লেগে আছে। কিন্তু গায়ে? জামার আস্তিনটা শুঁকলাম। সেন্ট-টেন্ট, গন্ধ-টন্ধ কিছু—যদি লেগে থাকে?

চোরের মতো উঠছিলাম। জানি না কেন, এক-একদিন এমন এক-একটা অন্ধকার ছেয়ে আসে যে, মনে হয়, চোর, চোর, সবাই চোর। বুলা কিন্তু মিছে কথা বলেনি। চোর সতীশ রায়, ও যাকে বাবা বলে। ওর মাকে চুরি করে এনেছে। এখনও নিজের বাড়িতে চোর বনে বসে আছে। আমার বাবাও চোর—রোজ সকালে ওদের বাড়ি ঘাপটি মেরে বসে থাকে। চোর আমিও, এই তো অহেতুক কেবলই ছ' আঙুলে গাল ঘষছি, মুছে ফেলতে চাইছি সেই কখন-লাগা একটি গরম নিশ্বাসের স্পর্শ, এখন চুপি চুপি পা টিপে টিপে উঠছি—নিজের বাড়িতে এইভাবে কেউ ঢোকে?

গোটা পৃথিবী এইভাবে এক-একদিন লুকোচুরি খেলার আসর হয়ে যায়, কিন্তু মা, চোর তুমিও কি? না-হলে সেদিন কেন ঘরে আলো জ্বলছিল না, উনুনও ধরানো হয়নি, সব নিঝুম, যেন গল্পে-পড়া খা-খাঁ, ছমছমে এক রাজপুরী। আশ্চর্য, সেদিন সিঁড়ির নীচে কুকুরটাও ডাকল না, বিড়ালগুলোও অদৃশ্য, বোধ হয় ওৎ পেতে ছিল অন্ধকারে, ইঁদুর ধরবে বলে, সেই সাদা-ছটফট-পাখা আরশোলারাই বা গেল কোথায়। কানের কাছে হুঁ একটা মশা গুনগুন করলেও

বাঁচা যেত, বুঝতে পারতাম সব কিছুই উধাও হয়ে যায়নি, চরাচরে অন্তত কেউ-না-কেউ সজীব আছে। চৌকো আকাশটার চাঁদোয়ায় সেদিন একটি তারাও ছিল না, কালপুরুষ আর লুব্ধক, তুমি যাদের চিনিয়ে দিতে। তারা সব গা-ঢাকা দিয়ে রইল কোথায়!

বারান্দায় দাঁড়ালাম। কোথায়, কোথায়—প্রাণপণ চিৎকার করে বললাম, কিন্তু মনে মনে। চোরের গলা তো ফোটে না। কোথায়, কে কোথায় আছ, সাড়া দাও, যে-কোনো কোণের যে-কোনো একটি প্রাণ 'এই যে আমি' বলে সাড়া দাও। পাহারাওয়ালা সদর রাস্তায় যদি থাকো, তবে "খবরদার!" বলে হেঁকে ওঠো একবার। এই তো আমি, চোর, এই ক্ষণে ধরা দেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু মা, তোমাকে তো জানি চিরকাল স্বপ্রকাশ, তুমিও গুপ্তচরের মতো আচরণ করলে কেন। কেন কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলে, কেন আমি চৌকাট পার হতে না হতেই ঠাস করে গালে ভীষণ একটা চড়। তোমার গায়ে এত জোর। এই নাকি তোমার ভালবাসা, অথবা তোমার ভালোবাসা কি এতই বেশি?

দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে দিচ্ছিলে, ভাগ্যিস দেওয়ালটা নরম, যদি দাঁত ভেঙে যেত আমার, যদি কপাল ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ত? ঘর অন্ধকার, দেখতে পেতে না অবশ্য।

মা, মিছেই সেদিন তুমি আমাকে মার্‌লে। তুমি জানো না, আমিও সেদিন মেরে এসেছিলাম। হ্যাঁ, বুলাকে। আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। তোমার চড়টার মতো ওজনেরই একটা থাপ্‌পড়। ওর তুলতুলে গালে আঙুলের মাপে মাপে রক্ত জমাট, ওর মুখের বাকীটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ, বুলা হঠাৎ সীমা ছাড়িয়ে গেল যে। বেশ তো হাত

নেড়ে নেড়ে কথার খই ফোটাচ্ছিল, মাঝে মাঝে খাটে বসে দোলাচ্ছিল পা, নখ দিয়ে খুঁটছিল মুখ

(ব্রণ কিংবা ঘামাচি খুঁটতে খুব সুখ, আমি তো পারলেই গেলে দিই, ভেতরে শাঁস মতো থাকে না? বার করে দিই। আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এই ছাখ না, দিতে না দিতে এক্ষুনি কাঁটা দিয়েছে। ছাখ্!),

বলতে বলতে বুলা ওর ধূলোভর্তি পা তুলে দিল আমার কোলে, দেখলাম সত্যিই ওর পায়ের রোমকূপগুলি কূপ-চিহ্নের মতোই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, ওর কনুই থেকে কবজিও তাই, আমার একটা হাত টেনে ওর নিজের উন্মুক্ত হাতটার উপর দিয়ে ছড়ের মতো বুলিয়ে নিয়ে গেল।

একটা শিরশির ভাব শুধু, না, তার চেয়ে খানিকটা বেশি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, স্পর্শমাত্র তাকে তুলে রাখা একরাশ বাসন যেন ঝনঝন করে পড়ে গেল—মনে হল। শরীরও কখনও কখনও কাঁসার বাসন হয়ে যায়।

তখন অদ্ভুত গলায় আধবোজা চোখে বুলা অদ্ভুত একটা কথা বলল, ওর ঠোঁট টুকটুকে নয়, বরং হাওয়ায় শিটিয়ে যাওয়া কমলালেবুর কোয়ার মতো শুকনো, সেই ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বুলা অদ্ভুত গলায় বলল, "জানিস, তোর সঙ্গে আমার ভাব হবে। হবেই। তার একটা প্রমাণ আছে!"

"কী প্রমাণ?" শুকনো গলায় বললাম।

"প্রমাণ এই যে", বুলা আঙুলের কর গুনে গুনে যেন হিসাব মিলিয়ে বলতে থাকল, "ধর তুই আর আমি। কেমন তো? আমার বাবা, মানে যাকে বাবা বলি, ভিজে বেড়ালটি, চুপচাপ বসে থাকে, যেটুকু কাঁটা পায় তাই চোষে, অথচ আমার মা? এই বয়সেও—কী বলে যেন নবেল-টবেলে?—রঙ্গিনী। বাবা ওকে বাঁধতে পারেনি। আবার মাসিমা, মানে তোর মা, ছাখ, কী শান্ত,

যাকে বলে লক্ষ্মী, মাথা নীচু, লাজুক, মুখচোরা, কিন্তু তোর বাবা উড়ুউড়ু উড়ুনচণ্ডী, মাসিমা তোর বাবাকে বাঁধতে পারেনি। আমাদের অমিলটাই আমাদের মিল, এইবার বুঝলি? কী মজা, ভগবান আমাদের মিলিয়েছেন। ওই হিসেবে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হলে যেমন বলে, আমরা দু'জনে একেবারে পালটি ঘর, হি-হি, তুই আর আমি। তোতে আমাতে ঠিক মিশবে, ভাব হবে, ভগবান ঠিক করে দিয়েছেন, আমাদের দু'জনের একই দুঃখ যে। আমার এই বাবা একদিন ঠকিয়েছিল একজনকে, তারপর ছাখ্ কী শাস্তি, এখন ঠকছে নিজে। সে-ই মা-ই ওকে ঠকাচ্ছে, সুতরাং ও দুঃখী। আবার ওদিকে দুঃখিনী তোর মা, বুঝেছিস তো, নাকি আরও খুলে বলতে হবে?"

"আর বলতে হবে না", জড়ানো গলায় বললাম।

এই পর্যন্ত বেশ ছিল, যদিও আমার হাত পা হিম এবং চোখ জ্বলছিল, গলা ভেজাতে হচ্ছিল থুথু গিলে গিলে, নইলে স্বর বেরোবে না, তবু বুলার ওই ব্যাখ্যা, বুলার ওই ছোঁয়া নতুন একটা দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। বেশ মজা তো, ওদের দেওয়ালে দুটো টিকটিকি খুব কাছাকাছি এসে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল, আমরা দু'জনেও টিকটিকি নাকি, বুলার ছোঁয়া পেতে পেতে আমি, কটকটিয়ে ওঠা গোটা শরীর, ভাবছিলাম, বেশ মজা তো, বুলার মা/আমার বাবা; বুলার এই বাবা/আমার মা—স্বভাবে আচারে একরকম, তাই আমরা দু'জন, হি-হি।

একটা টিকটিকি দেওয়াল থেকে খসে মেঝেয় চিত হয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকল।

বুলা তখনই উঠে বসল সোজা সটান হয়ে। একটা বালিশ টেনে নিয়ে ওর বুক আড়াল করল। ওর পায়ের কাঁটা, হাতের কাঁটা মরে এসেছে, কিন্তু আমারগুলো যাচ্ছে না কেন?

ও বালিশের সেলাইগুলো নখে টেনে টেনে ঢিলে করছিল, আস্তে

আস্তে আঙুল ডুবিয়ে দিচ্ছিল আমার চুলে মাঝে মাঝে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

('তোর চুলের গোড়া বেশ শক্ত আর রঙ কালো, আমার মতো নয়, আমার চুল বাদামী, তাছাড়া চিরুণী টানলেই উঠে যায়।' 'কেন বুলা, তোমার চুলও তো সুন্দর, হলই বা বাদামী, কিন্তু ফাঁপানো, ঢেউ খেলানো, আজ কি সাবান দিয়েছ, নাকি রোজই চুলে সাবান মাখো?')

এই পর্যন্তও বেশ ছিল। কিন্তু বুলা হালকা একটা হাই তুলল, ওর সাজানো সমান দাঁতের পাটি দেখা গেল, তার ফাঁকে টকটকে তুলতুলে একটি ছুঁচলো জিভ, দুটো ঠোঁট আলাদা হয়ে যাওয়া দু'টি ঝিনুক, চোখ ছিল আধবোজা, একেবারেই বুজে ফেলবে বুঝি, তখন আমি কী করব, আমি যে একা হয়ে পড়ব, এই ঘর, ওর বুকে চেপে ধরা বালিশ, মেঝেয় চিৎ টিকটিকিটা, কী সর্বনাশ, না-না, ওই যে বুলা চোখ খুলেছে, ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ছে।

বেশ ছিল। বুলা তখন ঢিলে ঢালা হয়ে বসল, ঢিলেই তো, ওর জামাটার ছাঁট ঢিলেই তো, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, আমার প্যান্ট, তখনও হাফ প্যান্ট, তখন তাই রেওয়াজ, কেন এত আঁটসাঁট? কষ্ট হচ্ছে।

ঢিলেঢালা হয়ে বসল বুলা, শুনতে পাচ্ছিলাম টিকটিক, টিকটিক, না টিকটিকি নয়, ওদের ঘড়িটা; একটা কাঁটা টিকটিক করে আর একটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। বুলা একটা হাত আমার কাঁধে রাখল। না, আর কিছু না। ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে, আমার কানের লতিতে এত সুড়সুড়ি?

আর কিছু নয়। বুলা এবার আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছে। কোথায় ছিলাম আগে, কলকাতায় এই কি প্রথম?

('ওমা, তুই তবে গাঁইয়া! মিটমিটে বদমাস, একটুও

বুঝতে দিস নি তো? ফিচেল শয়তান, এমন কায়দায় কথা বলিস যেন এই শহরেই বরাবর আছিস।' বুলা আমাকে চিমটি কেটে বলল।. চিমটি কাটছ কেন বুলা? আমার লাগছে।)

সেখানে ছিলাম কে-কে।

বললাম, "মা আর আমি।"

"শুধু মাসিমা আর তুই? আর কেউ ছিল না?"

"ছিল। দাদা। নেই।" উপর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

বুলা বুঝল। ঠোঁট, ওর সেই ঠোঁট, বেঁকিয়ে একটা শব্দ করল, যার মানে আহা কিংবা উহু। বলল, "মেসোমশাই?"

"কোথায় থাকতেন ঠিক ছিল না তো। মাঝে মাঝে যেতেন।"

"তার মানে", বুলা যখন বলল, "তার মানে ফুলে ফুলে মধু খেতেন", তখন মা, আমি রেগে গেলাম। ও কি জানে না, আমার বাবা স্বদেশী, কতবার জেল খেটেছেন, তা-ছাড়া ভারত ভ্রমণ; তা-ছাড়া মিসেলেনিয়াস ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী ইত্যাদি?

বুলা ঢিলেঢালা পা ছড়িয়ে বসে হাসছিল।—"বেশ। বুঝলাম। তার মানে তোরা একাই ছিলি, তুই আর মাসিমা এই দু'জন?"

"বললাম তো।"

"আর কেউ আসত না?"

"আসত আর-একজন।" ভেবে নিয়ে বললাম "আসত সুধীর-মামা।"

"কেমন মামা?"

"জানি না। মামা—মামা, এই পর্যন্ত।" আমি চটে উঠছিলাম। আমার রাগ বাড়ছিল।

"রোজ আসত?"

"রোজই—প্রায়ই।" পরে হিসেব করে বললাম, "পরে অবশ্য আসা ছেড়ে দিয়েছিল।"

"ছেড়ে দিয়েছিল কেন!"—বুলা তখনও নখ দিয়ে বালিশের স্থতো খুঁটছে, ভিতরের তুলোটুলো সব বের করে নিতে চাইছে।

"ছেড়ে দিয়েছিল, এই এমনি।"

কিন্তু বুলা ছাড়ল না, ওকে সব বলতে হল। বললাম। যতটা জানি, যতটা বুঝেছিলাম। সব শুনে বুলা, সেই বুলা, বালিশটা বুকে চেপে, বেরিয়ে পড়া আঁশ-আঁশ তুলোয় মুখ ডুবিয়ে কেবলই হাসতে থাকল।

বলল, "বুঝেছি।"

আমি যদি আগে বুঝতাম, মা, বলতাম না। নেশায় সব হয়, আর সেই আমার জীবনের প্রথম নেশা। আসলে মিথ্যেই শহুরে-পনার নকল করেছি, ও শুধু নকলই, আসলে আমি তখনও হয়ত সেই সরল গ্রাম্য স্থবোধ বালকটিই রয়ে গিয়েছিলাম। নইলে বলতাম না।

বুলা শুনে বলল, "বুঝেছি।" ওর ব্রণ ভর্তি মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ বিকটভাবে বেড়ে গিয়ে যেন আরও বীভৎস দেখাল। বলল, "তবে তো, তবে তো—শুনবি? তবে তোর মা-ও যা ভেবেছি তা নয়; ডুবে ডুবে জল খেত!"

"তার মানে?" যতটা চীৎকার করা যায়, ততটাই গলা চড়িয়ে বললাম।

"তার মানে এই", বুলা আমার গালে টোকা মেরে বলল, "তার মানে যা তা-ই। আমার মা যা, তোর মা-ও তাই। এক কথায় অ—সো—তী।" বুলা কেমন ককিয়ে ককিয়ে বলল। বলল, "আর সেই জন্যেই মেসোমশাই, তোর বাবা, ওখানে বেশি যেতেন না।"

মা, তখনই আমি হাত তুলে বুলাকে মারলাম। একটা প্রচণ্ড—ঠাস! যত রাগ, যত দুর্বলতা ছিল, আর যত কান্না, সব দিয়ে।

তোমার জন্যে, তোমারই মান রাখতে বুলাকে যখন মেরে এসেছি মা, যখন আমার আঙুলগুলো নিঃশেষে অবশ হয়ে আছে, তখনই তুমি আমাকে মারলে।

চমৎকার দাম কিন্তু, চমৎকার দাম দিলে।

চোদ্দ

আমাকে সেদিন দাম চুকিয়ে দিলে ওইভাবে, অথচ বাবার ব্যবহারটা দ্যাখো, হাত তুললেন কি? সেই যে, মা, তুমি চূড়ান্ত অপমান করলে একদিন, একেবারে মর্মের মূলে গিয়ে আঘাত, তবু উনি সব সহ্য করলেন, ঠায় দাঁড়িয়ে, বৃক্ষ যেমন বজ্রপাত প্রাপ্য বলে মাথা পেতে নেয়।

সন্ধ্যা থেকেই সেদিন বৃষ্টি, আমি ন'টা বাজতে না বাজতেই বই বন্ধ করে খেয়ে নিয়েছি, শুয়ে পড়েছি মাথা অবধি কাঁথা টেনে।

টের পাচ্ছি, তুমি একবার দক্ষিণের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালে। ছাঁট আসছিল, তবু ভেজালে কনুই অবধি। সেদিন তুমি চমৎকার একটা খোঁপা তৈরি করেছিলে। একবার বুঝি ভাবলে জানালাটা টেনে দেবে কিনা, পাল্লা ধরে একবার টেনেও ছিলে, কিন্তু কী ভেবে থেমে গেলে। শুধু তো ছাঁট নয়, ভিজে হাওয়াও তার সঙ্গী ছিল, আমার চোখ আরামে জড়িয়ে আসছিল। তুমি ঘরের ওপাশে গিয়ে খানিক দাঁড়ালে উত্তর দিকের সেই বরাবর বন্ধ জানালায়। বন্ধ খড়খড়ি, কিন্তু ছোট্ট একটা ফুটো আছে। কান পাতলে। খুব করুণ একটা সুর ভেসে আসছিল, কেউ বোধহয় সরু তারের কোনও যন্ত্র বাজাচ্ছে। ওদিকে বরগা চুঁইয়ে ছাত থেকে জল পড়ছিল, কয়েক ফোঁটা পড়ল আমার কপালে। তুমি আমাকে তুলবে বলে ঠেলছিলে। উঠলাম না দেখে তখন আমাকে সুদ্ধু বিছানাটা টেনে নিয়ে গেলে একটু ওদিকে, যেদিকটা খটখটে।

এ-সব বুলাদের ঘরের সন্ধ্যাটার বেশ কয়দিন পরে।

সিঁড়িতে শব্দ হল। জুতোর চলন মুখস্থ। বাবা আসছেন। আমি চোখ বুজে। বাবা আসছেন।

রাত ক'টা তখন? দশটা তো নিশ্চয়ই। বৃষ্টির শপশপে রাতে মনে হচ্ছিল অনেক বেশি।

বাবা এলেন। তুমি একটা গামছা ছুঁড়ে দিলে। সব টের পাচ্ছি। বাবা বললেন, "ধন্যবাদ।" ধন্যবাদ কেন? ও আবার কী রকম ভাষা। যেন বানানো-বানানো। কেউ কাউকে বলে না। অন্তত আপনজনকে না। কিন্তু বাবা বললেন। বাবার গলাটাও একটু অন্য রকম শোনালো।

মাথা মোছা সারা হলে বাবা বললেন, "চিরুনি।" তুমি বললে, "এখন? এই রাতে তোমার মুখ আবার কে দেখছে?"

বাবা বললেন, "কেন, তুমি?" তুমি সতর্ক, তাড়াতাড়ি আমার বিছানার দিকে তাকালে। আমার মুখে কাঁথা মুড়ি।

জুতোটা খুলেছেন বাবা, কিন্তু জামা ছাড়েননি। ইতিমধ্যে পকেটে পুরে দিয়েছেন একটা হাত, একটু এগিয়ে আর-একটা হাত তোমার গালে। "—ঠাণ্ডা যে?"

"আজ যে বৃষ্টি।" তুমি বলছ চুপে চুপে, আমার বিছানার দিকে আবার তোমার সন্তর্পণ দৃষ্টি।

"তাই ঠাণ্ডা?"

"হয়ত তা-ই। কিংবা ঠাণ্ডা হয়ত আমি-ই, বরাবর তাই তো জানি।"

"না, তুমি গরম। আজ গরম খিচুড়ি আছে তো। কিংবা গরম-গরম লুচি?"

"বলো তো ভাজতে পারি।"

"তার আগে," বাবা বললেন, "তার আগে এসো। এই যে এইখানটায়। চুপ করে দাঁড়াও—লক্ষ্মী মেয়ে।"

"আমি তো লক্ষ্মীই।"

"কে বলে?"

"সকলে। খালি কপালটাই যা—"

"কথা থাক। দাঁড়াও।" ইতিমধ্যে পকেটে পোরা হাতটা উঠে এসেছিল, হাতটা কাঁপছিল, নাকি কেঁপে গেল খোঁপাসুদ্ধ তোমার মাথাটা? ততক্ষণে চুল জড়িয়ে গিয়েছে ফুলে।

তুমি অবাক, হঠাৎ যেন সন্দিগ্ধ, বললে, "এ কী। ফুল?"

"চেনো না? গন্ধ পাচ্ছ না? সাপও তো শুনেছি ভুলে যায় ফুলের গন্ধে; বিভোর হয়ে থাকে।"

"আমি সাপ নই, হলে হয়ত বিভোর আমিও হতাম।"

"বিষ আর ফণা তবে কার?"

তুমি চুপ করে ছিলে। বাবা তখন আরও এগিয়ে তোমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন।—"বলো, আন্নু, একবার বলো, 'তোমার।' বলো।"

তুমি একেবারে অন্য কথা বললে। আঙুলে মালাটা জড়াতে জড়াতে—"ঘরের বউ হয়ে ফুলের মালা! লোকে বলবে কী। তা-ছাড়া এই বয়সে—"

(সেই সময়ের পক্ষে কথাটা, মা, একেবারে ভুল বলোনি। আমাদের ঘরে ঘরে ফুলের চল হয়েছিল আরও পরে। তখন ফুলের বাজারের বেশিটাই টেনে নিত—পূজো-আচ্চা বাদ দিলে বিয়ে কিংবা মৃত্যু। আর ফুল ছিল সেই মহলে, যেটা সমাজের বাইরে।)

তুমি, অপ্রস্তুত, যখন বললে, "তা-ছাড়া দেখছি," তোমার চিবুক তুলে ধরেছেন, "এই বয়সে—" তৎক্ষণাৎ বাবা দাঁড়িয়েছেন আরও গা ঘেঁষে, মিটিমিটি তাকিয়ে দেখছি, তোমার চিবুক তুলে ধরেছেন, "কত বয়স হল দেখি, দেখি, বয়সটা কি আঁকা আছে গালে? দেখি, এসো তবে মুছে দিই—" আর তখনই !!!

ছিটকে সরে গিয়েছ তুমি, লজ্জায় নয়, তা হলে তো ঘোমটা খসে পড়ত না মাথা থেকে, সরে গিয়েছ রাগে। থরথর কাঁপছ। কাঁপছেন বাবাও, স্পষ্টই বোঝা যায় দু'টি পা-ই টলমল, যেন হাড় নেই, ভেলকিতে দাঁড়িয়ে-ওঠা গাছা মোটা দড়ি।

"তুমি—তুমি কী খেয়ে এসেছ?"

"কিশ্‌চু তো না এ—ই এক্—টু।"

বাবা কাঁপছেন, আমি কঠিন কাঠ, এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে ওঁর গলা কেন আজ অন্য রকম। "কিশ্‌-চু খ-খাইনি, এ-এই একটু-উ।" উনি বারবার বলতে থাকলেন "একটু-"র "টু" অক্ষরটা "টু—উ"-এর মতো শোনালো, যেন একটা পাখি ডাকছে "কুউ", এই একটু, এই একটু, একটি কথাই আতসবাজীর আলোর মতো ঘরের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকল।

"একটু—কতটুকু? তোমার মুখে গন্ধ।"

"অন্‌-ন্যায় হয়েছে। গন্‌-ধোটা থাকা অন্যায় হয়েছে। একশোঁবার মানব। বিশ্বাস করো, ঢাকতে আমি পাত্তাম, এলাচ—ওই যে এলাশ্‌ না কী বলে—খেতেই চেয়েছিলাম—কিন্তু খ্‌খাইনি, বিশ্‌শাশ্‌ করো ঢাআক্‌তে আমি চাইনি।"

"এত রাত, আমি ভেবে মরি, ছেলেটা জেগে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ল—"

"পড়ল? আহা। পড়ে গেল? পড়ে কোথাও লাগেনি তো আনু? আহা। পড়ুক, পড়ুক, ঘুমিয়ে পড়ুক। আবার উঠে পড়বে। আমি জানি। লোকে পড়ে আর ওঠে। এই নিয়ম। যেমন, এই ছ্যাখ, আমি উঠেছি।" বলতে বলতে বাবা গৌরাঙ্গ ভঙ্গীতে ছু' হাত তুলে দাঁড়ালেন।

আমার হাসি পাচ্ছে, কোনমতে নিজেকে চেপে ধরে আছি, কিন্তু, মা, তুমি একটুও হাসছ না যে? বিশেষ করে বাবা যখন পুরনো কথায় ফিরে বলছেন, যেন গর্ত হয়ে যাওয়া একই চাকার দাগে কথাটা গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরছে, তখন হাসি সামলানো যায়?

বাবা বলছিলেন, "য়ু আর রাইট। অন্‌ন্যায় হয়েছে। ঘরে গন্ধ আনা নিশ্চয় অন্যায়, ওটা বাইরে রেখে আসা উচিত ছিল, লোকে যেমন জুতো বাইরে রেখে ঘরে ঢোকে, গন্ধটাও······তেমনই······

বলছ তো? য়ু আর রাইট। স্-শেই জন্যেই তো নিয়ে এলাম ফুলটুল, তা তোমার পশন্দো হল না। বেশ, ফুল যদি পছন্দ না হয়, তবে জ্বালাও ধূপকাটি, ফিনাইল ঢেলে ধুইয়ে দাও—ধধুৎ!" বাবা পাক্কা একটি হিক্কা তুললেন।

"গিয়েছিলে কোথায় শুনি? এত রাত হল। কোথায় যাও রোজ, কাটিয়ে আসো এত রাত অবধি—"

"জানো তো। থ্থীয়েটারে।"

"সেখানে এইসব গেলা হয়?"

"শেখানে? উহুঁ, ঠিক শ্শেখানে নয়", বাবা মাথা নাড়ছিলেন, "তবে কাছাকাছি। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাছাকাছি। দূরে নয়, দূরে নয়। আর—আর তুমি যা ভাবছ তা-ও নয়। বিলিতি জিনিস ছুঁইনি। আমি স্বদেশীওয়ালা, যা খেয়েছি স্—শষ দিশী, খাঁটি দিশী। বাওয়া, চরিত্রভ্রশ্ট হইনি। নীতি ঠিক রেখেছি।"

"তোমার আবার চরিত্র, তোমার আবার নীতি" কী ঘৃণায় কথাগুলি উচ্চারণ করছিলে। ঘৃণা? অথবা, মা, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?

নাকে চাপা দিয়েছ কাপড়, কিন্তু চোখে না। না, সেদিন তুমি কাঁদছ না। বাবা একটা বিড়ি ধরাতে চাইছেন, পারছেন না, হাত কাঁপছে, কাঠি কেবলই নিবে যাচ্ছে, একবার তো ওঁর আঙুলের ডগা অবধি আগুন ধিকিধিকি এগিয়ে এল, এখন চোখ দিয়ে অনুনয় করছেন, বাবা, তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন দেশলাইটা ধরিয়ে দিতে, তুমি দিচ্ছ না, পিছনে সরছ, আমি নিশ্চল, গোপনে নিষ্পলক, একটা মূক-অভিনয় দেখছি।

"এর চেয়ে তুমি যা ছিলে তাই বেশ ছিলে, এ আমি কী দেখছি। সব শিক্ষা করা হচ্ছে—"

বাবা মহাজ্ঞানীর মত মাথা নাড়লেন, "উহুঁ, শিক্ষা না। আমাকে শিক্ষার্থী বোলো না। সব শেখাটেখা সারা বলেই তো শেষ পর্যন্ত

এখানে পৌঁছতে পেরেছি। আনু, আমাকে শিক্ষার্থী বোলো না। শিক্ষার্থী তোমার ছেলে, ও ছাত্র। শেখার বয়েস, ও-ই বরং এখন শিখবে।"

"শিখবেই তো, শিখছে। বাপের ধারা পাচ্ছে।"

"পারবে, আলবত পারবে। বাপের ব্যাটা যদি হয়, নির্ঘাত আমার সব ধারা পাবে।" উচ্চাঙ্গের রসিকতা করছেন এই আত্মপ্রসাদে বাবা উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

(বাবা অপ্রকৃতিস্থ, অথচ নিয়তির মতো সেদিন অমোঘ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন।)

তুমি বলছিলে, না করুণ কোনও প্রার্থনা নয়, অনুনাসিক আবেদন নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে বলছিলে, যেন আদেশ, বলছিলে, "আমাকে তুমি আবার সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

"সেখানে?" মোয়ার মত হাত ঘুরিয়ে বাবা বললেন, "শুনেছি সেখানে কেউ তো নেই।"

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না তোমার। যতটুকু রেগেই ছিলে তার চেয়ে একরতি বেশী রাগ দেখা গেল না।—"না থাকুক। আমি যাব।"

"সঙ্গে যাবে কে?" বাবা অপাঙ্গে আমাকে দেখছিলেন।

—"কেউ না। আমি একা। ছেলে, তোমার ছেলে, ও যাবে কোন্ দুঃখে। বললাম তো, শিখে উঠেছে। ও এখানেই থাকবে। বাপ আর ছেলে এক ঘাটেতেই মুখ ধোবে, বাঃ দিব্যি!"

(মা, তুমি কি এত নীচ, সংকেতে কি নিচে বুলাদের ঘর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে?)

তলিয়ে বোঝার মতো অবস্থা বাবার ছিল না, একটা হেঁচ্‌কি তুলে তোমার কথাটারই পুনরুক্তি করে বললেন, "বাঃ দিব্যিই তো, দিব্যি।"

ভবী তবু ভুলল না। কঠিন কণ্ঠে তখনও বলে চলেছ তুমি, "কিন্তু বলো, আমাকে এখানে এনেছিলে কেন তুমি। বলো, বলতেই

হবে। মিথ্যে কেন ছলছুতো করে চিঠিতে ভুলিয়েছিলে। এখানে এসে কী পেলাম বলতে পারো?”

“কষ্ট হচ্ছে?” দরদ দিয়ে বাবা বললেন, “হবেই তো। দেশে কত খোলামেলা আর এখানে সব বন্ধ আটকানো। বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে যাদের শোবার অভ্যেস, যদি তাদের ছোট্ট চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে—”

“কথার চালাকি রাখো। বন্ধ জায়গাতেও আটকাতো না, যদি চারধার ভদ্র হত। বিশ্রী বাড়ি, উত্তরের জানালাটা খোলা যায় না কেন”, বাবার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তুমি বললে, “তা কিন্তু জেনে ফেলেছি।”

“কী জেনেছ?” বাবা কি ভয় পেলেন?

“জেনেছি ওদিকের একটা ঘরে কারা একটা মেয়েকে ধরে এনে আটকে রেখেছে। মেয়েটা সব সময় কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কান পেতে শুনেছি, ওর কান্না খুব করুণ, গানের মতো শোনায়।”

“তাতে আমার দোষ কী।”

“দোষ কী আর! তবে তুমি এর চেয়ে ভালো একটা বাসায় আমাদের আনতে পারতে। নইলে যেভাবে ছিলাম, বেশ ছিলাম। সুখে-দুঃখে একরকম দিন কেটে যাচ্ছিল। নতুন একটা অপমানের মধ্যে কেন টেনে আনলে। বলো, বলো, বলো।”

তোমার চোখে ফুলকি ঝরছিল। তোমার দাঁতে দাঁত ঘষে যাচ্ছিল। এত তেজ আগে কখনও তো দেখিনি।

বাবা কাচুমাচু হয়েছিলেন এতক্ষণ, এইবার গর্জে উঠলেন—“আঃ আনু ক্ষ্যামা দাও। এতক্ষণ থিয়েটারে ছিলাম, অনেক বক্তৃতা শুনে এলাম, ঘরে এসে আবার সেই পার্ট শোনা? এক নাইটে দুটো শো দেখা? মাপ করো, আমাকে দিয়ে হবে না। এতবার ক্ল্যাপ দিতে পারব না।

"থিয়েটারে রোজ যাও কেন? কে যেতে বলে?" তোমার ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে গেছে, আমি যেন সাপের শিস্ শুনছি, তুমি কি সেই মা, যাকে চিনি, যিনি শান্ত সতত-স্থির একটি প্রতিমা? প্রতিমার রঙ জলে ধুয়ে গেছে, আর পিছনের কাঠখড়ও দেখতে পাচ্ছি। বলে চলেছ, "তুমি তো থিয়েটারের কেউ নও, তুমি, তুমি তো শুধু ওদের প্রেসের ম্যানেজার, হ্যান্‌ডবিল ছাপাও—তবে রোজ রোজ ওখানে যাও কিসের টানে?" একটা চোখ ছোট করে ফেললে তুমি, এ-সব কায়দা এখানে এসে বুঝি আপনা হতেই শিখেছ, বললে, "কিসের টানে, বলো না কিসের? কোনো থিয়েটারউলির? তা রোজ রোজ সেজন্যে মাথায় হিম লাগানো কেন, একজন তো নীচেই আছে। বিকেলে সে বাড়ি থাকে না সেই জন্যে?"

"চুপ করো।"

"করব না। সকালে তো নিত্য যাও, ওর ভেড়ুয়া স্বামীটাকে বাজারে পাঠাও। সত্যি করে বলো তো, এক দিনও তুমি কি বাজারে যাও, গিয়েছ?"

ঘড়ঘড়ে গলায় বাবাকে বলতে শুনলাম, "সে তুমি বুঝবে না। বাজার করা আমার কাজ না। আমি একজন আরটিস্‌ট।"

এইবার বিকট একটা কলের বাঁশির মতো বেজে উঠল তোমার গলা। কাঁথা মুড়ি দিয়েও ঘুমের ভান বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। সোজা হয়ে বসলাম বিছানায়, একবার তোমার, একবার বাবার মুখের দিকে চাইছি।···

"আরটিস্‌ট, তুমি আরটিস্‌ট? ওই কথাটার আমি মানে জানি। তুমি কিসের আরটিস্‌ট আমার গুণনিধি, বুঝিয়ে দাও না, একবার বুঝিয়ে দাও। গাদা-গাদা পালা লিখেছ বলে? তুমি যদি আরটিস্ট, চামচিকেও তবে প্রজাপতি। ও-রকম ছাইভস্ম সবাই লিখতে পারে।"

হিস-হিস করছিলে এতক্ষণ, এবার তোমাকে ছোবল মারতেও

দেখলাম। বাবা টলছেন, বাবার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যাচ্ছে। বিকৃত, অস্পষ্ট স্বরে শুধু বলতে পারলেন "যা লিখেছি তা ছাইভস্ম? সবাই লিখতে পারে, স—বা—ই? তুমি এই কথা বললে?"

"বললাম। ঠিক ঠিক শুনতে না পেয়ে থাকো যদি, বলছি আবার। ছাই—ছাই—ছাই।"

দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছেন বাবা, সেই রকমই অসহায় গলায় বলছেন, "তবে যে তুমি কত মন দিয়ে শুনতে, তারিফ করেছ কত, কত হা-হুতাশ"—

"শুনেছি, মানে শুনতে হয়েছে। তোমার স্ত্রী বলে।"

"শু—ধু আমার স্ত্রী বলে? নইলে—"

"নইলে ওগুলো ছিঁড়ে উনুনের আগুনে ফেলে দিতাম।"

খুব বুঝি কষ্ট হচ্ছে, বাবা দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তুমি থামো নি, কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়েই গিয়েছ। বাবা যখন বললেন, "এতদিন এ কথা বলোনি কেন", সঙ্গে সঙ্গে তুমি: "বলিনি তুমি কষ্ট পাবে বলে। খেয়ালী মানুষ, ঘর বেঁধেও বাঁধো নি, ভাবতাম, না-হয় ওসব নিয়ে ভুলে থাকুক।"

"ভোলাতে, খালি ভোলাতে? এত দয়া তোমার, দয়াময়ী?"

"দয়া কিনা জনি না! মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, এমনিতে তো কিছু বুঝি না! তবে আজ না বলে পারছি না, তুমি যখন পড়ে শোনাতে, আমার হাই উঠত, ঘুম পেত। সত্যি বলছি। সত্যি, সত্যি, সত্যি।"

"ঘুম আর হাই?" সম্মোহিতের মত এক-একটা কথার সূত্র বাবা মরীয়ার মতো টেনে চলেছেন, হঠাৎ যদি তোমার কথা বন্ধ হয়, উনি ধপাস করে বসে পড়বেন।—"ঘুম পেত, আর হাই?"

"আর হাসিও পেত। ছাখো, তোমার ও-সব মাথামুণ্ডু কোনো দিন কেউ নেবে না, প্লে হবে না। যদি হয়ও—" শেষ পাথরটা তুমি ছুঁড়ে দিলে,—"যদি—হয়-ও, লোকে দেখবে না। টিটকারি দেবে, উঠে পালাবে।"

ঠিক এই সময়েই বাবা বুঝি হাত তুলেছিলেন। মা, তোমাকে মারতে নয়, পাথরটা ঠেকাতে। পারলেন না, পাথরটা ঠিক বুকে গিয়ে লাগল। বাবা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ছেন। অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে কী যেন ধরতে চাইছেন।

"মা! ধরো, ধরো বাবাকে, দেখছ না বাবা পড়ে যাবেন?" চিৎকার করে উঠেছিলাম। তুমি নড়বে না, তুমি নড়ছ না দেখে নিজেই তড়াক করে উঠেছি লাফিয়ে

(পরে জেনেছি, আমাদের ভিতরকার কয়েকটা সজাগ-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এইভাবেই সহসা তড়িৎ-শক্তি-তাড়িত হয়ে ওঠে),

কিন্তু বাবা ততক্ষণে দুমড়ে-মুচড়ে মেঝেতে আসন নিয়েছেন।

একটা পুরনো ইমারতকে ইটকাঠ সমেত আমার চোখের সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে এর আগে কখনও দেখিনি। কাছে যেতে বাবা হাত তুললেন আবার, এবার আমাকে ঠেকাতে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে, ভিজিয়ে, তবে কোনরকমে শুকনো দুটি কথা বলতে পারলেন, "থাক। ঠিক আছি।"

কই, মুখে গন্ধ কই, বাবার চোখে আর নেশাও নেই। সেখানে বদ্ধ, বাণবিদ্ধ একটি পশুর ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি।

ইটকাঠগুলো পড়েই রইল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে। এই ভগ্নস্তূপ কোনো ইতিহাসের সাক্ষী হবে না।

কোথায় দয়াময়ী? চার দিকে চেয়ে তখন ভীষণা ছাড়া আর কোনও মূর্তি আমি দেখতে পেলাম না। সত্যি-সত্যি নেশা হঠাৎ মাথায় চড়ে গিয়েছিল কার, বাবার না তোমার? ঘরের ছবিটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, দেওয়ালগুলো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। নেশা কি আমারও?

সেদিন বাবার মড়ার মতো মুখচ্ছবি দেখেই ভয় পেয়েছ। আঘাতটার কত গভীর ক্ষত বুঝিনি। আজ অনুভব করছি। পরে নিজেও কলম ধরেছি কিনা! কিন্তু দয়াময়ী তোমাকে কী করে বোঝাবো! ওর চেয়ে যে বড় মার নেই সে-কথা যারা কোনোদিন কিছু-না-কিছু লিখেছে তারাই জানে; যারা লেখে না, তারা বুঝবে না।

সেই সময়টাতে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা সামনে থেকে মুখ ভেংচে যদি ভয় না দেখাত, সেবার বছরের ওই ক'টা মাস আমার আরও কষ্টে কাটত। পড়ার চাপে আমি তলিয়ে গেলাম। দেখলাম না দমকা হাওয়ায় হাওয়ায় সেবার কত ধুলো উড়ল, পার্কের হলুদ ঘাস কবে আবার সতেজ হল। বাড়ির লীজ নিয়েছে যারা—যারা তেতলায় চিলেকোঠা আর আর-একখানা ঘর নিয়ে থাকে—তাদের পোষা পায়রাগুলো কখন তপ্ত হয়ে ডেকে ওঠে, ক্লান্ত হয়ে কখন যায় চুপ করে, কিচ্ছু টের পেলাম না।

আর মন দিলাম না, মা, আমাদের সংসারের মূর্তিটা যে ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে সেদিকেও। ত্রিভঙ্গ, কিন্তু তিন খণ্ড নয়। জোড়াই ছিল, কিন্তু জোড়াগুলো যে কত আলগা বোঝাও যাচ্ছিল। তবু দেখেও দেখতাম না। দেখতে গেলে আমার পাস করা হবে না। পাস? ভুল বললাম। পাস, আমি জানতাম, করব ঠিকই, কিন্তু খুব ভালো রেজালটা না করলে—

হাকিমি? দূর, হাকিমির কথা তখন কে ভাবছে! কলেজে অন্তত একটা ফ্রী-স্টুডেনটশিপ, বিনে মাইনেয় পড়ার অধিকার। কী হব, আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি, শুধু "চয়েস অব্ এ প্রফেশন", এই "এসে"-টা এলে কী লিখব, কষে সেই বানানো ব্যাপারগুলো মুখস্থ করতাম। বাবা যা ছিলেন, সেই স্বদেশী হব না তো নিশ্চিত। জেল-টেলে যাব না। তার মানে এই নয় যে, আমার দেশপ্রেম নেই।

আছে যথেষ্টই, কেননা দুনিয়ার তামাম পরাধীন দেশের আন্দোলন, অগ্নিপরীক্ষা, আত্মত্যাগের ইতিহাস তখনই পড়ে ফেলেছি। ক্লাসের যে-ছেলেরা টিফিন-পিরিয়ডে দল বেঁধে আড্ডা দিতে বের হয় না, যারা মাঠে, দুপুরের রোদে, গোল হয়ে বসে, যাদের স্বভাবতই নেতা বীরেন, আকারে যে-ছোট্টটি, কিন্তু তেজে অপরিসীম, তাদের কাছ থেকে বইয়ের পর বই চেয়ে নিয়ে পড়েছি!

কিন্তু দলে নাম লেখাইনি। সাহসের অভাব? এক অর্থে তাই যখনই ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, ওরা তর্ক করছে, ক্লাসঘরেই ডেস্‌ক চাপড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, মাস্টারমশাই এলেও সরছে না, এক-একদিন তো বেপরোয়া ধ্বনি দিতে দিতে জলের তোড়ের মত ক্লাস থেকে বেরিয়েও যায়, ওদের পিছনে গিয়ে যখন দাঁড়াই, তখন কখনও ভাবি, দিই আমারও নামটা লিখে। ওরা সবাই পারছে, আমি পারব না?

কিন্তু পারি না। মা, তখনই হাত কাঁপে, চোখের পাতা ক্রমাগত পড়তে থাকে, যেহেতু তুমি সব কিছু আড়াল করে দিয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাকে দেখি। আমিও যদি, বাবা যা করছেন সেই মতো, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই, তোমার হবে কী?

আমার বুকের বয়সোচিত আগুন তুমি বারে বারে স্নিগ্ধকরুণ চাহনির মিনতি দিয়ে নিবিয়েছ, কোনো দিন তাই বড় রকমের ঝুঁকি নিতে পারিনি, বে-হিসাবের সঙ্গে হিসাব আমার জীবনে জড়িয়ে গিয়েছে—মা, তুমি আমাকে কাপুরুষ করেছ।

এক দিকের অকৃতার্থ ব্যর্থতা আমাকে অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই পথ অন্তর্মুখী, একই সঙ্গে সঙ্গলোভী অথচ আবার লোকের সাহচর্যে ক্লান্ত-কুণ্ঠিত, সেই বহির্বিমুখ মন ইতিমধ্যে খাতায় পাতায় পাতায় কাঁচা কাঁচা অপটু বর্ণপাত করছিল। সে-সব লেখা লুকোনো থাকত, কাউকে দেখাইনি। পিতৃরক্ত নিয়তির মতো, তার হাত থেকে নিস্তার কোথায়

কিন্তু সেবার, পরীক্ষা খুব কাছে কিনা তাই, সব বন্ধ ছিল। নইলে চোখে পড়ত বাবা আগেকার মতোই সময়মত কাজে বেরোন বটে, কিন্তু ওঁর পা ফেলা যেন অনিশ্চিত, একটু অন্য রকম। বাজার নিজেই নিয়ে আসছেন, কিন্তু কী আনতে হবে জিজ্ঞাসা করা নেই, কোনো-কোনোদিন তুমি বড়জোর একটুকরো কাগজে লিখে দিচ্ছ।

বিকেলে একজন উপযাচক টীচারের বাড়ি থেকে পড়া বুঝে ফিরতে দেরি হত। বকুনির ভয় ছিল না, কেননা অন্যায়ও তো কিছু করছি না, তা-ছাড়া জানতাম, তুমি আর বকবে না।

তবু উঠোন পার হয়ে কাঠের সিঁড়িটায় যখনই পৌঁছেছি, তখনই পা একটু ঠেকে গেছে। এখনই বুঝি কেউ বেরিয়ে আসবে, "আসবি ? আয় না, আয়" শুনতে পেয়েছি। হাত তুলে চৌকাট ধরে কে যেন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। গায়ে কাঁটা দিত, সিঁড়িটা নড়বড়ে জানি, তবু লাফিয়ে লাফিয়ে টপ্‌কে একেবারে উপরের বারান্দায় এসে দম নিয়েছি। আর ভয় নেই, নিরাপদ এবার।

তাই, দিনগুলো পড়ার ঘোরে কেটে গেল, কী ঘটছে না ঘটছে খেয়াল করিনি। পরীক্ষা যেদিন শেষ, সময় ফুরোবার আগেই শেষ খাতাটি জমা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, আকাশের দিকে চেয়ে আর পলক পড়ে না, এত অপর্যাপ্ত আলো, দশ দিক খোলা তবু সারা অঙ্গ সোনার পাতে মুড়ে ওই আকাশ কী-করে যে এমন স্থির-নিশ্চিন্ত থাকে !

আসলে দশ দিক খুলে গিয়েছিল আমার। রেলিং-এ ঝুঁকে-পড়া এক মহিলা, মনে হল এর চেয়ে মহীয়সী আমি কাউকে দেখিনি, ঠেলা গাড়িতে চড়া ভিখারীকেও ঠেকছিল সুন্দর, সুন্দর রাস্তার প্রত্যেকটা ঘরবাড়ি, ফলওয়ালারা হাঁকছে "গেণ্ডারি গেণ্ডারি !" আমার জন্যে। মেয়েদের স্কুলের একটা রূপসী বাস এসে দাঁড়াল—আমার জন্যে। অনেকগুলো গাড়ী মোড়ে মোড়ে ভেঁপু দিচ্ছিল, যেহেতু আজ আমি

নির্ভার, নির্ভাবনা, তাই এতদিন ধরে দেখা শহরটা এইদিন অপরূপ হয়ে দেখা দিল। বিকালের রোদ্দুরে পানের দোকানে ঝলসাচ্ছে আয়না, আজ একটা পান খাব, সেই সঙ্গে নিজের মুখ একবারটি দেখে নেব। সুর করে কী বলছে ওই ফিরিওয়ালাটা ?—'যা লেবে তা দো-আনা, লে যাও বাবু দো-আনা ?" নেব, নেব, সব নেব, কিচ্ছু ভেবো না।

প্রথম পরীক্ষা চুকে যাওয়ার সেই অনুভূতি। সেই ফূর্তি, সেই মুক্তি—তার স্বাদ পরের বারগুলোতে তেমন করে পাইনি। কী করব এখন, আমাকে নিয়ে, এই সময়টাকে নিয়ে ? বেলা তো, বড় একটা ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটে মোটে, বাড়ি যাব কি ? কিন্তু পা সরছে না সেদিকে, সবিস্ময়ে অনুভব করছি, আমি আর নেই আমার বশে, কে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমায়, টানছে, ঠেলছে, যেদিকে খুশি সেদিকে, আমি—আমি যেন অপহৃত হয়ে যাচ্ছি।

মা, এতখানি ভণিতা শুধু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে। এবার তোমাকে সেদিনের পরিণতির কথা বলি।

"এদিকে কোথায়", ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম।

"ভয় নেই, বিপথে নিয়ে যাব না," মুচকি হেসে একজন বলেছিল।

বলেছিল যে, সে বুলা। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত যে গঙ্গার পাড়ে পৌঁছে যাব, আগে বুঝিনি। এদিকে রাস্তাগুলো সব যেন পাতা-কাটা পরিপাটি, জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে তার চেয়েও জোরে চলে যায় গাড়ির পর গাড়ি। সাবধানে পার হচ্ছি, দূর থেকে ফাঁপানো একটা ফ্রক দেখেই চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না।

উঁচু ডাঙামত জায়গাটা থেকে নেমে এসেছিল বুলা, মুখে লাল-রিবন হাসি, একটুও অবাক হল না, একবার জিজ্ঞেসও করল না

আমি ওখানে কী-করে এলাম, এসেছি কেন। আসব, যেন ও জানত। তাই নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আয়।"

"কোথায়।"

বুলা হাত ধরে টেনে আমাকে রাস্তা পার করে দিচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "ভয় নেই, বিপথে নিয়ে যাব না।"

ওপারে রেল লাইনের উপরে ওর পরীর মত শরীর রেখে, যেন উড়ে যাবে সেইভাবে, বলল, "এটা একটা ঘাট, নাম আউটরাম। আঘাটায় তোকে নিয়ে আসিনি।"

বুলার জুতোর আজ গোড়ালি উঁচু, ফলে মাঝে মাঝেই আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, ফলে ওর পা আজ কতকটা সুডোল দেখাচ্ছিল। হেসে বলল, "নাগাল পাচ্ছিস না?"

চট করে জবাব দিলাম, "তোমার নাগাল আমি এমনিতেও পাব না। যা জোরে ছুটছ!"

"বেশ, দাঁড়াচ্ছি—ওই ওখানে গিয়ে। ওটার নাম জেটি, ওর দোতলায়। জোয়ার এলে সবটা দোলে।"

কূলে কূলে লোহার বেড়ি-পরানো বাঁধা জাহাজ, অতিশয় বাধ্য বশ-মানা, মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে মোটা গলায় ডেকে ওঠে বটে, কিন্তু হাত-পা ছোড়ে না, বিশ্বাস করা শক্ত যে, এই জাহাজগুলো কখনও অকূলের ঠিকানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে, বা খুঁজে পেতে ফিরে এসে পাড়ে ভেড়ে আবার। দেখে মনে হয় না।

পনেরো

ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে মণিবন্ধে রস চুঁইয়ে পড়ছে, বুলা একটা কাঠি আইসক্রীম চুষছে। বলল, 'কী ঠাণ্ডা, আমার গালের মতো', বলতে বলতে সে আমার গালেই একটা ঠাণ্ডা হাত রাখল। কাঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খাবি! খেতে চাস তো খা না।" ইতস্তত করছি দেখে চোখ টিপে ভঙ্গি করল একটা—"বুঝেছি আপত্তি কেন তোর। আইসক্রীম কী এঁটো হয়? হয় না! গলে ক্ষয়ে যায় যে। দেখছিস না?" বলে, বুলা মুখ নামিয়ে জিভ বের করে নিজের কব্জি নিজেই চাখল।

কথা বলে চলেছিল সে একাই। জানতিস আমি এখানে থাকব? জানতিস না? তুই তো ডুমুরের ফুল হয়েছিলি কদ্দিন যেন? সেই যেদিন, হি-হি, আচ্ছা আমাকে কী বলে মারলি বল তো, একটুও কষ্ট হল না? কষ্ট হয় কোন্‌খানে জানিস তো? কষ্ট হয় এইখানে—বলে আঙুল ঘুরিয়ে কষ্টের জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

তারপর: তোর মা-গঙ্গার কাণ্ড ছাখ। সূর্যের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে অথচ এমনিতে শুনি নাকি পবিত্র। পবিত্র না পবিত্র, ঘোলা জল এখন লালে লাল, আমাকে বাবা দশটা টাকা দিলেও এ জলে আমি নাইতে নামব না।

সে একটু চুপ করল, বোধ হয় আমাকে করুণা করে রেহাই দিল, কিন্তু না তো, ওই রে! এই যে বুড়বুড়ি ফুটছে আবার: অনেক লোক নাইছে কিন্তু, এদিকে আয়, চেয়ে ছাখ ওই বাবুঘাটে। বল তো গঙ্গায় নিত্যি চান করে যারা তারা পাপী, না পুণ্যবান? পাপ—পাপ, ধুলো নোংরা ধুয়ে ফেলতে আসে। ওরা পাপ করে কিনা, তাই পুণ্যের জন্যে এত পিটপিটিনি, নিত্যি নিত্যি স্নান। মাগো মা, কী বেহায়া, মেয়েগুলোর গাখালি, নয় তো ভিজে কাপড়ে সব ফুটে

বেরুচ্ছে। ওরা কি মেয়ে! আমার কিন্তু সে খুব গোপন কথা বলার মতো গলা করল—আমার কিন্তু শোবার ঘরেও···এই যে ফ্রক পরে আছি, দেখছিস তো পায়ের কতটা অবধি খোলা, দেখ না, আজকাল এতেই কেমন গা শিরশির করে।

বলে সে আমাকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করল। তোদের ছেলেদের বাপু ও-সব বালাই নেই, এই যে শারট আর হাফপ্যান্ট পরে আছিস, বেশ মানাচ্ছে। তুই অবিশ্যি একটু রোগাপটকা আছিস, পায়ের গোছ, মাশ্‌ল এইসব আর-একটু পুষ্টু-ভারী হলে আরও মানানসই হত। মানায় মেমসাহেবদেরও—সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, মানাক গে যাক, আমরা তো আর মেমসাহেব নই। এই বছরটা গেলেই আমি শাড়ি ধরব, মাকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছি, বলেছি আমার বাইরের আর নিচের দুটো জামা-ই চাই।

এবার সে একটা প্রশ্ন করে বসল, আমার পক্ষে দস্তুরমতো কঠিন প্রশ্ন। এখানে এসেছি কেন বল তো? এক, দুই, তিন—তিনটে বল, একটা মিলেই যাবে ঠিক।

পারবি না? ধুউ-র বোকা-টা, দু-য়ো। এসেছি মাকে ধরব বলে। এতক্ষণ কথা যার কলের জলের-মতো ঝরছিল, তার গলা হঠাৎ কলতলার মতো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল।

বললাম, "মাসীমাকে! কেন, মাসীমা তো বাড়িতে—"

কথা কেড়ে নিয়ে সে বলল, "নেই। দু'দিন ধরেই নেই। তুই জানবিই বা কী-করে। খবর তো রাখতিস না। আজকাল আমাদের ঘরের দিকে একবার তাকাস না পর্যন্ত। জানিস, আমি কতদিন দরজায় দাঁড়িয়ে—"

"আমার পরীক্ষা এসে পড়েছিল যে। তা-ছাড়া বুলা," ওই পরিবেশে যতটা হওয়া যায়, ততটাই অকপট হয়ে আমি বললাম, "বুলা, আমার ভয় করত।"

"পাছে আমি পেছন থেকে এসে পেত্নীর মতো ঘাড় মটকে দিই?"

গলার জমা বাষ্প উবিয়ে দিয়ে সে আবার ঝকঝকে হাসিতে ভরে গেল, "তাই হনহন করে চলে যেতিস, সিঁড়ি পার হতিস তিন লাফে? রাম-নামও জপ করতি নাকি, এই! বল না!" সে আমাকে তার কাঁধ দিয়ে আলগোছে একটু ঠেলে দিল। ওর কানে দুল, পড়ন্ত আলোয় ঝলমল করছিল।

বললাম, "কিন্তু বুলা, লীলা মাসীমার কথা যেন কী বলছিলে?"

"শটকেছে। নিজের মেয়েকে ফেলে যে ওভাবে পালায়, সে কি মা, সেকি মানুষ। তোরও তো মা আছে!"

বললাম, "আর মেসোমশাই?"

"ওই লোকটার কথা বলছিস, যাকে আমি বাবা বলি?"

(মা, নমস্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা, পারিবারিক কয়েকটি স্বীকার্য স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করা, এর নির্মম-নির্মোহ নমুনা আমি কি প্রথম বুলার মধ্যেই পেয়েছিলাম? সবাই প্রকাশ্যে যাকে মূল্যবান জ্ঞান করে, তাকে মূল্যহীন করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার উদ্ধত শূন্যতা? বুলার অবিশ্বাস, বুলার তিক্ততা, নিঃসঙ্গ নিপ্প্রেম বুলার নিষ্ঠুরতা গোপনে কলির মতো আমার ভিতরেও সংক্রামিত হয়েছিল নিশ্চয়; তোমার-আমার, আমার আর বাবার সম্পর্কের অনেকগুলো অধ্যায়কে প্রভাবিত করেছিল।)

"যাকে বাবা বলি?" বুলা বলছিল, "তার আর কী, বেচারা! তামাক খাচ্ছে, নিজের কলকে নিজেই সাজাচ্ছে আর কাশছে, ওদিকে আবার সারারাত হাঁপানির ছটফটানি, তবু ছিলিমটুকু চাই, তার ওপরে আবার হা-হা-হু-হু জুটেছে। সইতে পারিনে। আসলে কিন্তু ওর আর এমন-কী। বউ গেলে বউ হয়, কিন্তু মা গেলে আর-একটা মা আমি কোথায় পাবো।"

বুলা আবার গাঢ় হয়ে গেল, যেন দুপুরের পুকুরে হঠাৎ মেঘের

ছায়া পড়ল। টের পাচ্ছিলাম, ওর ঝিকমিক হাসির বালি একটু সরালেই তলায় জল।

দেখতে দেখতে সে আবার চকচকে বালুকণা খুঁড়ে খুঁড়ে ঢেকে ফেলল, টলটলে জল।—"তা ছাড়া বুঝলি না, ওর বয়স গেছে, তিনকাল গিয়ে বাকী আছে এককাল, স্বাস্থ্য খারাপ, বউ-টউয়ের তেমন আর দরকার নেই তো ; যে বউ আবার বাগ মানেনি, যে বউ আবার আসল নয়, নকল। তা নকল বউ গেল, নকল মেয়ে তো রইল ! জানিস, দু'রাত্তির আমি ঘুমোতে পারিনি, খালি মনে হয়, ওই লোকটা উঠে এসেছে, আমাকে একদৃষ্টে দেখছে ! আমার আবার শোয়া বিচ্ছিরি, ঘুমের মধ্যেও তাই গা ছমছম করে।"

গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, কেন বুলার কাছ থেকে কাঠি-আইসক্রীমটা নিয়ে নিইনি তখন, বললাম—বরং বলা উচিত নিজেকে বলতে শুনলাম—"কিন্তু বুলা, মেশোমশাই তো তোমার—"

"বললাম যে ! যেমন নকল মেয়ে, তেমন নকল বাবা। পাতানো বাবা, বানানো বাবা যা-খুশি হয় বলতে পারিস। ও সব পারে। অবিশ্যি চোখ দিয়ে। সব যদিও গেছে, তবু চোখ দুটো তো আছে !"

আমি মাথা নাড়তে থাকলাম। যে কথা কাউকে বলিনি, নিরুপায় হয়ে সেই নিভৃত একটি অভিজ্ঞতার কথাটাও ওকে বললাম।—"শুধু চেয়ে দেখলে কিছু হয় না", বুলাকে জানালাম, তারপর চোখে চোখ রেখে : "জানো, আমার বাবাও দেশে থাকতে এক-একদিন আমাকে ওই ভাবে দেখত।"

"সে-দেখা অন্য দেখা। তোরা, ছেলেরা, বুঝবি না। আমরা তো মেয়ে, আমরা সব টের পাই। জানি। বুঝি।"

প্রতিটি শব্দের শেষে পূর্ণযতি ওর ধারণার দৃঢ়তা প্রমাণ করছিল।

"তা হবে না", বুলা বলল, নিশ্চিত স্বরে, "মাকে আমি খুঁজে বার করবই। যেখানেই থাক।"

যেখানে থাক, সে বলে গেল, ওকে আমি পাবই। আমি জানি যে। নেহাত যদি কলকাতার বাইরে না গিয়ে থাকে, ধর গিরিডি কি হাজারিবাগে, একবার তাও গিয়েছিল—তবে একটা-না-একটা বিকেলে এখানে তো আসবেই? বিকেলে ওর মাথা ধরে, গঙ্গার হাওয়া হল ওষুধ, বন্ধুদের নিয়ে হাওয়া খেলেই দেখেছি ওর মাথা ধরা ছেড়ে যায়।

একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুলা বলে গেল, সওয়া পাঁচ। তার মানে আরও আধঘন্টা কি তিন কোয়ারটার। আসবে ছ'টা নাগাদ। আজ না আসুক, কাল? নয়ত পরশু নিশ্চয়ই। ধরে ফেলব হাতে-নাতে। ওই বটগাছটার তলায় বুড়ো পানওয়ালাকে দেখতে পাচ্ছিস? ওর কাছ থেকে মা জরদা-দেওয়া পান খাবে। খেয়ে পিচ ফেলবে ফুড়ুৎ! ফিনকি দেওয়া রক্তের মতো। মার অভ্যেস। বুড়োটাকে বলে রেখেছি, দেখতে পেলেই ইশারায় আমাকে জানাবে।

বোকার মত বললাম, "বুলা, উনি আজ যদি পান না খান?"

"তাই ভাবছিস?" বুলা তালি দিয়ে উঠল, "তা হলে আছে কুলপী—সিদ্ধির কুলপী—মার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ওই যে কুলপীওয়ালারা ঘোরাঘুরি করছে ওখানে, ওই গম্বুজের দিকটায়। ওদের বলে রেখেছি। আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছি রে বোকচন্দর, মা যদি ঘুঘুনি, আমি হলাম গিয়ে তারই তো কন্যে? লীলা বাম্‌নির মেয়ে আমি বুলা বাম্‌নি।"

নিজের চালাকিতে নিজেই মোহিত বুলা একটু কেমন করে হাসল।—"ভাবছিস, এত অন্ধিসন্ধি আমি জানলাম কী করে? মা নিজেই আগে বোকামি করেছে যে। মুখে তো বলেইছে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়েও এসেছে। যখন ছোট ছিলাম। একা ঘরে থাকব কী করে, ভয় পাব, তাই। আগে ওর স্নেহ ছিল, মায়া ছিল।"

"এখন নেই?"

'এখন আছে ভয়। আর হিংসে। বন্ধুরা তখন বিরক্ত হত, রেগেও যেত, তবু মা পরোয়া করত কি! ওর তখন বয়সও ছিল যে। জানত যতই ওরা গরগর করুক কুকুরের মতো, সব শুধু মুখে। শেষ পর্যন্ত ল্যাজ নেড়ে লুটিয়ে পড়বেই। মার সেই জোর ছিল। জোরটা গেছে, তার জায়গায় হিংসে এসেছে। ওর পাতের মাছে আমি পাছে ভাগ বসাই, সেই হিংসে। যেই অরিন্দম রায়েরা আসে, ওমনি বাড়ি থেকে শুট করে বেরিয়ে পড়ে। আমাকে ওদের কাছে চাটুকু দিয়ে আসতেও পাঠায় না। বন্ধুদের নজরে নজরে রাখে!"

হরির লুটের বাতাসা ছড়াবার ঢঙ-এ হাত তুলে বুলা বলল, "রাখুক, আমার তো বয়েই গেল। আমি তো আর ওর মতো হিরোইন হবার জন্যে হ্যাংলামি করে বেড়াচ্ছি না। চানস্ এলে আপ্‌সে আসবে। ওকে ওই এক নতুন বাতিকে পেয়েছে, ওই বুড়ি নাকি হবেন হিরোইন। হিরোইন, না কচু। কচু না ঘোড়ার ডিম। ছুঁড়ি পেলে কেউ বুড়িকে পার্ট দেবে? কোথায় দিয়ে থাকে, বল?"

বললাম, "থিয়েটারের কথা আমি তো বিশেষ জানি না।"

"জানবি, জানবি। না হয় মেশোমশাইকে—তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস। ঘোরাঘুরি তো শুনি উনিও করেন, রকম-টকম কি আর না জানেন?"

বুলা বুক ভরে বাতাস নিল। জাহাজের মতো দেখতে একটাকে আর-একটা জাহাজ শিটি বাজিয়ে কয়লার ধোঁয়া উড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বুলা বলল, "এখানে দম আটকে আসছে, কালিতে জামা নষ্ট হয়ে যাবে। আয়, ওই ছায়ায় যাই।"

পাটাতনের উপর দিয়ে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে বুলা একটা কোণে, একটু আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিল। তার ঠিক নিচেই গোটাকতক ডিঙ্গি বাঁধা, মাঝিরা রান্না চাপিয়েছে, জলের ছলাৎ-ছলাৎ, সেখানেও ধোঁয়া।

"ন্‌নাঃ" বুলা বলল, "সুখের জায়গা এই পৃথিবীতে কোথ্‌থাও

নেই। ওই ঘরটায় যাবি? দেখবি টেবিল চেয়ার পাতা, চমৎকার চা করে। এখনও তো হাতে বেশ কয়েক মিনিট সময় আছে, চা খাওয়াবি? পয়সা আছে?"

পকেট থেকে যা ছিল তা বের করে হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।—"মোটে বারো ভাগ, ওই দামে এখানে ধোয়া পেয়ালায় গরম জলও দেয় না। এই নিয়ে তুই মাঠে আসিস, গঙ্গার ধারে? তোর প্রেমের দাম কি তিন আনা?"

পাটাতনের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। বুলা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আরও ধারে। জলে ফেলে দেবে, এই ওর মতলব নাকি, পকেটে মোটে তিন আনা নিয়ে এসেছি এই পাপে?

চোখ বুজে ফেলেছিলাম, অথবা ঠিক ঠিক বলতে পারব না, বুলাই হয়ত ওর ঠাণ্ডা একটা হাতে আমার চোখ চাপা দিয়ে থাকবে।

কিন্তু না, ঠেলেতো ফেলল না, সেরকম কিছুই ঘটল না। বরং অনুভব করেছিলাম, ও যেন আর একটু কাছে টেনে নিয়েছে। ঘন শ্বাস, ওর মুখের কোনও অংশ আমার মুখে কি—? জানি না। তাকাইনি। বলতে পারব না।

এবার সত্যিই বুঝি বুলা আমাকে একটু ঠেলে দিল। ওর চকচকে চোখ যেন টর্চের মতো, আমার মুখে ফেলতে ফেলতে এক নিশ্বাসে বলে গেল "হল না। তুই চোখ বুজে ফেলিস কেন রে? অন্ধ নাকি? আমার গা-টা তাই কেমন করে উঠল। হঠাৎ মনে হল, ছেলেকে চুমু খেলে, জানিস, আমার কেমন মনে হয়, বুঝি অন্ধ হয়ে যেতে হয়, বুঝি গান্ধারী যা হয়েছিল। অবিশ্যি গান্ধারী করেছিল বিয়ে। চুমু তো আর খায়নি!"

—

গোল ঘড়িটায় তখন সময় দেখাচ্ছিল পৌনে ছ'টা।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে বুলা বলল, "মার সময় হয়ে এল। চল এবার যাই।"

নেমে এলাম দু'জনে; রাস্তা পার হলাম। ওদিকে ঢালু জমি, বিছানো ঘাস। রাস্তা পার হবার সময় বুলা আড়চোখে বুড়ো পানওয়ালাটাকে দেখে নিল। সত্যিই পর পর অন্তত দুটো কুলপীওয়ালা আমাদের সেধে গেল। পাহারাওয়ালারাও ছিল দূরে দূরে।

কেল্লার উপরে ভূতুড়ে খুঁটিগুলো টকটকে চোখে চেয়ে আছে। ঘাড় উঁচু করে দেখে বুলা বলল, "ওই ছাখ, ওরাও পাহারাওয়ালা, ওরাও নজর রাখছে। ফাঁকি দিয়ে মা পালাবে কোথায়?"

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল। সাড়ে ছয়। গঙ্গার বুকে এপার-ওপার কারা আলোর দু'নরী হার পরিয়ে দিল। একটা মোটরলঞ্চ চারদিকে বিস্মিত আলো ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বুলা বলল, "জল পুলিশ ওরা। আমরা দু'জনও ঠিক যেন গোয়েন্দা না রে? ডিটেকটিভ গল্পে যেমন পড়েছি। খুনী ধরব বলে ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়েছি—তোর রোমাঞ্চ হচ্ছে না?" বলে বুলা আমার হাত ধরল। "অবিশ্যি ঠিক খুনী বলা যায় না। তবে খুনীর চেয়েও খারাপ—ফেরারী। নিজের মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে ফেরারী।"

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছিল। হঠাৎ খানিকটা ধুলো উড়ে গঙ্গার গলার হারের সব ক'টা আলোকে লালচে করে দিয়ে চলে গেল। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে দেখে আমি ভয় পেলাম। ফুচকাওয়ালারা ঝুড়ি-ঝাঁপি গুটিয়ে সরে পড়তে শুরু করেছে। ভাঙা আসরে যে যা পারে বেচে দিয়ে খালাস হতে কুলপীওয়ালাদের মরীয়া হয়ে ছুটোছুটি। তাদের ডাকাডাকি এখন খুব করুণ—কাতর আর্তনাদের মতো।

আমি ভয় পেলাম। বললাম, "এই। আমি যাই। সন্ধ্যা উৎরে গেল। বিকেল থেকে বাড়ি ফিরিনি।"

বুলা আমার হাত তো চেপে ধরলই, পাও জুতো দিয়ে মাড়িয়ে

দিয়ে বলল, "যা তো দেখি। তুই না ছেলে ? তুই পুরুষ, না কাপুরুষ ? আমাকে ফেলে পালাবি ? এই তোর রীতি ?"

(মা, আজ সবই যখন একেবারে হৃদয় খুলে ঢেলে দিচ্ছি, কোনো আড়াল কোনো লজ্জা সংকোচ রাখিনি, তখন স্বীকার না করে পারছি না, বুলা, প্রগলভ বুলা, সেদিন কিন্তু অব্যর্থ ব্রহ্মবাক্য উচ্চারণ করেছিল। আজ ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, যেন দিব্য দৃষ্টিবলে সে বলে দিয়েছিল আমার ভবিতব্য। হ্যাঁ, ওই আমার রীতি। পরে হয়েছিল। বারে বারে। কাপুরুষতার পৌনঃপুনিকতায় বহুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কলঙ্কিত। কেবলই ফেলে পালিয়েছি। কেন ? কেন আবার। গা বাঁচাতে। যঃ পলায়তে স জীবতি। যে পালায় সে বাঁচে। বাঁচে ? আমি কি বেঁচেছি ?)

ঘড়ির বড় কাঁটা ঋষির মতো এক হাত সোজা উপরে তুলে দেখিয়ে দিচ্ছিল—সাতটা। পুরোপুরি সাত। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। মনকে বললাম 'যা হবার তা হবে। থেকে যাই, শেষ পর্যন্ত দেখি। আজ তো পরীক্ষা শেষই হয়ে গেল, বাড়ির কড়াকড়ি ঢিলে, মা আজ কিছু বলবে না। বললেও বলব বন্ধুদের সঙ্গে টকি দেখে ফিরছি।'

কিন্তু বুলাই বলল, "চল। আর না। আজ এল না।" ওর কথার সঙ্গে যা মিশে বেরিয়ে এল, আমাকে ছুঁলো, সেটা শ্বাস, না বাতাস ? বুলার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। ফোঁটা ফোঁটা জল, সমস্ত মুখ ভিজে। তবু জোর করে বলতে পারি না কান্নার ফলে ও-রকম চেহারা হয়েছিল কিনা। বৃষ্টির জলেও হতে পারে।

জোর জোর পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল বুলা, অনেক দূরের নিয়ন বাতি লক্ষ্য করে। পাশাপাশি চলতে আমাকে বেগ পেতে হচ্ছিল দস্তুরমতো।

"আজ এল না," বুলা বলছিল কাকে ?—হয়ত নিজেকেই—"কাল আসবে। কাল আসব। রোজ আসব। যতদিন না পাই ! নিস্তার নেই। এদিকে না পাই তো ওদিকে যাব—ওই বুরুজটার ওদিকে, যেখানে সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, প্রিনসেপ ঘাট। সেখানে দেখব। একদিন দু'দিন। না পেলে চলে যাব আরও দক্ষিণে"—বুলা একটু দাঁড়িয়ে হাতের আঙুলে হিসাব করে দেখল—"কবে যেন শনিবার ? পরশু, না তার পর দিন ? সেদিন আরও দক্ষিণ দিকে যাব, রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে যেখানে রেসের মাঠ।"

"তুমি সব চেনো ?"

"তোকেও চেনাব, আমার সঙ্গে ক'দিন ঘুরবি, ব্যস। তোকে চিনিয়ে দেব। মার বন্ধুরা ওকে যেমন চিনিয়েছে। ফী-শনিবার ওর ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসা চাই।"

'তু-তুমি অতো চিনলে ক-কী-করে ?" নিজে থেকেই তোতলা .হয়ে যাচ্ছিলাম।

(তুমি জানো, ওটা আমার পুরনো রোগ, সেরে যায়, আবার সময় বিশেষে ফিরে ফিরে আসে। লোকে বলে, তোতলামিটা অভ্যাস বই কিছু নয়। কথাটা ভুল, ওটা বাগ-জড়তার চেয়ে কিছু বেশি—বলা যায় স্বভাবেই নিহিত। এক-একটা সংকটে যেমন বুদ্ধি লোপ পায়, অনেক সংকটে তেমনই কথা। তখন তোতলামি আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। সংকট বা বিপদ মানুষকে নিয়ে দু'রকম খেলা খেলে—লুডোর দু'দিকে দু'রকম দান পড়ার মতো—কারও উপস্থিত বুদ্ধি উবে যায়, কেউ তখনই হঠাৎ ভীষণ তুখোড় হয়ে ওঠে। কারও কথা জড়িয়ে যায়, কেউ-বা আন্‌ট-সান্‌ট যা-মনে-আসে বলে যেতে থাকে। সেদিন আমি যে এক-একটা শব্দের উপরে হোঁচট খাচ্ছিলাম,

তার কারণ আমার হীনম্মন্যতা ; বুলার পাশে নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগছিল।)

"চিনলাম কী করে? বুলা যে চালু মেয়ে, শুনিসনি? ওই মারই এক বন্ধু একবার নিয়ে এসেছিল, সে এক মজার ব্যাপার। মা তো গেছে অরিন্দমের সঙ্গে, তখন দেবপ্রিয়-না-কী-যেন-ওর নাম, সে এসেছে। মা নেই? মা নেই তো মেয়েই সই, হিহি, এখানে আমাকে নিয়ে এল, শরবত খাওয়াল, রেলিংয়ের ধারে দাঁড় করিয়ে, হুফ হুফ হুফ, ঘোড়ার খুরে কত যে ধুলো ওড়ে দেখিয়ে দিল, বাস রে! কী তেজ এক-একটা ঘোড়ার—ইয়া-ইয়া উঁচু, বাদামী বা কালচে-বাদামী মাজা-মজবুত শরীর, যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে, হ্যাঁ, শক্তি একেই বলে।"

চোখ বুজে বুলা বুঝি শক্তিমান, দ্রুতধাবমান দু'একটা রেসের ঘোড়াকে ধ্যানে অনুভব করে নিল। আমি আরও বোকার মতো হয়ে যাচ্ছি।

সামলে উঠে বুলা বলল, "যাক, এই রেসের মাঠেই সেদিন মা-মেয়ে মুখোমুখি। চোখে চোখে কোলাকুলি—কী যেন, হ্যাঁ, সেয়ানে-সেয়ানে। তারপর আর-একদিন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে, অরিন্দম রায় মাকে "টা-টা" বলে চলে যাচ্ছে, জানালায় আমাকে দেখে একটা চোখ ইসক্রুপের মতো করে হাসল। মাও লক্ষ্য করেছিল সেটা। সেই থেকে শুরু। বোধহয় ভয় পেল, আমাকে আটকাতে পারবে না, তার চেয়ে ওর পক্ষে যেটা ভয়ের—আটকে রাখতে পারবে না ওর বন্ধুদের। ফ্রক-ট্রক পরিয়ে রেখে আর কতদিন। ফ্রক ছাড়ালেও ওর মুশকিল কিছু কম নাকি! ফ্রকেই বরং চাপা পড়ে কম—ওর বন্ধুরা যা-সব এক-একটা যুধিষ্ঠির! এই রকম দু'চারটে ঘটনা—" বুলা বলছিল—"মা তাই তো ভয় পেল। ওর ভেতরটা উঠল গুড়গুড় করে, বদহজম হলে পেটের মধ্যে যেমন শব্দ হয়।"

"কিন্তু", একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বুলা ঘাসে পা ঘষে ঘষে বলল,

"ওই ধরনের হিংসুটে তো হয় ছেলেরা, হুলো বেড়াল যেমন শুনেছি বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে। কিন্তু মা বিড়াল কি নিজের বাচ্চাকে—মা তো নয়, ও রাক্ষসী। রাক্ষসী আমার মা, বলল 'হা-হা'।"

'হি-হি'কে প্রসারিত করে বুলা এবার বলল 'হা-হা'।

গোল চক্করের পর চক্কর পেরিয়ে আমরা প্রায় সেই পার্কটার কাছে এসে পড়েছিলাম, যার ওপাশে ট্রামগুলো ঘুরে ঘুরে নানা দিকে আবার বেরিয়ে পড়ে। তারই কাছের চৌমাথায় নানা নম্বরের বাস সওয়ারীর জন্যে হাঁকাহাঁকি করে।

বুলা বলল, "আয় দোতলায় বসি," বলেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তরতর করে, একটু পরে সামনের আসনটাতে আমরা পাশাপাশি। ঝলকে ঝলকে হাওয়া এলোমেলো করছিল ওর রেশমী চুল, ওর রেশমী চুল লেগে লেগে এলোমেলো করছিল আমাকে, ওগুলো কি চুল, নাকি সরু সরু বিদ্যুতের তার, চমক, চমক ; চমক নয়, সুড়সুড়ি; না, সুড়সুড়িও না—একটা আবেশ ; নতুন কাপড় পরার মতো, নতুন বইয়ের পাতা নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ পাওয়ার মতো—কিন্তু আমার কী হচ্ছে বুলা তা টের পাচ্ছিল না।

সে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। পিতলের রঙে গাল রেখে। গালে বৃষ্টির ছিঁটে লাগছে। সেই বুলা, চালু বুলা, এখন আলাদা হয়ে গেছে। খুব আস্তে আস্তে বলছে, "জানিস, আমার বাবা ও-রকম ছিল না, মার মতো একটুও না। বাবা, মানে আমার আসল বাবার কথা বলছি।"

"মনে আছে?"

"একটু-একটু। চেহারাটা মনে নেই, চশমাটা মনে আছে। গোল ধরনের মুখ, চোখ দুটো মস্ত। কাগজে যাদের ছবি ছাপা হয়, সেই লীডারদের কারও কারও সঙ্গে যেন মিলে যায়। ফটো নেই তো, মা নিয়ে আসেনি, তাই প্রত্যেকটা নাম-করা মানুষের ছবি দেখলেই উপুড় হয়ে পড়ি—আমার বাবা বুঝি ওই রকম ছিল। আবছা মনে

ছায়াটিকে উদ্দেশ করে বলল, "যান না মশাই, ক'টা মালাই কিনে আনুন, দেখবেন, বেশি সিদ্ধি যেন না-থাকে, ভাঙ খেলে আমার মাথা ঘোরে"—বলে ঘোরানোটা বোঝানোর জন্যেই লীলামাসী যেন ঘাড়টা ঘুরিয়ে একটু তুলে ধরল, তখন ওর মুখে আলো, পেইন্ট করে নিশ্চয়, রঙটা কী উৎকট, লীলামাসী স্টেজে নামবে, সেটা একেবারে ঠিক হয়ে গেছে নাকি, এখন থেকেই কি তাই পেইন্ট করতে শুরু করেছে ?

ছায়ার হাতে কী গুঁজে দিল অরিন্দম, বোধহয় টাকা-ঠাকা, ছায়া নড়তে নড়তে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলে গেল। চিনেছিলাম।

কলহাস্যে পিছন থেকে লীলামাসী বলে উঠল কিনা, "যান, যান, দৌড়ে যান, ফিরে আসবেন কিন্তু চটপট, দেরি হলে অরিন্দমবাবু চটবেন, আপনার নাটকটা তাহলে আমরা আর নিচ্ছি না।"

ছায়া সামনের দিকে ঝুঁকেছে বলে একটু কুঁজো এখন, সত্যিই দৌড়চ্ছে নাকি, কিন্তু ঈশ্বর, হে ঈশ্বর আমি ওর একটা লেজও দেখতে পাচ্ছি কেন! তোমাকে তো বলেছি, মা, আমার এই রকম অসম্ভব সব দেখার ভুল তখন থেকেই হয়!

লীলামাসী শাড়িটা ঘাঘরার মতো ফাঁপিয়ে পড়ল বসে একটু নীচু হয়ে সে—কী ?—বোধহয় চোরকাঁটা বাছছিল।

"তুমি লোকটাকে নাচাচ্ছ কেন বলো তো! বোকা আধপাগলা লোকটা সেই থেকে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে", গলা যখন পুরুষের তখন নিশ্চয়ই অরিন্দম বলছে, "ও কিন্তু সত্যিই ধরে বসে আছে আমরা ওর নাটকটা নামাব, হাঃ হাঃ।"

"নাটক ? তুমি ওগুলোকে বলছ নাটক ? পালাগান তো ওগুলো, স্রেফ যাত্রা, প্যান-প্যানানি একদম। ক'টা শুনিয়েছে যেন ? এক—দুই—তিন—চারটে। বাস্ রে, মাথা ধরে যায় ?" একমুঠো লম্বা ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে লীলামাসী বলল।

"তবু তো তুমি শোনো।"

"মজা লাগে যে।"

"আমাদের আজকের মজাটা কিন্তু মাটি করে দিল। কমিক ফিগার—লোকটা একটা আস্ত বাফুন।"

লীলামাসী একটা ঘাস কামড়ে বলল "থুঃ", ঠিক ভামতী যেভাবে ফেলত।

ছায়া ফিরে আসছে তড়বড় করে, আমার চোখ জালা করছে, ওকে দেখতে চায়ের দোকানের 'বয়'-এর মতো লাগছে কেন, ভগবান আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দাও, ভাবছি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি আমি, ওর পথ আগলে দাঁড়াই কিংবা লুটিয়ে পড়ে বলি, "যেও না, ওদের কাছে যেও না, এমন চাকরের মতো করছ কেন, তুমি—তুমি না সম্ভ্রান্ত, শিল্পী না তুমি? ওরা তোমাকে নাচাচ্ছে, ওরা বিরক্ত হচ্ছে, মজা পাচ্ছে, তুমি যেও না।"

মনে মনে "পিতা হি পরমন্তপ" সেই মুখস্থ শ্লোকটা আওড়াচ্ছি, আর দেখছি সেই ছায়া আমার পাশ কাটিয়ে ওদের ওখানে হাঁটু গেড়ে বসল, অন্ধকার ওর গায়ে যেন লোমের কোট পরিয়ে দিল, অন্ধকার ওকে ভাল্লুক করে দিল নাকি, ছায়াটা কি এবার ভাল্লুকের মতো নাচতেও শুরু করবে?

ভীষণ কষ্টে বোবা আমি ডুগডুগির বাজনাও শুনতে পাচ্ছি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ওরা আর-একটা ফিটন ডেকে যাত্রা করল, কিন্তু দেখলাম সেই অনুগত ছায়াকে সঙ্গে নিল না। অথবা গেল না সেই। লীলামাসী একমুখ হাসি হয়ে বিদায় নিল।

তখন ছায়া আর আমি সামনাসামনি। সরে যাওয়ার সময় পাইনি। সে আঁতকে উঠল, ভূত দেখল যেন, তার মুখ শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছু বলল না, ধমক না, হাতছানি দিয়ে ডাকাও না, চিনতে পেরেছে যে, তার কিছুমাত্র ওই নির্বাক মুখমণ্ডলে ছিল

কি? সে হঠাৎ পিছন ঘুরে হনহন করে উলটো দিকে চলতে শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছি।

এবার আমিই ছায়া হয়ে ওর পেছনে।

আবার পাশাপাশি, ট্রাম যেখানে ঘোরে সেইখানে। হাইকোর্টটা রাত্রে মন্দিরের চূড়া হয়ে গেছে। ঘাট থেকে এই অবধি ফুটপাথে সারি সারি ভিখারী, লোকজন বেশি নেই, তবু নিতান্ত অভ্যাসবশতই ওরা "দান করে যান বাবু, পুণ্য হবে, পুণ্য হবে" বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের উনি আড়চোখে আমাকে দেখছেন। তখনও কথা নেই। একটা ট্রাম ঢংঢং আওয়াজের ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা সাফ করতে করতে এগিয়ে আসছে, তিনি করলেন কী, হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন একটা গোল চাকতি, যেটা, অনুভবে বোঝা গেল, শক্ত, ঠাণ্ডা, কোনও ধাতুর। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতল ধরে উঠে পড়েছেন ট্রামে, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আমিও—পিছনের ক্লাসটাতে।

মুঠো খুলে দেখি, একটা সিকি।

মা, তখন আমার বয়স কত আর—পাকা কিংবা পচ্-ধরা, ঝুনো কিংবা পোড়-খাওয়া তো হয়ে যায়নি! তবু আমি চট করেই বুঝে ফেলেছি ওই সিকিটার মানে কী। সিকিটা মানে আমার মুখ সেলাইয়ের ছুঁচ, সিকিটা ঘুষ, বাড়ি গিয়ে কিছু যেন ফাঁস না করি, আগাম দাম তারই।

বাবার সঙ্গে ওই সময় থেকে আমার একটা সমঝোতা হয়ে গেল। পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া। ধূর্ত, নিঃশব্দ একটা লুকোচুরি চলেছে আরও বেশ কয়েকবার। ওঁর উপরে একটা অদৃশ্য জোর পেয়ে গেছি; পরে জেনেছি, বিদেশী ভাষায় একে বলে ব্ল্যাকমেল। সুবিধা পেলেই শুধু শুধু চোখে চোখে কথা, পরে নির্লজ্জের মতো আমিও হাত পেতে ধরতাম—সেখানে পড়ত বোবা দু'আনি, সিকি, আধুলি।

ভিখিরি, সব ভিখিরি।

ওই ঘটনার কথা কখনও ফাঁস করিনি। আজ তো অমাবস্যার রাত্রে কবর খোঁড়া—মড়ার খুলি-টুলি বেরিয়ে পড়লেই বা কী ক্ষতি।

"আমি চলে যাব", খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে বুলা বলল।

কাঠের যে সিঁড়িটা বুড়োর মত নড়বড় করতে করতে দোতলা পর্যন্ত এসেছে, সেই আবার দোতলা থেকে বাচ্চা ছেলের মত হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেছে ছাদে, যেখানে চিলেকোঠা, আর-একটা শেড্ খুলে এ বাড়ির "লেসী" সপরিবারে মুফতে বাস করে।

সেদিন তারা কেউ ছিল না। দরজায় তালা দিয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়েছিল। কলেজের খাতায় নাম ভর্তি করে এলাম, তোমার মনে আছে, যাওয়ার আগে-পরে দু'বারই তোমাকে প্রণাম করেছিলাম?

মন হালকা ছিল, ছাদে ওঠার সিঁড়িটা তাই হাতছানি দিয়ে ডাকল। জানতাম না সেখানে থাকবে বুলা।

আজ বুলার চেহারা আলাদা, খোলা চুল, তখনও ভিজে, বোধ হয় খানিক আগে স্নান করে থাকবে। কারনিসে পিঠের দিকটা রেখে সে খোলা চুল বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিল, কানের কাছের কয়েক গাছি ইতিমধ্যেই রোদে শুকিয়ে হাওয়ায় উড়ছিল।

কাছে এসে দেখলাম বুলার চোখের পাতাতেও জল, চিকচিক করছে। হয়ত সবে স্নান করেছিল বলে, হয়ত খাটো ফ্রকের বদলে কচি রঙের শাড়ি পরেছিল বলে, বুলাকে খুব স্নিগ্ধ, নম্র লাগছিল, ওর পায়ের কালচে ছোপগুলো ঢাকা ছিল, চোখেও সুর্মা-টুর্মা ছিল না সে-কারণে, অথবা তথাপি, তাকে গভীর আর আয়ত-দৃষ্টি করে তুলেছিল।

ছাদের তুলসী গাছটা থেকে তাজা কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে আমি নাকের কাছে ধরেছিলাম, বুলাকে অন্তত মনে হচ্ছিল তখন ওই প্রণম্য তুলসীর মতো পবিত্র।

কোন্ কলেজ, কী পড়ব,

(আর্টস পড়বি, ওমা, ছেলে হয়ে তুই—সে কি! অঙ্কে মাথা নেই বুঝি? আমার কিন্তু সায়েনসের ছেলেদের দেখতে খুব ভালো লাগে, পুরুষদের পক্ষে ওটাই মানানসই, পরে যারা হয় মেডিকেল স্টুডেনট, গলায় ঝোলানো বুক পরীক্ষার সেই যন্ত্রটা, ভারী স্মার্ট, কিংবা ইনজিনিয়ারিং—ফিটফাট)

এই ধরনের মামুলি কয়েকটা কথায় কথায় রোদ তেজ ফুরিয়ে ফেলছিল, সুন্দর, গুঁড়োগুঁড়ো হলুদ বুলার মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে, একেই আভা, না শোভা, না কী যেন বলে ওর মুখের বন্ধুর ব্রণগুলো মুছে মসৃণ হয়ে গেল কী করে?

"আমি চলে যাব", বুলার ছায়া যখন বেয়ে বেয়ে আমার বুক পর্যন্ত উঠেছে, তখন আধো-উদাস ভাবে সে ঘোষণার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল "আমি চলে যাব।"

"কোথায় বুলা, কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করতে হল না, নিজেই সে বলল, "কোথায় ঠিক করিনি। আর কোথাও যদি জায়গা না হয়, তবে একটা অরফ্যানেজে।"

আমি কিছু বুঝতে পারছি না, চেয়ে আছি বুলার মুখের দিকে, অস্পষ্ট জড়ানো অক্ষরে লেখা চিঠি পড়তে না পেরে লোকে যেমন বোকার মত চেয়ে থাকে বুলা তখন বলল, "যার বাবা নেই, মা পালিয়েছে, তারা কোথায় থাকে? অরফ্যানেজে—অনাথ আশ্রমে। তাই না? তুমিই বলো।"

একটু এগিয়ে এসে সে আমার কাঁধে হাত রাখল। সেই ছোঁয়ায় মুখরতা ছিল না, অন্য অন্য দিন যা থাকত, কড়ার মত ছ্যাক করে উঠল না শরীর, বরং একটা শীতল জলের ধারা কাঁধ থেকে কণ্ঠনালীতে, সেখান থেকে বুকে; আবার ওদিকে পিঠে শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে নামতে থাকল। "তুমিই বলো"—বুলা এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলল।

ওকে বললাম না যে, লীলামাসীকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তার ঠিকানা হয়ত আমার বাবাও জানেন। বললাম না, যেহেতু বলতে মাথা হেঁট হয়ে যেত।

"চলে যাবে কেন বুলা", আমি চটকানো পাতার সবুজে চিত্ত ভরপুর করে বললাম, "চলে যাবে কেন। এখানে তো এখনও তোমার—" ওখানেই থেমে যেতে হল। সতীশ রায় নামক অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিটিকে সব জেনে 'তোমার বাবা' বলতে বাধছিল।

"এখানে আমার আর জায়গা নেই", বুলা, শান্ত-সংযত, বিষাদে শ্রীমণ্ডিত বুলা বলল, "নীচে আমাদের ঘরে ক'দিন হল লোকজনের সাড়াশব্দ পাচ্ছ না?"

"পেয়েছি। কারা এসেছে?"

"ওই লোকটির বউ। না না, হেঁয়ালি করছি না। ওর বউ আছে, যাকে ও ছেড়ে এসেছিল। সেই বউ তার এক বোন্‌পো না কী-এক সম্পর্কের কাকে নিয়ে চলে এসেছে। ও নিজেও নিয়ে আসতে পারে।"

একটুও উত্তাপ নেই, বুলা বলে চলেছে, "ওকে দোষ দিই না। মা তো ছেড়ে গেছে ওকেও! যে-পাড় ছেড়ে ভেসে পড়েছিল, মাঝগঙ্গা থেকে সাঁতরে সাঁতরে সেখানে ফিরে গেল। ওর দোষ কী, নইলে যে ওকে ডুবতে হত। লোকে আগে নিজেকে তো বাঁচাবে।"

বুলা একটি শরীরিণী ক্ষমা হয়ে গেছে, ক্রমেই বিস্তীর্ণ হচ্ছে। ওর অপার্থিব বিস্তারে আমার সমুখের আকাশ আড়াল হয়ে যাবে।

"আমিও নিজেকে বাঁচাব", বুলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিল, মাথা নীচু করে লোকে যেভাবে পুঁথি পড়ে, সেইভাবে "হার আমি মানব না।···স্কুলের উর্মিদি আমাকে সাহায্য করবেন বলেছেন। প্রথমে উঠব ওঁর ওখানে। ওঁর চেনাশোনা আছে, বলেছেন যতটা পারেন সুযোগ করে দেবেন।" এই পর্যন্ত বলে একটু হাসল বুলা, হাতের পাতা যেন আয়না, সেখানে শেষ বেলার রোদটাকে প্রতিফলিত দেখতে দেখতে নিজেই বলল, "ভেবো না। হয়ত সত্যি সত্যি অরফ্যানেজে

যেতে হবে না। দাঁড়াতে পারব। আর সেদিন—" উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠল বুলা, ওর মুখে ছায়া-আলো, আলো-আর-ছায়া খেলে যেতে থাকল, "দেখো, আমার মা-ও হয়ত আমার কাছে ফিরে আসবে। যখন আমার খুব নাম হয়েছে, দেশ জুড়ে সারা বছর 'শো'-এর পর 'শো' করছি, তখন—বলা তো যায় না। তখন আমাকে দেখার জন্যে টিকিটঘরের সামনে লম্বা লাইন, হল ভর্তি—বলা তো যায় না। তখন হয়ত একদিন হঠাৎ দেখব মা অবাক হয়ে বসে আছে একটা সীটে, আর তুমি—তুমিও আর-একটা আসন থেকে ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছ।"

বুলা থামল। হাত উঁচু করে খোলা চুল জড়িয়ে বাঁধল। আস্তে আস্তে ও অপসৃত হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর একটি একটি পা ফেলে ফেলে, তখন থেকেই চলার গতিতে নৃত্য রপ্ত করে নিতে চাইছে যেন, নেমে যাচ্ছে সিঁড়িটার হাতলটা একবারও স্পর্শ না করে। প্রথমে ওর পা, ক্রমশ জানু, পিঠ, গ্রীবা, কবরীসমেত বুলা অস্ত গেল।

"বলা তো যায় না।"—মা, অনেকক্ষণ ধরে আমার কানে ওর আবৃত্তির মতো করে বলা কথাটা বাজছিল। নাচের ঢেউ তুলে শিল্পী যখন পটের অন্তরালে চলে যায়, তখনও দূর থেকে শোনা যায় ক্ষীণ রিণিঝিনি, সেই শব্দ রোদ শেষ হয়ে যাবার পরও বাতাসে ভাসতে থাকল। "আমি হার মানব না, বড় হব", হয়ত বুলার এই মর্মান্তিক প্রতিজ্ঞাটা ছিল সত্য, হয়ত শুধু বাঁচার জন্যে সে দুরন্ত দুর্মর একটি আশার বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছিল।

আর সেই ছাদে, যখন একটার পর একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, অনেক পতঙ্গ একসঙ্গে বিচিত্র ব্যস্ততায় তুলছে নানাবিধ শব্দ-তরঙ্গ, তখন আমি সেই অলীক অনুভূতিটা ফিরে পেলাম। সবাই চলে যাচ্ছে, থাকছি আমি। দিনের আলো, সন্ধ্যার পাখি, রাস্তার ঘরমুখী

মানুষ, যেই যখন যায়, আমি আহত অভিমানে তাকিয়ে থাকি। সবাই যাচ্ছে, আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, যেমন বুলাও আমাকে অতিক্রম করে গেল এইমাত্র।

তারপর, তারপর—বলো তো মা, তার পর কী। তারপর তুমি। তরতর করে নেমে এলাম একটু পরে আমি। যে থাকে থাকুক, যে যায় যাক, তুমি তো আছ। তুমি থেকো।

নীচে নেমেই, তুমি কী একটা সেলাই নিয়ে বসেছিলে তখন, গলা ফাটিয়ে ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম "মা!"

সেলাই সরিয়ে তুমি চমকে তাকালে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে পিঠে হাত রাখলে, বললে, "ভয় পেয়েছিস?"

উত্তর দিলাম না। তখন হাত ঠেকালে আমার কপালে, গলায়, বুকে। "জ্বর-টর হয়নি তো? দেখি।"

কী করে বোঝাব মা, ভয় না, জ্বর না, কিচ্ছু না। কত দিন পরে তোমার ব্যাকুল শ্বাস এত কাছাকাছি পাচ্ছি, অসঙ্কোচে মুখ ঘষছি তোমার কাঁধে।

('সর, সর, কিছু হয়নি তো সরে যা—বুড়ো ধাড়ি!')

তুমি লজ্জা পাচ্ছ, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছ

('তোর আজ বল্ তো হল কী?'),

আমি আঁকড়ে ধরছি তত।

সত্যিই কিছু না। এই তো তুমি, এই তো। দেখা যাচ্ছে, ছোঁয়া যাচ্ছে, ঘ্রাণ স্নেহ সব নিয়ে, বরাবরের মতো সেই আশ্রয়টি হয়ে আছ।

সেদিন স্নায়ুমণ্ডলীতে হঠাৎ একটা ঝড় উঠেছিল কেন, ওই অস্থিরতা, তালগোল পাকানো পাগলামির হেতু এখন বুঝতে পারছি। বুঝতে পারা উচিত ছিল সেদিনও, যখন তোমাকে মেঝেয় টেনে বসিয়ে কোলে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছি, তুমি চুলগুলো থাকে থাকে ভাগ করে দিচ্ছ, আর আমি অশ্রুতপ্রায় গলায় বারে বারে বলছি, "মা, তুমিও লীলামাসীর মতো চলে যাবে না তো।"

ওই ভয়ংকর আতংকটা হঠাৎ একেবারে নিচের তিলা থেকে ভেসে উঠে থাকবে আমার সচেতন মনে। আমাকে সহসা শিশুর মতো আকুলিত করেছিল।

কিন্তু শেষবারের মতো। এর পরে-পরেই আমার অসহায় শৈশব, আমার থরথর কৈশোর আমাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে গেল।

অনেক গড়াতে গড়াতে এখানে এসে দম নিচ্ছি; ভাবছি সারা জীবনের অনেক ভয় লুকোনো থাকে, ওই ছেড়ে যাওয়া নামে আঘাতের পর আঘাতের ধাতুতে তৈরি এক কঠিন কৌটোতে।

> (প্রাণ কোথায় থাকে? সে-ও রূপকথার গল্প বলে, কৌটোতে। সেই কৌটো থাকে কার হাতের মুঠোতে, সে কি জননী, প্রণয়িনী অথবা ঘরণী—কোন-না-কোনও নারী? এক-এক বয়সে এক-এক জন, এক-এক সময়ে এক-এক জন, আমরা স্বেচ্ছায় কৌটোটা গচ্ছিত রাখি তাদের কাছে।)

ভয়ও তাই। একটা কৌটোয়। যে আছে সে ছেড়ে যাবে, এই ভয়; যা আছে তা চলে যাবে। কিছুই থাকবে না, এই নঙর্থক প্রত্যয়, নানা ছেড়ে যাওয়ায় ছাপের পর ছাপ রাখে, মনের চেহারাটা হয়ে যায় ডেড্‌লেটার অফিসের খামের পিঠ—আমার হচ্ছিল, একটা অস্বস্তি, অনিত্যতা-বোধ স্নায়ুকেন্দ্র থেকে নির্গত হয়ে উর্ণাজালে আমাকে আবদ্ধ করে ফেলছিল। দাদা, সুধীরমামা, এসব তো বাসী নমুনা। টাটকা দৃষ্টান্ত ছাখো, লীলামাসী বুলাকে ছেড়ে গেল। বুলা ছেড়ে গেল এই বাড়ি—কোথায় জানি না। আরও আছে, আরও আছে, ছাড়াছাড়ির পালা অনেক বাকী, সেদিন একলা ছাতে দাঁড়িয়ে এই ভীষণ সত্যে আমূল বিদ্ধ হয়েছিলাম, পাখিরা ঘরে ফিরছে ঠিক, কিন্তু যে-ক'টা ফেরে, শুধু তাদেরই তো দেখি, অনেকগুলো হয়ত ফেরেও না, কেউ কি তাদের হিসাব রাখে?

তুমি যদি না থাকো। থাকবে কী তবে।

সেদিন অকস্মাৎ আতঙ্ক গ্রাস করেছিল এই কারণে।

শুধু মানুষই যে ছেড়ে যায়, তা-ও তো নয়। ছেড়ে যায় অনেক অভ্যাস, শক্তি। যেমন এক সময়ে ভেবেছিলাম, কলম ধরার শক্তিও হারিয়েছি। ঈশ্বর, ঈশ্বর, অন্তরাত্মা আর্তনাদ করেছে ক্রুশে ক্লিষ্ট মানব-পুত্রের মতো, তুমিও কেন পরিত্যাগ করছ আমাকে, কী দোষ করেছি।

আবার, এ-ও জানি, ছেড়ে যাবার অনুভূতিটা অর্ধসত্য মাত্র, আংশিক। আমরাও ছেড়ে দিই, সরে আসি। অথচ মনে হয়, ওরা সরে যাচ্ছে, আমি স্থির আছি। তা সম্ভব কি? বিপরীতমুখী দু'টি গাড়িই পরস্পরকে অতিক্রম করে।

লীলামাসী গেল, বুলা গেল, তার কত পরে আমরাও ও-বাড়ি ছেড়ে আসি? খুব বেশি হলে কয়েকটা মাস, বড়ো জোর এক বছর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল সেবার কলকাতায়, সকালে আঙুল বাঁকানো যায় না, বিছানা মনে হয় হিমে ভিজে হিম, আর সন্ধ্যা হতে না হতে শহরটা খানিক ধোঁয়া খানিক কুয়াশা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। উনুনের পাশে বসে তুমি আর আমি হাত সেঁকি, আমার আবার কাশি-সর্দি জ্বর-জ্বর ভাব, তুমি বলছ "বুকে পিঠে হাতের তালুতে আর পায়ের তলায় গরম তেল মালিশ করে নে।" রাগী ঝগড়াটে বিড়াল দুটোও শীতকাতুরে, আগুনের তাতের লোভে উনুনের পাশে শুয়ে থাকত, পাত্তাই পাওয়া যেত না সিঁড়ির নিচের কুকুরটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা তখনও বাইরে। ফিরবেন কখন কে জানে।

উনুনের পিঠে মেলে-ধরা হাত গুটিয়ে তুমি হাসলে।—"আর পারছি না। গাঁটে গাঁটে ব্যথা, বোধহয় বাতে ধরল। তোর বয়স কত হল রে?"

"তুমিই তো জানো। কত আর—সতেরো?"

চোখ বুজে কী হিসাব করে বললে, "না ষোল। ঠিক ষোল—এইবার পূর্ণ হচ্ছে।"

"বয়সের কথা এখন কেন ?"

"না, শরীর চলছে না, ভাবছি কবে রথ-বল সব যাবে, অথর্ব হয়ে পড়ব, বরং তোর বিয়ে দিয়ে দিই। বল্ কেমন বউ তোর পছন্দ, ডাগরডোগর, না একেবারে ছোট্টটি ?"

এ-সব কথায় আমার কান লাল হয়, মানে তখন হতে শুরু করেছে ; না আরও কিছু-কিছু ঃ গলায় কী যেন জমে যায়, ভিতরটা টনটন করে ওঠে। প্রথমটা তাই কিচ্ছু বলতে পারছিলাম না, পরে আবার যখন জিজ্ঞাসা করলে "কেমন বউ তোর পছন্দ", তখন জানতামই তো ঠাট্টা করছ, তাই ঠাট্টার ধরনেই ফশ করে বলে দিলাম, "তোমার মতো।"

সতেরো

কতক্ষণ পরে সদরের দরজাটা কড়কড়-কড়াৎ করে উঠেছিল ? চার দিক ছমছমে, তাই আমাদের ঘর থেকেও শোনা গেল। আমি চমকে উঠেছিলাম। তুমি কান পেতে শুনলে একবার, বললে, "এ-বাড়ি নয়। বোধ হয় পাশের বাড়িতে।"

তখনও শব্দ হতে থাকল।

জানালা খুলে দিতেই কনকনে অনেকখানি হাওয়া একঝলক তীরের মতো ঘরটার দেওয়াল, আমাদের চোখমুখ বিঁধিয়ে দিয়ে গেল। সদরে শব্দ হচ্ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বিবর্ণ গলায় বললাম, "এই বাড়িতেই তো!"

"কিন্তু দরজা তো খোলা। কড়া নাড়ে কেন ?"

"বোধহয় নতুন লোক। জানে না।"

তখনই বোঝা গেল, যে এসেছিল সে সাড়া না পেয়ে দরজাটা ঠেলেছে, পাল্লাজোড়া হা-হা হয়ে গেছে হঠাৎ, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে ভারী একটা কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছে, "কে আছেন, এ-বাড়িতে কে আছেন ?"

রাস্তার গ্যাসের আলো সেই ফাঁক দিয়েই তেরচা ভাবে পড়েছিল বাইরের প্যাসেজে। মাথায় আলোয়ান জড়ানো একজন লোক সেই একফালি আলোর রেখা ধরে ধরে আসছে এগিয়ে, তার মুখে "কে আছেন, কে আছেন ?" আর একটু এগোতে সুস্পষ্টভাবে বাবার নামও শোনা গেল, লোকটা জিজ্ঞাসা করছে এটা কি তাঁর বাড়ি ? বলতে গেলাম "হ্যাঁ", কিন্তু গলায় কথা বেরুলো না, স্বর বসে গেছে।

সে তখন ঠিক আমাদের জানালার নীচে। তুমি আমাকে পিছন থেকে একটু ধাক্কা দিয়ে বললে, "যা তুই নেমে যা।"

"আমি যাব না মা, ভয় করছে।"

"এত ভিতু! ভয়তরাসে কোথাকার।" ধমক দিয়ে বললে তুমি কিন্তু স্বর চাপা, অবাক হয়ে দেখছিলাম মাথায় কাপড় তোলা, অপরিচিত একটা লোকের উপস্থিতিতেই ঘোমটা টেনে দিয়েছ?

তাড়া খেয়ে গলা বাড়িয়ে কোন মতে বলতে পারলাম, "হ্যাঁ, এই বাড়ি। কিন্তু বাবা তো বাড়ি ফেরেননি!"

তাকে বলতে শোনা গেল, "জানি। জরুরী খবর আছে। কোন-দিকে সিঁড়ি?"

চাইছিলাম না যে, লোকটা আসে। এ-ও বুঝতে পারছিলাম যে, আসবেই। একবার যখন মনস্থ করেছে তখন লোকটা আসবেই, যেহেতু সে তখনও গুটিগুটি সেই খিলেনের দিকে এগোচ্ছে যার পরেই বাঁক ঘুরে সেই কাঠের সিঁড়ি।

তখন অগত্যা আমি জানালার বাইরে লনঠনটা নামিয়ে দিয়ে প্রাণপণে দোলাতে লাগলাম আর বলতে থাকলাম, "এই দিকে, এই দিকে।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঠকঠক শব্দ উঠে আসছে। কাঠ হয়ে ভাবছি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেব নাকি, ওর যা বলার আছে বাইরে থেকেই বলুক না, কবাটে কান পেতে ভিতর থেকে আমরা শুনে নিলেই বা ক্ষতি কী।

নীচে যখন ছিল, তখন শুধু মাথায় চাপানো আলোয়ানটা দেখা যাচ্ছিল, উপরে উঠে সামনাসামনি দাঁড়াল যখন, তখন ওর ভুরুহীন দুটো চোখ দেখতে পেয়েছি। মুখ-মণ্ডলের বাকী অনেকটা ভাগ ঢাকা, যদিও সেই মুখেরই প্রায় দক্ষিণ মেরুতে মৃদু ভূকম্পের মতো ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, তখন দরজা আগলাবার আর সময় নেই, বন্ধ করা তো অসম্ভব, তাই সেই নড়া ঠোঁটের সামনে নিরস্ত্র আমি দাঁড়িয়েছি, ঘোমটা-টানা তুমি পিছনে, হাত আমার কাঁধে—বোঝা যাচ্ছে না ভরসা দিচ্ছ না পেতে চাইছ।

ওর ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কথা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, হয়ত ওর সব দাঁত নেই তাই ; লোকটা বৃদ্ধ বলে। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলে তুমি, পিছন ফিরে দেখি তোমার মুখ ফ্যাকাশে। আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে "তোর—বাবার কী যেন হয়েছে, ইনি বুঝিয়ে বলতে পারছেন না, বলছেন অজ্ঞান হয়ে গেছেন—বলুন, বলুন না কোথায়—কোথায় আছেন তিনি—"

লোকটি একটু ইতস্তত করে বলল, "অফিসে।"

"অফিসে মানে থিয়েটারের সেই প্রেসে ?"

ঘাড় নাড়ল লোকটা। জেরা করার সময় ছিল না, ভাববার তো নয়ই, তুমি সমস্ত অস্তিত্বসুদ্ধ নড়ে গিয়ে বলে উঠলে—"তুই যা, এক্ষুনি যা।"

আমি কী বলব, বলবার সময়ই বা দিলে কই তুমি, গায়ের উপর ভারী কী পড়ল, চেয়ে দেখি মোটা চাদর একটা, দেখতে দেখতে জুতোয় পা গলিয়েছি, একটু পরেই দেখতে পাচ্ছি, সেই লোক আগে আগে, আমি তার পিছু নিয়েছি।

শীতার্ত রাত্রি, রাজপথ তবু সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে পড়েছিল। সম্মোহিতের মতো চলতে না থাকলে আমি ভয় পেতাম। ট্রাম এল, ওর ইসারায় উঠলাম। অনেক পরে ট্রাম একটা জায়গায় থামল, নামলাম। ও কি কাপালিক আর আমি নাগরিক এক নবকুমার ?

সেই মোড় থেকে একটা রিক্শায়। "এখনও কি অনেক দূরে ?" আমার গলা একেবারে পেটের তলা থেকে উঠে এল, শুনলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি কাকে। সে তো আগাগোড়া চাদর মুড়ি, দুরন্ত শীতে তার ফোকলা মুখ থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে হি-হি হু-হু ইত্যাদি অব্যয়, সামনে মোটা পরদা টানা, কোথায় যাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে না।

সে হঠাৎ বলে উঠল "থামো, থামো এইখানে", আর বশীভূত

রিক্‌শাটা ঠন করে একটা শব্দ করে সত্যিই থেমে গেল। চার দিকে চেয়ে বললাম, "কই এ-তো থিয়েটারের সেই প্রেস নয়, এ তো অন্য রাস্তা মনে হচ্ছে যেন?" জোর করে বলার মতো সাহস ছিল না; "যেন" কথাটা জুড়ে দিয়েছিলাম এই কারণে।

ঘাড় ফিরিয়ে কী বলল লোকটা, আগের মতোই অস্পষ্ট স্বর, অথচ আশ্চর্য, এখন ওর কথা মোটামুটি বুঝতে পারছি—সে বলল, "না, প্রেস নয়। তোমার বাবা আছেন এই বাড়িতে!"

চড়া আলো জ্বলছিল, ঘরজোড়া ফরাস পাতা, ঘরের ভিতর একাধিক লোক আছে বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার চোখ ঝাপসা, প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি।

চৌকাটে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল—যেন ঘোষণা করল—"প্রণব-বাবুর ছেলে", আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে টুক করে সেই ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল।

তখন সেই ফরাসে বসে-থাকা মূর্তিগুলির একটিকে ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। "প্রণবের ছেলে তুমি? আরে এসো, এসো", কিন্তু তিনি কী বলছিলেন আমি ভালো করে শুনতে পাইনি, যদিও খুব সতেজ উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর, আমি চোখ তুলে দেখছিলাম তাঁর কান্তি। দীর্ঘ, সুপুরুষ, স্বর্ণপ্রভ—কোনও মানুষের এত রূপ আমি এত কাছাকাছি থেকে আগে দেখিনি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, নীচু ছাদটা প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন, বিশাল দুটি চোখ একটু রক্তাভ, বাসী ফুলের পাপড়ির মতো একটু ক্লান্তও। তিনি এগিয়ে এলেন, আর আমাকে দু-হাতে এক-রকম সাপটে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঘরের মাঝখানে—সময় বেশি নয়, তবু এরই মধ্যে আমার কাশীরাম দাসে পড়া "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি···খগরাজ, পায় লাজ নাসিকা অতুল"—এই সব লাইন মনে পড়ে গেল।

"প্রণবের ছেলে, প্রণবের ছেলে এসেছে" তিনি কাকে ডেকে বললেন, "বসতে দাও, বসতে দাও, এই জাজিমটাতেই জায়গা করে দাও, ও নলিনী, ও নীলি"—তাঁর কণ্ঠস্বর জ্বাল-দেওয়া দুধের মতো ঘন গাঢ়, শঙ্খের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল, আবার শঙ্খের মতো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। তাঁর টলমল এক পায়ের ধাক্কায় একটা গ্লাস গড়িয়ে পড়ল।

(গড়ানো গ্লাসের চেহারা কী করুণ, কাত হয়ে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে, তার ঠোঁটে ফেনা, গাঁজলা আস্তে আস্তে কষের মতো শুকোয়।)

যাকে নলিনী বলে ডাকা হল, সে এবার সামনে এল। কালো-পেড়ে শাড়ি, হাতে কাচের চুড়ি, পাটির মত পরিপাটি চুল বাঁধা, এগিয়ে এসে সে মস্ত ওই মানুষটাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "আঃ, কী হচ্ছে সব্যসাচীবাবু, দেখছেন না বাচ্চা ছেলে, ঘাবড়ে যাবে যে।"

আস্তে আস্তে পিছু হঠে, ঠিক থিয়েটারে যেভাবে হাঁটে, তিনি ঝপ করে বসে পড়লেন তার-বাঁধা একটা যন্ত্রের উপরে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। ফরাসের উপরে কোচাটা পড়ে রইল শুঁড়ের মতো, উনি লম্বা, কিন্তু ওঁর ফিতে-পাড় ধুতিটার কোঁচানো কোচা লম্বা ওঁর চেয়েও।

ইনিই সব্যসাচী। বিখ্যাত অর্জুন, বিখ্যাত কালকেতু, বিখ্যাত জাহাঙ্গীর—থিয়েটারে মোটে একবারই দেখেছি, বাবা দেখিয়েছিলেন—দেওয়ালে দেওয়ালে দেখেছি কত পোসটার—আমার পলক পড়ছিল না। আমার অপলক দৃষ্টি অনুসরণ করে উনিও যেন একটু ফুলে উঠলেন, বুক চিতিয়ে বললেন, "চিনতে পেরেছ তাহলে? হ্যাঁ, আমিই সেই সব্যসাচী, মঞ্চে যে অনবরত রাজা, আমীর, নবাব সেজে থাকে, আর সাজঘরে? স্রেফ ভিখিরি—হাজার মরণে মরেছি, চরণে চরণে বেজেছি।"

"আঃ, কী হচ্ছে! আপনাকে বললাম না সব্যসাচীবাবু, বাচ্চা একটা ছেলে—"

"বাচ্চা ছেলে?" ছাত কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন তিনি, আমাকে যাচাই করতে থাকলেন ঢুলুঢুলু দুটি চোখ দিয়ে, বললেন, "বাচ্চা, বাচ্চা কই! দিব্যি তো গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। নীলি, ওই বয়সেই আমি যা পেকেছি তাতে এখানে-ওখানে একটা-দুটো বাচ্চা হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। হয়ে গেছে কিনা তাই বা কে জানে।"

"আঃ", এইবার সত্যি সত্যিই চড়া গলায় একটা ধমক দিয়ে উঠল সে, যার নাম নলিনী, আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বারান্দায়, একটা বেনচে বসিয়ে দিল।—"তুমি কিছু মনে কোরো না, উনি একটু ওই রকম, পেটে কিছু পড়লেই আলগা হয়ে যান।"

এতক্ষণে আমি বলতে পারলাম, "বাবা?"

"প্রণববাবু পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। এখন একটু ভালো। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান।"

"হঠাৎ?"

নলিনী, ওই মহিলা, এই প্রশ্নে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল। "হঠাৎ, মানে ঠিক হঠাৎ নয়, মানে একটা আঘাত পেয়েছিলেন, তোমাকে বলব পরে, সব বলব। তাই থেকেই ফিটটা হল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল গল গল করে, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কখনও তো দেখিনি, তা ভয় পাবার তেমন কিছু নেই, তুমি কাঁপছ কেন খোকা, ইস কপালটা যে হিম, ঠাণ্ডা লাগছে বুঝি এখানে, না ভয়ের বিশেষ কিছু নেই, ডাক্তার এসেছেন, ওষুধ দিয়েছেন, বললেন "স্ট্রোক", প্রথম স্ট্রোক, ওই রকমই হয়, বোধহয় ব্লাডপ্রেসার না কী ছিল তোমার বাবার—ডাক্তারবাবু বললেন রক্তটা নিজে থেকেই বেরিয়ে গেল সেটা ভালোই হল, না-হলেই বরং ভয় বেশি ছিল, এখন চাই কিছুদিন বিশ্রাম, তা-হলেই ঠিক হয়ে যাবে, একি তুমি এখনও কাঁপছ কেন খোকা, একটু গরম দুধ খাবে, এনে দিই?"

শুধু দুধ নয়, সে আমাকে প্লেটে ক'রে দুটি সন্দেশও এনে দিল।
দুধের গ্লাসে কেমন-একটা কড়া গন্ধ, বললাম "ওষুধ ওষুধ গন্ধ যে!"
যেন লজ্জিত হল সে, কালো পাড়ের আঁচল ঘুরিয়ে লজ্জা ঢাকল,
বলল "ও কিছু নয়, তোমার বরং ভালোই হবে, গায়ে বল পাবে এই
শীতে", তারপর আমার মুখের কোণে দুধের ছিটে লেগে ছিল বলে,
এদিক-ওদিক চেয়ে বোধহয় একটা গামছা-টামছা খুঁজল, শেষে
নিজেরই কাপড়ের কোণ দিয়ে আমার ঠোঁট মুছিয়ে দিল।

আমি, সারা শরীরে জড়োসড়ো, সরে যেতে চাইছি, কিন্তু সে
বলল, "লজ্জা কী, তুমি তো আমার ছেলের মতো। মা বুঝি ছেলের
মুখ মুছিয়ে দেয় না?"

ভেবে ছ্যাখো মা, নিজের সঙ্গে ও তোমার তুলনা দিল! স্থান-
কাল ভুলে জোরে জোরে মাথা নাড়লাম আমি, বিশ্রী গলায় বললাম,
"আপনি আমার মা নন তো!"

প্রস্তুত ছিল না সে, তাই প্রথমে একটু যেন থেমে গেল, তারপর
ক্রমশ শক্ত হল তার মুখের পেশী, নাকের বাঁশি কাঁপতে থাকল, সে
শক্তি সংগ্রহ করছে, তারপর সেই শক্তির সবটুকু ঢেলে দিয়ে বলল,
"আমি তোমার মা। কিছু জানো না তুমি, কিছু না।"

তার কণ্ঠস্বর সুনিশ্চিত, দৃঢ়, একটু আগে যে-স্বরে সে "আঃ কী
হচ্ছে" বলে বিশাল প্রবল সব্যসাচীকে ধমক দিয়েছিল।

"এসো, এবার তোমার বাবাকে দেখবে এসো।" তার কিছু
পরেই, বোধ হয় নেই-কথা অস্বস্তি ভাঙতে সে বলল, তার পিছনে
পিছনে পালিত প্রাণীর মতো গিয়ে ভেজানো ঘরটার চৌকাটে
দাঁড়ালাম।

এই ঘরটার দেওয়ালে মৃদু-নীল আলো, বাবা ঘুমন্ত, আলোর
আভা ছড়িয়ে পড়েছে ওঁর চওড়া কপালে, বাবাকে এত সুন্দর আগে
কখনও দেখিনি।

কী বলতে যাচ্ছিলাম, সে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চুপ"।

আদিষ্ট আমি তার পায়ের পাতায় চোখ রেখে রেখে পাশের ঘরে গেলাম।

সে-ঘরে তখন সব্যসাচী আর শূন্য গেলাসটা পাশাপাশি, একই সঙ্গে ফরাসে গড়াচ্ছেন দু'জনে। মনে হল, পাশের ঘরে যেমন বাবা, সব্যসাচীও এখন তেমনই নিহিত ঘুমে। কোমরের কষি ঢিলে হয়ে গিয়ে ওঁর ভুঁড়িটা এখন যথেষ্ট স্পষ্ট, যেটা বয়সের লক্ষণ, কোমরবন্ধ এঁটে আঁটসাট পোশাকে যখন রাজা সাজেন, কি বীর সেনাপতি, তখনও কি এ-এব লক্ষণ ফুটে থাকে ?

ওখানে বসা উচিত হবে কি হবে না যখন নিজে স্থির করতে পারছি না, পারছিনা তাই নলিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি; তাকিয়ে আছি সংকেতের অপেক্ষায়, তখন সে নিজেই একটা ধারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এইখানে বোসো।"

বলেই বুঝতে পারল সব্যসাচী ওখানে, তাই আমি ইতস্তত করছি। হেসে বলল, "ভয় কী, বোসোই না। দেখছ না, ও এখন একেবারে আলাদা মানুষ, ঘুমিয়ে কাদা ? কিচ্ছু বলবে না!"

জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। সে তখনও অহেতুক সব্যসাচীর হয়ে ওকালতি করে চলেছিল।—"ও ওইরকমই। দশাসই মানুষটা, কিন্তু যখন যা করবে তার চূড়ান্ত করে ছাড়বে। বাড়াবাড়ি ছাড়া জীবনে কিছু করল না। আসলে ভেতরে ভেতরে খুব নরম কিনা, তাই সেটা ঢাকতে ওর যত বাড়াবাড়ি বাইরে।"

সত্যি কথা বলব, আমি এ-সব কথা একবর্ণ বুঝতে পারছিলাম না। উশখুশ করছি, আর কতক্ষণ এখানে থাকব, বাড়িতে তুমি বোধহয় তখনও বসে আছ, এই দুর্জয় শীতে যাবই বা কী-করে, যে নিয়ে এসেছিল সেই কি আবার সঙ্গে যাবে, এইসব নানা ভাবনা, তার উপর অপরিচিত এই পরিবেশ, পাতা ফরাস, ফরাসে গেলাস, গেলাসের পাশে সব্যসাচী ; আমাদের সেই আধা-শহরের বাড়িতে যেমন সন্ধ্যার পর চারদিক নানা পাখি, পোকা আর ঝিঁঝিঁর স্পষ্ট ডাকে ভরে

যেত, এখানে এই বাড়িতে তেমনই কাছে-দূরে অনেক চাপা হাসি-হুল্লোড়, তবলার বোল্, মিহি সুরের গান শুনছি। আমার ক্লান্ত স্নায়ু মাছির মতো নানা শব্দের জালে ধরা পড়ে ছটফট করছিল।

আমি যাব কখন, বাবাকে রেখে যাব না নিয়ে যাব, এ-সব প্রশ্ন তো ছিলই, তা-ছাড়া সবচেয়ে জরুরী কথাটা তখনও যে জানা হয়নি —বাবা এখানে এসেছিলেন কেন।

আমার হয়ে সমস্যাটা মিটিয়ে দিল নলিনীই। যেন আমার মনের কথাটা বুঝল।—আঁচলে কপাল মুছে বলল, "ইস্, আজ সন্ধ্যা থেকে কত কাণ্ডই না ঘটল। নাটক হয় থিয়েটারে, আজ আমার ঘরেই। পুরোপুরি একটা নাটক। এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। প্রথমে তো এলেন প্রণববাবু, তোমার বাবা।"

—"আসেন বুঝি?" মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে এল, আর নলিনীও যেন বুঝল কথাটার নিহিতার্থ।

আস্তে আস্তে বলল, "আসেন বলিনি তো, বলেছি এলেন। আমি তখন সবে গা ধুয়ে উঠে এসেছি ওপরে। দেখি, উনি তক্তপোশে বসে। হাতে একগোছা কাগজ, তাড়ার পর তাড়া। বললাম, ওগুলো কী। প্রণববাবু বললেন, আমার লেখা পালা। আজ তো স্টেজ বন্ধ, ভাবছি, সব্যসাচীবাবুকে শুনিয়ে যাব খানিকটা। বললাম, সব্যসাচীকে শোনাবেন তো এখানে কী। আসলে একটু রাগ করেছিলাম তোমার বাবার ওপরে। উনি সেটা ধরতে পারলেন না, পারলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। উনি হেসে বললেন, আসবেন আসবেন, খবর নিয়েই এসেছি। আমাকে কথা দিয়েছেন সব্যসাচীবাবু, আমার প্লে স্টেজে নামাবেন, অথচ সময় দিতে পারছেন না। আজ পর্যন্ত ওঁর ভালো করে শোনাই হল না। এখানে ওঁকে ধরব বলে এসেছি। আমি অবাক হয়ে বললাম, শোনাবেন এখানে? পারবেন? প্রণববাবু কাচুমাচু মুখে বললেন, কত দিন ধরে এগুলো বয়ে বয়ে সব্যসাচীবাবুর পিছুপিছু ঘুরছি জানেন? আর পারছি না।

কথা দিচ্ছি আপনাকে, বেশিক্ষণ আপনাদের জ্বালাব না—ঘণ্টা দুই বড় জোর। একটু বসি? এমনভাবে প্রণববাবু বললেন একটু বসি যে, তুমিই বলো, কেউ কাউকে চলে যেতে বলতে পারে?"

নলিনীর কথা অনর্গল শুনে যাচ্ছি, রাত বাড়ছে, যত বাড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে তত, তবু ঘুম পাচ্ছে না। সেদিন কতক্ষণ পরে এসেছিলেন সব্যসাচী চৌধুরী? সন্ধ্যার ঢের পরে, বাবা ততক্ষণ নাকি কাকুতি-মিনতি করে নলিনীকেই কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাতে শুরু করেছেন।

> ('তুমি যদি একটু বলে দাও নলিনী'—হঠাৎ বাবা নাকি অল্পপরিচিতা ওই মহিলাকে 'তুমি' বলে ফেলেছেন—'তা-হলে সব্যসাচীবাবু নিশ্চয়ই এটা নিয়ে নেবেন। একবার স্টেজড্ হলে আর পায় কে। লোকে এটাকে নেবেই—তুমি দেখো।')

পড়া চলছে, ঠিক তখনই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেছেন সব্যসাচী। বাবা ফরাসে বসে পুঁথির পাতা ওলটাচ্ছেন, নলিনী তক্তপোশে গালে হাত দিয়ে শুনছে, সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ প্রবেশ করেছেন যিনি, তিনি নায়ক ও নটোত্তম, ঘাড় বেঁকিয়ে বলে উঠেছেন, "বাঃ, উত্তম, এ উত্তম।"

"তার পরে" নলিনী বলে গেল, "যা-যা হল, যে-যে বিশ্রী কথা সব্যসাচী, মানে ওই লোকটা, বলে গেল, তোমাকে তা বলতে পারব না। এইটুকু জেনে রাখো, তোমার বাবা ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন, সব্যসাচী ওঁর গায়ে হাত দেয়নি অবিশ্যি, মানে দিতে পারেনি, আমিই ঠেকালাম, তখন লোকটা কুৎসিত ভাষায় আমাকে গালাগালি দিল, নিজে গড়িয়ে পড়ল ফরাসের একধারে, গোঙাতে থাকল, ওদিকে তোমার বাবা অজ্ঞান অন্ধধারে, রক্ত, সে কী রক্ত! তোমাকে কী বলব, উনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন, হাতের লেখা পাতাগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্যাপারটা কী জানো, তোমার

বাবা প্রণববাবু বাইরেই ও-রকম একরোখা মানুষ, ভেতরটাতে খুব নরম, গ্রীনরুমে ঠোঙা ভরে ভরে আমাদের কত খোবানি বিলিয়ে যান, একবার আমার গলা একটু ধরেছিল, উনি অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে নিয়ে এলেন এক গ্লাস গরম পাঁচন, প্রায় রোজই থিয়েটারে আসতেন তো ; মানে যদিও উনি প্রেসের ম্যানেজার, ওঁর কাজ শুধু প্রোগ্রামে পোস্টারে বড় বড় হরফে সকলের নাম ছাপানো, তবু ওঁর ধারণা, ওঁর আসল কথা ওটা নয়, উনি আসলে পালা-লিখিয়ে, ওঁর বই অভিনয় হবে, নাম ছড়াবে, এই সব আর কী !"

(মা, এ-ব্যাধি বাবার একার নয়, আমরা যা করি,
যার মধ্যে আছি, সেটা আমাদের নয়, আমরা
প্রত্যেকেই ভাবি আমরা আসলে অন্যলোক,
আমাদের সার্থকতা অন্যত্র—এই ভাবনায় জর্জর থাকি
অহরহ, যন্ত্রণায় অস্থির হই, অযথা ঘটাই রক্তপাত।)

"আমি ওঁর কষ্টটা বুঝতাম, বুঝি"—নলিনী বলছিল, বলতে বলতে ওর স্বর কোমল হয়ে এসেছিল, "যাক, তোমরা ভয় পাবে, তাই খবর দিয়ে তোমাকে আনিয়েছিলাম। দেখে তো গেলে, মাকে বোলো। উনি এখন ভালোই আছেন। কাল সকালে থিয়েটারের গাড়িতে পাঠিয়ে দেব। তুমি—তুমি এখন যাও। অনেক রাত হল।"

ইতস্তত করছি দেখে জুড়ে দিল "যাবে বৈকি, যাবে। যেতে হবে। এখানে থাকতে নেই। বুঝতে পারছ না ?" সব্যসাচীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "এখানে সারা রাত কেউ থাকে না তো। ওরাও না। সবাই চলে যায়, খালি আমি থাকি। আজকের রাত অবিশ্যি আলাদা—দু' ঘরে দু'জন ঘুমে, একা আমি থাকব। আমাকে জেগে থাকতে হবে—আমার অবস্থাটা দেখছ তো!" বলে নলিনী ম্লান হাসল। আমার সঙ্গে নেমে এল নীচে। ইসারায় যে ট্যাক্‌সিটা ডাকল, বোঝা গেল তার চালক তার চেনা। আবার আমার চোখে

চোখ রেখে বলল, "ভয় নেই। ও তোমাকে ঠিক পৌঁছে দেবে।" শেষবারের মতো আমাকে স্পর্শ করল সে, হাতে একটু চাপ দিল, "কাল সকালে প্রণববাবুকে পাঠিয়ে দেব। আর—উনি যে আমার এখানে, তা কিন্তু তোমার মাকে বোলো না, বোলো উনি আছেন, থিয়েটারের একটা ঘরে।"

মা, কিছুদিন তোমার সেই ধারণাই ছিল। কেননা, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। সজ্ঞানে। বাবা পরদিনই এসেছিলেন ঠিক। থিয়েটারেরই গাড়িতে। ধরাধরি করে ওঁকে উপরে নিয়ে আসা হল। কাঠের পুরনো সিঁড়িটা সেদিন আরো বেশি করে কাঁপল। সেখান থেকে বাবা সোজা বিছানায়। জ্ঞান ফিরে এসেছিল, আরও ফ্যাকাশে মুখ, ঠোঁট থেকে থেকে কেঁপে কী-যেন বলতে চাইত, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চোয়াল-চিবুক বেঁকে-চুরে বিকৃত হয়ে যেত। ডাক্তার আসছিল।

তারপর বাবা একদিন মাথাও তুললেন, মাঝখানে কেটে গেছে ক' সপ্তাহ, ক' মাস, হিসাব নেই। একদিন বাবা উঠেও বসলেন। তারপর ক্ষীণ গলায় আমাকে খাতা আর পেনসিল আনতে বললেন—সে কত দিন পরে?

বালিশের উপরে খাতা রেখে বাবা ঘাড় গুঁজে লিখছিলেন। একটানা নয়, থেমে থেমে। ঘরের এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি ওঁর আঙুলগুলো কাঁপছে।

তুমি ঘরে ঢুকলে। একটু ঝুঁকে পড়ে লেখাটা দেখতে গিয়েছিলে বুঝি, বাবা তাড়াতাড়ি খাতাটা চাপা দিলেন। অল্প হেসে তুমি বললে, "থাক থাক, লুকোতে হবে না। দেখতে চাই না, দেখার সময় ত নেই আমার। পালা লিখছ বুঝি—আবার?"

সেই রক্তপাতের পর থেকে বাবার চোখ সর্বদাই সাদা দেখাত। যে-হাসি তখন তিনি হাসতেন তার রঙ সাদা।

—"পালা? না, আনু, পালা না। ও-সব আর লিখব না। লিখছি, মানে, এই এমনি।"

"বোসো। আগে তোমার ওষুধটা আনি।" এই বলে তুমি সরে গেলে, ফিরে এলে খলে চাল-ধোওয়া জল আর কবিরাজী ওষুধ ভরে নিয়ে। অসুখটার পর বাবার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা সহজ হয়ে এসেছিল। আগেকার সেই আড়ষ্টতা, সেই কাঠিন্য ছিল না।

কিন্তু ওই খাতাটা? খাতাটাই সব গোলমাল করে দিল আবার। বাবা কেন যে এত অসাবধান, রোজই ওটা কোথায় লুকিয়ে রাখতেন কেউ টের পেত না, কিন্তু একদিন হয়ত ভুলে গেলেন। কবিরাজের কথামত তিনি তখন সকালে-সকালে পার্কে এক-একটা চক্কর দিয়ে আসতে শুরু করেছেন।

কলতলা থেকে মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি, তখনও উনুন ধরেনি, তুমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, খোলা খাতাটা আলোর সামনে ধরে।

আমার নিশ্বাস পড়ল তোমার কাঁধে, তুমি চমকে খাতাটা ঢেকে ফেললে আঁচলে, সেদিন বাবা যেভাবে ঢেকে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনই, তোমার মুখ শুকনো। তখনো আমি বুঝতে পারিনি ওই লজ্জার খাতাটায় গোপন কী-এমন কথা লেখা আছে বা থাকতে পারে, তোমরা দু'জনেই যা ঢাকছ?

আঠারো

সেই খাতাটায় কি যে ছিল, বুঝেছিলাম পরে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে খাতাটাকে যেদিন আমিও পেয়ে গেলাম।

না, পালা নয়। ডায়েরি। কয়েক লাইন পড়তেই বোঝা গেল বাবা সেদিনের ঘটনাটা লিখে রেখেছেন।

> (তখন বুঝিনি কেন। কেন যে বাবা কাগজে-কলমে সব কবুল করতে গেলেন। এই সর্বনাশা খেয়ালের মানে খুঁজে পাইনি। সেই মানে আজ পরিষ্কার। নিজের কাছে সাফ থাকার জন্যে। সব মানুষকেই কখনও-না-কখনও এ-কাজ করতেই হয়। করতেই হয়, নতুবা আমিই বা কেন আজ যেচে সব উজাড় করে একাকার করে দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে দু'টি আলাদা মানুষ বাস করে: একজন অপরাধ করে, করে চলে, আর একজন নিজেকে ধরিয়ে দিতে তলে তলে সর্বদাই জোগাড়-যন্ত্র করে যায়। আমরা দু'টি বিপরীত অভ্যাস মিলিয়েই।)

ডায়েরির ভাষাটা ছিল এই রকম:

সব্যসাচী আমাকে ভুল বুঝিলেন। ভাবিলেন নলিনীর ওখানে আমিও গিয়াছি ফূর্তি করিতে। তিনি টলিতেছিলেন, চোখ রক্তিম, বোঝাই যায় কিছু অতিমাত্রায় পানাদি সারিয়াই তবে তিনি ওখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার আরক্ত অক্ষি দুইটি হইতে যেন অগ্নিগোলক বর্ষিত হইতে থাকিল। "শালা", থরথর করিয়া, রাগে কিংবা নেশায় কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি কদর্য যে সম্বোধন দিয়া শুরু করিলেন, কলমেও সেটা লিখিয়া রাখিতে কষ্ট হইতেছে,

তিনি বলিলেন "শালা, চোরের মতো এখানে ঘুরঘুর করিতে শুরু করিয়াছিস! কুকুর হইয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ ঠেকাইতে চাহিতেছিস?"

তাঁহার মাথার ঠিক ছিল না, মুখের কথারও না, সুরচিত, মহচ্ছন্দে পরিপূর্ণ যে-সব সংলাপ তাঁহার মুখে নিয়ত শুনি, তাহার সঙ্গে এই ভাষার কিছুমাত্র মিল নাই। তাঁহাকে বলিতে চাহিলাম, নলিনীর নিকট আমি আসি নাই, আসিয়াছি তাঁহারই নিকটে, আমার রক্ত দিয়া লেখা সব রচনা, আমার বুকের শিরা-ছেঁড়া ধন তাঁহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিব বলিয়া, এই আমার শেষ চেষ্টা, আমার সব সাধনা সার্থক হইয়া উঠিবে, কাঁটার মতো যাহা নিরন্তর ব্যথা দিতেছে তাহা পুষ্পের মতো সৌরভে ভরিয়া উঠিবে, সকলে আমোদিত হইবে—আমোদিত হইব আমি নিজেও, আমার নিজস্ব, আমার প্রকৃত এবং মূল ব্যক্তিসত্তায় অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। বহু রাত্রির সব স্বপ্ন সফল হইবে আমার—এই আমার শেষ চেষ্টা।

বলিতে চাহিলাম এই সমস্ত কথাই, কিন্তু পারিলাম না। পলকে আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন চিরকালের চেনা একটি সিংহ ক্ষুদ্রকায় কিন্তু নিষ্ঠুর ও পিচ্ছিল সরীসৃপ হইয়া যাইতেছে। করুণ নয়নে তখন চাহিলাম নলিনীর দিকে, সে কিছু বলুক। নলিনী সুন্দরী, স্বভাবে মধুরা, বৃত্তি যাহাই হউক তাহার চিত্তটি উচ্চ, উপরন্তু সে দয়াময়ীও বটে। নলিনী বুঝিল! সব্যসাচীকে যাচিয়া বলিল, "যাহা ভাবিতেছ তাহা নয়, উনি অন্য কোনও কারণে আসেন নাই, আসিয়াছেন উঁহার রচিত পালাগুলি লইয়া তুমি কী করিবে, সে-বিষয়ে তোমার শেষ কথা শুনিতে।"

শুনিয়া সব্যসাচী অট্টহাস্য করিল। কিছুটা নাসিকা ও কিছুটা ওষ্ঠের সাহায্যে তাহার মুখ হইতে প্রমত্ত এবং অদ্ভুত একটি শব্দ নির্গত হইয়া আসিল, বানান করিয়া লিখিলে যাহা দাঁড়ায় "ফ্‌-উ-উ-ৎ।" খণ্ড-"ত" অংশের সঙ্গে একটি হেঁচকিও ছিল। অতঃপর সব্যসাচী—অর্থহীন ওই আওয়াজটার পর—যাহা বলিল তাহার অর্থ

দাঁড়ায় এই : ফ্রু-উ-উ-ৎ! তোর ওই পালা লোকে অভিনয় করিবে? আহাম্মক।

(সব্যসাচী সত্যই আমাকে বলিল, 'আহাম্মক')

নিজের মুখ মানুষ নিজে দেখিতে পায় না, নিজের ওই ছাইপাঁশ কী আহা-মরি বস্তু হইয়াছে তুই নিজে বুঝিস না। আমি শুধু তোকে একটু খেলাইয়াছি। নেহাৎ পিছেপিছে ফেউ হইয়া ঘুরিয়া মরিতি, ফাইফরমাস খাটাইয়া লইতাম তোকে দিয়া, আর-একটু মায়াদয়াও এই শরীরে আছে, তাই এতদিন সোজাসুজি কিছু বলি নাই। আজ মদ খাইয়াছি প্রচুর, এই ছাখ আমার চোঁয়া ঢেকুর, তোর আসল রূপ আমার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, তাই, শোন্, সটান বলিয়া দিতেছি তোকে—কিছুমাত্র আশা নাই। তোর ওই লেখা, থুঃ, মানুষ তো কোন্ ছার, ষাঁড়-শিয়ালের মুখেও ওসব পার্ট মানাইবে না।

বলিতে বলিতে আবার একটি হেঁচকি তুলিলেন তিনি এবং নিক্ষেপ করিলেন একটি গ্লাস—লক্ষ্য করিয়া আমাকে। তাঁহার রুষ্ট একটি হা-হা হাসি নির্মম হইতে নির্মমতর হইয়া আমাকে আঘাত করিতে থাকিল। আঘাত। সে তো শরীরে লাগিলই, আরও প্রচণ্ডভাবে বাজিতে থাকিল শরীরের চেয়েও গভীরতর কোনও স্তরে।

কী ঘটিয়াছিল, তখন হইতে কী ঘটিতে থাকিল জানি না, একবার মনে হইয়াছিল আমার মাথা ঘুরিতেছে—জানিতাম পৃথিবী ঘোরে, কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখিয়া গোটা আকাশটাই ঘুরিয়া গেল তাহার উপরে, বুকের মধ্যে বড় কষ্ট, বড় ভূমিকম্প—আর? আর তৎক্ষণাৎ একটা খোসা, মোহের খোসা, যেন খসিয়া পড়িল। মনে হইল আমি মুক্ত। আর?

সব মনে নাই। আমি পুরুষ, কিন্তু লিখিতে আপত্তি কী, একবার যেন মনে হইল আমি কাঁদিতেছি। চোখের জল মুছিব বলিয়া হাত তুলিতে গেলাম, সে-হাত ঠেকিয়া গেল নাকে, ভিজা-ভিজা—হাতটা সামনে ধরিয়া দেখি, চোখের জল কই, এ তো রক্ত।

রক্ত ঝরিতেছিল, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, পায়ের তলায় মাটি নাই, হাতের কাছে ধরিবার মতো একটা অবলম্বনই বা কোথায়, ভয় পাইলাম, দেওয়াল প্রভৃতি সব অদৃশ্য হইয়া গেল নাকি। রক্ত ঝরিতেছিল, তাহাতে দুঃখ নাই, কষ্টও যেন কম, ঝরিতেছে ঝরুক না, বরং তপ্ত স্রোতের জোয়ারে শরীরের সর্বত্র যে শিরাগুলি, বুঝিতেছি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এখানে-ওখানে আরও হাজারটা ফুটা হইয়া সেগুলি বরং ঝাঁঝরা হইয়া যাক, গেলে আমি বাঁচি। আর কিছু মনে নাই। একবার যেন দেখিলাম সব্যসাচী ঢলিয়া পড়িতেছেন ও-পাশে, তখনই, কী আশ্চর্য, আমিও পড়িয়া গেলাম ফরাসের এ-পাশে। পড়ার মুহূর্তে বুঝি শক্ত মুঠিতে খামচাইয়া ধরিলাম ফরাসের চাদরটা, একবার যেন বোধ হইল নলিনী ওই দিক হইতে আসিয়া হাঁটু ভাঙিয়া বসিয়াছে আমারই পাশে···যেন বোধ হইল···আমার লুটাইয়া-পড়া মাথাটা কেহ সযত্নে···কোলে তুলিয়া লইয়াছে।

জানিয়াছি পরে—এই নলিনীই আমাকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু আজ আমি মুক্ত—সুস্থ অন্তত এক দিক হইতে। আজ আমার কিছুমাত্র মোহ নাই। তাই লিখিয়া রাখিলাম যে, খোলস খসিয়া পড়িয়াছে।

মা, তাড়াতাড়ি লেখাটা ঢেকে ফেলেছিলে তুমি, আমি এসেছি টের পেতেই, ভয়ে অথবা লজ্জায়, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখ, অন্তত তখন আর কোনও ভাবলেশ দেখিনি।

তুমি জানো না, এই কয়েক ছত্র পরে পড়ে ফেলি আমিও গোপনে, তারপর কবে কী-করে, বোধহয় বাসা-বদলের হিড়িকে ওই কাগজগুলো আমারই হেফাজতে এসে যায়। বাবা তখন অশক্ত, প্রায় ঘরে অন্তরীণ, ওগুলো খুঁজেছিলেন পাননি; পাননি যে, তাও কাউকে বলতে পারেননি। খোঁজা আর না-পাওয়া, দুটোই গোপনে।

মাঝে মাঝে দেখলাম যে, তিনি তাঁর তোরংটা হাতড়াচ্ছেন অন্ধকারে, হাঁটু মুড়ে, উবু হয়ে, গোপনে—নিজের জিনিসও তবে চোরের মত সন্তর্পণে কাউকে-কাউকে খুঁজতে হয়, কেউ কেউ খোঁজে? বিশ্বের বিচিত্র বিধানে কত শাস্তি যে কতভাবে তোলা থাকে!

তারপর, আবার ছাখো, সেই শাস্তির মেয়াদ আপন নিয়মেই কবে মকুব হয়ে গেছে, আর শেষের দিকে খুঁজতে দেখিনি বাবাকে, হয়ত ওর দাম, ওগুলো নিয়ে চিন্তা-ভয়-সংকোচ তাঁর নিজের কাছেই মসৃণ ভাবে মুছে ঘুচে গিয়েছিল। আর আজ? আজ তো সব একেবারে সাফ—পরিষ্কার—আজ বাবা নেই, তুমিও নেই, ওগুলোর দাম যাচাই করব কার কাছে, তাই মূল্যহীন কয়েকটা দলিল আমার কাছ থেকেও হারিয়ে গেছে।

সেদিন কিন্তু এত সহজে জের মেটেনি।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে বাবা বাইরে বেরিয়েছেন সে-দিন, কাছাকাছি পার্কটার্ক কোথাও হবে। আমি পড়ছিলাম। তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে, সটান, সোজা। ইদানীং কাজ ফেলে এভাবে আমার এত কাছে আসতে না। একটু চমকে গিয়েছিলাম, আনন্দও পেয়েছিলাম। বইয়ের পাতা মুড়ে, কত দিন পরে প্রগাঢ় গলায় বলে উঠলাম—"মা।" হাত বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু দেখলাম তুমি ফিরে যাচ্ছ। আমার প্রত্যাখ্যাত হাতটা এল ফিরে, গলায় দড়ি-দেওয়া লাশের মতন অধোবদন, রইল ঝুলে।

"তুই তাকে দেখেছিস?" এই কণ্ঠস্বর তো জানালার বাইরে থেকে ভেসে আসেনি, সুতরাং তোমার। "কাকে?" আমি শুধু চোখ তুলে একবার বলতে পারলাম।

আমার জন্যে আমার কাছে তুমি আসনি, অন্য কী-একটা কথা

আছে জেনে নেওয়ার—তাই। অভিমান নামে আর-একটা ঢেউ ফুলে উঠল, ফুলে উঠে সে আগেকার ঢেউ আবেগটাকে তারই পিছে-পিছে টেনে নিয়ে গেল। আমি আবার যা তাই, যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে এলাম। তাই শুকনো গলায় শুধু বলেছিলাম, "কার কথা বলছ, কাকে?"

বেশ কিছুক্ষণ তুমি কথা বলতে পারোনি। খালি কথা বলার কয়েকটা প্রয়াস তোমার চোখে, ঠোঁটের কোণে নানা আকারের ভাঙাচোরা রেখা হয়ে খেলে যাচ্ছিল। শেষে খুব আস্তে, কোনও রকমে বলে ফেলা এই কথাটা শুনতে পেলাম—"তোর বাবা, মানে প্রথম যেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।"

"ওঃ সেইদিন!" পুরনো কথা, সুতরাং যেন কিছুই-না আমি এইভাবে হালকা গলায় বললাম "সে তো থিয়েটারে। অনেক তো লোকজন ছিল সেখানে। তুমি কার কথা বলছ?"

স্পষ্ট দেখেছি মা, তোমার চোখের পাতা কাঁপছে, তোমার একটা হাত উঠছে। আমাকে মারবে? না, মারোনি। এত বড়, এই বয়সের ছেলেকে চট করে আর মারা যায় না, কারণ, আগেই বলেছি, মা-বাবার বিরুদ্ধে বয়সটাই তখন ছেলেদের বন্ধু, সহায় অথবা বডিগার্ড যে। নতুবা তুমি মারতে, জেনেশুনে সজ্ঞানে আমি মিথ্যে বলেছি, ন্যাকা সেজেছি, সেই কারণে। কিন্তু যে-দৃষ্টি তোমার চোখে দেখলাম, মা! তার চেয়ে মারও বুঝি কম অপমানের ছিল। একটিবারও পাতা-না-পড়া সারা চোখের ধিক্কার দিয়ে আমার মিথ্যেটাকে পুড়িয়ে দিয়েছ তুমি। 'ছি-ছি', সেই চাউনি বলছিল 'ছি-ছি' তোর বাবা সেদিন থিয়েটারে অজ্ঞান হয়ে পড়েনি। "আমি জানি।"

"আমি জানি", তোমাকে বলতে শুনলাম, "কোথায় ছিল, কোথায় গিয়েছিল সে।" স্থির দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে ন্যস্ত করে বললে "তুই তাকে দেখেছিস?"

"দেখেছি, মা।"

"কেমন দেখতে, বল্ না, বল্ না, সেই নলিনী দেখতে কেমন?"

আমি নিরুত্তর।

তোমার প্রত্যেকটা প্রশ্ন তখন চিমটির মতো কাটছে আমাকে, আমি কথা বলব না দেখে তুমিই কথা জুগিয়ে যাচ্ছ, আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেবে বলে—"বল্ না, বল্ না, দেখতে সে কেমন? খুব হাসে বুঝি, আর দাঁতে মিশি দেয়?"

"দেয়, মা।" অম্লানবদনে বললাম।

(নলিনী আমাকে গরম দুধ খাইয়েছিল।)

"গায়ের রঙ কেমন? আমার মতো?"

"তোমার মতো রঙ ক'জনের আছে মা। তোমার পাশে সে মিশ্‌কালো।"

(নলিনী তার নিজের আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল।)

"বাজে কথা বলিস না", তুমি তেড়ে উঠলে সতেজে "চিনি তোদের সব কটাকে। সব এক জাত এক ধাত।"

(আমি আর বাবা এক-জাত এক-ধাত, তুমি ঠিক জানো তো মা?)

"সত্যি বলছি, ভীষণ কালো। থপ্‌থপে, মোটা, বিশ্রী।" এবার আরও জোর গলায় বললাম।

(আমাকে নীচে অবধি পৌঁছে দিয়েছিল নলিনী, স্নেহে মমতায় আমার হাত চেপে ধরেছিল—হে ঈশ্বর, এই কৃতঘ্নতার পাপে আমার যেন কুষ্ঠ, কাল-ব্যাধি হয়। কিন্তু না, ওই ভীষণ সব শাস্তি আমি পাবই বা কেন, মার—আমার দুঃখিনী মার মান আর মন রাখতে বানিয়ে সব বলছি, ঈশ্বর, তুমি জানো না?)

"ওর মুখের ভাষা খুব বিশ্রী তো?"

"বিচ্ছিরি, মা। তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারব না। বে-হায়া বলতে যা বোঝায় তা-ই।"

"তোর বাবা—তোর বাবাকে নিয়ে করছিল কী, কীভাবে চাই-ছিল ?"—শেষ সঙ্কোচের লেশটুকুও খসিয়ে ফেলে হঠাৎ দ্রুত বলে উঠেছ তুমি, যেন চোখ বুজে—আমরা খানাখন্দ গর্তটর্ত সামনে পড়লে যেভাবে পার হয়ে যাই।

"সে-সব তোমাকে বলা যায় না। মানে, ওইসব মেয়ে যে-রকম করে থাকে আর কী।"

(বাবা অজ্ঞান হতে না হতে নলিনী তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিল।)

এবার তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলে। বেদনায় নীল হয়ে যাচ্ছে তোমার মুখ, দেখতে পাচ্ছি। তারই মধ্যে একটু সান্ত্বনার খোরাক আমার কথা, মা, আমি তো যথাসাধ্য শান্তির ছিটেফোঁটা জোগান দিয়ে যাচ্ছি।

"তুই তো এতদিন কিছু বলিসনি। সব চেপে গিয়েছিলি।"—অনেক পরে বললে আস্তে আস্তে।

"বলা যায় না যে, বলা উচিত নয়। ছেলে হয়ে কী করে—বলো, তুমিই বলো তো!"

"ঠিক।" আমার মাথায় একটি হাত রাখলে, যে-হাতটা মারবে বলে একটু আগে তুলেছিলে। "এখন তুই মস্—তো হয়ে গেছিস।"

"মস্ত না, মা।" খুব অবনত ভাবে বললাম "একটু বড়ো, বলতে পার। এখন আমি একটু-একটু বুঝতে পারি।"

"যা বুঝবি, এবার থেকে সব আমাকে বলিস।" এ কি প্রত্যাশা, এ কি আদেশ ? বড়ো হওয়ার স্বীকৃতি এ কি, বড়ো হওয়ার দাম ?

মাথায় অনেকদিন থেকে বড়ো তো বটেই, মেপে দেখেছি। সেদিন টের পেলাম, বয়সেও সেই প্রথম আমি তোমার সমান-সমান।

মা আর ছেলের মধ্যে লুকোচুরি আর ব্যবধান সেই প্রথম ঘুচে গেল। আর, বোধহয়, সেই শেষ বার।

তবু কিন্তু একটা অপরাধের বোঝা আমার ঘাড়ে চেপে মাথার ভিতরকার সব বিচার আর চিন্তা এলোমেলো করে দিতে চাইছিল। তোমাকে একটু স্বস্তি দিতে, তোমার সমান-সমান হতে কার প্রতি যেন আমি ঘোরতর অন্যায় করলাম। সে-কে? বাবার ভেঙে পড়ার ক্ষণটিতে সহসা যে করুণাময়ী হয়েছিল, গরম দুধ খাইয়ে আমার মুখ দিয়েছিল মুছিয়ে, তার কথা মনে পড়ে ভিতরটা হু-হু হয়ে যাচ্ছিল। তাকে অপমান করেছি, কোনও অন্যায় করেনি সে, তবু। এই অপরাধের ক্ষমা নেই, তবু সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।

এই পর্যন্ত লেখা সোজা হল। কিন্তু মা, এর পর ক্ষমা চেয়ে নেব তোমার কাছেও। তোমাকেও সেদিন ঠকিয়েছি আমি, মুখে যা-ই বলি, মনে মনে তো জানি যে, বিশ্বস্ত থাকতে পারিনি। মনে মনে ওই নলিনীর প্রতিও শ্রদ্ধা-অনুরাগ-কৃতজ্ঞতা মিলিয়ে একটা আকর্ষণ বোধ করছিলাম যে। বারবার মমতাময়ী একটি প্রতিমার রূপ আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। মা, আমার দুঃখিনী মা, তোমার প্রচণ্ড সংশয়-সন্দেহ, মনঃকষ্ট যন্ত্রণার সেই মুহূর্তেও আমি তোমার সঙ্গী হতে পারিনি। বরাবরই একা তুমি, তখনও একা রয়ে গিয়েছ।

আমি, নির্বিবেক, সেদিন একই সঙ্গে তোমাদের দু'জনকেই ঠকিয়েছি।

এর পরে, এর পরে মা, এই চিঠির খেই ধরব কোথায়, কালানুক্রমিক আর কত ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে যাব। ঘটনার বর্ণনা বা ঘনঘটা তো এ-লেখার লক্ষ্য ছিল না, এ-তো, চেয়েছিলাম, হোক শুধু উন্মোচন আর বিশ্লেষণ; বদ্‌লে-যাওয়ার বিবরণ, কয়েকটি সম্পর্কের,

অনেকগুলি মূল্যের ; বোধের, বিশ্বাসের, ধারণার। এ-তো নিজেকে বিকাশ করা শুধু, বলে বলে আত্মশোধন। যেমন কিনা সকালের কুলকুচি, মুখে জল পুরে পুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া বাইরে, সব গন্ধ ধুয়ে যাক, গত রাত্রি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে তার বাসী যত স্মৃতি, বাসী আর তেতো, আচমন করে আবার নূতন।

কী জানি কেন, সেবার শীতে দিন যত তাড়াতাড়ি গুটিয়ে আসতে থাকল, ততই মনে হতে লাগল যে, আমাদের তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট যে-টুকু জীবন, তারও একটা অধ্যায় গুটিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে, সহসা সব কোথাও শেষ হয়ে যাবে, উৎক্ষিপ্ত হব আবার, নির্ধারিত এক নিয়তি আমাদের টেনে নিয়ে কোনও এক বাঁকের মুখে হয়ত ঠেলে দেবে।

টের পাচ্ছিলাম। নিয়তি যদিও কাজ করে গোপনে, তবু আগামীর উপরে, বরাবরই দেখি, আজকের ছায়া পড়ে। কে একজন চর বাস করে ভিতরে, সে আগেভাগে সব বলে দেয়। সেই ছায়া, অস্পষ্টভাবে, একটা অনিশ্চয়তার আকারে আঁকা হয়ে যায় মুখে মুখে, তোমার মুখে সেই ছায়া পড়ছিল। আমারও।

অথচ বাইরে কোনও লক্ষণ, আতঙ্কের কোনও কারণ ছিল না। হয়ত সবই স্নায়ুর কারসাজি। স্নায়ুরা যেন খোজা প্রহরী, তারা অত্যাচারী, জর্জরিত করে আমাদের ; আবার তারা আমাদের প্রতি বিশ্বস্তও বটে।

নইলে দৃশ্য-বাহ্য ভয়ংকর কোনও কিছুর আভাস ছিল না। বাবা আবার কাজে যেতে আরম্ভ করেছিলেন, বেরুতেন একটু দেরিতে, বিকালের দিকে। আমার কলেজ চলছিল ; তোমার পূজা, কাপড়-কাচা রান্না। একটু টানাটানিও চলছিল অবশ্য। এই ক' মাস বাবা ঘরে বসে, ঠিকমত টাকা আসছিল না, তার উপরে ডাক্তার, ওষুধ, খরচের ধাক্কা।

কিন্তু তাতেই তো মুষড়ে পড়োনি তুমি। বাতাস থেকে লোকে যেমন শ্বাস নেয়, তুমিও তেমনই উপর দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য কোনও নল থেকে টেনে নিতে সাহস। তাই নিচ্ছিলে।

প্রথম কবে ভয় পেলে তুমি, কবে? কাজে ফের যোগ দেওয়ার পরও যখন মাস ঘুরে গেল, অথচ ঘরে মাইনে এল না, তখনই কি? সে-মাসে তোমার হাত একেবারে খালি। একটা শার্টই কোনমতে এ-বেলা ও-বেলা কেচে ক্লাসে যাওয়া চালিয়ে দিচ্ছিলাম। জামাটা, যেহেতু ইস্তিরি করা সম্ভব ছিল না তাই, কুঁচকেই থাকত, আমার কুণ্ঠিত-অস্বচ্ছন্দ মনের মতো।

তুমি ভয় পেলে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ হলো না, উনি এলোমেলো উত্তর দিয়ে ব্যাপারটা কীভাবে যেন ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, ব্যাখ্যা করতে কিংবা উড়িয়ে দিতে, তাতে তোমার সন্দেহটা আরও বাড়ল। এমনিতেও অসুখটার পর থেকে বাবার কথা-টথা কেমন জড়িয়ে যেত, সব সময় অর্থ বোঝা যেত না।

তুমি বললে, "এই, আমার ভালো ঠেকছে না। উনি কেমন হয়ে গেছেন দেখছিস তো। উনি—উনি বোধহয় কাজে যান না।"

"কাজে যান না? কোথায় যান তবে?"

"কী জানি কোথায়। কোথাও নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো বলছি। বলছি যে, তুই-ও একদিন না-হয় ওঁর সঙ্গে যা। দূর থেকে দেখবি, লক্ষ্য রাখবি।"

তুমি ভেবেছিলে বাবা কাছে-পিঠে নেই, সুতরাং শুনছেন না। কিন্তু তিনি শুনেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কী-একটা ভুলে-যাওয়া জিনিস নিতে ফিরে এসেছিলেন—ঠিক তক্ষুনি। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন তিনি, বন্য জন্তু যেভাবে শুকনো ডালপালা মচমচ করে ভেঙে-চুরে ধেয়ে আসে, সেইভাবে। কিন্তু হঠাৎ একেবারে স্থির ঘরে ঢুকে। একবার আমার দিকে তাকালেন, একবার তোমার দিকে। অদ্ভুত একটা হাসি মুখের দিক-রেখায় ধীরে ধীরে উদিত হল। সেই হাসি

দিয়েই মাখিয়ে মাখিয়ে, অথচ আহত গলায়, বাবা বলছিলেন—"সঙ্গে যা! লক্ষ্য রাখ্! তার মানে, আনু, আমার ছেলেকে বলছ আমারই পেছনে স্পাই হতে? ছিঃ!"

তুমি কাঠ, কথা বলছিলে না। বাবাই বলে চলেছিলেন, হঠাৎ মুখ খুলে গিয়েছিল তাঁর, তাই অনায়াস সাহসে বলে গেলেন, "স্পাই লাগাবার দরকার তো নেই। ঠিকই ধরেছ তুমি আনু। আমি প্রেসে যাই না, থিয়েটারেও না। আমি যাই তার কাছে।"

নাম উচ্চারিত হল না, অথচ বোঝা গেল। বাবা তেমনই সোজাসুজি চেয়ে, স্পষ্ট গলায় বললেন, "হ্যাঁ, তার। তোমার কোনও ধারণা নেই, সে কত উঁচুতে। সে দেবী, সে আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি তার কাছে ঋণী—প্রাণের ঋণ, যাই সেটা শোধ করতে।"

"সে দেবী?" এতক্ষণে একটুখানি হাসি দেখা দিল তোমার মুখে, যে-হাসির নাম ব্যঙ্গ অথবা অবিশ্বাস, যে-হাসি ছুরির মতো ধারালো। —"সে দেবী?" তুমি বলছিলে, "একটা থিয়েটারের মেয়ে, খারাপ মেয়ে, সে দেবী হয়ে গেছে তোমার চোখে?"

"থামো!" চমকে গেছি বাবার নির্ভয়, দৃঢ় কণ্ঠস্বরে।

আর, মা, তার চেয়েও চমকে দিয়েছ তুমি। আমাদের কান চকিত করে দিয়ে বলে উঠেছ "আমি যাব, আমাকে দেখাবে তাকে?"

চকিত বাবাও, কিন্তু রোখ্ যখন চেপে গেছে, তখন সেই উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলায় তিনি হার মানবেন কি অত সহজে! তাঁকে গম্ভীর গলায় বলতে শুনলাম "যাবে? দেখবে তাকে? সে-সাহস কি তোমার আছে?"

"দেখানোর সাহস তোমার আছে তো?" এবার তোমার গলা। সেই হাসিমাখা ছুরিটাই আবার ঝলসালো।

এ কী নাটক! জীবনে এমন নাটক পড়িনি, কিংবা লিখিনি। জীবনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কিনা, তাই সেই মুহূর্তে এই বিবেচনা-

বোধও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, ওই দৃশ্যের কতটা বাস্তব, কতটা অলীক। এমন-কী তিনজনে মিলে যখন দৃশ্যান্তরে চলে যাচ্ছি—একটা ঘোড়ার গাড়িতে, এ-পাশে বাবা আর আমি ; তুমি ও-পাশে, ঘোমটার উপরে চাদর মুড়ি দিয়ে—তখনও সেই অভিজ্ঞতার আস্তরণ নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা আর অযোগ্যতার টানাটানি চলছিল।

বাবা হঠাৎ বললেন, "নামো এইখানে।" তুমি নামলে। তখনও আপাদমস্তক ঢাকা, খালি চটিজোড়া দেখা যায়, আলতা-পরা দু'টি পা তার উপরে।

নলিনী ছিল পাশের ঘরে, যে-ঘরে একদিন বাবাকে ঘুমোতে দেখেছি, সেই ঘরে, দেওয়ালে একটি পট, সিঁদূরে-আঁকা মাঙ্গলিক। বাবা, প্রথম সংলাপ তাঁরই, আঙুল তুলে বললেন, "ওই ছাখো।"

চমকে ফিরে তাকাল নলিনী। থতমত খেয়ে বলল, "আরে! আপনারা—আ প নি!" তখনই সে বাবার পিছনে দেখতে পেল কিনা তোমাকে, অথচ আশ্চর্য বসতে বলল না একবারও, নিজেই উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে আসতে থাকল। আস্তে আস্তে। ওর পা টলছে, কিন্তু সেটা লুকোতে চেষ্টা করল না একটুও, বরং দেখিয়েই যেন টলাচ্ছে।

আজকের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেদিন থাকত যদি, তবে তখনই বুঝে ফেলতাম নলিনী একটা-কিছু করার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে।

গালে হাত দিয়ে সে আমাদের সকলকে দেখতে থাকল, শীতের সকালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগে লোকে যেমন পুকুরটাকে ভালো করে দেখে নেয়। তারপর আমাকে বলল, "খোকা, তুমি একটু বাইরে যাও তো, ওখানে গিয়ে বোসো।"

আদেশের ভঙ্গি, অমান্য করার সাহস হল না।

তুমি তো সেখানেই ছিলে, চৌকাটে স্থির, তুমিই বলো তো, তখন কি আস্তে আস্তে মুখের ভাবও বদলে যাচ্ছিল নলিনীর, যেমন সে নিজের গলাটাও যেন বদলে নিয়ে বলছিল, "ওঁকে—ওঁকে এখানে এনেছেন কেন?"

আমি ওর মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু গলা শুনেছি।

"তোমাকে দেখাতে।"—বাবার গলা।

"আমাকে? আমরা কী নোংরা, কী বিশ্রী, কী খারাপ হয়ে থাকি, তাই দেখাতে? প্রণববাবু, আপনার মাথা একেবারে খারাপ। মাথাটার চিকিৎসা করান আগে।"

হেসে হেসে বলছিল নলিনী, তখন কি তার কোমরও উঠছিল দুলে দুলে? আমি দেখতে পাইনি।

"নোংরা তো নও, খারাপও নও তুমি।" বাবা বিস্মিত, তবু বলে চলেছেন পূর্ব-বিশ্বাসে, "এই তো এসে দেখলাম, তুমি পূজোয় বসেছ।"

"ঠিক যেমন লেখে শরৎবাবুর নবেলে?" ঝলক দিয়ে দিয়ে হাসছে নলিনী, হাসি তো নয়, যেন রক্ত উঠছে, "আরে দূর, দূর, আপনার মাথা খারাপ বলেছি না, প্রণববাবু? খারাপ খালি মাথাটাই, নইলে ভেতরটা ভালো—একেবারে নিপাট সাদা ভালোমানুষ, এ-লাইন আপনার নয়। জানেন তো, আমরা থিয়েটার করি? বুঝছেন না, ওই পূজো-টুজোও আমাদের ভড়ং, অভিনয়? আমরা হলুম গিয়ে বজ্জাত, ধড়িবাজ—আমাদের নাড়ি-নক্ষত্তোরের হদিশ পাওয়া আপনার সাধ্যি নয়। যদি বলি"—বলতে বলতে খিলখিল হাসতে থাকল নলিনী—"যদি বলি, এই চন্নামের্তো দেখছেন, আসলে ওটা হল চোলাই মদ, চাখি, খাই চুক চুক করে, দেবো, খাইয়ে দেবো একটু আপনাকে?"

বলতে পারব না নলিনী আঁচলে গাছকোমরও বেঁধে নিয়েছিল কিনা। আমি তখন শুনলাম তোমাকে চাপা গলায় বলতে—"চলে এসো, চলে এসো তুমি এখান থেকে।"

কথাটা নলিনী যেন কান পেতে শুনল। এবার টিকটিকির মতো গলা করে বলে উঠল "ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছেন আপনি। চলে যান, নিয়ে যান ওঁকে এখান থেকে। ভদ্দরলোকে থাকে এখানে—ছিঃ।"

স্পষ্টই বোঝা গেল, বাবা ভেঙে পড়ছেন আস্তে আস্তে, অন্তত ওঁর ভাঙা গলাই শোনা গেল, "কিন্তু নলিনী, আমি যে বড় বড়াই করে ওদের নিয়ে এসেছিলাম। বড় মুখ করে বলেছিলাম—দেখাব।"

"কাকে?"

"আমার প্রাণদাত্রীকে।"

"প্রাণ?" নলিনী উঠল ভেংচে, "বলে নিজের পেরানটাই রাখা দায়, তায় আবার অন্যকে পেরান-দান? না মশাই দানটান কিচ্ছু করিনি আমি, করতে পারব না। দেখবেন, এক্ষুনি সাত-শকুন এসে আমার প্রাণটা নিয়েই টানাটানি শুরু করবে—তাই তো তৈরী হয়ে আছি সেজেগুজে।"

"চলে এসো, চলে এসো এক্ষুনি।"

একটু থামল নলিনী, হয়ত তোমার গলা শুনতে; থেমেই ফের গলগল বলে চলল "আপনার সঙ্গে বেরোতে পারতাম অবিশ্যি, তা আপনি তো মশাই আবার ঘরের বউ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ডুডু আর টামাক, দুই-ই?—অ্যাক্কেবারে মাথা খারাপ। তা-ছাড়া আপনার তো আবার রেস্ত নেইকো, পকেট ঢুঁ-ঢুঁ। যান বলছি, পালান শীগগিরি, নইলে বলেছি না কখন আবার ওরা এসে পড়বে। যদি সব্যসাচীই আসে? সেদিন তবু জানে পারেনি, আজ কিন্তু বলা যায় না, থাকবে না রক্ষে। আপনি পাগল একদম, ওদের চেনেন না, আরে মশাই, আপনার ওই ভালোমানুষি পালা-টালা ওই বদমাশেরা ভেবেছেন বুঝি স্টেজে নামাবে?"

মাটিতে নুয়ে-পড়া বাবার গলা—"কিন্তু নলিনী, আজ আমি সে-জন্যে আসিনি। ও-সব আর ভাবছি না।"

"কী ভাবছেন তবে ?"

"ভাবছি, এ কি তুমিই, যে সেদিন আমাকে—"

"বলেছি তো অভিনয় করেছিলাম। থিয়েটার মশাই, সব থিয়েটার জানেন না।" নলিনী গুনগুন সুর ভাঁজতে শুরু করেছিল—নলিনী দলগত জলমতি তরলং…

"চলে এসো।" ধ্বনিত হল এই শেষ বার। তার পরেই দেখলাম, তুমি বারান্দায়। বাবা, মাথা হেঁট, বেরিয়ে আসছেন পিছে পিছে। আর নলিনী ? সে তোমাদের পিঠের উপরে ঠাস করে জোড়া কবাট বন্ধ করে দিচ্ছে।

থিয়েটার, সব থিয়েটার। সেদিনকার ওই চমৎকার থিয়েটারটা দেখার পর, অনেকক্ষণ আমরা কেউ কথা বলতে পারিনি। বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল—ঘৃণায়, বিস্ময়ে আতঙ্কে।

পরে, অনেক পরে, স্মৃতির রঙ যখন বদলে যেতে থাকল ক্রমে ক্রমে, পুরনো বইয়ের পাতার যেমন যায়, পড়া কবিতার এক-একটা অর্থ বেরিয়ে আসে হঠাৎ হঠাৎ, তেমনই ওই থিয়েটারও আমি অন্য দিক থেকে দেখতে পেয়েছি, যেন সীন্‌-এর পিছনে বসে।

কোনও কোনও সীন্‌-এ দর্শকও দৃশ্যের অংশ ; সীন্‌-এর মতোই আঁকা হয়ে যায় ; চেয়ে থাকে বিস্ফারিত, বোকা। তখন চিনতেও পারে না, ইচ্ছে করে ভূষোকালি মেখে পুতনা রাক্ষসীর বেশে সে দেখা দিল কিনা, গতকালই যে বহুরূপিণী ছিল যশোদা। কারও কারও শেষ মোহটাও গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—থিয়েটার, সব থিয়েটার।

উনিশ

বাবার সেই একেবারে চূর্ণ চেহারাটা প্রথম আমি দেখতে পাই এক দিন, আহিরীটোলায়, গঙ্গার ঘাটে। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল গঙ্গামৃত্তিকা গায়ে লাগালে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, বাবা বিনাবাক্যে সেই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিলেন। প্রথমে ভাঁটার সময় গঙ্গামাটিতে লিপ্ত করতেন সর্বাঙ্গ, তারপর জোয়ার এলে গা ভাসিয়ে দিতেন, পাড়ে উঠতেন সব ধুয়ে ফেলে। কখন জোয়ার আসে, সেই অপেক্ষায়, দেখেছি, অনেকক্ষণ ঘাটে বসে আছেন। জোয়ারে গা ঢেলে প্রায়ই দেখতাম, চলে যাচ্ছেন দূর থেকে দূরে, বাঁধা নৌকো, গাদাবোট, ফ্ল্যাট আর সিটিবাজানো ফেরি-ইষ্টিমারগুলোও ছাড়িয়ে, পাড়ে অবিরল ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ, ঢেউ ঘোলা জল, জলে রোদ ঝিকঝিক, বাবাকে আর দেখা যায় না, তখন আমার ভয় করত।

তোমার হুকুমে শুকনো কাপড় নিয়ে আমি প্রায়ই বাবার সঙ্গে যেতাম কি না। ভয় করত, বাবা যেদিন অনেক দূরে চলে যেতেন। দুর্বল শরীর, সবে তো সেরে উঠেছেন, মনে মনে ভাবতাম, এতটা ভালো না, যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—ভাবতাম। যদি হাঁপিয়ে পড়েন, তলিয়ে যান? চীৎকার করে তখন ডাকতাম। কিন্তু উনি যেন শুনছেন না, শুনতে পাচ্ছেন না বা চাইছেন না, দূরে, আরও কত দূরে? যেন এ-পারের কথা ওঁর আর মনে নেই, দেখতে পেয়েছেন কিছু ওপারের, অন্তত ওপার থেকে ডাকতে শুনেছেন কাউকে।

> (নদীর পারে এটা নিয়ম, ওপারে কারা থাকে, তারা ছায়া-ছায়া, তাদের গলা বিলীন উদাস, আকাশে যখন এক-এক ঝাঁক পাখি ছেঁড়া-ছেঁড়া ছড়ানো মালা, বিশেষত শীতকালে, শীতের শেষ দিকের দুপুরে ওরা চক্রাকারে ঘোরে, তখন ওই পারের অদৃশ্যপ্রায়

কারা অকারণে চীৎকার করে কী বলতে থাকে, কাকে ডাকে? হয়ত কাউকেই না, ডাকে না, শুধু কথা বলে পরস্পরকে, সেই গলা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেঙে কেঁপে ছড়িয়ে যায়।)

আমার ভয় করত।

সেদিন জোয়ার ছিল বিকালে। বাবা ফিরছেন না, খুঁজতে গিয়ে দেখি তখনও জলে নামেননি, খালি বাঁধানো ফাটা একটা ধাপে বসে পা দু'টিকে ডুবিয়ে রেখেছেন।

আমাকে দেখে নুয়ে পড়ে জল নাড়তে থাকলেন ধীরে ধীরে; ধীরস্বরেই বললেন "এখনও সময় হয়নি।"

"স্নান করেননি?"

"জোয়ারই আসেনি যে। তবে আসছে, বুঝতে পারছি। এতক্ষণ হয়ত-বা এসে গেছে বজবজে বা খিদিরপুরে।"

"এতক্ষণ ধরে তবে করছেন কী?"

বাবা মুখ তুললেন। একেবারে অদর্শী শূন্য দৃষ্টি, সামান্যতম রঙও লেগে নেই চোখের কোণাতে। সেই দৃষ্টিতে আমার বুকের ভিতরটা কী-রকম করে উঠল, ভয় চাপা দিতে তীক্ষ্ণ গলায় আবার বলে উঠলাম "এতক্ষণ ধরে তবে করছেন কী?"

"স্রোত দেখছি", বাবা বললেন জলের উপরে ঝুঁকে পড়ে, ঢেউগুলো হাতের এপিঠে ওপিঠে ছুঁতে ছুঁতে।—"চেয়ে ছাখ, এখন এই দিকে বইছে তো, জোয়ার এলেই কিন্তু উলটো দিকে বইতে থাকবে। অপেক্ষা করছি।"

বলে, ওই স্রোতেই ন্যস্ত-দৃষ্টি হয়ে গেলেন। প্রবাহের গতি-প্রকৃতি অত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে করে কী রহস্য ধরতে চাইছিলেন তিনি? "কিছুই না", পরে নিজে থেকেই এক সময় আমাকে বলেছেন, "কিছুই না। পরমাশ্চর্য কোনও তাৎপর্য এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। তবে পড়ে যাই, পড়ে যেতে হয়। যেমন

সন্ধ্যার পর আকাশে তারা-র খোলা খাতাটা সুযোগ পেলেই পড়ি। উঁহু”—মাথা নেড়ে নেড়ে বাবা বললেন “মানে বুঝে ফেলি ভাবছিস ? মোটেই না। সাংকেতিক ভাষাতে লেখা তো, অক্ষরই যে চিনি না ; বুঝব কী করে।”

আমিও বুঝছিলাম না, একটুও না। আর একবার মুখ তুলে বাবা আমাকে বললেন, সহাস্যে কিন্তু সঙ্গোপনে কিছু রহস্য উন্মোচনের ধরনে, “স্রোতের বেলাতেও এই ব্যাপার। বুঝি না। তবে দেখে দেখে এই পর্যন্ত বুঝলাম যে, স্রোত সামনের দিকে চলে। কিন্তু দুষ্টু তো, তাই চলতে চলতে, হয়ত চলায় একটু বৈচিত্র্য আনতে স্রোত নিজেই এক-একটা দ' তৈরী করে। ওই নিয়ম, জগতের নিয়ম, স্রোতের যেমন, আমাদেরও তেমনই। আমরাও মাঝে মাঝে এক-একটা দ' সৃষ্টি করি, এক-একটা জটিলতায় জড়িয়ে যাই, ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চলি। বেশ মজা, না ?”

বাবা হাসছিলেন, কিন্তু কেমন করে যেন, ওই ঢেউগুলো পার হয়ে ওপারে গিয়ে যেন, মা, আমি হাসতে পারছিলাম না ; গলা থেকে পা আমার সবই কেঁপে যাচ্ছিল।

(সেই দেশের বাড়িতে একবার চৈত্রের রাত্রে উঠোনে কে এসে শিব সেজে দাঁড়াল, তার মুখ সাদা, গলায় সাপ, গায়ে ছাই, আমি জড়োসড়ো, কিন্তু তুমি ক্রমাগত আমাকে ঠেলা দিতে দিতে বলছ 'যা না, ও তো তোদের ইসকুলের হরি দপ্তরী, কাছে গিয়ে ছাখ না।' তবু যেতে চাইনি। চেনা মানুষেরাও হঠাৎ-হঠাৎ অচেনা চেহারায় দেখা দিলে, অচেনা গলায় কথা বললে কেমন লাগে বলো তো। হোক না বহুরূপী। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, বহু-রূপীকে দেখে যে-কোনও লোকের একটু ভয় না লেগেই পারে না।)

ছেলেবেলার সেই ভয় সেদিন গঙ্গার ঘাটে ফিরে এসেছিল, বাবা যখন স্রোতের গতি, তারার ভাষা-নির্ণয়, এই সব বিষয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে, ও অসংলগ্নভাবে কী-না-কী বলে যাচ্ছিলেন।

তোমাকে বলিনি। বলিনি যে, বাবা তখন মাঝে মাঝে আরও অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতেন। এক দিন খুব ভোরে, তুমি কখন উঠে গেছ, জেগে দেখি বাবা আমার শিয়রে। আমার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে পড়ে যাচ্ছেন, নিজে নিজেই, নাটকে স্বগত-উক্তি যেভাবে করে, "ছিল আশা মেঘনাদ! মুদিব অন্তিমে/এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে/সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব মহাযাত্রা/ কিন্তু বিধি! তাঁর লীলা বুঝিব কেমনে? ভাঁড়াইলা সে-সুখে আমারে।"

যেই টের পেলেন আমিও জেগে, অমনই দূরে পাঠানো কণ্ঠস্বর টেনে আনলেন কাছে। একটু হেসে বললেন, "বল্ তো কার?"

"মাইকেলের তো", আমি বললাম।

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ "পড়েছিস বুঝি? এরই মধ্যে? বাঃ! পড়ে যা। তারপর—" এখানে তিনি বুঝি একটু ইতস্তত করলেন, "তারপর লিখিস। লিখে যাস।" আমার কপালের উপর প্রবল হাতের চাপ, অধীর একটি আশীর্বাদ।

তোমাকে তখন এ-সব বলিনি।

কিন্তু খটকা তোমারও কি লাগল না, বাবা যেদিন সকালে বাজারে গিয়ে আর কিছু না, নিয়ে এলেন শুধু রাশি রাশি সজ্‌নের ফুল, তুমি খুব হতাশ হয়ে, খুব রেগে গিয়ে বললে, "এ কী! শুধু ফুল? এত ফুল কি কিনে আনলে তুমি?"

"কিনেই তো। নইলে আমাকে কে দেবে বলো। তবে আমি তোমাকে দিচ্ছি", বলতে বলতে বাবা সেই রাশি রাশি ফুল তোমার কোঁচড়ে উপুড় করে ঢেলে দিলেন।

গালে তোমার একটু লালের ছিটে লাগল, বাবা কিন্তু এতটুকু লজ্জিত নন, বললেন, "যদি পাই তবে একদিন শালের মঞ্জরীও নিয়ে আসব। সজ্‌নে আর শালের মঞ্জরী। দুটোর তাৎপর্য কী, জানো? সজ্‌নের কাছে শিখে নেব হাসির শুভ্রতা, আর শালের মঞ্জরীর কাছে চাইব যেন তার মতো সব তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারি!"

"এসব বড় বড় ভাবের কথা। মানে বুঝি না।" তুমি বলেছ বিরস স্বরে। বাবা তখন "তবে হালকা একটা কিছু শুনবে?" বলেই শুরু করেছেন, "মরি মরি কী আশ্চর্য, পুরুষের ব্রহ্মচর্য/হউক সলিল দৃঢ়, তুষার শীতল/তথাপি আতপ-তাপে যে-জল, সে-জল।"

—যে-জল, সে-জল। বাবা থেমে বলেছেন, "বলো তো কার?"

"জানি না।"

"তোমাকে তো মুখস্থ করিয়েছিলাম একবার। নবীন সেনের লেখা।"

বাবার উদ্ধৃতি আবৃত্তির বেশির ভাগই ছিল মাইকেল, হেম, নবীন সেনের।

কিন্তু শুধু ভাবের কথাই তো নয়, অভাবের কথাও আমাদের সংসারে একটু একটু করে ঢুকে পড়ছিল, ঢুকে না পড়ুক আনাচে কানাচে তার কালো ছায়ার আভাস মিলছিল। মাঝে মাঝে মনে হত বিকট চেহারার কেউ জানালার বাইরে শিকে মুখ রেখে স্থির ভাবে চেয়ে দেখছে। যেন সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে, আর-একটু সময়, আর একটু সাহস বাড়লেই শিক ধরে ঝাঁকাতে শুরু করবে।

তবু গোড়ার দিকে তোমাকে বিচলিত হতে দেখিনি। খুব ভোরে, যেমন করতে তেমনই, স্নান করে আসছ, সিঁদুর পরছ যত্ন করে, আর সকালের দিকে যতক্ষণ টুকিটাকি কাজ সারা না হচ্ছে, ততক্ষণ

কোনও কীর্তনের সুর গুনগুন করছ আপন মনে। ওই সুরটা আমি চিনি, যখনই শুনি তখনই মনের খুব নীচের পরতে ছোট্ট একটি কাঁটার মতন কী-যেন ফোটে। আর সেই সময়েই টের পাই, কেউ একেবারে যায় না, কিছু-না-কিছু যায় রেখে, যেমন সুধীরমামা কবে গেছেন, অথচ রয়েও গেছেন ওই সব গানের সুরের রেশে।

যেমন—গল্প থামিয়ে, মা, আরও একটু বলব?—যেমন, প্রথম যে-পদ্মটির গন্ধ পাই, আমার বয়সের সেই সকালে, সেই পদ্মটি আর নেই

(সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি ফুল শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি),

কিন্তু যখনই আজও একটি পদ্ম হাতের কাছে পাই, নাকের কাছে এনে তার ঘ্রাণ নিই, স্নিগ্ধ, মৃদু, তখনই সেই প্রথম-পাওয়া সৌরভটিকে ফিরে পাই। মরে-যাওয়া একটি ফুল চিরকালের সব ফুলের মধ্যে গন্ধটুকু হয়ে জেগে আছে।

এই সৌরভের নামই স্মৃতি। বারবার তা ফিরে আসে ছবিতে, গানে, আমাদের আমূল কাঁপায়। ছ্যাখো মা, অসুখে পড়ে পাতার পর পাতা তো এই সব লিখে ভরে ফেলছি, এখনও যদি হঠাৎ অনেক আগে শোনা কোনও গান বেজে ওঠে, অমনই উদাস হয়ে যাব। আমার হাত থামবে, কলমটা কাঁপবে। না, এই বয়সের পথে সমীচীন কোনও ভক্তি বা তত্ত্বমূলক গানেই না। খুব কাঁচা, হয়তো খুব জোলো প্রেমের গানেও। অথচ এখন কি আর প্রেম করা বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে প্রেম করি বা প্রেমে পড়ি? না। তবু হারানো একটি গান, পুরনো সেই সুর ধ্বনিত হলে আজও কান পেতে থাকি, তারা থরথর বয়সের যত হাহাকার, প্রেমের প্রথম দংশনগুলিকে ফিরিয়ে আনে। ক্ষতগুলি আবার জ্বালিয়ে দেয় বলেই বুঝি, এখনও আছি। সুরকেই তাই স্মৃতি, আর স্মৃতিকে সৌরভ বলছি।

তুমি বলতে সুরু করেছিলে, "ভালো ঠেকছে না, একটুও ভাল ঠেকছে না।"

বুঝেছি যে, তুমি বাবার কথা বলছ। বাবার চালচলন ধরন-ধারণ সবই বদলে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বের হতেই চাইতেন না। তবু মাঝে মাঝে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হত পার্কে; কোন-কোন-দিন গঙ্গার ঘাটে, যেদিন ছায়ার মতো আমি সঙ্গী হতে পারতাম।

"এর চেয়ে", অস্থির হয়ে তুমি এক-এক দিন বলে উঠেছ, "ও আগে যখন বাইরে-বাইরে ঘুরত, সে-ও এক রকম ছিল। কিংবা সংসার ছেড়ে দূরে দূরে, খবরও পেতাম না হয়ত, তবু মানুষটাকে বোঝা যেত। এখন আর ওকে বোঝা যায় না। বাইরে যায় না, ঘরে পড়ে আছে আধ-মরা হয়ে—ঘরে থেকেও যেন আরও বাইরে চলে যাচ্ছে।"

এর কিছুটা হয়ত অত্যুক্তি। যেটা ঘটে সেটা খোলা মনে আমরা মেনে নিতে পারি না, যেটা চলে যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলি তার জন্যে, ভাবি সেটাই ছিল ভালো। তোমার খেদ এই নিয়মের ছকেই পড়ত, তবে অস্বস্তি-আতঙ্কের কারণও ছিল।

একটা বড় কারণ, বাবার যে চাকরিটা আর নেই, সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওরা ছাড়িয়ে দিয়ে থাকবে।

তোমার অবশ্য বিশ্বাস ছিল ছাড়ায়নি, বাবা নিজেই ছেড়েছেন। বাবাকে তুমি আগে থেকে, আর সন্দেহ কী, আমার চেয়ে ভালো করে চিনতে। বলেছ, "ওর বরাবরের যা ধারা আবারও তাই। তা-ছাড়া কাজ করবে কী করে, ওখানে আর টিকতে পারত না তো। প্রেসের চাকরিটা আসলে ছিল ছুতো। থিয়েটারের একটু নামগন্ধ ছিল কিনা, তাই। যে-আশায় ওখানে গিয়েছিল, তাই যখন ভাঙল, তখন আর পড়ে থাকবে কিসের জন্যে। শরীর ভেঙেছে ওর, শরীরের সঙ্গে মনও। কিন্তু আমরা কী করি বল্ তো, আমাদের চলে কী করে?"

তুমি সংসার চলার কথাই ভাবছিলে। মা, ওই কঠিন দিনে, সংকট যখন সাঁড়াশির মুখের মতো ছোটো হয়ে আসছে, তখনও আমি কিন্তু

একটা পালা-বদল চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করেছি। যতদিন বাবা ছিলেন রূঢ়-বলিষ্ঠ, পুরুষ-বাস্তব, ততদিন তুমি ছিলে সুদূর, ক্ষীণ, শোকে ধূসর ; নিজের রচিত এক অলীক জগতে বাস করছিলে। আর বাবা যখন নির্জিত-নির্জীব, হয় অস্তিত্ব-অনুভূতির কোনও সূক্ষ্ম স্তরে উড্ডীন, অথবা বলা যায়, একটা অবাস্তব বোধের মধ্যে বিলীন, তখন তুমি বেরিয়ে এলে, বেরিয়ে তোমাকে আসতেই হল, গরজে, প্রয়োজনে। নিজেদের সম্ভ্রম আর ভদ্রতা নিয়ে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখাই তখন একমাত্র উদ্বেগ, আর তাই তুমি স্বাভাবিক বিচারে আচরণে ফিরে এলে।

এক পরিবারে একই সঙ্গে দুটি অস্বাভাবিক চরিত্রের অবস্থিতি অসম্ভব, সেটা প্রায় বে-হিসাবী বিলাসের পর্যায়ে পড়ে। বিধাতা তাই আতিশয্য ছেঁটেকেটে সামঞ্জস্য এনে দেন, বরাদ্দের ভারসাম্য বজায় থাকে।

এবার সে শিকগুলো দুমড়ে বাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছিল, অনটন-অভাবের সেই ছায়ামূর্তিটা, নতুবা সে সারাক্ষণই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত জানালার বাইরে, ক্লাস থেকে ফিরে ক্লান্ত আমি যখনই চোখ বুজেছি তখনই সেই অশরীরী কেউ ভীষণ অত্যাচারী, দুঃস্বপ্নটা দেখতে পেতাম। ক্লাস পুরো করা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো, পড়া মাথায় ঢুকত না, ইচ্ছেও করত না পড়তে, কারণ ভরপেট খেয়ে তো কলেজে যাইনি, একটা দুটো ঘণ্টা পেটা হতে না হতে পেট খালি, তখন করিডরে সিঁড়িতে ভিড়, ঠেলাঠেলি, পাশের গলিতে একটা বাড়ির ছাতে, দূর ওসব দেখে কী হবে, খালি পেটে কি আর ও-সমস্ত ভাল্লাগে, ওরা ফিজিক্স থিয়েটারের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে চোরা শিস দিচ্ছে দিক, শিস দেওয়ার কায়দা ওরা জানে, আমার জিভটা একটু মোটা, জড়— আমি পারিনে। ঢংঢং ঘণ্টা, এর পর কী, কার ক্লাস, ও হ্যাঁ হ্যাঁ পি-

আর-সি'র, বাংলার। মাথা ঝিম-ঝিম, পি-আর-সি রোজ অমন টেড়ি বাগিয়ে আসেন কী করে, এই সুমন্ত শুনছিস, নটবর কার্তিক মাইরি, কাঁধে চাদরটা পাট-পাট, একটুও কোঁচকায় না. ওর বউ ওকে নিশ্চয় রোজ রোজ সাজিয়ে দেয়, সাজিয়ে-গুজিয়ে ক্লাসে পাঠায়, দ্বিতীয় পক্ষের বউ যে, বৃদ্ধস্য তরুণী···, এই তরফদার তুই তো সব জানিস, তরুণী বউয়েরা আর কী-কী করে দেয় একবাট্টি বল না শুনি। লেকচার শুনছিস, তাই বলছিস চুপ করতে? খুব যে! লেকচার শুনছিস না ঘোড়ার ডিম, ওটা হল তোর পোজ, কী আছে এত শোনার, শুনি! স্যারের কোন্ কথাটা নতুন, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার জীবনদেবতা, অ্যাক্‌বারে পচে গ্যাছে, রবীন্দ্রনাথ পচেননি। শুনে শুনে ওই কথাটা পচেছে, এর পরের পিরিয়ডটা তো আরও যাচ্ছেতাই, ও-পি-সি-র ক্লাস, পি সি পড়ান পলিটিকস, ডেমোক্রাসি অ্যাকরডিং টু আরিস্টটল ইজ দি পারভারটেড ফরম অব, অব, অব কী যেন কথাটা কী যেন, আমি কিন্তু কাটছি, পরের ক্লাসটা থেকে পালাচ্ছি, তরফদার চাঁদু ভাইটি, তুই প্রক্‌সিটা দিয়ে দিস, মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, মাথার আর কী দোষ, খেয়েছি সেই কোন্ সকালে তা-ও ভাতে-ভাত, সে-সব হজম হয়ে গেছে কোন্ কালে, ফেরার পথে খাব চিনেবাদাম, তা-ও এক পয়সার মোটে, তার আগে দাও না দরোয়ান ভাই মিশিরজী, আমাকে আঁজলা ভরে জল খেতে দাও, নইলে এতটা পথ আমি যাব কী করে, পেটে খিদে চনচনে, রাস্তায় শেষে মাথা ঘুরে পড়ে না যাই, নইলে, চোখে মুখে যদি অন্তত জলের ছিটে থাকে, তবে পানের দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখার সুখ পেতে পেতে দিব্যি যাওয়া যাবে।

/

এই অংশটা এইভাবে লিখলাম, তখনকার মনের ভাব, চিন্তার ধরনের খানিকটা আভাস দিতে, ভিজে মাটি, শুকনো ঘাস, কাদা শিকড়সুদ্ধ কিছুটা আনলাম উপড়ে।

কিন্তু এই চালে কেন? মা, তুমি এই কথাটা জানতে চাইবে তো? অন্য কোনও রকমে তখনকার দারিদ্র্যের বিকট মুখচ্ছবি ফোটাতে পারব না যে। এক কালে পারতাম, যখন সে কাছের ছিল, আমার পিঠের কাছে, বুকের কাছে, ঘাড়ের উপরে তার গরম গরম নিশ্বাস ফেলত। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে চোখ বুজলে তাকে দেখতে পেতাম, একটু আগে লিখেছি না? ভুল লিখেছি। মা, তখন চোখ খুলে রেখেও সর্বক্ষণ তাকে দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি বাড়ির আনাচে-আনাচে, জমে-থাকা ধুলোয়, তরকারির খোসায়, ভাঙা চেয়ারের পায়ায়, দেয়ালের খসে-পড়া আস্তরে-চূণে। তোমার রুক্ষ-চুলে; মোটা শাড়ির এখানে-ওখানে ফেঁসে-যাওয়া কিন্তু লজ্জায় রেখে-ঢেকে ঘুরিয়ে পরা প্রতিটি অংশে। আমার মাড় দিয়ে কাচা জামার প্রতিটি সেলাই রিফু আর তালিতে। কথায় কথায় সর্দি জ্বর-কাশিতে বিছানায় পড়ে থাকায়। ঢকঢক জলে আর আধ-পয়সার বাদাম-ছোলায় টিফিন সারায়। ক্লাসের বন্ধুদের বই চেয়ে-চিন্তে এনে পড়ায় আর সেই অপমানটা নানান তৈরী-করা তুখোড় মিথ্যে দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায়। আঃ মা! আমার সেই কৈশোরের শেষে আর প্রথম যৌবনের লক্ষণের দিনগুলিতে কী কষ্ট যে পেয়েছি আর কত মিথ্যার পর মিথ্যা বলেছি! সমাজে, স্বজন-মহলে মুখরক্ষার, মাথা তুলে চলাফেরা করবার আর কোনও উপায় ছিল না।

আরও লিখব? কিন্তু যতই লিখি, সে কেবল কথার পর কথার পাহাড় সাজানো হবে, হাজার চেষ্টা করলেও সেদিনকার সেই দৈন্য, সেই দৈত্যটাকে জ্যান্ত করতে পারব না তো। আমার সেই ক্ষমতা গেছে। এখন বড়ো জোর শুধু হাড়মাস জড়ো করা সার হবে। সে প্রাণ পাবে না, নড়ে উঠবে না।

অথচ মা, সেদিন সে নড়ত, আমার চোখের সামনে, আমার বুকের ভিতরেও—সতত। আমার তখনকার আবেগ-আশঙ্কা, সুখের

কামনা আর দুঃখ নিয়ে আত্মরতি-ক্রীড়ার মধ্যে সে-ও মিশে ছিল। শিরায় যেমন রক্ত থাকে, জলে শ্যাওলা আর বাতাসে বাষ্প মিশে থাকে।

মা, তার চোখের পাতা পড়ত না, কী-জানি, পাতা হয় ছিলই না, পল্লবের লেশও দেখিনি, শুধু তার হিংস্র নিষ্ঠুর বড়-বড় নখ দেখেছি, যা দিয়ে সে আমাকে আঁচড়াত, রক্তাক্ত করে তুলত। আমাকে ঘৃণা করত সে, আমিও তাকে ঘৃণা করতাম, তবু তখন কিন্তু কলমের দু'-চার আঁচড়েই তার ছবিটা আঁকতে পারতাম।

আর আজ দ্যাখ, কখনও ঠুংরির স্টাইলে, কখনও পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলে তখন থেকে আওয়াজ তুলে যাচ্ছি, গলা চিরে গেল, তবু ঠিক সুরটি ফুটল না। যে ছবিই আঁকি আজ, সেটা হয় কমিক নয় রোমান্টিক হয়ে যায়। কেননা আঁকবে কে? যে ছেলেটা তাকে জেনেছিল, যাকে সে ভয় দেখাত, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কবে, দু' পয়সা বাঁচাতে দিন দুপুরে যে দু' মাইল রাস্তা চষে ফিরত, তাকে তো আমি আজ ডেকেও পাব না! আজ আমি কথায় কথায় এঁকে-ওকে দু' টাকা থেকে দশ টাকা শুধু বখশিস করে থাকি, করতে পারি, সে আর এমন কী শক্ত—সেটা ফশ করে দেশলাই ধরানোর মতো; কিন্তু সেদিনের সেই স্পর্শকাতর, অভিমানী, আত্মসম্মানী ছেলেটি, বখশিসের লোভ দেখালেই সে কি ফিরে আসবে? এভাবে কেউ কি উৎকোচে বিনষ্ট-বশীভূত করতে পারে নিজেরই অতীতকে? অতীত তো কারও তু-তু কুত্তা নয়—ভবিষ্যৎ যেমন অনায়ত্ত, অতীতও স্বাধীন; কবলমুক্ত; আমার সেই-আমি আজ আর আমারও আজ্ঞাবহ নয়।

আসলে তা-ও হয়ত না। কথায় কথায় অনেকখানি জায়গা যে ভরিয়ে দিলাম, যার মানে দাঁড়ায় ঝোপের চার পাশে লাঠি পিটে পিটে সারা হওয়া, তার কারণ আমার ভিতর থেকে এই মুহূর্তে একটা কিছু বাধা দিচ্ছে। তখনকার আমি-কে তুলে আনা সহজ নয়, সে তো ঠিকই। তার চেয়েও বড় অসুবিধা, শুধু "সেই আমাকে"-ই

তো তুলে আনলে চলবে না, সেই সঙ্গে যে তোমাকেও তুলে আনতে হবে।

মা, মিথ্যে বলব না। সেই পরিচ্ছেদে পৌঁছে গিয়েছি যখন তোমার আমার সম্পর্কের আরও নির্মম ব্যবচ্ছেদ প্রয়োজন হবে। তাই কলম সরতে চাইছিল না, ইনিয়ে বিনিয়ে দৈন্য-দুর্দশার রক্তমাংস-হাড়-ছাড়া ছবি এঁকে এঁকেই সময় কাটিয়ে দিতে চাইছিল।

কিন্তু আর না। এই তো আমি শক্ত মুঠোয় ধরেছি কলমটা, আর কাঁপছে না। জহ্লাদ যখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি তার হাতের খাঁড়া কাঁপে? না। সে শুধু ভয়ংকর যে কাণ্ডটা সংঘটিত করতে যাচ্ছে, তার জন্যে মনে মনে মার্জনা চেয়ে নেয় ইস্টদেবতার কাছে। আমি তাই নিলাম মা, নিজেকে প্রস্তুত করলাম। কলমটা এখন ধারালো ছোরা বসাব নিজের বুকে, আর তোমার তিলে তিলে তৈরী করা মহীয়সী প্রতিমাখানিকেও হয়ত বাঁচাতে পারব না।

আমি আত্মঘাতী, আবার দ্যাখো, বাবার সেই পরিহাসচ্ছলে জারী করা হুকুমটাই সত্য হল, আমি পরশুরামও, যে মাতৃঘাতী।

(কলকাতায় গোড়ার দিকে বাবা একবার—তখন তিনি সুস্থ—কাহিনীটা মুখে মুখে বলেছিলেন। পিতা জমদগ্নির আদেশে দ্বিরুক্তি না করে পরশুরাম নাকি মাতা রেণুকাকে হনন করেছিল। বাবা বলেছিলেন "এই হল পুত্র। পিতৃআজ্ঞা যার কাছে বেদবাক্যের মতো। তোকে যদি বলি, তুই পারবি করতে?" তিনি হাসতে হাসতেই বলেছিলেন অবশ্য। সেই হাসিটা আমার কানে এখন ঝনঝন করে বাজছে।)

তোমাকেও আঘাত করতে হবে। কারণ অভাব নামে সেই দস্যুটা, যে হ্যাংলা হলেও ল্যাঙ্গট-পরা পালোয়ান, আমাদের দু'জনকেই

টেনে হিঁচড়ে নীচের ধাপে নামিয়ে আনছিল। বাবা তখন থেকেও নেই, অনেকদিন পরে ফের সেই আমরা দু'জন।

প্রয়োজন আমাদের ছোট করে ফেলছিল।

মা, কোন্ কথাটা প্রথমে লিখব, পরীক্ষার ফী-জ নিয়ে জোচ্চুরি, না তোমার শেষ দু'গাছি চুড়ি বিক্রী ?

কুড়ি

আগে পশুপতি জ্যাঠাবাবুর কথাটা বলে নিই। সেই সময় উনি আমাদের সংসারে কয়েকটা দিন বয়ে গিয়েছিলেন একটা ভরসার বাতাসের মতো।

"প্রণব আছে, প্রণব আছে?" বলতে বলতে একদিন সকালে পড়েছিলেন আমাদের ঘরে ঢুকে, তখনকার দিনে টোকাটুকি দিয়ে ঢোকার ব্যাপার-স্যাপার ছিলই না, বাবাকে দেখতে পেয়ে "আরে এই তো প্রণব" বলে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, "কিন্তু বিছানায় কেন।" তুমি সশব্যস্ত, মাথায় ঘোমটা তুলে এক পাশে, আগন্তুক ওই লোকটি, যাঁর চেহারা দশাসই, কাঁধ চওড়া, গায়ে মোটা ফতুয়া, অনেকটা বাবাকে আগে যেমন দেখাত, প্রশস্ত কপাল, চোখ উজ্জ্বল, তোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে চিনবে না বউমা! আগে দেখনি। আমি পশুপতি। প্রণব কোনদিন আমার কথা তোমাদের বলেনি?"

বাবার তখন কথা বলতে কষ্ট হত, কিন্তু এক ধরনের সম্বিত তখনও ছিল, দেখলাম ওঁর শীর্ণ-ক্লিষ্ট মুখ আকস্মিক একটা আলোকে ভরে গেছে। পশুপতি বললেন, "আমি ওর দাদা হই।"

বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে কোনমতে বললেন, "দাদারও বেশি।"

পশুপতি জ্যাঠা বললেন, "সম্পর্ক হিসেব করলে, খুব দূরের যদিও, এক রকম নেই-ই। তবু আমরা অনেকের চেয়েই আপন, কাছাকাছি। সুখে-দুঃখে বহুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি।"

তুমি তখন তাঁকে প্রণাম করলে। তোমার দেখাদেখি আমিও।

পশুপতি নিঃসংকোচে বসলেন বাবার বিছানার এক ধারে। বললেন, "ওর এই অবস্থা তা-তো জানি না। অমি তো অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, গত মাসে আমরা সবাই ছাড়া পাই, জানো

তো ? আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাই রাঁচিতে, শ্রীঘরবাসে শরীর তো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে ? প্রণব সে-সব নিজেই তো জানে। রাঁচিতে আমাদের গ্রুপের আরও কয়েক জন এল, আন্দামান-ফেরত পুরনো দু'জন বন্ধুও দেখি জুটে গেল। সেখানে দিনের পর দিন ধরে অনেক পরামর্শ। প্রণব", বাবার দিকে স্থির চোখে চেয়ে পশুপতি বললেন, "একটা প্ল্যান পাকা করেই এখানে এসেছি।"

বাবার চোখের পাতা আর ঠোঁটের কোণ কাঁপছিল।

পশুশতি আসন করে বসেছেন। বললেন, "এখনই ভেঙে কিছু বলব না। বলব ক্রমে ক্রমে। তার আগে" বুক পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে তিনি বললেন, "যাও তো, গরম গরম জিলিপি নিয়ে এসো আগে। আর খাস্তা কচুরি। সকাল থেকে পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি।"

তুমি অবাক হয়ে চেয়ে ছিলে। কচুরি আর জিলিপি যখন এল, পশুপতি তখন বললেন, "হাত মুখ ধুয়ে আসি, তারপর। কলঘরটা কোন্ দিকে ?"

ঘরটর যে নেই সেটা তাঁকে আর বলা হল না, ইশারায় দেখিয়ে দেওয়া হল কলতলার দিকটাকে।

তুমি বললে বাবার মুখের দিকে চেয়ে, "ভারী চমৎকার লোক তো, একেবারে খোলামেলা।"

বাবা অস্পষ্ট স্বরে যে-উত্তর দিলেন তার মানে দাঁড়ায় এই, পশুপতিরা হলেন আলাদা জাতের মানুষ। মনে মুখে এক। কোনও ময়লা নেই। ময়লা নেই বলেই এত সহজে সব পরিবেশে মিশে যেতে পারেন।

উনি একটু পরেই ফিরে এলেন। তুমি তখন খাবার ভাগ করে করে রাখছ ডিসে ডিসে। বাবা শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। মুখে বলছেন না কিছুই। অসুখটার পর থেকে ওঁর নোলা বেড়েছিল।

একটা ডিস পশুপতির সামনে সাজিয়ে ধরে তুমি ফিসফিস করে আমাকে বললে "জিজ্ঞেস কর্‌তো, উঠেছেন কোথায়।"

"উঠেছি একটা মেস-এ, মির্জাপুরের ওদিকে," পশুপতি সরাসরি জবাব দিলেন, "ওটা অনেক দিনের জানাশোনা জায়গা, তা ছাড়া আমাদের দলেরও একটা আড্ডা।"

"খাওয়া দাওয়া কেমন ?" জিজ্ঞাসা করলে তুমি, এবারও আমার দিকে মুখ রেখে।

"ঠাকুরের রান্না তো, বিশেষ ভাল না। আমার ইচ্ছে আছে বউমা, একদিন তোমার হাতে খেয়ে যাই।"

"বেশ তো, যান না", এতক্ষণে তুমি বলতে পারলে সরাসরি, ঘোমটাটা যদিও টানাই রইল, তারপর খুব কুণ্ঠিতভাবে, খুব আস্তে আস্তে, "ক'দিনই বা থাকবেন, সাহস করে বলতে পারছি না আপনাকে। যদি—যদি খুব অসুবিধে মনে না করেন, তবে দু বেলাই খান না এখানে!"

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি, এইতো আমরা নিজেরাই এইভাবে আছি, পাপোষের তলায় চাপা-পড়া পোকার মতো কায়ক্লেশে, এই বিমুখ-বিমাতা শহরে, সকালে আজকাল রোজ আমি মুড়িও পাই না, বাবার মাথার ঠাণ্ডা তেলটা কেনাই হচ্ছে না ক'দিন, এর মধ্যে খেতে ডাকছ আর-এক-জনকে ? কী খাওয়াবে বিশিষ্ট ওই ভদ্রলোককে তুমি, থালায় কি শুধু পান্তাভাত আর নুন-কাঁচালঙ্কা বেড়ে দেবে ? আমি লুকিয়ে তোমার পায়ের আঙুলে চিমটি কাটছি, তার মানে সংকেতে তোমাকে বলছি চুপ করতে, কিন্তু ওই যে, ওই তো, পশুপতিবাবু বলছেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়," আর তুমি ইতিমধ্যে যেন আরও লজ্জাবতী ভাদ্র-বধূ, মাথা আর তুলছই না, চোখ দু'টিকে সারাক্ষণ রেখেছ মেঝের শানে, আরও মিষ্টি, খুব মৃদু গলায় বলছ, "আপনার অবিশ্যি খেতে কষ্ট হবে," মা, এ-গলা তুমি পেলে কোথায়, আর সাজানো-গোছানো

সুন্দর করে বলা ওই কথাগুলো, তৈরী করে বলছ, না তৈরী করাই ছিল, যেন একটা শেখা পার্ট, তুমি মুখস্থ বলছ; পশুপতিবাবু হাসছেন হো-হো করে—"কী যে বলো, জীবনের শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণ-পক্ষের মতো দু'টো ভাগের একটা যাদের কেটেছে জেলে, সেখানে লপ্‌সিই হল গিয়ে অমৃত, আর তুমি বলছ, এখানে খেতে কষ্ট হবে? হা-হা-হা।"

পশুপতিবাবু একবার হাসি থামিয়ে ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন।—"কিন্তু বউমা, ঠিক করে বলো, তোমার অসুবিধে হবে না তো। দেখছ তো আমার শরীরের বহর, আমি আজকাল পেটুকও। আগেকার খেতে না-পাওয়াটা এখন পুষিয়ে নিচ্ছি আর কী। এ-বেলার বাজার তোমাদের নিশ্চয়ই হয়ে গেছে

(উনি ইদানীংকার কিচ্ছু জানেন না, হালে আমাদের আবার রোজ বাজার হয় কবে),

তাহলে একটা কাজ করা যাক, আমি আসব ও-বেলা, তুমি যাও তো খোকা, বাজারের সেরা মুগডাল আনবে, কেমন? আর পেট মোটা কই, কেমন? আলু পেঁয়াজ যা-যা চাই সব ওকে বলে দাও তো"—তিনি এবার জামার ভিতরের পকেট থেকে দশ টাকার নোট টেনে বার করলেন।

একটু আগে জিলিপির জন্যে পাঁচ, এখন বাজারের জন্যে দশ, নোটগুলো নক্‌শাকাটা ফুল হয়ে এই ঘরের হাওয়ায় ভাসছে। ভাসছে সত্যিই, না ভেল্‌কি দেখছি আমরা? পশুপতিবাবু, আকস্মিক ওই অভ্যাগত মানুষটি কে জানে রক্তমাংসের কিনা, হয়ত কোনও রূপকথার মানুষ উনি, রূপকথার পাতা থেকে নেমে এসেছেন, তাহলে তো এই নোটটা সত্যি নয়, এক্ষুনি উবে যেতে পারে—ভয়ে ভয়ে নোটটাকে আমি মুঠো করলাম।

প্রথমে অবাক হয়েছিলাম অবিশ্যি, এখন আর হচ্ছি না, যেন, এখন বুঝতে পারছি, এ-সমস্তই আমার জানা, আগেই কোথাও দেখা

ছিল, জানা ছিল যে, পশুপতি নামক ওই বলীয়ান পুরুষটির আবির্ভাব ঘটবে, তাঁর গল্প, তাঁর হাসি, তাঁর নোট, পর পর এ-সব ঘটবেই তো, আমি দু'বার করে দেখছি।

"দু' ভাই মিলে অনেক দিন পরে জমিয়ে খাওয়া যাবে, কী বলো ভাই প্রণব", ওই অলীক-প্রায়, অপরূপ, প্রেরিত পুরুষ-প্রতিম ব্যক্তিটি দরাজ গলায় বলছেন তখন। তিনি, যাঁর নাম পশুপতিবাবু।

বাবা কিছুই বলছিলেন না। একটু আগে যেমন পশুপতির, তখন বাবারও বালিশে-রাখা মাথা থেকে চোখ দুটি ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। মা, তুমিও ঘোমটার তলা থেকে চাইছিলে এদিকে-ওদিকে, আর আমি ?—আমি কি তখন সহসা উপস্থিত এক সৌরজগতে, সৌরজগৎ তখন ওই ঘরটাই, যেখানে নানা চোখের নানা দৃষ্টি গ্রহ-উপগ্রহের মতো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

"চমৎকার লোক এই পশুপতিবাবু, না ?" উনি চলে যেতে বলে উঠলাম। আসলে বললাম আমরা তিনজনেই, তোমরা দু'জন চোখ দিয়ে, আমি মুখে।

"ছিঃ, অত বড় মানুষটা, নাম ধরে বলতে নেই, জ্যাঠাবাবু বোলো।" ঠিক বকছ না তখন তুমি আমাকে, শুধু যা সমীচীন তাই শিখিয়ে দিচ্ছ।

আর, মা, যখন খানিক পরে বাজারে যাচ্ছি নোটটা নাচাতে নাচাতে, তখন মনে মনে তোমাকে প্রণাম করছি, মা, তুমিও তবে নিশ্চয়ই জানতে, যখন ওঁকে হঠাৎ খেতে বলেছিলে, ওঁর চেহারাই কি দিল্‌দরিয়া ভিতরটাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, অথবা অভিজ্ঞা তুমি, তাই। অথবা অভাবই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে থাকে ? যাই হোক, তুমি ধরতে পেরেছিলে কিন্তু—পশুপতিবাবুর

(ছিঃ, পশুপতি তো নয়, জ্যাঠাবাবু)

দরাজ ঔদার্য সব বুঝি মন্ত্রবলে তোমার দিব্যদৃষ্টিতে আভাসিত ছিল ?

মশলা পেশা হল বিকালের দিকে, দুটো উনুন জ্বলল, এ সব খুঁটিনাটি না-হয় বাদ দিয়ে যাই, কিন্তু বালতি বালতি জল ঢেলে ঘর ধোয়া-মোছা, আচ্ছা ওটাও থাক, কিন্তু মা, কোথায় ছিল ধবধবে ওই শাড়িটা, সন্ধ্যায় গা ধুয়ে এসে যেটা তাড়াতাড়ি পরে নিলে ? এ-ও বুঝি সেই দিব্যদৃষ্টি দূরদৃষ্টি, তুমি জানতে কোনো-না-কোনোদিন এই রকমই একটা আবির্ভাব-অভ্যুদয় ঘটবে, তাই আগামীর দিকে চেয়ে একটা ভালো শাড়ি তোরঙে তুলে রেখেছিলে ?

আমার দৃষ্টিতে কী ছিল—বিস্ময়, না মুগ্ধতা ? একটু কি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলে ? তাই কেমন-যেন ধরা পড়ে-যাওয়া গলায় বললে, "কী দেখছিস্ ?"

আর তো সেই বালকটি নই, যে-বালক দেশের বাড়িতে বাবা প্রথম আসার দিনটিতে তোমার রঙীন শাড়ি দেখে ব্যথিত-আহত বোবা হয়ে ছিল। আজকের শহুরে-সেয়ানা ছেলেটা সটান বলে বসল, "তোমাকে। না, এই শাড়িটাকে।"

"পরলাম", কুণ্ঠিত গলায় তুমি বললে, "পরলাম। বড্ড নোংরা হয়ে থাকি, বাইরের একজন খাবে, যদি ওঁর গা ঘিনঘিন করে ?"

মা, তুমি বাইরের মানুষটির চোখ দিয়ে দেখছিলে, তাই সেদিন বুঝতে পারনি। আজ যদি বলি, গা ঘিনঘিন করছিল আমারও ?

(যদিও তখন শহুরে, তখনই মিথ্যেবাদী, তখনি বলেছিলাম, "ভালোই তো লাগছে এই শাড়িটায় তোমাকে।")

আর কী বলছিলে তুমি, নোংরা ? যে শাড়িটা পরে ছিলে তখন, সেটা ফরসা বটে, তবু টের কি পাওনি ওর সুতোয় সুতোয়,

প্রত্যেকটা টানা আর পোড়েনে কত ধুলো লুকিয়ে আছে? এই শাড়িটা রঙীন নয় অবশ্য, কিন্তু কোথায় যেন লোভের রঙ নির্লজ্জভাবে কটকট করছে, তোমার চোখে পড়েনি? দিব্যদৃষ্টি এমনই হয় বুঝি? একটা দিকে খোলা থাকে, অন্য দিকে কানা?

এত ধোয়া-মোছা, আমাদের ঘর অনেক দিন পর যেন ঝকঝক করতে থাকল, তবু কই, তেমন পরিচ্ছন্ন তো লাগছে না! বরং ময়লা একটি মেয়ে, ফুটফুটে হওয়ার আশায়, ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে মুখখানা কি রক্তাক্ত করে ফেলল?

এত স্পষ্টভাবে বুঝিনি সেদিন, তবু নামহীন অন্য একটি নয়ন দিয়ে আবছাভাবে দেখছিলাম।

সেই দৈত্যটা। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত-ধূর্তটা, যে শিক ঝাঁকাত। সে সরসর করে সাপের মতো চলে এসেছে ঘরের ভিতরে।

পশুপতি, না না জ্যাঠাবাবু, সময়মত এলেন। খেলেন পরিতোষ সহকারে, কাঁটা চুষে চুষে পাতের পাশে ফেলে ফেলে

(ভাবছ প্রণব, আমার দাঁত বাঁধানো? তা নয়, তা নয়, এখনও বেশ মজবুত আছি')।

ঝোলের বাটিতে কব্জি ডুবিয়ে

('তুমি কিন্তু খেতে পারছ না প্রণব, হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেছ। অথচ এই সেদিনও তো—যাক, ভেবো না কিছু, আমি যখন এসেছি। আবার দাঁড় করিয়ে দেব তোমাকে, কাজের মধ্যে টেনে নামাব। যা ছিলে তাই করে দেব। ভেবো না')।

পানও মুখে একটা পুরলেন জ্যাঠাবাবু, যাবার সময় আমাকে কাছে ডাকলেন, দেখেছেন তো সেই থেকেই কিন্তু ঠিক ওইভাবে নয়, এতক্ষণ ওঁর কাছে আমি ছিলাম এই বাড়ির অংশমাত্র, কিন্তু যেন ওই প্রথম আলাদাভাবে চোখে পড়লাম।

"কী পড় তুমি ?"

বললাম।

"সায়েন্স, না আর্টস ?"

"আর্টস।"

"অঙ্কে মাথা নেই বুঝি ?"

সময় বিশেষে আর-একটু ছেলেমানুষ কী করে হয়ে যেতে হয়, মুখে লাজুক-লাজুক ভাব রাখতে হয় ফুটিয়ে, তখন থেকেই বেশ জানি। খুব সারল্যের হাসিখানি এঁকে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইলাম। কিন্তু উত্তর দিলাম না, গুরুজনদের সঙ্গে সমানে কথা বলে যেতে নেই, কখনও-কখনও না বলাটাই সহবৎ, সেটাই বিনয়, এ সব শেখা ছিল তাই খুব সরল হাসি আর দীপ্ত দৃষ্টি মিলিয়ে চেয়ে থাকলাম।

বাবাও কিছু বললেন না, তখন এগিয়ে এলে মা, তুমি নিজেই। ঘোমটা কপাল পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে, সত্যি-সত্যি কিছু ভাসুর নন তো উনি, সুতরাং কী এসে-যায়, নীচু গলায় বললে, "ওর ঝোঁক অন্য দিকে। লেখায়-টেখায়।"

"ওর বাপের মতো ?" জ্যাঠাবাবু হাসলেন, আর সেই মুহূর্তে কী হল, বাবা হঠাৎ দু হাতে চোখ ঢেকে অস্থিরভাবে মাথা এদিক-ওদিক নাড়তে থাকলেন, কী অস্বীকার করতে-চাইছিলেন উনি, জানি না। উনি লেখক নন, না আমি না ? অথবা ওঁর মতো না ? সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই, রেগে যাচ্ছিলাম আমি, ফুঁশছিলাম, আড়-চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছিলাম, 'তোমার মতো একটুও নই আমি, কেন হব, যদি সত্যি সত্যি কখনও লেখক হই, তবে আমি হব সময়ের মাপমত, ঝকঝকে, মডার্ণ। কিচ্ছু হয়েছে কি তোমার গুলো ? ওই পালা-টালা ? কিচ্ছু না।'

আর বাবা ? শুধুই মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন। অস্পষ্ট, অর্থহীন-ভাবে।

পশুপতি অতসব দেখছিলেন না, বললেন, "কী পড়ো দু-একটা বই নিয়ে এসো তো। আজকালকার কোর্সে কী সব আছে, ভালো করে জানিওনে।"

"সব বই তো নেই ওর" তাড়াতাড়ি বলে উঠলে তুমি, "কিনতে পারেনি।"

"পারেনি কেন", পশুপতি জিজ্ঞাসা করলেন একবার, কিন্তু একবারই শুধু, দু'বার নয়, দু'বার জিজ্ঞাসা করতে হল না, এবার আমি মুখের সেই সরল হাসিটুকু ঘুচিয়ে ছলছল চোখে চেয়ে রইলাম কিনা

(মা, আগে থেকেই কেউ কি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, নাকি আমরাই, আমরা দু'জনে মিলে বোবা ভাষায় ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, কথা-টথা যা তুমি জুগিয়ে যাবে, আর আমি কখনও স্মিত, কখনও দুঃখিত মুখে এই সব ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে রাখব, বদলাতে থাকব ?)—

আমি খুব করুণভাবে চেয়ে রইলাম কি না, তাই পশুপতি আর জিজ্ঞাসা করলেন না, বই কিনতে না-পারার কারণটা বুঝে নিলেন। একটু পরে বললেন, "পরীক্ষা কবে ?"

"এই তো সামনেই। ফীজ এখনও জমা দেওয়া হয়নি।" এবারও বললে তুমিই, এই শহরটা কী মা! কী এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে সে জড়োসড়ো গৃহবধূর মুখে প্রয়োজনীয় কথা জোগায়, ঘোমটাটা ঠেলে ঠেলে দেয় একটু একটু করে, পিছনে, আরও পিছনে!

এবার আর কারণ জিজ্ঞাসা করেন নি পশুপতি, শুধু বলেছেন, "ও।"

তিনি যখন চলে যাচ্ছেন, তখন আরও একবার মাথা নুইয়ে প্রণাম করছ তুমি, আমাকে করতে বলছ। মৃদু গলায় বলছ, "আবার আসবেন।"

"আসঘ বইকি, এমন চমৎকার খাওয়ালে তুমি বউমা, আসব

না?" পশুপতি বললেন, "আর কিছু না হোক, ওই খাবার লোভেই তো আসব।" চলে গেলেন হাসতে হাসতে। বাবা উঠলেন না। ওঁর মাথা নাড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু চেয়ে দেখলেন।

আর তখনই, মা, তুমি বলে উঠলে, "আরে!"

আমি তাকালাম।

আঁচলের খুঁটটা খুলতে খুলতে তুমি বললে, "ওঁর সেই দশ টাকার বাজারফেরত চার টাকা ছ' আনা—তা যে রয়েই গেল, ফেরত দেওয়া তো হল না!"

আমি তাকিয়ে রইলাম, কিছু বললাম না। তুমি বাবার দিকে চাইলে। বাবাও চুপ। তুমি তাড়াতাড়ি বললে, "বোধ হয় ভুলে গেছেন।" আমরা কিছু বলছি না, সেই দৃশ্যে কথা তোমার একারই। এবার একটু হাসছ তুমি, মানে, হাসতে চেষ্টা করছ।—"যাক, আবার তো আসবেন।"

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল মা, ভীষণ কষ্ট, তোমাকে ওইভাবে একা করে দিতে, একাই কথা বলিয়ে নিতে, তাই এবার মুখ খুলতেই হল বলতেই হল সায় দিয়ে "আবার আসবেন। ওঁর নিশ্চয়ই মনে ছিল না।"

"তাই তো, তাই তো, তাই", তুমি বুঝি আমার ওই একটা কথারই অপেক্ষা করছিলে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা নামিয়ে হালকা হয়ে গেলে, তোমার খুশী মন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে যেন তালি বাজাচ্ছিল, তাই-তাই-তাই।

"ওঁর মনে ছিল না।" বলেছিলাম। কথাটা হয়ত ঠিকই, কিন্তু আংশিক ঠিক। ওইটুকু বললাম। কিন্তু বাকীটুকু? তোমার যে মনে ছিল, ফেরত টাকাটা তোমার সজ্ঞান আঁচলের খুঁটে আগাগোড়া বাঁধা ছিল, সে কথা বললাম, না, বলতে পারলাম না, ছেলে হয়ে মাকে ও-কথা বলা যায়!

বাবা শুধু চেয়ে দেখছিলেন। দেখতে থাকলেন, পর পর চার

দিন কি পাঁচ দিন ঠিক মনে নেই, পশুপতি, মানে জ্যাঠাবাবু আসছেন, যাচ্ছেন, কোনও দিন বাজার আনছেন নিজেই, কোনদিন বা এসেই দিচ্ছেন নোট বাড়িয়ে, কত রকমের রান্না, তার গন্ধ কী চমৎকার, আঃ, জানালার বাইরের সেই ভয়-দেখানো দৈত্যটা, এখন ভিখারী হয়ে সেই দৈত্যটা, পাতের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে সব চেটেপুটে খাচ্ছে।

বাবার সঙ্গেও অনেক কথা হত জ্যাঠাবাবুর। আগেকার কথা, পরে কী হবে, সেই সব কথা! শুধু এক দিন দেখলাম, জ্যাঠাবাবু ঢুকছেন হাতে মস্ত একটা ইলিশ নিয়ে আর বাবা শুধু আড়চোখে তাই দেখে নিয়ে চুপে চুপে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

রান্না হতে থাকল, জ্যাঠাবাবু কাগজ পড়ে যেতে থাকলেন. প্রথমে ব্যাপারটা তেমনকিছু বিসদৃশ মনে হয়নি, কত কাজেই তো মানুষ এক্ষুনি আসছি বলে বেরিয়ে যায়, বাবা অন্তত নীচের বাথরুমেও তো গিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু শেষবারের মতো কড়াটা ছ্যাক করে উঠল, গরম গরম ফেনা গড়িয়ে দিয়ে ভাতের ঝরঝরে হাঁড়িটা সুস্বাদু চালের গন্ধ ছাড়তে থাকল, ওদিকে খবরের কাগজটাও পড়া হয়ে গেল আদ্যোপান্ত, জ্যাঠাবাবু তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে চশমার কাচ সাফ করতে শুরু করলেন, ঘাড় ফিরিয়ে তুমি আমাকে বললে, “মানুষটা কোথায় গেল, ছাখ তো”, আর তখন জ্যাঠাবাবু, হঠাৎ যেন সচকিত, বললেন “তাই তো, প্রণব গেল কোথায় ?”

আমি জানতাম, কোথায়।

গঙ্গার জলে ব্যস্ততাহীন একটার পর একটা ফুল ভেসে যাচ্ছিল, বাবা ঝুঁকে পড়ে তার দু'একটা তুলে শুঁকছেন, আমার পায়ের শব্দেই আমাকে চিনে বললেন, “পশুপতি রোজ রোজ আসে কেন।”

আমি তখনও ওঁর মুখ দেখতে পাইনি। যখন এদিকে ফিরলেন,

দেখলাম, সেই মুখটা ভয়ার্ত, হাতের ভিজে ফুলটা কাঁপছে। চাপা অথচ দ্রুত গলায় বাবা নিজেই বললেন, "আমি জানি কেন।" মাথা নীচু করে জুড়ে দিলেন, "ওরা আমাকে আন্দামানে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যাবে বলেই পশুপতি এসেছে।"

বললাম, "আন্দামানে নয় তো। ওঁর কয়েকজন বন্ধু আন্দামান ফেরত, এইমাত্র।"

বাবা তবু বিহ্বলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আমি জানি।"

জোর দিয়ে বললাম, "ভুল বুঝেছেন। ওঁরা নতুন করে একটা কিছু আরম্ভ করবেন ভাবছেন। সঙ্গী হিসেবে আপনাকে পেতে চান, আপনাকেও আন্দোলনে নামাতে চান।"

"না, না, না" নুয়ে পড়ে জল ছুঁয়ে বাবা হাত তুলে নিলেন সভয়ে, ধরা ধরা গলায় বললেন, "আমার শীত করবে যে, পারব না। আমি নামব না।"

আস্তে আস্তে ধরে উঠিয়ে ওঁকে ফিরিয়ে আনলাম বাড়ি। রাস্তায় বিড়বিড় করে বাবা বলছিলেন, "অনেক টাকা কিনা এখন ওদের, দু'হাতে তাই ছড়াচ্ছে। এ সব হল পুরনো আমলের স্বদেশী ডাকাতির টাকা।"

পশুপতি উঠে দাঁড়ালেন আমাদের দেখে।—"ভালই হল, দেখা হয়ে গেল। আমি বেশ কিছু দিন আর আসতে পারব না প্রণব।" রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "যাচ্ছি আসামের জঙ্গলে।"

বলতে বলতে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি, ফিরে তাকিয়ে বললেন, "সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে ফিরব আবার—তা অন্তত চার পাঁচ মাস তো বটেই। তখন আশা করি তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ দেখতে পাব প্রণব। - তখন তৈরি থেকো।"

বাবার ঠোঁট কাঁপছিল, কী বললেন, বোঝা গেল না। মোটা

মোটা আঙুলে খামচে ধরেছিলেন আমার জামাটাও। আশ্রয় চাইছিলেন? আঁকড়ে থাকতে চাইছিলেন?

কিন্তু ওই খামটা, বিছানার উপর পড়ে ছিল যেটা, নোটভর্তি খামটা আবার কি ভুলে ফেলে যাচ্ছিলেন জ্যাঠাবাবু, ওটার কথা ওঁর মনে ছিল না? তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খামটা দিতে গেলাম ওঁকে, উনি স্বর্গীয় হাসিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়ে বললেন, "থাক"।

ওই "থাক" বলাটাই কাল হল। আমাদের পক্ষে ভীষণ একটা ঘটনা। সেই ভিখারীটা ঘরের মধ্যে উবু হয়ে বসে "থাক" কথাটা কান পেতে শুনল। আপ্যায়িত হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। তার মুখ থেকে লালা ঝরছিল।

এতক্ষণ পরে, মা, তুমি এগিয়ে এসেছ। একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে, আমার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলেছ, "কেন খামটা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলি?

"ভাবলাম, আবার বুঝি ভুল করে—"

"ভুল করে নয়। ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করেই ওটা রেখে যাচ্ছিলেন উনি। আমি জানি।"

"জানো?" আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।—"জানলে কী করে?"

"আমাকে বলেছিলেন যে। বলেছিলেন যে, বউমা, কিছু যদি মনে না করো তো এটা রাখো। এত চালাক চতুর ছেলে তোমার, টাকার অভাবে ওর পড়ার বা পরীক্ষার কোনও ক্ষতি হয়, এ আমি চাই না।"

"পৃথিবীতে, আশ্চর্য, এখনও এ-রকম মানুষ আছে", অভিভূত, উচ্ছ্বসিত, তুমি বলেই চলেছ, আর যেহেতু বাবা আগাগোড়া বাক্যহারা, তাই রোখ্ চেপে গেছে তোমার মাথায়, প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে দিয়ে বলেছ তার পরে—"তোমার থিয়েটারের লোকেদের চেয়ে ঢের ভালো, যা-ই বলো বাপু। ওরা যেই দেখল তুমি

পড়ে গেছ, অমনই ছাড়িয়ে দিল। ছাড়িয়েই তো দিয়েছে, তাই না ?”

যেহেতু ততক্ষণে তুমি বুঝে নিয়েছ বাবার নিষ্পলক চোখে কিছুই ফুটবে না, সুতরাং সায় পাবার আশায় তাকিয়েছ আমার দিকে, আর আমি বাধ্য, অনুগত, আমি ছাড়া তোমার কেই বা আছে, তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের টিকটিকিটার সুরে সুর মিলিয়ে বলেছি, ঠিক ঠিক।

এই পশুপতিরা, আমারও মন তখন বলছিল, যেন গল্পে পড়া গোপাল দাদার মতো ; যেন আকালের মাসে এক পশলা বর্ষার মতো : হঠাৎ এসে ভিজিয়ে দিয়ে যান, বাঁচান। মারেনও কি ? মায়ের দিকে তাকাইনি, তখন কায়মনোবাক্যে এতই বাঁচতে চাইছিলাম। নইলে খামটাকে মুঠোর মধ্যে ভরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যখন নামছি, তখন মাথাটা একটু ঘুরত নিশ্চয়ই ? মনে হত, ওটা যেন একটা ঘোরানো সিঁড়ি, গড়িয়ে পড়ছি, তুমি আমি দু'জনেই, এক দিকে প্রয়োজন, আমরা পড়ছি, সম্ভ্রমবোধ অন্য দিকে, পড়ছি তো পড়ছিই, কে কাকে আঁকড়ে ধরব, টলমল সময়ে কী করে টাল সামলাব যা দিয়ে আমরা ঢাকা থাকি সেই চামড়া-টামড়া ছড়ে যাচ্ছে চোখের পরদাও যাচ্ছে ছিঁড়ে।

জগতের কাছে অনাবৃত, সে-কথা তো পরে, পরস্পরের কাছেও আমরা যে বেরিয়ে পড়ছিলাম, সেইটাই ভয়ঙ্কর, আজ ভাবতেও লজ্জা করে। এত মিথ্যে তখন বলেছি, অবিরল, অনর্গল, বাড়ি-ওয়ালা থেকে শুরু করে মুদি ; মুদি থেকে প্রতিটি পাওনাদারের কাছে, জমিয়ে রাখলে তা হত প্রকাণ্ড একটা স্তূপ, ছড়িয়ে দিলে সেই মিথ্যে যেত দুর্গন্ধ একটা ধাপা হয়ে। কোনোটা তুমি বলছ, কোনোটা আমি ; একে আমি ঠেকাচ্ছি, ওকে তুমি, আমরা জানি কার পালা কোন্‌টা, কার কথায় কোথায় কাজ হবে, আঃ, আজকের অস্তিত্বটাকে টেনে টেনে কোনক্রমে কালকের ঘরে জমা দিতে, এত

যে গ্লানি, কত যে কষ্ট, আর কালকের ঘরে জমা দিয়েই কি নিষ্কৃতি আছে, কালকের পরেও তো আছে পরশু, পরশুর পরে—পৃথিবীর কোথায় যেন আছে ছয় মাস রাত? এই সংসারেও নেমে এসেছিল সেইরকম একটানা এক অমানিশা, অন্ধকার দিয়ে তার শরীর মোড়া, অন্ধকারে তার অপার শরীর গড়া, আমরা তার ভিতর দিয়ে চলছি, মাথা হেঁট, কখনও-বা হামাগুড়ি, তবু শেষ কোথায়, আলার ঝিলিক সীমা-টীমা কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বরং বেঁচে গিয়েছিলেন বাবা, কায়ক্লেশ ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার ক্লেশ থেকে বিধাতা তাঁকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে দিচ্ছিলেন, হয়ত আশা-বাসনা-মোহ এইসব থেকেও মোচন। এই কৃপা সকলে পায় না।

না, তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে খানিকটা ভুল করছি হয়ত, বরং কলমটা একটু কামড়াই, এখানে একটু থামি। শরীর নির্জীব হয়ে আসছিল বাবার, সেটা ঠিক। কিন্তু মন? দু'টি চোখের রহস্যপথ দিয়ে নেমে অন্য মানুষের মনের তলদেশে কতদূর অবধি চলে যাওয়া যেতে পারে? মা, বাবার বোধগুলি তখন কী অবস্থায় ছিল আমি জানি না, সেখানে সতত কী ঘটত, বিস্ফোরণ? অথবা সে কি ছিল প্রশান্তির রাজ্য, তার থই আমি পাব কী-করে। কখনও মনে হত বাবা অনভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি সমেত অস্তিত্বের কোনও নির্লিপ্ত স্তরে পৌঁছে গেছেন, কখনও বা টের পেতাম, ওঁর দেহে যত যন্ত্রণা, মনেও তার চেয়ে কম নয়। সজীব উৎসুক চোখ দু'টি কেবলই চারদিকে ঘুরত, ঘুরে ঘুরে সব দেখত, কিন্তু কী দেখত তারা আমাদের কি দিত বুঝতে?

একুশ

সেই সব দিন। তখন তুমি বুঝতে দিতে আমাকে। আমি তোমাকে বুঝতে দিতাম। পাশাপাশি রাখা হুটি বই; পাতা খোলা, হাওয়ায় হুটোরই পাতা উড়ছে। অথবা হঠাৎ ঝড়ের মুখে যদি পড়ে হুই পথচারী, পরনে যাদের হালকা কাপড়-চোপড়, তারা পরস্পরের কাছে শরীরের কতটুকু সেই দিশাহারা সময়ে রেখে-ঢেকে চলে? কিংবা হু'জন ডুব দিতে নেমেছে একই ঘাটে, তখন নিজেদের কাছে তাদের বাকী থাকে কয় রতি লজ্জা? আর হু'টো বিড়াল যখন চুপে চুপে মুখ ঠেকাতে আসে একই পাতে, উপমার পর উপমা, মা, এর প্রত্যেকটা হাতের তালুতে অঙ্গারের মত পুড়ছে; থাক আর উপমা দেব না।

অমানিশার কথা লিখেছি একটু আগে, শুধু ওইটুকু বলাও কিন্তু আংশিক, কেবল ওই বিবৃতিটুকুতে তখনকার বোধ বিধৃত হয় না। অন্ধকার যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে তো সে শালীন ও পবিত্র। কিন্তু সেই অন্ধকার আকাশেও একটা লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলত। পশুপতি ওই একটুখানি লোভ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে সেই ধ্বক-ধ্বক লুব্ধক। রাত্রে শুকনো রুটি যখন আর রোচে না, কাটতে গিয়ে দাঁতের গোড়া-সুদ্ধ যেন নড়ে যায়, তখন সিদ্ধ সরু চালের সুবাস উঠতে থাকত কোথা থেকে, ছড়িয়ে পড়ত, মৃহু-মিষ্টি কিন্তু মাতানো গন্ধ, কিন্তু সূক্ষ্ম, এত চমৎকার গন্ধ চালগুলো জড়ো করতে থাকে কবে থেকে, কিশোরী-কুমারীর মতো জমিয়ে রাখে বুকের নিভৃতে, অতি পবিত্র, অথচ পরে সেই সুবাসই পাপ-বাসনার আকারে ছড়িয়ে দেয় আমাদের ভিতরে, তার পাশে, ফুলটুল, দূর কোন্ ছার ওইসব ফুল যখন থালের ঝিমঝিমে ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে স্নায়ুপথ ধরে শুধু নাকই তো নয়, সকল ইন্দ্রিয়তে? সেই ঘ্রাণের নাম স্মৃতি, স্বপ্নও তার নাম।

ব্যথিত চোখ তুলে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতাম। কথা নয়। চোখের তারায় একটা সংকেত-বদল হত। কথা নয় একটা আশা ঝলসে যেত, সেই আশার নাম কী? একটা স্বপ্ন ফুটত, সেই স্বপ্নের আকার কী, দু'জনেই—হয়ত দু'জনেই—যা দেখতাম। পশুপতি বা ওই রকম আর কেউ এসেছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন নোট, গোছা-গোছা নোট, সেই নোট ভাসছে, সেই নোট পড়ে থাকছে থাক থাক হয়ে বিছানায়, তারই একটা দুটো হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছি বাজারে, থলে-ভরতি মাছ যার চওড়া-চওড়া চাকতির মতো দেখতে আঁশ, ফিনকি দেওয়া রক্তমাখা কানকো, সেইসব মাছ, আর/অথবা মাংস। কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার, অসম্ভব এক মহোৎসব, আমরা মাংস খাচ্ছি আবার, বাটি ভরপুর, বাটি একটার পর একটা, থরে থরে সাজানো, জলতরঙ্গের বাটি যেন, ছুঁলেই রঙ আর গন্ধের টুংটাং বেজে ওঠে—এইসব স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, তোমার পরনে মড়মড়ে মাড় দেওয়া নতুন শাড়ি, পাড় যার টকটকে, তোমার চোখে আর আতঙ্ক নেই, কপালটুকু তকতকে একটি আঙিনার মতো আয়ত, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, যেন ঘাম নয়, শিশির দিয়ে তৈরী একটা টায়রা, খুন্তি আর চুড়ি নড়ছে, বাজছে, ওঠাপড়ার তালে তালে, সরু মোটা দুই তারে সুর মেলানো এক বাজনা। শুনতাম। অদৃশ্য কোনও মৌচাক ঘিরে মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মতো অস্পষ্ট রান্নার সৌরভ। খেতাম।

মা, এই পর্যন্ত রোমান্টিক, এই পর্যন্ত কাব্য। হোক না রান্না নিয়ে, তবু কাব্য, উপোসীর প্রাণ হু-হু করানো গান। কতদিন ভরপেট খেতে পাইনি বলো তো, স্বপ্ন-দেখা চোখ দিয়ে সে-জন্য না-হয় জল ঝরত, কিন্তু সেই স্বপ্ন লালা হয়ে থালায় ঝরে পড়ত কেন; সেই লালা কালি হয়ে গিয়ে কেন পাতে লিখতে থাকত, অনবরত, দীনহীন একটি আকৃতি, একটি প্রার্থনা: আর কেউ, আবার কেউ আসে না? কোনও অতিথি, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, যারা বর্ষার স্নেহের মতো

কিংবা দেবদূতের মতো সহসা আবির্ভূত, অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে দেন কৃপা আর করুণা ?

বোবা ভাষায় আমাদের মধ্যে এইসব বলাবলি হত।

> (কিন্তু এ কী লিখছি আমি, কাকে লুকোচ্ছি ? সব বলব বলে আজ মুখোমুখি বসেও এ-লজ্জা কাকে, এ লজ্জা কিসের ? ব্যাপারটা আসলে একটা ন্যাংটো হ্যাংলামি, তাই কি তাকে কচি-কচি কলার পাতায় তাকে তুলে সাজিয়ে রাখছি ? গুণ্ডামি ঝেড়ে ফেলে তা-হলে সাফ সাফ বলে ফেলা যাক : নিরুপায় দেউলিয়া দশায় আমরা পশুপতির পুনরাগমনের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিলাম। দু'পয়সা ছড়াতে পারে এমন কাউকে বাড়িতে রাখা যে মোটের উপরে বেশ লাভজনক ব্যবসা, প্রায় একটা কুটীর শিল্পই —সেটা বুঝেছিলাম। বিশেষ কোনও পশুপতি অবশ্য নয়, নির্বিশেষ : কোনও আত্মীয়, কোনও হিতৈষী, কোনও দাতা, কোনও পরিত্রাতা—যে কোনও।)

কিন্তু তারা কেউ এল না। ঈশ্বরের এই এক রহস্য, নির্ধারিত এক বিধান, এক খেলা তিনি দু'বার দেখান না। কেউ আর এল না, বরং গেলাম আমরা, আমাদের যেতে হল। তার আগে তোমার হাত-বাকসের তুলে-রাখা, সিঁদুর-মাখা টাকা—সেই সব ভারী ভারী খাঁটি রূপোর টাকা—সব গেল। শুধু অন্য লোকের হাতে তুলে দেবার আগে সেগুলো ধুয়ে ফেলা হত জলে, সিঁদুরের দাগ মুছে মুছে টাকাগুলোকে বিধবা করে দেওয়া হত।

তুমি সরল, তুমি ভীষণ বোকা, মা, ভাত বেড়ে দেবার সময় অত

ঝুঁকে পড়তে কেন বলো তো, নইলে হয়ত আরও অনেক দিন পরে আমি টের পেতাম যে, তোমার দুটি হাতই খালি।

চাপা গলায় বলে উঠেছিলাম, "মা, তোমার চুড়ি?"

একটি সেকেণ্ড মাত্র সময় নিয়ে বলেছ "খুলে রেখেছি। কী হবে চুড়ি পরে। আমি—আমি তো বুড়ি!" একটু ফ্যাকাসে হেসেছ।

আমি সরল, ভীষণ বোকা আমি, সঙ্গে সঙ্গে ভাত মেখে মেখে গ্রাস মুখে তুলতে শুরু করেছি। কথাটায় কাজ হল দেখে তোমার মুখের ফ্যাকাসে হাসিটায় একটু রঙও ধরল। আমার গালে আলতো একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললে "সব দিকে নজর, দুষ্টু ছেলে। ও-সব চুড়ির প্যাটার্ণ সেকেলে, আজকাল কেউ পরে নাকি। পাশের বাড়ির বউকে দিয়েছি, ও হালফ্যাশানের সব জানে, স্যাকরার সঙ্গেও চেনাশোনা আছে, ভেঙে নতুন করে গড়াব, তৈরী হয়ে এলে তোলা থাকবে। তোর বউ আসবে যখন, টুকটুকে বউ, আমিই পছন্দ করে আনব তো, তখন তাকে পরিয়ে দেব"—যতিচিহ্নগুলো চোখের সামনে লেখা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিলাম।

> ("আমিই পছন্দ করে আনব"—ছেলের বউ তারাই বাছাই করে আনবে, তখন পর্যন্ত মায়েরা এইসব কথা ভাবত।)

মিথ্যে? হোক না। অনেক মিথ্যে, ফুঁ দিয়ে তপ্ত দুধ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো, অনেক মিথ্যে মিষ্টি এবং সত্যের চেয়েও কোন-কোন সময়ে মনে হয়, দরকারী। কিন্তু মিথ্যের মুশকিল, মিইয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ফুরিয়ে যায় অনেক সুন্দর জিনিসের মতো, যথা ফুল রামধনু ইত্যাদি; মিথ্যের আয়ু বেশি না।

বেশি হলে তুমি অসুখে পড়তে কেন, আর পাশের বাড়ির বউটি আমাকে বলবে কেন যে, "তোমার মা চুড়ি ক'গাছি তো ছাড়িয়ে নিল না! যার কাছে বাঁধা রেখেছি, সে কিন্তু তাড়া দিচ্ছে, বলছে বেচে দেবে এর পরে। মাকে বোলো।"

তোমাকে বললাম, তুমি বিবর্ণমুখ, শুনলে। কিছু বললে না।

চুড়িগুলো গেল। এর পরের পালা সেই গিনিটার, যেটা দিয়ে তুমি বলেছিলে, তোমায় কোন্ বড়লোক জ্যাঠশ্বশুর মুখ দেখেছিলেন দাদার—সেই গিনিটাও গেল। গিনিটার ব্যাপারে মধুর কোনও মিথ্যের আড়াল ছিল না। যেহেতু তখনও দুর্বল তুমি, সবে অসুখ থেকে উঠেছ, তাই মুখ তেতো হয়ে আছে, বলেছ "ওই বউটা ঠকাচ্ছে আমাকে—বাঁধা রাখা চুড়ি বেচল অথচ বাড়তি একটা টাকা দিল না। সদরে তো কত দোকান আছে, তুই—তুই নিজে একবার যাবি? যাচাই করে বেচবি। পারবি, পারবি না?"

কী যে বলো, পারব না? তোরঙটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছ, আমাকে সাহস দিচ্ছ, যেন তুমি এক বীর মাতা, সেকালের বীর-মাতারা বুঝি এইভাবেই রণসাজে সাজিয়ে দিত পুত্রকে, আমি তৈরি তোমার পিঠের উপর উপুড় হয়ে গিনিটা কত নীচে পড়ে আছে দেখছি।

তোরঙের তলায় কত কাপড়, পুরনো, ছেঁড়া তবু ভাঁজভাঁজ, কাচানো; রঙফিকে একটা শাল, তার নীচে একটা কোট, ধূসর সেই কোটটা যার পরতে পরতে পোকাদের অস্থি থাকলে এতদিন জীবাশ্মে পরিণত হত; তার নীচে তাড়াতাড়া কাগজ, ভীত, পশ্চাদ্ধাবিত পশুদের যেমন গুহা, প্রত্যাখাত, পৃথিবীর কাছে অপ্রয়োজনীয়, অকারণে-লেখা রাশিরাশি পালারও তেমনই ওই তোরঙটা শেষ আশ্রয়। তারও নীচে একটা কড়ির কৌটোয় রাখা ঝকঝকে একটা গিনি, নিছক জমানো ধাতু পিণ্ড না হলে, এতটুকু প্রাণ থাকলে সেদিন হঠাৎ চোখে আলো লেগে সেটা নিশ্চয়ই চমকে উঠত। এইটে দিয়েই পৌত্রের মুখ দেখেন একজন, সে কতকাল আগে? সে-মানুষ মরে গেছে, যে দিল আর যে পেল দু'জনেই, সে-সময় মরে আছে। সোনা নিজেই মরা, কিংবা একেবারে নির্মম কিনা, তাই ডালা খোলা হতেই ওর নির্লজ্জ উজ্জ্বল আলো উথলে উঠছে।

কাঁপছিলে, যখন চাকতিটা আমার হাতে তুলে দিচ্ছিলে।

লোভীর মতো, বোকার মতো গোল চাকতিটা হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলাম আমি, আমারও চোখ চকচকে। —"কত দাম, কত দাম এর?" জিজ্ঞাসা করলাম, রুদ্ধ, লুব্ধ, উত্তেজিত স্বরে।

"কত দাম?" তোমার মুখ সাদা হয়ে গেছে, তখন কি জানি বিশ্ব-জগতের কূটতম প্রশ্নটি করেছি তোমাকে? তাই তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, এত আস্তে এত ফেঁসে যাওয়া স্বরে বলছ কেন, মা, ও মা, একটু জোরে বলনা, নইলে কী বলছ কিছুই যে কানে আসছে না, তুমি কি মুখ ফিরিয়ে বললে যে "জানি না", কিংবা "আমার কাছে কিচ্ছুর কোন দাম নেই, কিচ্ছু না?" কী মূর্খ আমি, তখনও ওটাকে হাতে ঘোরাচ্ছি, সোনার চাকতির লেখাটা পড়ে বিজ্ঞের মতো বলছি, "সভ্‌রিন লেখা আছে। রাজা-রানীর মুখ আঁকা। এক গিনি—দাম অন্তত টাকা পনেরো-কুড়ি তো হবেই, তাই না?"

"জানি না। কিচ্ছু না—তুই যা।"—ছি, এত জোরে চেঁচিয়ে উঠতে নেই মা, গলার নলী ছিঁড়ে যেতে পারে।

রাজারানীর মুখ? এই ছাখো মা, এতদিন পর কথাটা লিখছি আর বোকা সেই ছেলেটাকে কৃপা করছি। গিনিটাতে কার মুখ আঁকা ছেলেটা জানত না।

আর দাম? সে যে পনেরো কুড়ি টাকা বলেছিল, রতির ওজন ধরে, না বাট্টার হিসাব করে? কয় ফোঁটা রক্তের দাম কত? তার ঠিক উত্তরটি কি কোনও ব্লাড ব্যাংকের বেচাকেনার খাতায় লেখা থাকে!

একটু ছুটি দাও। জিনিসটা তুলে দিতে যার হাত কাঁপছিল, ঘরের দরজা অবধি এসে যে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে ওইখানেই রেখে দিয়ে যে নিল, গিনিটা নিয়ে গলির পর গলি, তারপরে সদর, সদরের পর চৌরাস্তার মোড়, সেখানে গিয়ে যে হাঁপাতে থাকল, তার পিছু

পিছু যাই, তাকে একটু দেখি। দূরে, তার পিছনে পড়ে আছে স্থির একটি পাথর, কঠিন হলে কী হয়, পাথরেরও বড় কষ্ট, এই পাথরের মধ্যেও লুকোনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত—আর ছেলেটার মুঠোর মধ্যে লুকোনো একটা লজ্জা, জমাট জ্বলজ্বলে ধাতু, সাহসই কি কঠিন হয় শুধু!—ভীরুতা, লজ্জা, এইসবও শক্ত বরফের আকার ধারণ করে কঠিন হয়ে যায়।

গ্যাসের আলোর নীচে আর পোস্টটার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তুমি কে? আমি কি তোমাকে চিনি? মুখ একবার তোলো, তোলোই না, আরে, ওই ডোলটা আমার চেনা বৈকি। অন্তত এক সময় প্রত্যেকটা ভাঁজ, প্রত্যেকটা কাটা দাগ, চুলের থাক, চোখের পাতার ওঠাপড়া সমেত আমার কাছে চেনা ছিল। একটা ছিল খানিকটা পারা-চটা পুরনো এক হাত-আয়না—পুরনো কিন্তু তার নজর খুব সেয়ানা—তার মারফত রোজ আলাপ হত, সে তন্ন তন্ন করে চিনিয়ে দিত। ঠোঁট, চিবুক, গলা, তোমার সবই আলাদা আলাদা এবং স্পষ্ট—কী-ব্যাপার বলো তো, যেমন ছিল, মানে তখন যেমন দেখতাম, অবিকল তাই যে আছে। কিন্তু কী জানো, আমার আর তেমন নেই আর, ঘাড়-গরদান, চোয়াল-চিবুক সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাচ্ছে। কী করব, সেই হাত-আয়নাটা খুঁজে পাই না যে আর, অনেক দিন থেকেই পাই না, নতুন যেসব আয়না ফিটফাট, দেওয়ালে দেওয়ালে কিংবা আলমারিতে, ড্রেসিং টেবলে সেট করা, তারা ঝকঝকে খুব, কিন্তু তাদের একটা দোষ, মুখের সব ভাঁজ, পেশী-টেশি মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়, তা-ছাড়া চুল নিয়ে তাদের ইয়ার্কি সবচেয়ে বিশ্রী; যতটা পারে সাফ করে, যেগুলো রাখে তার উপরে রুপালী রঙ দেয়। তুমি কিন্তু তেমনই আছ, কী করে আছ? জানি, জানি, ম্যাজিকটা জানি; কোনও কায়দায় সেই হাত-আয়নাটা নিজের কাছে বুঝি রেখে দিয়েছ তুমি? স্বার্থপর! দাও না, ধার দাও না! না দাও তো অন্তত ওটাকে

মাঝখানে বসিয়ে দাও আমাদের, সেই আগেকার মতো, নইলে আমি যে আর এগোতে পারছি না, তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব কী করে। সঙ্কোচ বুঝি তোমার একার ; আমারও নেই ? প্রথমে, সঙ্কোচ তো অপরিচয়ের। মাঝখানে কতগুলো বছর কেটে গেছে বলো তো, ক—ত ! বলা যায়, যুগ যুগ পার। ইতিমধ্যে কতবার হলদে পাতা নামঞ্জুর করে ডালগুলো অজস্র সবুজে কচি হয়ে কখনও কাঁপল, কখনও পাগল হল, তদানীন্তন বৃক্ষসমুদয়ের বেশির ভাগই সম্ভবত অদ্যাপি বর্তমান, কিন্তু তৎকালীন মনুষ্যেরা সকলে নয়, মানুষদের মুশকিল, তাদের পাতা একবার ঝরে গেল তো গেলই, গেল তা আর গজাল না, এক জীবনে দু'বার নয়, কোনও কোনও গাছ যেমন একবারই মাত্র ফল ধরে, মানুষও কতকটা তেমনই, তার যত পত্রপুষ্প, এক জন্মে শুধু একবারের তরে। উপরন্তু মনুষ্য বৃক্ষের মতো কেন, অশ্বের মতোও দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকতে পারে না।

তাই তো তাড়া দিচ্ছি তোমাকে, সময় ফুরিয়ে আসছে। সময় ফুরিয়ে আসছে আমার, আমার তো বটেই, তোমারও। মাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ ঘরের চৌকাটে, মনে নেই ? ভেবে দ্যাখো, তিনি হয়ত সেখানেই এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। তুমি যাবে, তবে উনুন জ্বলবে। দুপুরে তোমাকে আর বাবাকে খুদেডালে জ্বাল দিয়ে

(খিচুড়ি নয়, জাউ ; "খেয়ে দ্যাখ, জাউ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী")

খাইয়ে তাঁর নিজের একরকম উপোস গেছে, তাই বলছি তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি।

এত বছর পরে তোমাকে দেখছি তো, তাই একটু ঝাপসা ঠেকছে। ওই গ্যাসপোস্‌টটা কোথা থেকে এল, ওটা আজকাল নেই তো। আজকাল, জ্বলুক চাই নাই জ্বলুক, সব ইলেকট্রিক আলো।

এত বছর পরে তোমাকে দেখছি তো, তাই দেখামাত্র ভিতরটা কেমন টনটন করে উঠল, হঠাৎ বুকের শিরে টান পড়লে যেমন লাগে।

একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল সব, হঠাৎ আঁধি উঠলে যা হয়, অথবা চোখে কাঁকর-টাকর পড়লে যেমন জ্বালা করে। কুয়াসা? না। কান্নাও না। তবু। তবু কী? ওই যা বলেছি—একটু টনটন। তাই তো সামলে নিতে একটু সময় নিলাম, ইনিয়ে বিনিয়ে অবান্তর বকে, আসলে তৈরী হলাম। চশমার কাচ মুছে নিয়েছি, এবার আমি ঠিক ঠিক দেখতে পাব। কলমটা আবার ধরেছি শক্ত করে, এবার আমি লিখতে পারব।

গ্যাসের আলোটার নীচেই ছায়া, সেই ছায়ায় রক্ষিত হয়ে আছ এখন, অথবা তারই অংশ হয়ে। ছায়ার ভাগ হয়ে যাবার ওই একটা সুবিধে, পুকুরের জলে ডুব দিয়ে থাকার মতন, কেউ দেখতে পায় না।

আমি কিন্তু পাচ্ছি। তুমি কাঁপছ—কাঁপছ কেন? এটা তো চৈত্র তবু তোমার গায়ে চাদর জড়ানো কেন? হাতের মুঠোয় গিনিটা লুকোনো, সেই হাত আবার পকেটের মধ্যে পোরা, তবু কি স্বস্তি নেই, তবু কি আরও লুকোতে চাইছ? তাই এই চৈত্রেও চাদর জড়িয়েছ গায়ে—লোকে হাসবে না? এইবার বেরিয়ে এসো ছায়া থেকে, মুখ থেকে লাজুক, ভীতু চোর-চোর ভাবটা মুছে ফেল। অনভিজ্ঞ করুণ চোখে তাকাচ্ছ কেন, কী বলছ, মোছা যায় না? এ-তো ঘাম নয় যে রুমাল বোলালেই মুছে যাবে? জানি, জানি, চোর-চোর ভাব-টাবের ওই মুশকিল, যতই ঘষো না কেন, চামড়া কেটে রক্ত দেখা দেবে তবু মুছে-ফেলা ভাবটা ফের ফুটে উঠবে। জানি, জামা-কাপড়ের পরতে পরতে জড়িয়ে নিজেদের আমরা যতটা পারি ঢেকে-ঢুকে রাখি, কিন্তু মাঝে মাঝে সারা দুনিয়ার চোখ রঞ্জনরশ্মি হয়ে যায় যে; বাহিরটাকে ভেদ করে ভিতরটাকে বাহির করে আনে।

তবু সাবধান। ওই যে সাইনবোর্ডটার উপরে ফণা ধরে, তিন-তিনটে আলো ফোঁস-ফোঁস করছে, তাতে বাহারের হরফে লেখা আছে—পড়তে পারছ কি?—আর্ট জুয়েলার্স। পিছনে একটা কোটর, সেখানে সুতো-বাঁধা চশমা এঁটে যে বসে আছে, তারও চোখ দুটো

নজর করে ছাখো, সাপের মতোই ক্রুর এবং শীতল। তুমি সটান এগিয়ে যাও, কেঁপো না কিন্তু, কেঁপো না। তা-হলেই পেয়ে বসবে ও, ওই ধূর্ত লোকটা, যার কুতকুতে চোখ।

"কী কেনা হবে?" চশমা খুলে তোমাকে খুঁটিয়ে দেখে কী বলবে, তুমি না আপনি ঠিক করতে না পেরে সে ভাববাচ্যে সম্বোধন করল, "কী কেনা হবে?" তার স্থির চোখ তোমাকে দেখছিল।

দেখুক, চাদরে ঢাকা, তাই কনুইয়ের কাঁপুনি ও টের পাবে না, কথা বলতে গিয়ে স্বরনালীটা থরথর করে উঠেছে, এই যা!—"কিনব না, বেচব", এ অন্য কারও গলা, অন্য কেউ বলল, অন্য কোনও মানুষ চাদরের তলা থেকে হাত বের করে মুঠোটা মেলে ধরল, গিনিটা ভিজে, লজ্জায় চাপে এতক্ষণে গলে যে যায়নি, এই রক্ষে— ভীষণভাবে স্নায়ু-কবলিত সেই মানুষটি কোনও রকমে বলে ফেলল, "এইটে।"

"দেখি", লোকটা বলল সম্মোহক স্বরে। চৈত্র-সন্ধ্যা, রাস্তার বিস্তর ধুলো ঢুকে পড়ছিল বলে লোকটা কাশছিলও। কাশি নয়, পরে বুঝেছিলে, ওটা ছুতো, পরের কথাটা মনে মনে তৈরী করা। জিনিসটা হাতে নিয়েছে লোকটা, একবার ধরছে চিৎ করে, একবার ঘষছে, মাথা কাটা যাচ্ছে তোমার, কান ঝাঁঝাঁ, গিনিটা তো নয়, তুমিই চিৎ হচ্ছ, উপুড় হচ্ছ, কাৎ হচ্ছ এক-এক বার, যেন কুস্তিতে, কোনও পালোয়ান তোমাকে, তোমার সম্মানকে, মাটিতে ফেলে চাপড়া চাপড়া ধুলোবালি বুকে-পিঠে-মুখে মাখাচ্ছে, আঃ! রাস্তার ধুলোয় তোমারও দাঁত কিচকিচ, জিভ-ঠোঁট ভরে গেল।

"চোরাই মাল?" হিলহিলে সাপটা হাসল, সাপও হাসতে জানে, চাইল টেরচা চোখে।

সাবধান, অপমানে তোমার হাতের মুঠো পাকিয়ে উঠছে উঠুক, কিন্তু ওই পর্যন্ত। হাত তুলতে যেও না। রোগা হলে কী হয়, এই সাপেরা বড় সাংঘাতিক, দরকার হলে ধারালো কিছু বের করে তোমাকে

একেবারে জব্দ করতে জানে। অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ তুমি বাড়াবাড়ি করতে যেও না।

"চোরাই কেন হবে। আমার, আমাদের।" তোতলা গলার উত্তর? হোক, সে-ই ভালো।

"মার বাক্স ভাঙা হয়েছে?" সাহস চরমে উঠেছে লোকটার, তবু সামলে থাকো। কান একটু লাল হয়ে যাচ্ছে, তাতে দোষ নেই, চোখ দুটিকে নিষ্প্রভ, শান্ত রাখো। শুধু বলো, "না।"

এর চেয়ে বেশি বলতে যাওয়া সমীচীন হবে না। বাক্স ভেঙেছ বললে কসুর কবুল করা হবে, আবার ভাঙোনি যে, সেটাও বিস্তারিত বলতে গেলে তো শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াবে যে, মা-ই দিয়েছে? মা গিনি বেচতে পাঠায় কেন? পেটের দায়ে, খিদের জ্বালায়? বলার পর—বলার পরও কি মাথাটা সোজা আর উঁচু করে ধরে রাখা যাবে? তোমরা যে মধ্যবিত্ত, তোমরা যে যাকে বলে ভদ্র, সেই অভিমানটাকে একেবারে শুকনো নারকেলের মালা করে দেবে?

কান ঝাঁঝাঁ তবু শুনতে পাচ্ছি, সে বলছে, "গিনি দিয়ে তো লোকে মুখ দ্যাখে। এটা দিয়ে মুখ দেখা হয়েছিল কার—তোমার?"

গলানো সীসে কানে ঢুকছে। আর ওই গিনিটা, সোনা হলেও ধাতু তো! জেল্লা দিতে পারে শুধু, ধাতু কি না, তাই স্নায়ু নেই, সাড় নেই, সাড়া দিতেও পারে না।

কার মুখ দেখা হয়েছিল, কার, কার, সেই মুখ কি আঁকা আছে ওখানে, লোকটা কি অন্তর্যামী, অথবা ওর সব সব-জানা চেনা আছে, ও কি সেই-মুখটা দেখতে দেখতে পাবে, দেখে ফেলেছে এরই মধ্যে?

একী, ঘামছ কেন তুমি। মুখ মুছে ফ্যালো। সাহসে তাকাও। নইলে ক্রমশ ওর বশে চলে যাবে, ওই সেয়ানা স্যাকরাটার। ও যদি, বলা তো যায় না, গিনিটা পকেটে পুরে ফ্যালে, যদি, বলা তো যায় না, যদি, হাসতে হাসতে টুপ করে মুখে ফেলে বলে, "গিলে ফেলেছি, এই দ্যাখো, কই, আর নেই তো!" ম্যাজিকওয়ালাদের মতো বলে,

এই বোকা, রোগা-পটকা এই ছেলেটা! কী করবে তখন তুমি, ভ্যাঁ করে কাঁদবে, না চেঁচিয়ে উঠবে? কে বিশ্বাস করবে তোমাকে। গিনিটা যে ছিল, তোমার ছিল, তার প্রমাণ কী। যারা ছুটে আসবে, যদি আসেও, ধরাই যাক আসবে, তবু তারা যদি হেসে ওঠে তোমার চোখে চোখ রেখে, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে থাকে, প্রমাণ কী, প্রমাণ কী, তুমি কী বলবে তখন, হাঁপাতে হাঁপাতে বড় জোর এই কথাটি—"ছিল।"

ছিল? হাঃ হাঃ, খুব হাসির ওই কথাটা: "ছিল"। যতক্ষণ "আছে" ততক্ষণই খাঁটি, সত্যি সত্যিই থাকে। কিন্তু যেই "ছিল" হয়ে গেল, অমনই কোথায় আর কী, সব মায়া, সব মুছে-যাওয়া মিছে। এই পৃথিবীতে কত কী-ই তো ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, কবে কার হয়ে, কার কাছে, তার কতটুকু চিহ্ন-ছাপ-স্মৃতি-রেখা-রেণু, এইসব পড়ে থাকে? তুমি ঘামছ। মুছে ফ্যালো। আর কেউ নেই, শুধু, তুমি আর ওই দোকানী, তাই ভয়?

লোকটি অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছিল। একটু আগে যাচাই করেছে গিনিটা যেভাবে, সেই ভাবেই এখন যাচাই করছে তোমাকে। কিংবা চাউনিটা ওর বঁড়শি, তোমাকে বিঁধে রেখেছে, ছটফট করছ তুমি মাছের মতো, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে চলে আসতে পারছ না, তা-ছাড়া গিনিটা যখন্ ওর হাতে, তুমি আসবেই বা কী করে। যারা মাছ ধরে তারা বুঝি এইভাবেই টোপগাঁথা মাছকে খেলায়, সুতো টানে, সুতো ছাড়ে?

"কুড়ি টাকা দিতে পারি।" লোকটা বলল অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে পরখ করার পরে।

"কুড়ি—মোটে কুড়ি? তবে আমি যে শুনেছিলাম তিরিশ, মা বলেছিল···"

"খবরের কাগজ পড়ো, খবরের কাগজ? আজকের সোনার বাজারের দর কী লিখেছে জানো? এই ছ্যাখো।" লোকটা মস্ত বড়

একটা পাতা মেলে ধরল। অনেকগুলো অক্ষর, অনেকগুলো সংখ্যা শুধু, তার কিছুমাত্র অর্থ তোমার কাছে স্পষ্ট হল না। মূক-বধির ভিক্ষুকেরা যেভাবে হাত পাতে, তুমি সেইভাবে হাত বাড়িয়ে ধরলে।

দশ টাকার নোট একটা, তারপর ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হচ্ছিল, কারণ লোকটা গুনে গুনে টাকা দিল আরও দশটা, তখন রূপোর টাকাও বেশ চলত।

"দেখে নাও, অচল দিয়েছি কিনা। ফিরে এলে কিন্তু ফেরত হবে না", তুমি নেমে আসছ, লোকটা পিছন থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে মারছে তোমাকে। তুমিও বুক পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে করে ছুঁড়ে মারবে নাকি ওর মুখে? পারলে না।

> (সারা জীবনে যে কতবার ওই না-পারাটা কতভাবে ফিরে এসেছে! পারার ইচ্ছেটা কচ্ছপের মতো চিৎ হয়ে বোবা চীৎকার করেছে শুধু। কত চড় কতজনকে মারা হল না, কত থুথু ছিটোতে গিয়ে কেবল গিলতেই হল, আপসটাকে গাধার টুপি পরিয়েছ আর নিজেকে ঠকাতে সেই টুপিটার গায়ে বড় বড় হরফে লিখে রেখেছ "মহত্ত্ব" শব্দটা।)

এই তো বাইরে নেমে এসেছ তুমি, এখানে খোলা হাওয়া, তবু শ্বাস নিতে কেন কষ্ট, আমি জানি কষ্ট কেন, তোমার তখনকার সব কথা আমার খাতায় টোকা আছে, পার্কের ভিতরে গিয়ে দম নিচ্ছ, দম তো নয়, নিজের সঙ্গে নখে নখে আঁচড়ে একটা লড়াই চলছে, আমি জানি। তোমার লজ্জা এখন লোপ পেয়ে সবটাই লোভ হয়ে যাচ্ছে। উপরের দিকে শুকনো মুখে চাইছ তুমি, অনেক তারা, কলকাতায় কেবল এইসব পার্কের আকাশেই তারা থাকে, জলজ্যান্ত চোখে চেয়ে তারা ভিতরটাকে দেখতে চায়, হয়ত দ্যাখেও। চোর! চোর! ওকী করছ তুমি, একটা রূপোর টাকা কেন তুলে নিচ্ছ, কী করবে ওটাকে,

রাখবে কোথায়, আলাদা করে প্যান্টটার বেল্‌ট পরানোর ফোকরটার ফাঁকে ?

মা, এই গ্যাখো মা, আমি ফিরে এসেছি। মা, আমার পকেটে টাকা বাজছে, অনেকগুলো টাকা, কিন্তু ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন তুমি, তোমার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তুমি কি ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলবে "দে, দে, দে"—বলে কেড়ে নেবে ?

তার দরকার কী, আমি তো টাকাগুলো দেব বলে বের করেছি। রূপোর টাকা, এক মুঠো।

"কত ?"

"উনিশ।"

> (উনিশ, আমি কি বললাম উনিশ ? কিন্তু আমি যে বলতে চেয়েছিলাম কুড়ি ? বিশ্বাস করো, মা, বিশ্বাস করো, কুড়িই চেয়েছিলাম বলতে, আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে উনিশ।)

"উনিশ ?"

> (মা, ওভাবে চেয়ে আছ কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, উনিশ হবে না কেন, হতেই পারে, নিশ্চয় পারে, উনিশ আর কুড়ি তো একই, লোকে কথাতেও তো বলে উনিশ-বিশ।)

"জিজ্ঞেস করছ কেন ?" আমার গলা কাঁপছে।

"উনিশ, মানে ভাজা হিসেব কিনা, তাই। কুড়ি নয়, পঁচিশ নয়, উনিশ ?"

"তুমি আজকের কাগজ গ্যাখোনি, সোনার বাজার দর পড়োনি, পড়লে—" গলা আরও কাঁপছে, আমার তোতলামি বাড়ছে, ভয় পেয়ে টাকাগুলো তোমার হাতে গুঁজে দিতে চাইছি আমি—"এই নাও, রাখো।"

নিতে গিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিয়েছ তুমি, তোমারও চোখে ভয়, তোমারও কণ্ঠ আর্ত। "থাক, তোর কাছেই রাখ।"

ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছি তোমার দিকে। তাকাতে পারছি। কই, অবিশ্বাসের ছোপ তোমার মুখে লেগে নেই তো। আমি—আমি এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছি।

"থাক। তোর কাছেই রাখ। ওর জিনিস···ভাঙিয়ে এনেছিস ···দরকার মত চেয়ে নেব, তুই-ই খরচ করিস।" আমার কানে এখনও বাজছে।

কিন্তু মা, সেদিন আমার কান সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝাঁ করেছে, আমি মাটিতে মিশে যাচ্ছি। ও-টাকা ছুঁতে পারবে না তুমি, তোমার হাত জ্বলবে, বুঝেছি। অথচ আমি এখন কী করি। সব টাকাটা আমার কাছে থাকবে, আগে যদি জানতাম, আলাদা করে সরানো একটা টাকা, সেই টাকাটা, সেই একটা টাকাই কী-এক আশ্চর্য অদ্ভুত উপায়ে বেজে উঠছে। তোমার হাতের পাতা বাঁচলো, আমার কোমরের কাছটা ছ্যাকা লেগে পুড়ছে। আমাকে একী শাস্তি দিলে তুমি। মৃতের প্রতি মমতা, বেশ তো, যত খুশি তাকে মনে রাখো, তাই বলে এত নিষ্ঠুর হবে যে জীবিত তার প্রতি? এত পক্ষপাতী তুমি!

বেশ, শোধ নিতে জানি, আমিও জানি।

এই হ্যাখো না, ছুটছি। এখন ছুটছি আমি, দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মনিহারী দোকানটার সামনে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলছি, "তরল আলতা এক শিশি।" শিশিটা পেয়ে দাঁড়াইনি একটুও, এক লহমাও না, একটা টাকা দিয়েছি ফেলে, সেটা সত্যিই তখন বেজে উঠেছে, আমি ততক্ষণ পিছন ফিরে ফের বাড়ির দিকে, অবাক দোকানী বলছে "আরে, আরে, দাঁড়ান, এর দাম তো ছ'আনা মোটে", কিন্তু শোনে কে। রেজগি? ও ভেবেছে কি? কোনও জের রাখব বুঝি আমি!

বাড়ি ফিরে, "মা, তোমার পা দুটি দেখি।"

"পা? এখন? কেন রে?"

"দেখিই না। একটিবার। শুধু পাতা দুটি।" বলতে বলতে শিশিটা তোমার পায়ের কাছে রেখেছি।

"কোথায় পেলি?"

"কিনে এনেছি।"

"কী দিয়ে, কেন, এই রাত্তিরে?"

"তুমি পরবে বলে। পরো না মা, এক্ষুনি।"

যথেষ্ট অবাক হওয়ার সুযোগও পাওনি।—"এখন, এখানে, এই রান্নাঘরে? পাগল ছেলে", হাত বাড়িয়ে আমার চিবুক ছুঁয়ে বলেছ, "পাগল ছেলে! দেখছিস না, এখন রাঁধছি? তা ছাড়া—তা ছাড়া ওসব পরা আমি তো আজকাল ছেড়েও দিয়েছি।"

"পরতেই হবে।"

আমার অবুঝ চোখের দিকে চেয়ে কী যেন পড়ে নিলে। তুলে নিলে শিশিটা। যেন বর দিচ্ছ এমনই গলায় বললে, "ঠিক আছে, পরব—কাল সকালে।"

সেদিন রাত্রের স্বপ্ন, আঃ, সেই স্বপ্নটা! একটা রূপোর টাকা লুকিয়ে গলছে, গলানো রূপোর রঙ কখনও লাল হতে পারে? অথচ হচ্ছিল, একেবারে গলগল, তরল, টক্‌টকে আলতার মতো। পাতা দুটি পেতে রেখেছ তুমি, শাড়ির কোণ একটু সরিয়ে, আমি উপুড় করে আলতা ঢালছি তোমার পায়ে, আলতাই তো! নাকি রক্ত, আমার অপরাধের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে উঠে-আসা রক্ত, দুটি পা ধুইয়ে দিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইছে? উনিশ আর বিশ সত্যিই আলাদা থাকল না তো, এক হয়ে, ওই দ্যাখো, এক রঙে মিশে যাচ্ছে।

আবার তুমি আমার। এ এক দারুণ মজা তো, নয় মা? একজন চলে গেছে, কিন্তু ফিরে আসছে মাঝে মাঝে; আর রয়ে গেল যে, সে-

ও চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে তবু ফিরে আসছে। আসতেই হচ্ছে তাকে। পাপ ধুয়ে ফেলছে অনুতাপে, তার সমর্পণ শেষ প্রণামে।

যাওয়া-আসায় অতএব কোনও বিরোধ দেখছি না, যে গেছে আর যে আছে তাদের মধ্যে কোনও হিংসা নেই।

বাইশ

মা, আমি চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে আসতে চাইছি। মন্ত্রপাঠ ছাড়া মুক্তি নেই, স্থির জেনেছি, কিন্তু পাঠের আগে হাত ধুয়ে বসতে হবে তো! তাই ধুচ্ছি।

এই অনর্গল লেখাটা সেই প্রক্ষালন, সেই শুদ্ধি, এ-কথা বুঝি, আগেও একবার বলেছি। ধোওয়ার পালা এখনও শেষ হল না। কবে শুরু করেছিলাম, সেই শীতে, তখন নিজেকেই যারা প্রতি বছর এই সময় নিমন্ত্রণ করে আনে, গাছে গাছে ম্রিয়মাণ পাতাগুলি কাঁপছিল সেই সব বিদেশী পাখির সুরে, অথচ তাদের দেখা যাচ্ছিল না, কেন না কুয়াশা একটা টানটান পরদা টাঙিয়ে দিয়েছিল দূরের সব-কিছুকে অগোচর করে দিয়ে। দূরকে যখন দেখা যায় না, তখনই সে সবচেয়ে কাছে আসে। যে-পাখিকে চোখে দেখতে পাই না, তার সুরই মনে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটে।

সেই শীতে। তখন সকাল-সন্ধ্যায় আমি বিছানায় পড়ে অস্থিরের মতো আকাশ দেখতে চাইছি বারে বারে—সবে অসুখ থেকে উঠেছি কিনা, তাই সব কিছু লাগছে নিষ্প্রভ, নিষ্পত্র, রিক্ত। যখন টের পেলাম আর কোথাও কিছু নেই, আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই, তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি অপেক্ষা করছি কিসের, কার জন্যে। উপরের আকাশটা যেহেতু ঝাপসা, তাই তো তাকালাম ভিতর দিকে, কী আশ্চর্য, সেখানেও একটা আস্ত আকাশ যে! এতদিন দেখিনি? সেই আকাশে মস্ত করে আঁকা তুমি।

উঠে বসতে চাইলাম, অসুখটাকে অস্বীকার করে। অসুখ তো নয়, নোটিশ, মৃত্যুর নোটিশ, সেই শমনটা ফিরিয়ে দিয়ে বলছি "যাব না, এখন যাব না আমি, আর কিছুদিন পরে। আর একটু সময় দাও, একটি গণ্ডূষ জল। সময় হল সেই এক গণ্ডূষ জল।"

"যদিও", চোখ বুজে আমি মৃত্যুকে বলেছি "আর অধিক আয়ুতে অধিকার নেই আমার।' কারণ, আমার এখনকার বাঁচা শুধু দিনের বেলায় একটি সাদা চাদর পাতা আর প্রতি রাত্রে তাকে কালো কম্বলে ঢেকে দেওয়া, ফের তুলে ফেলা সকালে, রাত্রে আবার ঢাকা—এই মতো, ক্রমাগত, পৌনঃপুনিকতায় জর্জরিত। আমি জানি। সুতরাং শান্ত মনে নতুন দিগন্তের দিনে বেরিয়ে পড়তে আপত্তি ছিল না, বিশেষ করে কাজ-অকাজ সবই যখন সারা, কিন্তু একটুখানি কাজ বাকী আছে যে। উৎসর্গপত্র লিখতে হবে, একটি বা কয়েকটি; ইহকালে কার-কার ছিলাম, পেয়েছিলাম কাকে, কাকে এবং কী। এই সবই। মৃত্যু দণ্ডিত ব্যক্তির শেষ বাসনা।

একটু সময় চেয়ে নিয়েছিলাম সেই শীতে, তারপর অনর্গল লেখায় কত পাতার পর পাতা ভরে গেল। এখনও কিনারার কাছাকাছিও যেতে পারছি না। শীতে হিম পড়ছিল, গোড়ার দিকের পাতাগুলো তাই ভিজেভিজে হয়ে যেত। তার পর চৈত্র এল, রুক্ষ রঙ, শুকনো ধুলো, লেখাটাকে নিষ্ঠুর করে দিচ্ছিল। কিন্তু মা, আবার আষাঢ় এসেছে, থেকে থেকে বৃষ্টি, টপ্ টপ্ কান্নার মতো ঝরছে, জানি না সেই জলে অক্ষরগুলো ধুয়ে যাবে কি না।

তবু লিখে যাব, লিখতেই হবে। এখনও যে বাকী আশ্বিন, আমার সোনায়-সবুজে সহাস, শিউলি-উতলা আশ্বিন, সে এসে এই লেখাকে নীল নরম আকাশের রঙে চুবিয়ে দেবে। এক-এক ঋতুতে এক-একটা রঙ নেবে এই উন্মোচন, এই কাল-পরিক্রমা, এই উৎসর্গ। কখনও মধুর, কখনও তিক্ত, কখনও সিক্ত, কখনও বিরস হবে—ঋতুর ছাপ আমরা বদলাতে পারি না, ওরাই আধার হয়ে আমাদের ধরে, লেখার জাত-ধাত সব কিছুকে আকার দেয়, প্রকারও বদলে দেয়।

দিক। তবু ব্যক্ত হয়ে যাক। হয়ে যাক, হতে থাক। আমার দায় লিখে যাওয়া খালি। এই তো ছাখো না, মাঝে মাঝে ক্লান্ত কলম তুলে নিই, কোথায় থামব, টেনে দেব শেষ দাঁড়ি ? ভাবি। অবশেষে

টের পাই থামা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে মনের তলায় কোথায় গুটি বাঁধছে স্নায়বিক ভয়, অযৌক্তিক ভৌতিক একটা ধারণা : যেদিনই থামব সেদিনই আমার মৃত্যু অবধারিত। শেষ হিম ঋতুটি আমাকে গ্রাস করে নেবে।

এখনও সে আছে, টের পাই, ওঁৎ পেতে আছে, কখনও কবাটের বাইরে, অন্ধকার বারান্দায়, কখনও বা টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, ঘন পাতার মগডালে বৃদ্ধ রাতে পেঁচা যেমন গভীর করে শ্বাস নেয়। টের পাই। একটু লিখি, আড়চোখে চাই, ঢক্‌ঢক্ জল খেয়ে তাকে বলি, "একটু দাঁড়াও, আর-একটু। ফুঁসতে ফুঁসতে আততায়ী ছায়াটা সরে যায়, ঘাড় ফিরিয়ে ঘর্মাক্ত আমি ফের কলম ঠেলতে থাকি। ঠেলতে আমাকে হবেই, কারণ যতদিন ঠেলছি ততদিন কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না।

হারানো সুতোটা কোথায় ধরব? স্বপ্ন যখন রক্তে-আলতায় মাখামাখি হয়ে গেল, ফিরে যাব সেইদিনে? স্বপ্ন সেই একটাই তো নয়, আরও অনেক দুর্বোধ্য দৃশ্যে আমার তখনকার ঘুমের আকাশ ভরে উঠছিল।

কলকাতা কিছু দেবে না, এখনো কোনমতে পা যদিও-বা রাখা যায়, এই শহরটা আমাদের মাথা তুলতে দেবে না, ক্রমশ তার আকার ছোট হয়ে আসছে, তার গলি চিমটে হয়ে টিপে ধরছে, আর তার কল্‌জেকে কালি করে দেওয়া কয়লার ধোঁয়া ক্রমশ যত দম বন্ধ করে ফেলছিল, ততই আমি অভ্যাস করে নিচ্ছিলাম অন্য কোথাও চলে যাওয়া, নিজেরই তৈরী বিকল্প এক জগতে।

অথবা সে-জগৎ তৈরীই ছিল, যেমন ছাদ। ঘরে খুব গরম লাগল তো সেখানে চলে গেলাম, নইলে না। কিংবা পার্ক। বাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম তো ছুটে গেলাম ফুর-ফুরে হাওয়ায়, ঘাসে শুয়ে পড়লাম। নইলে না।

আজব দেশে একা অমলাই যায়নি। যায় সবাই। শুধু একজনের কথা লেখা আছে। একজনের কথাই সকলের কথা, একটি ছোট্ট কৌটোর মধ্যেই মাতানো যত আতরের ঘ্রাণ। যখন তখন বেরিয়ে পড়ার নেশা তখন থেকেই আমাকে পেয়ে বসে নাকি, দূরে কোথায় দূরে দূরে ঘুরে বেড়ানোর এই পিপাসা? হাঁটতাম, তখন খালি হাঁটতাম আমি, গলির পর গলি, নোনা-ধরা ইঁটে শহরটার সাবেকী শরীর কোন্ শতকের গন্ধ মেখে রেখেছে, তাকে পেতে পেতে চৌরাস্তায়, যেখানে চলে ছত্রাকার মৌচাকের গুঞ্জন, মোটরের পোড়া তেলে বুঁদ হয়ে, বুক ভরে নিয়ে, ফের চলতাম—ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ডক, যেখানে জাহাজের জঙ্গল। তাদের ভেঁপুতে, তাদের মাস্তুলে আকাশ আর সাগরের নিশানা, কোন্ দিকে সাগর, কোন্ দিকটা দক্ষিণ সেটা বলে দিতে হেলেপড়া সূর্য আছে, আমি যাব। কিংবা এক-এক দিন রেল লাইন ধরে ধরে ইস্টিশনের আওতা ছাড়িয়ে পুল, কালভার্ট, ধোবার মাঠ, যেতে থাকতাম।

এই সব পাগলামি। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া যেত না তো, ফিরে আসতেই হত, সেই একই রাস্তা ধরে, বড় জোর একটু অন্য পথ ঘুরে, তবু শেষ পর্যন্ত সেই কবাট, সেই চৌকাট। চষে চষে চরে বেড়িয়ে এই শহরটাই শুধু তার সমুদয় অলিগলি সমেত তন্নতন্ন চেনা হয়ে গেল। কোথাও যাওয়া যায় না, আমি তখনও বুঝিনি তো। তখনও যে শুধু সামনের সমতলের দিকে চেয়ে দিশা খুঁজেছি, উপরের দিকে তেমন করে তাকাতে শিখিনি।

> (তাঁকে খুঁজতে হবে আকাশের দিকে আশা করে—
> একি শুধু সংস্কার? শুধু আকাশে কেন, তিনি
> মাটিতেও কি থাকতে পারেন না। পারেন, নিশ্চয়,
> হয়ত আছেনও। কিন্তু আকাশের যে ব্যাপ্তি, মাটি
> তা পাবে কোথায়। উপরের দিকে চাইলে দৃষ্টি নীলে-
> নীলে, কালো-কালোয়, অথবা শুভ্রতার অসীমায়

হারিয়ে যায়, সেই অবলুপ্তি মাটিতে কোথায়? নীচের দিকে তাকালে নজর তো খানিক পরেই থেমে যায়। বিরাট-স্বরাট, প্রচণ্ড-প্রকাণ্ড কোনও মহিমা নিঃসীম থেকে নেমে এসে একই সঙ্গে অনুভব আর কল্পনাকে যত কম্পিত করতে পারে মাটি তা পারে না। স্বভাবতই মনে হয় সে-কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠা আকাশেই।)

মা, বিকল্প জগতের কথা বলতে বলতে এই দ্যাখো, কোথায় এসে ঠেকেছি।

বিকল্প, মানে কল্পনা। মানে তৈরী করা, এই তো? তখন আমি তৈরী করতাম কী?

বলছি। ধরো, একটা সাঁকো। কোনও ঘাটে এসে যেন দেখলাম, খালটার গায়ে জোয়ারের টস্‌টসে জ্বর। চোখ বুজলাম, চট্ করে তৈরী করে ফেললাম একটা সাঁকো, তারপর আমি পার হয়ে যাচ্ছি। কোথায়? জানি না।

আর কী? ধরো, একটা বাড়ি। রূপকথায় যেমন লেখে তেমন নয় অবশ্য, মানে মেহগিনি, হাতির দাঁত, সোনার খাট-টাট অত সব কিছু নয়, তা-হলে তো বাস করতে, পাশ ফিরতে, শুতে পারব না আমি, মখমলে, পঙ্খের কাজকরা দেওয়ালে অস্বস্তি হবে, সাদা পাথরের মেঝেতে পা পিছলে যাবে, কিন্তু অন্য এক বাড়ি। ছোট্ট একটু লন চাই আমার, নরম ঘাস, বেলফুলের চারার সুবাস, চড়া নয়, মৃদু। আর যারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, এমন কোনও তরুণ তরুর সারি, যাদের পাতা ফিকে ঝিক্‌ঝিকে সবুজ এইসব তরু। তাদের ডালপালা বেশি আবোল-তাবোল বকবে না, তারা শুধু ছিমছাম সটান ছায়া ফেলবে, অবক্র কয়েকটি রেখা, তাদের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে সেই ছায়ায়

আমি জুড়োব, পাখিরা খুঁটে খুঁটে মুখে কী তুলে ফিরছে, পিঁপড়ে চলেছে সার দিয়ে, মগ্ন আলস্যে দেখব—-এই সব আল্পনা।

বিকল্প জগৎ আরও একটা তৈরী হচ্ছিল—আমার লেখা। তখন কবিতা লেখাই ছিল শুধু, তা যদি কবিতা হয়, মানে কেবল কথার পর কথা গাঁথা, লাইনের পর লাইন মেলানো। সে-ও তৈরী করা। কারণ, উদ্দিষ্ট কেউ ছিল না তো, না ঈশ্বর, না তখনও কোনও ঈশ্বরী, তবে কাকে নিয়ে লিখতাম, কী নিয়ে? তার সবটা হয়ত-বা বানানো না। ওই যে ছটফট, ওই যে চৈত্রের বাতাস চোখেমুখে লাগলেই বুকের ভিতর হঠাৎ একটা কষ্ট, কোনও ফুলের, বাসী কি তাজা যাই হোক না, গন্ধ নাকে লাগল তো কেমন একটা যন্ত্রণা অনেক—অনেক রাত পর্যন্ত একটা শূন্যতার বোধকে বুকে জড়িয়ে এ-পাশ ও-পাশ করা, এর কোনোটাই তো আমার বানানো না, তবু ওরা আসছিল, সেই শূন্যতাই ছন্দ-মিলের শরীর পেয়ে পূর্ণ হয়ে উঠছিল। তাকে নিয়েই বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলতাম আর আঁকতাম ছোট ছোট ছবি—কার?

মনে পড়ছে, একদিন লিখছি, চমকে এক সময়ে মুখ ফিরিয়েছি। লাজুক-লাজুক তোমার মুখে ধরা পড়ে-যাওয়া ভাব।—"দেখছিলাম কী লিখছিস। এসেছিলাম তো পা টিপে টিপে, চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। কী করে টের পেলি আমি এসেছি?"

তুমি ফিরে যাচ্ছিলে, আমি টানলাম আঁচল ধরে।—"টের পেলাম কী করে?" ফশ্ করে বললাম, "মা, তোমার নিশ্বাস থেকে, গন্ধ থেকে।"

আজ লিখতে বাধা নেই, সেদিন ঠিক কথা বলিনি। কেউ এসেছে টের পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই, পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কল্পনা করেছিলাম সে অন্য কেউ, যাকে কখনও দেখিনি অথচ নিরন্তর ভাবি, খুব কমনীয়, খুব লোভনীয় কোনও আকৃতি, কিন্তু দৃষ্ট নয়, দৃষ্ট নয় বলেই সে আমার অদৃষ্টের মতো, চমৎকার একটি মুখের ডৌল, কিবা তার গ্রীবা আর আয়ত নয়নের ভঙ্গি, তাকে আমি গদ্গদ ভাবাবেগে কত কথা বলি, তার গান শুনি।

কল্পনা। তারই আবির্ভাব ঘটেছে ভেবেছিলাম। তাকিয়ে দেখি, তুমি। হতাশই হলাম। তোমাকে বলিনি।

হতাশা ঢাকতেই তোমার আঁচল ধরে টানলাম।—"বোসো একটু; বোসোই না। কী লিখেছি, শুনবে?"

"পড়্।"

পড়ে গেলাম। তারা, ফুল, পাখি, জ্যোৎস্না—এই সব তো ছিলই, কিন্তু সব শব্দসজ্জা আর বর্ণনার সমারোহ ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল কোনও কন্যা, যে দিব্যা, তার ধ্যান, তার ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতির জন্য আকুতি, মোহজ অনুভূতি—সবই ছিল। আটকাচ্ছিল একটু-একটু, তবে তখন স্রোতের তোড়ে নেমে যাচ্ছি, থামার সাধ্য নেই, কানে একটু ছোপ ধরেছে? ধরুক না, মা হয়ত সব কিছু বুঝছেও না।

বোঝা? তুমিই বরং সবটা শুনে ওই প্রশ্নটাই করলে আমাকে। চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বললে "এই, তুই এ-সব বুঝিস?"

> (বোঝা? ছেলে কবে নিজে থেকে উপুড় হল, কবে সে শুরু করল হামাগুড়ি দিতে, কিংবা একটা-কিছু ধরে টলমল পায় উঠে দাঁড়াল, হাসল কবে সবে-ওঠা একটি-কি-দুটি দাঁত বের করে, সব মা তা জানে, তা চোখের উপর দেখতে পায়, কেউ কেউ ডায়েরিতে টুকেও রাখে, কিন্তু—। ছেলে কবে যে সব বুঝতে শিখল, কোনও মা কোনোখানে কোনও দিন তা কি টের পায়? ওই না-জানাটা পরদার মতো দু'জনের মাঝখানে নেমে পড়ে হঠাৎ আড়াল করে দেয়।)

কাগজটা টেনে নিয়ে নিজেই একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।—"কার কথা?"

আমি কী মিথ্যেবাদী, অথবা মাথার বুঝি ঠিক ছিল না, তা-ই কী

বলতে কী বলে বসলাম, বললাম যা হয় না।—"তুমিও তো হতে পার?" বললাম হাসতে হাসতে, ওই হাসিটা যে ফুঁ-এর মতো, জড়োসড়ো ভাবটা জুড়িয়ে দেব বলে।

"যাঃ।"—ওই একটি ছোট্ট কথা, পলকে কী ছোট্টটি করে দিয়েছিল তোমাকে মা সেদিন যদি দেখতে পেতে।—"যাঃ।" অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও তুমিও বিশ্বাস করলে বুঝি বা হয় না? মিথ্যেটা মাত্র এক ঝলকের আয়ু পেল, সত্যের মতো, মিষ্টি এক ফোঁটা বৃষ্টির মতো পাতার উপরে টলমল করল।

তারপর আস্তে আস্তে বললে, অস্বস্তিটা উড়িয়ে দিতে এবার উচ্ছ্বসিত, "কী সুন্দর লিখেছিস রে। এ-রকম—এ-রকম আর কারও লেখা না।"

বোকা আমি সেদিন তাই বিশ্বাস করেছি। স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মাখা কথা গোগ্রাসে খেয়েছি। বিনয় করে, বিনয় কিংবা অনুকম্পা-বশত, যদিও বলেছিলাম "কেন? বাবা?"

"উনি তো অন্যদের নিয়ে লেখেন, সে-সব কেমন যেন দূরের দূরের। তুই কার কথা লিখেছিস জানি না, তবে তুই লিখিস তোর মতো করে।"

বিশ্বাস করলাম।

কাগজটা তোমার হাত থেকে টেনে নিয়ে বললাম, "একটা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দেব। আমার লেখা ছাপা হবে, দেখো!"

দেখেছ, কিন্তু তুমি আর কতটুকু। তার পর বছরের পর বছর জুড়ে সেই ছাপার দাম নিয়ত দেখছি।

মা, এখন মার্চ মাস, অতীতের জলস্রোতের ধারায় নতুন করে স্নাত হতে হতে এই মাসে এসে কথাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে

চাইছি। এখন হিম নেই, হাওয়া ঈষৎ তপ্ত, আর আমি যেখানে বসে লিখছি সেখানকার বাগান, বারান্দা শুকনো পাতায় মর্মরিত। তবু গুমোট দিনের পরে বিকেলটা ঝিরঝিরে আর শেষ রাতটা বিশেষ করে শান্ত। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে, গা ওঠে শিরশির করে, পা নেড়ে নেড়ে তখন আন্দাজে চাদরটা কোথায় বুঝে গলা অবধি ঢেকে নিই। লিখতে লিখতেই একটা উপমা মনে হল ; সেটা লিখি, লিখে দিই ?—যদিও উপমাটা গুরুজনদের কাছে উচ্চারণ করার ঠিক উপযুক্ত নয়। মনে হচ্ছে মার্চ যেন কোনও মেয়ে, যার সদ্য বিবাহ হয়েছে রুক্ষ-রূপ কারও সঙ্গে, কিন্তু সেই মেয়ে তার স্নিগ্ধস্বভাব পূর্বপ্রণয়ীকে এখনও ভুলতে পারেনি।

খুব মিষ্টি করে সেদিন কবিতা পড়ার ছবিটা এঁকেছিলাম, তবু ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি সেই সুরটা সেদিন বিকালেই কেটে গিয়েছিল এ-কথা লিখতে ভুলি। পা টিপে টিপে তখনও এসে দাঁড়িয়েছিলে আমার পিছনে। হাসলাম। "আবার পড়ে শোনাতে হবে বুঝি ? কিন্তু নতুন আর কিছু এখনও তো লিখিনি !"

খুব কুণ্ঠিত, বলেছ, "না, না, তা নয়।"

"তবে ?"

কাপড়ের পাড় খুঁটে খুঁটে তখন তুমি কথা খুঁজছ।—"তুই—তুই তো খুব চমৎকার লিখিস।"

(লিখিই তো। তাতে কী। কী বলতে চাইছ বলে ফেল)

—"গুছিয়ে খানকয়েক চিঠি লিখতে পারবি ?"

"চিঠি ? কাকে ?"

"বলছি, আমাদের কয়েকজন আত্মীয়কে। কতকাল কারুর খবর তো নেওয়া হয় না, আমাদের খবরও ওরা পায় না।"

"ইচ্ছে হলেই পেতে পারে। তা-ছাড়া তুমিও তো লিখতে পারো। চিঠি—তা আবার এত গুছিয়ে লেখার আছে কী ?"

"আছে।" তোমার গলা আরও নীচে নেমে গেছে, তুমি একটু একটু কাশছ,

(মা, তুমিও ছলনার আশ্রয় নিচ্ছ ?)

—"মানে, চার পাঁচটা ঠিকানা খুঁজে পেতে জোগাড় করেছি। একজন হলেন আমার মামাশ্বশুর, তোর বাবাকে তিনিই মানুষ করে তুলেছিলেন, একজন আমার এক মাসিমা, ছেলেবেলায় আমাকে—"

"ঠিকানা পরে দিও। কী লিখতে হবে এখন তাই বলো।"

তুমি তখনও একটু-একটু কাশছ।—"মানে লিখবি, এই আমাদের কথা আর কী। ওঁর এত বড় অসুখ, জানানো তো আমাদের কর্তব্যও ? আর তোর কথা, কলেজে পড়ছিস, শীগ্‌গিরই পরীক্ষা দিবি, এই সমস্ত খুলে।"

"খুলে লেখার মানে ?"

"যদি—যদি—শুনেছি তো ওদের অবস্থা ভালো, যদি পরীক্ষার কথা শুনে ওরা ফীজ্‌ বাবদ কিছু পাঠিয়ে দেয়—"

"তার মানে ভিক্ষে চাইব, ভিক্ষে নেব ?" শুনতে শুনতে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে, চীৎকার করে বলে উঠেছি "মা—।"

আরও কাছে এগিয়ে এসেছ তুমি। গন্ধ পাচ্ছি, বিকট গন্ধ, "সরে যাও, সরে যাও, সহ্য করতে পারছি না।"

"পারবি না ?"

"না। তা-ছাড়া ফীজ্‌ বাবদ একবার তো পশুপতি জ্যাঠার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ। জানি না, আমি কিছু জানি না। অতো ছোট, অতো নীচ কাজ আমি করতে পারব না।"

প্রথম কি ছলছল করে উঠল তোমার চোখ, ঠোঁট কেঁপে গেল, তার পরেই কি বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে দেখা গেল ? দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছ তুমি, একটু, নিজে থেকেই একটু সরে গিয়ে বলেছ, "তার মানে আমাকে তুই ছোট, আমাকে তুই নীচ বললি ? বেশ। তাহলে বল্‌, যদি সাহস থাকে তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌,

যার মা ছোট আর নীচ, তার পেটের ছেলে তবে কী? খুব উঁচু, খুব সৎ, খুব মহৎ, তাই, না?”

মা, এত জোরে জোরে কথা বোলো না, এত তাড়াতাড়িও না। তোমার চোখের পাতা এত ঘন ঘন পড়ছে কেন, থামোই না একটিবার, নিশ্বাস নিতে যখন এতই কষ্ট হচ্ছে তোমার। চোখের সামনে আমি একটা বাড়িকে গোড়া থেকে আগাসুদ্ধ কেঁপে উঠতে দেখছি, ভূমি-কম্পে যেমন টলে, পাছে পড়ে যাও তাই দু'হাত বাড়িয়ে আমি তোমাকে আটকাতে যাচ্ছি, কিন্তু কঠিন হাতে আমাকে সরিয়ে দিলে তুমি, তীব্র স্বরে বলে উঠলে “ছিঃ! আমি ছোট, আমি নীচ, আমাকে ছুঁলে তোর হাত নোংরা হয়ে যাবে যে, ছিঃ। আমাকে ধরিস না।”

ক্রমশ পিছিয়ে গিয়েছ তুমি, প্রায় দেয়াল পর্যন্ত, সেখানেই বসে পড়ে মুখ ঢেকেছ। কিন্তু ছোঁব না কেন, ছেলে মাকে ছোঁবে না এ আবার কী অসম্ভব হুকুম, আমি মানব কেন, এই ছাখ আমিও এগিয়ে যাচ্ছি নির্ভয়ে, তোমার সামনে হাঁটু মুড়ে মাথা নুইয়ে দিয়েছি, যেভাবে, তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ, প্রতিমাকে প্রণাম করে। একটু ছোঁয়া লাগল কি, লাগবেই তো, আর তাতেই ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে যেভাবে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে কাচে, তোমার চোখও সেইভাবে জলে ভরে গেল? ভরুক, ছাপিয়ে যাক, উপচে ঝরুক, আমি তা-হলে ততক্ষণ কিছু বলব না, না-হয় ততক্ষণ বসেই থাকি তোমার পায়ের কাছে, কতক্ষণে তোমার মুখের ঢাকনা সরে যাবে, সেই অপেক্ষায় চেয়ে থাকি।

তাই, “মা, ক্ষমা কর”, মুখ ফুটে এই কথা বলেছি বটে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে, যখন তুমি, অবসন্ন, ঠাণ্ডা শানে শুয়ে পড়েছ, আঁচল তখনও টানা মুখের পরে।

“মা, আমি চিঠি লিখব”, একটি অনুতপ্ত গলা আবার বলেছে। তুমি তবু পাশ ফিরে, তুমি চুপ। একটা হাত, সেই হাত সেই সময়ে

সাহসী আর ভীরু দুই-ই, এগিয়ে গিয়ে আঁচল সরিয়ে দিতে চেয়েছে। —"লিখব, আমি লিখব। কী লিখতে হবে, আর-একটিবার বলে দাও তুমি।"

হাতটা বাধা পায়নি। বৃষ্টি থেমে মেঘ সরে-যাওয়া একটু রোদ, ভিজে ভোরের চোখ ফুটেছে।

লিখছি, এখন লিখে যাচ্ছি আমি। চিঠির পর চিঠি। দূরের, দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের নামে নামে। চোখা নিবের মুখ দিয়ে যতটা করুণা খুঁচিয়ে তোলা যায়, সেই চেষ্টায় কোনও লাজলজ্জার লেশটুকু না-রেখে। লিখছি আমি লিখছি, বাইরে পাঠানো সেই আমার প্রথম লেখা, আমার যত মুনশীয়ানা উজাড় করে দেওয়া কথার বাঁধুনি, ওরা ছড়িয়ে গিয়ে ফিরে আসুক মুষ্টিভিক্ষা হাতে নিয়ে। ওরা ব্যর্থ হবে না নিশ্চয়। লিখছি আর অক্ষরগুলো নাচছে যেন যাত্রা দলের সখী, ওদের দেহে ঢঙ, ওদের চোখে ঢলঢল ছলাকলা আর মিনতি।

পড়ছ তুমি, আড়চোখে চাইছ, বলছ "ঠিক আছে।" দুই-একটাতে তুমি সই করছ, দুই-একটাতে আমি। তোমার মুখে ম্লান একটু হাসি দেখতে পাচ্ছি। হাসিই তো, না আর কিছু, দেখি, দেখি। আ—হ্ ওই হাসিটুকুই তো আমি এত কথা, কথার পর কথা সাজিয়ে কিনতে চেয়েছি।

শেষে, সব কথা সারা, তখন আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়েছ তুমি। মাথায় হাত রেখে বলেছ, "তুই ঠিক বলেছিলি। খুবই নীচু হলাম, সত্যি। কিন্তু নিজে থেকে হইনি তো। আমাদের অদৃষ্ট—সেই অদৃষ্টই আজ জোর করে মাথাটা হেঁট করিয়ে দিল। থেকেও নেই তোর বাবা। ঈশ্বর জানেন, আমাদের কেউ নেই যে। শুধু আমরা দু'জন।" হঠাৎ উপর দিকে চেয়ে বলেছ, "আর আকাশের চন্দ্রতারা শুনছে, ওরা সাক্ষী, নিজের জন্যে কিছু তো করিনি, সব—সব তোর জন্যে। তুই যাতে বেঁচে থাকিস, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিস। যে-মাথা আজ

নীচু হল, সেই মাথা আবার উঁচু হবে। এর একটা কথাও মিছে নয় রে, এই তো তোকে ছুঁয়ে বলছি। ছেলেকে ছুঁয়ে কোনও মা কখনও কি মিছে কথা বলতে পারে!"

তুমি উচ্চারণ করছিলে দৃঢ় স্বরে, তখন সেই খোলা আকাশের তলে আমূল কেঁপে যাচ্ছিলাম আমি।

(মা, আমাকে শক্ত করে ধরেছ, কী বলছিলে, আবার বলো। সেদিনের কথা, যা ওই খোলা হাওয়ায় তোমার এলোচুলের মতো আকুল, অথচ যার প্রতিটি শব্দ আবার শিলাবৃষ্টির ন্যায়, আবার সেই শব্দগুলির পতন শুনি। আবার বলো। অথবা বুঝি শিলা নয়, সেই কথা কয়টি নিঃশব্দ শিশির, আকাশের বুকে নিংড়ে পড়া হিম। শুনতে পাচ্ছি: 'যেদিন মাথা তুলে দাঁড়াবি, সেদিন আমি হয়ত থাকব না। চলে যাব। কিন্তু তোর মা এইখানে দাঁড়িয়ে এক দিন কী বলেছিল মনে রাখিস।')

গ্লানি তোমার মুখে হাসিটুকু দিয়ে ঢেকে দিয়েছ। থাক, ঢাকা থাক। আমার কষ্টটার কথা তবে আর তোমাকে বলব না। আমার আয়ত্ত বিদ্যাকে ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়েছি, শুরুতেই সরস্বতীকে নামালাম যাচিকার ভূমিকায়—প্রকারান্তরে সে-ও তো বেশ্যাবৃত্তি? সেই পাপ সারা জন্ম অনুসরণ করুক আমাকে; তার অভিশাপ একাই বহন করি, আত্মবিক্রয়ের সেই অপরাধের ভাগ দিতে ডাকব না, আজও ডাকিনি বা ডাকছি না—মা, তোমাকে কিংবা কাউকে।

তেইশ

মা, চলো এইবার সেখানে যাই, বাগানওয়ালা সেই লাল রঙের বাড়িটা, জায়গাটা এখন কলকাতার সঙ্গে মিশে গেছে, তখন ছিল এরকম শহরতলিই। দেশের বাড়ি ছেড়ে আসার পরে এখানে আমাদের দ্বিতীয় ডেরা, ঘিঞ্জি গলির পাট উঠে গেলে যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম।

পাট শেষ পর্যন্ত তুলে দিতেই হল। চার মাসের ভাড়া বাকী, লেসি লোকটা উঠতে নামতে রোজ তাগাদা দিতে শুরু করেছিল। বাবা বিশেষ বেরোতো না, তুমি জানোই তো, বোধটোধের ঘেরা ঘর থেকে তিনি যেন বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছিলেন, শুধু তাঁর চোখ চক্রাকারে ঘুরত। লেসির সঙ্গে কথা বলতে হত তোমাকেই, মনে পড়ছে? লেসি একদিন অভদ্র একটা কথা বলল তোমাকে, ফাটা শানে জুতোর গোড়ালি তার জোর আর রাগ দুটোকেই জাহির করল। আমি তেড়ে দৌড়ে গেলাম তার দিকে, তুমি দু'চোখ দিয়ে বলছ "না, না, না", দু'হাতে সাপটে আমাকে সামলাচ্ছ। তবু ওই লোকটার গায়ে একটা স্কেল-টেল কি কাঠের একটা টুকরো পড়ল, চোখ দিয়ে জ্বলন্ত গোলা বর্ষণ করল সে, ওই কাঠটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "বটে! আচ্ছা, এর শোধ আমি নেব। তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে যাবি, বুঝলি? না যাস যদি, তবে আদালতে নালিশ করব, পুলিস-পেয়াদা এনে তাড়াব।"

লোকটা আমাদের "তুই" বলল। নতুন গোড়ালি লাগানো জুতোটা ফাটা শানে আরও ঠুকল, খুব রেগে গেছে সে, ওকে এখন দেখাচ্ছে যেন আস্তাবলের টাট্টু ঘোড়া—আর ওর জুতো জোড়া নাল বাঁধানো খুরের মতন, অবিকল।

বাবা ভিতরে; হাতে-গড়া রুটির খানিকটা প্লেটে পড়ে ছিল;

তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওঁর স্নেহের চড়ুই ছু'টিকে খাওয়াচ্ছিলেন। স্নেহের, মানে চেনা হয়ে গিয়েছিল। যখন উনি ঘুমোতেন তখনও ওই পাখি ছুটো তিরতির করে ঘরেই ঘুরত, মাঝে মাঝে শিয়রের কাছে থাকত দাঁড়িয়ে, পাহারা দিত? অথবা, অসম্ভব নয়, ওরা ঠোঁট দিয়ে খুঁটে বাবার ছু'চারটি পাকা চুলও বোধ হয় তুলে দিতে পারে! যাক, বাবা চড়ুই ছুটোকে খাওয়াচ্ছিলেন, ওই লোকটার জুতো ঠোকার শব্দ শুনে চমকে তিনিও তাকালেন। কী যেন বলতে গেলেন তাড়াতাড়ি উঠে। নির্বাক মুখভঙ্গিই শুধু ফুটে উঠল, কথা শোনা গেল না, কথা হয়ত তিনি বলেনওনি, বলতে চেয়েছেন শুধু, তার আগেই ইতর ছোট লোকটা বাবাকেও ধমকে বলে উঠেছে—"চুপ! জোচ্চোর!"

জোচ্চোর—বাবাকেও ও বলল কিনা জোচ্চোর! তখন, মা, আমাকে আর ঠেকাবে কে, আমি ফুঁশছি, ঝাঁপিয়ে পড়ব, আঁচড়ে দেব, নাকি ওর কাঁধের মাংস নেব খুবলে, অধীর-অন্ধ আক্রোশে এই সব কথা ভাবছি, লোকটা ভ্রূক্ষেপও করছে না, কিন্তু অত্যন্ত অপমানকর ভঙ্গীতে হাসছে, কী নাটুকে ব্যাপার, বলো তো কী নাটুকে, আসলে ও কি আমার সাহসেরই আন্দাজ নিচ্ছে, সাহস অথবা ভীরুতার? ও বুঝতে পেরেছে নাকি যে আমি সত্যিসত্যি বেশী ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বিপন্ন করব না, টের পেয়ে গিয়ে থাকবে, আমার সাহসের অভাব আর হিসাবী স্বভাব? আশ্চর্য, সমস্ত জীবন যা আমার লজ্জা, যা-নিয়ে আমার আত্মগ্লানি, ওই ধূর্ত লোকটা আমার চরিত্রটা সেই সময়েই ওইটুকু ক্ষণের মধ্যেই পাঠ করে ফেলেছিল? বাহাছুর, ওকে বলতে হবে বৈকি! আমার সাহসের অভাব থেকে ও সাহস নিচ্ছিল, বিশ্রী দাঁতগুলো বিকশিত করে হাসছিল।

"তিন দিন সময় দিলাম, মাত্র তিন দিন", চলে যাওয়ার আগে ছুটো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকটা বলে গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি বাবা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আবার চড়ুই পাখিদের রুটির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছেন। কোনও

চাঞ্চল্য নেই। আমাকে দেখে হাসলেন। ইসারায় বললেন—'আস্তে।' তারপর রুটি ছড়ানো শেষ হয়ে গেলে চড়ুই দুটো যখন জানালা দিয়ে ফড়ফড় করে উড়ে বেরিয়ে গেল, বাবা তখন গুঁড়োটুড়ো ঝেড়েঝুড়ে বসলেন।—"আজকের মতো, ব্যস্! ওরা কত সুখী, দ্যাখ্ তো। কষ্টভাবনা কিছু নেই। যেই জানল, আজকের পাওনা ফুরিয়ে গেছে, অমনই—একটুও আপত্তি নেই—নিজে থেকেই চলে গেল। আমরা পারি না!" বাবা খুব লুকিয়ে একটা শ্বাস চাপলেন, "মানুষ পারে না। মানুষ জানতে পারে না কবে তার এখানকার পাওনা ফুরোলো, তাই তখনও পড়ে থাকতে চায়। কষ্ট পায়।"

আমরা কথা বলছিলাম না।

একসার পিঁপড়ে জানালার শিক বেয়ে ভিতরে আসছিল, এক-একটার মুখে এক-একটা টুকরো, এক-এক কণা চিনি, মেঝের কোণে ফাটা শানের খাঁজে কোথায় ওদের গর্ত, সেখানে টুকরোগুলো জমা দিয়ে ফের শিক বেয়ে বেয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। বাবা, তখনও মগ্ন, দেখতে দেখতে বললেন, "দেখছিস? দায় ওদেরও কম। যার যেটুকু সাধ্য, সে তাই বহন করে। মানুষের মতো নয়। মানুষের বোঝা মানুষকে ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।" বাবা নিজের শিড়দাঁড়া একটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন কি? আমরা দেখলাম না। আমরা কথা বলছিলাম না।

এই বাসা, এখানকার বাস শেষ হয়ে হয়ে এল, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, লেসি লোকটার ওই অভদ্র ব্যবহারে, আর সদ্য-সদ্য যা হয়ে গেল সেই ঘটনায়, তুমি আর আমি পরস্পরকে চোখে চোখে তাই বলছিলাম। যেন অন্ধকার হয়ে আসছে, লণ্ঠনে তেল নেই, জ্বালাব কী। জ্বালাব কী, জ্বালাব কী, মা, আমরা যাব কোথায়?

আর ঠিক তার পরদিনের ডাকেই—না, আমাদের সেই চিঠিগুলোর জবাবে কারও কাছ থেকে টাকা-ঠাকা নয়, তোমার সেই মাসিমার কাছ থেকে চিঠি এল।

আমি তথাকথিত যুক্তিবাদী, তার্কিক, আমি অকৃতজ্ঞও ; তবু জীবনে বারবার অলৌকিক কোনও করুণার পরিচয় পেয়ে সর্বসত্তায় শিহরিত হয়েছি। মুখ থুবড়ে পড়ব মাটিতে, ধুলোয় একেবারে মিশিয়ে যাব, যখন সেই ভয়ঙ্কর সংকেত পাঠ করে থরথর কাঁপছি, তখন শেষ মুহূর্তে দেখেছি কোথা থেকে নেমে এসেছে কোনও পরিত্রাতা, অলক্ষ্য হাত, আমাকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আমি বেঁচে গেছি। কেঁপেছি তখন—তখনও বিশ্বাসে বা ভক্তিতে নয়, কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু সেই নিছক কৃতজ্ঞতার আবেশও এসেছে অনেক পরে।

"দেখলি তো।"—তুমি আমার অবিশ্বাসী মনের কথা জানতে, তাই সেদিন চিঠিটা পড়ে দিব্য হাস্যে পূর্ণ হয়ে বললে, "দেখলি তো। আমার সেই মাসিমা যেতে লিখেছেন। ভগবান আছেন", উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলেছ, "তোকে বলেছি না, আমার এই মাসিমা মানুষটি চমৎকার। আপন নয় অবিশ্যি, তবে আপনের চেয়ে বেশী। ভগবতী নাম, রূপেও সাক্ষাৎ ভগবতী। গরীবের মেয়ে, শুধু ওঁর রূপ দেখেই পাত্রপক্ষ নিজে থেকে এসে ওঁকে তুলে নিয়ে যায়—গল্প শুনেছি। খুব বড় ঘর, ওঁর বিয়েয় নাকি পঞ্চাশটা নৌকো এসে ঘাটে লেগেছিল। বরপক্ষ নিজেরা সারা শরীর সোনায় ঢেকে ওঁকে সাজিয়ে দিয়েছিল,

> (এ-সব রূপকথা শোনাচ্ছ কেন মা, হঠাৎ কেন এত প্রগল্ভ হয়ে গিয়েছ, সেই কোন্ আন্তিকালের এক বিয়ের বৃত্তান্তে আমার কাজ কী ?)

শুনেছি ওঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল যেন এক রাজপুরী,

> (তোমার মুখে নোলা পড়ছে যে! মা, মুছে নাও।)

কিন্তু বছর যেতে না যেতেই কপাল ভাঙল।"

"স্বামী মারা গেল বুঝি ?"

"হ্যাঁ। মেসোমশাই গেলেন, কোলে ছেলে-পুলে আসার আগেই। মাসি তবু ওখানেই থেকে গেলেন, শুনেছি পুষ্যি নিয়েছিলেন ওঁর শ্বশুরকুলের জ্ঞাতিদের ঘর থেকে কাকে, শাস্তরমতে কিনা জানি না,

তবে পোষ্য তো, দত্তকের মতই—মাঝে মাঝে আসতেন বাপের বাড়ি, তখন খরচ করতেন দু' হাতে, আমরা ছোট, তবু দেখেছি তো, আমাদের ছিল পাশের বাড়ি, আমাকে কোলে তুলে কত আদর করেছেন,

> (মা, তোমার ছোট্ট মেয়েটি হয়ে আদর পাওয়ার লোভ মনের তলা থেকে উপরে উঠে এসেছে বুঝি ?)

বলতেন, উনি বলতেন, ওই পুষ্যি ছেলেটির সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেবেন,

> (লজ্জা করছে না, তোমার এসব বলতে লজ্জা করছে না ? বাবা ভাগ্যিস এখন অন্যমনস্ক, বসে আছেন পিঁপড়েদের আনাগোনার রহস্য-ধ্যানে, নইলে—নইলে যদি শুনতে পেতেন ?)

বলতেন অবিশ্যি মজা করে, তুই ওঁদের বাপের বাড়ির পোড়ো ভিটেটা দেখেছিস, পুকুরটার ঠিক উত্তরে—ঝোপঝাড়ে ভরা, যেখানে খেলতে যেতেও ভয় পেতিস ; যাক আমার বিয়ে তো ঠিক হল অন্য জায়গায়, মাসিমা খবর পেয়ে কী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জানিস? —একটা বেনারসী।"

কতটা সত্য, কতটা বানানো ওই মুগ্ধ উচ্ছ্বসিত বর্ণনার ? জানি না। চিঠিটা তুমি পড়ছ ফিরে ফিরে, বাবাকে একটু ঠেলা দিয়ে বলেছ, "শুনছ ? মাসিমা একবার যেতে লিখেছেন আমাদের।"

বাবার সম্বিৎ ঠিক ফিরল কি ? বোঝা গেল না। একেবারে উদাস স্বরে তিনি একবার খালি বললেন, "যাব ? যাব কোথায় ?"

"এই তো ঠিকানা।"

চিঠিটা তোমার নাকের কাছে, মুখের কাছে, চিঠিতে গন্ধ থাকে আমি জানি, চিঠিতে আর নতুন বইয়ের পাতায় পাতায়, প্রগাঢ় একটা ঘ্রাণ—ওই চিঠিতে সেদিন ছিল কী ; কী পাচ্ছিলে তুমি, তোমার সেই ছেলেবেলার কোনও সুবাস কি ? বাসী বকুলের কোনও গন্ধ-টন্ধ ?

চিঠিটাকে কোলের কাছে ধরে তোমার কোলে চড়ার বয়সটাকে ফিরে ছুঁচ্ছিলে? কিংবা চোখে লাগছিল কোনও রঙ, পুরনো কোনও বেনারসীর?

বাবা নিস্পৃহ গলায় বললেন, "তোমার এই মাসিমা কে? আমি চিনি না।" বলেই বিছানার চাদরে নখ দিয়ে কী লিখে যেতে থাকলেন, আজকাল মাঝে মাঝেই লেখেন, বিছানার চাদরে কি বালিসের খোলে; কী লেখেন, শুধু আঙুলের ঘোরানো ফেরানো থেকে তা বোঝা যায় না।

"চেনো। মনে নেই?" মরীয়ার মতো তুমি বললে, "সেই বেনারসী?"

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, "মনে নেই।"

তখন আমার দিকে কাতর ভাবে চেয়ে তুমি বলেছ "আমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে, মাসিমা বলেছেন।"

"এত দিন এই ইচ্ছে ছিল কোথায়?"

"কোথায় আছি জানতেন না তো। এখানে এসে খবর তো দিইনি। কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে কোন্ সম্পর্কটা তুমি রেখেছিলে? ছিলে তো নিজের পাগলামি নিয়ে।"

"পাগলামি?" বাবা শিশুর মতন সরল চোখে তাকালেন, হাত বুলিয়ে নিলেন না-কামানো গালে একবার—"আমার সব পাগলামি সেরে গেছে।"

সেই কথা শুনে ভীষণ চমকে আমরা আবার দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করেছি। তুমি এগিয়ে গিয়ে বাবার কপালে হাত রেখেছ। খুব মরমী গলায় বলেছ "সেরে তো গেছই। শুধু তোমার ওই অসুখটা—শরীর আর একটু সুস্থ হোক, দেখবে, সব দিক থেকে সেরে গেছ একেবারে।"

"সেরে গেছি?" বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অবোধ অসহায় বিশ্বাসী হাসি, মাথা নেড়ে নেড়ে ফিসফিস করে খালি বলছেন "সেরে

গেছি" এখনও সেই নিষ্পাপ হাসি দেখতে পাচ্ছি, সেরে গেছি, সেরে গেছি, সুস্থতার জন্যে পিপাসার্ত ভগ্নস্বর শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু বাবা তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। যখনই তুমি বলেছ, "মাসিমা এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পান না, চিঠিটা লিখিয়েছেন আর কাউকে দিয়ে, নিজে কোনও রকমে করেছেন শুধু সই—আমাদের একবার শুধু দেখতে চেয়েছেন—যাবে না ?" বাবা শুধু বলেছেন, "না, না। অনেক গিয়ে গিয়ে তো দেখলাম। এবার একটু থেকে দেখি কোথাও যাওয়া যায় কি না।"

মা, ও-সব কথার অর্থ সহজবোধ্য নয়। তুমি বোঝনি। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছ, "তবে তুই নিয়ে চল্। মাসিমাকে দেখাশোনা করার লোকও তেমন কেউ নেই আর—"

"কেন, সেই লোকটি, যাকে উনি পুষ্যি নিয়েছিলেন ?"

"সে নেই তো।"

"মারা গেছেন ?"

"মাসিমা তাই তো লিখেছেন—সে নাকি অনেক বছর হয়ে গেল।"

(তোমার ঈশ্বর সত্যিই আছেন, মানছি মা। ছাখো তো, কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তোমাকে! ওই বিয়েটা সত্যিই যদি—!)

"আর কেউ নেই ?"

"তার বউ নেই ?"

"সে-ও গেছে আর বছর। মাসিমা সব লিখেছেন। তোদের দু'জনের একজনও তো পড়েও দেখলি না। পড় না, এই তো আছে। মাসিমা কত দুঃখ করে লিখেছেন। লিখেছেন, পাতানো ছেলে গেল, অন্য বাড়ি থেকে আনা পরের মেয়েটা—মানে ওঁর বউ—সে-ও গেল, অথচ দু' জনে বুড়ির কাছে সঁপে রেখে গেছে দুটো শত্তুরকে, নাতি

একটা, একটা নাতনি। বুড়ি দু'জনকেই আগলাচ্ছে কিন্তু পারবে কেন। মেয়েটাকে তাই রেখেছে বোর্ডিং-এ। ছেলেটাকেও পাঠাবে পাঠাবে করছে। নিজেই বলে হাত-পা পুড়িয়ে খান উনি!"

"নিজেই? নিজে কেন?"

"কারও ছোঁয়া যে খান না উনি। সেকালের নিষ্ঠাবতী বিধবা যে!"

(তুমি সেদিন বলেছিলে "সেকালের।" আমিও আজ কথা লিখছি সেকালের! 'সেকাল' কথাটা, কী মজা, গ্যাখো কত আপেক্ষিক, একটা করে সেকাল চেপে বসে আছে সব কালেরই পিঠের 'পরে।)

"অথচ" তুমি বলছিলে, "ঠাকুর-চাকর সব আছে। যাক, শোন্, উনি তো ভাবে বিভোর, ওঁর মাথায় কিছু ঢুকছে না। তোকে বলি। মাসিমা লিখেছেন, পর যারা তারা চলে গেছে, তুই আপন, মেয়ে, মানে মেয়ের মতো। তোরা সব্বাই মিলে একবার আয়, সব দেখে যা, পরামর্শ করি। যাবি?"

সম্মোহিতের মতো সেদিন বলেছি "যাব মা।" আমি ততক্ষণে তোমার সব উচ্ছ্বাস, তোমার চক্ষে অস্বাভাবিক সব প্রগলভতার অর্থ বুঝেছি! খড়কুটো যা-হোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাও। বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও আমাকে। আমিও তো, মা, তাই। বাঁচতে চাই, বাঁচাতে চাই তোমাকে।

কিন্তু বাবা? সেইভাবেই বেঁকে বসে আছেন। তন্ময় হয়ে দেখছেন পিঁপড়ের সারি। তুমি যেই সরে গিয়েছ শুকনো কাপড় তুলে আনতে, বাবা ইসারায় আমাকে ডেকেছেন। উদ্দীপ্ত, বিস্ফারিত দৃষ্টি—চাপা স্বর, বলেছেন, "ওই গ্যাখ্। পিঁপড়েগুলো হেঁটে হেঁটে চলেছে জানালা বেয়ে বাইরে। ভাবছে চিনি ওই দিকে পাবে। অপেক্ষা কর, গরম হাওয়া বইছে, বিষ্টি নামুক! দেখবি ওরা ফিরে আসছে একে একে। যেহেতু জানালার ও-পাশেও চিনি নেই, পাবে না।"

"আ-স-বে-ই", বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন ভীষণ কোনও ঘোষণার স্বরে, মা, ঠিক যখন তুমি শাড়ি পাল্‌টে ঘরে ঢুকছিলে। তুমি কিন্তু চমকে ওঠোনি, মুছে গেছে একটু আগেকার সেই উত্তেজনা। চোখে পলক পড়েনি, একবার চেয়ে দেখে নিলে বাবাকে, তারপর শান্ত, অবিচল, আমার দিকে ফিরে বললে, "তৈরী? তা হলে চল্‌!"

ঠিক এক্ষুনি যেন কোনও কথা বলে উঠে তুমি আমাকে চমকে দিও না। ধরেই নাও না, এখন সেই রোদ-পড়ে-আসা বেলা, আমরা দুজনে ফিরছি; সেই লাল রঙের বাড়িটা, যার চার ধারে মাথা সমান পাঁচিল, বাগানও আছে একটা, বাগানের পিছনের রাস্তাটা গিয়ে ঠেকেছে গঙ্গার ঘাটে, সেই বাড়িটা থেকে ফিরছি। টম্ টম্, টম্ টম্, কী গাড়ি এটা বলো তো, এই গাড়ির নামও টম্ টম্, যে-ঘোড়াটা টানছে সেটার রঙ কী গাঢ় বাদামী, আর সেটা কী তেজী, চড়বার আগে তুমি নজর করে দেখনি, দেখলে তোমার ভয় করত। সামনে কোচম্যান, পিছে সহিস; টম্‌টম্ টম্‌টম্, আমাকে খানিকক্ষণ ওই শব্দের তলায় চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দাও, ভয় নেই, ওই শব্দে, রাজবেশ-পরা ঘোড়াটার নালাবাঁধা ক্ষুরের তালে তালে ঠক্‌ঠক্ চলায় থেঁতলে যাব না আমি।

এ-রকম গাড়িতে তার আগে চড়িনি। তাই নতুন করে সেদিনের ফেরাটা তৈরী করে নিচ্ছি, অতীতকে এইভাবে তৈরী করে নেওয়া যায় তো, তুমি ছাখোনি, যেভাবে তৈরী করে নেয় থিয়েটারে, নকল সেট-টেট এনে আর পিছনের সীন-টীন এঁকে, মোগল পাঠান যুগে যেমন হত, পৌরাণিক কালে হতে পারত যেমন?

ভেবে ছাখো, সেই বিকেল, আমার তখনও ঘোর কাটেনি, কোথাও ঢংঢং ঘণ্টা বাজছে, মন্দিরের চূড়ো, ওই বুঝি দক্ষিণেশ্বর?—তুমি দু' হাত জুড়ে প্রণাম করছ। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার নরম আলোয়

জুড়োচ্ছে ধনুকের মতো পিঠ-বাঁকানো পর পর সাত-সাতটা মহাকায় মহিষ, ওগুলো কী; এরই নাম বালি পুল নাকি? সেদিনকার চোখ দিয়ে আমাকে আর-একবার দেখতে দাও।

এই তো একটু আগে ছিলাম সেখানে, চৌকোচৌকো পাথরে বাঁধা তক্‌তকে মেঝে, পা পিছলে পড়ব না তো, এ কি ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজসূয় যজ্ঞের সময়কার, আর আমি দুর্যোধন? সাদা-কালো পাথর, কোণা-কুণি বসানো, ঘরজোড়া অবিকল এক দাবার ছক,—দাবার ছক? ভাবতেই বুকটা ছাঁত করে ওঠে, দাবার ছক যদি, তবে এই ঘরে আমি কী, আমরা কী, আমাদের নাম কী—বোড়ে নয় তো? কেউ কি ঘুঁটির মতো চালছে আমাদের অন্তরাল থেকে, আমরা কি মরে যাব, অথবা মন্ত্রী-গজ-নৌকো এই সব হয়ে বেঁচে উঠব নতুন করে, পুনরায় হব সচল এবং প্রবল?

তোমার মধ্যে কিন্তু অস্বস্তি দেখিনি। এত তাড়াতাড়ি ওখানে সহজ হয়ে গিয়েছিলে!

> (মেয়েরা পারে, যেহেতু এক ঘর ছেড়ে আর এক ঘর একবার তো তাদের যেতেই হয়। নতুন মাটিতে তরতর করে তারা বাড়ে, আমরা পুরুষেরা তা পারি না।)

বসেছিলে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তোমার সেই মাসিমার পাশে।

তাঁকে দেখলাম। তোমার এই মাসিমা সত্যি। রূপসী? ছিলেন কোনদিন তো নিশ্চয়ই, আমি দেখলাম রূপের চিহ্ন পড়ে আছে শুধু ফিকে ফ্যাকাশে রঙে। সরু শুকিয়ে যাওয়া মুখ, সোনার পাড়-বোনা চশমা চোখে, ধবধবে থান পরনে, তোমার মাসিমা, প্রণাম করলাম তোমার ইঙ্গিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে বললাম 'দিদিমা।'

তিনি দেখলেন তোমাকে, চশমাটা পরে তো দেখলেনই, একবার খুলে নিয়েও। তোমাকে কাছে টেনে নিলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন মাথায়, কপালে, গালে, পিঠে। চোখে জল এসেছে

ওঁর, দেখতে পেলাম, কিন্তু কেন, সেদিন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম। তখনও জীবনের খুব বেশী তো দেখা হয়নি। জানব কী করে যে, বেশী বয়সে কথায় কথায় চোখে জল আসে, কখনও কখনও কারণও থাকে না, কাউকে দেখলে, পুরনো কালের কোনও কিছু হঠাৎ আবার চোখে পড়ে গেলে আলোড়িত হয় স্মৃতি, আর এসে পড়ে বহু অনুষঙ্গ—এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস থেকে হঠাৎ যেমন বৃষ্টি, স্মৃতি তেমনই সহসা পরিণত হয় অশ্রুতে।

চোখের জল মুছে তিনি ভিজে গলায় তোমাকে ডাকছিলেন "খুকি।" তোমার চোখও ভিজে।—"উঁ—উঁ", তুমি সাড়া দিলে।

"উঁ!"—ওই ছোট্ট, আদরের আবদারের, আধো-আধো একটা অক্ষর কিন্তু সব কিছুর মানে বুঝিয়ে দিলে আমাকে। মা, আমি তোমাকে দেখতে পেলাম সেই বয়সে যে-বয়স কোনও দিন দেখিনি। কোথায় সেই বিষাদ-প্রতিমা, যা স্থির, ভারী, পাথর কুঁদে তৈরী? আহত, নানা তাপে জর্জরিত? হালকা হয়ে গেছ তুমি, খুশিতে, অসংবৃত অহেতুক উচ্ছ্বাসে।

ঘোর কাটেনি, গাড়িতে ফিরতে ফিরতেও তোমার সেই রূপ ধ্যান করছিলাম। ভাবছিলাম, ওই রূপান্তরের রহস্য কী। পড়ন্ত আলোয় দেখেছি তোমার মুখের খুশির ছোপ তখনও মোছেনি।

তোমার মাসিমার সঙ্গে তুমি যতক্ষণ কথা বলছিলে, তার সব সময় আমি সেখানে বসে থাকিনি। ঘুরে ফিরে দেখছিলাম, বেরিয়ে পড়েছিলাম বাগানটাতে, একবার দেখে এসেছিলাম গঙ্গার ঘাট অবধি।

গাড়ি যখন টালার পুলে, তখন ঘোলাটে ঘন শহরটা সম্মোহনের পরদাটা ঘুচিয়ে সম্বিৎ আবার ফিরিয়ে এনেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, "কিছু হল? কী বললেন তোমার মাসিমা—ওই দিদিমা।"

বাস্তব প্রশ্ন, অন্তরঙ্গ স্বর। তুমি চোখ-বড়-বড় করে বললে, "দেখলি না, কী খুশী!"

"খুশী তো বুঝলাম, বললেন কী?"

"সব শুনলেন। বললেন, আমরা সবাই মিলে ওখানে গিয়ে থাকতে পারি। আসলে, মাসিমাও বেঁচে গেছেন আমাকে দেখে, আমাকে পেয়ে।"

"তুমি ওখানে করবে কী?"

ওঁর পূজো, ওঁর রান্নার জোগাড়যন্তর করে দেব, আবার কী। আর তোর বাবা—উনিও তো বিশেষ কিছু করছেন না এখন, করতে পারছেন না। যত দিন সুস্থ না হন, ততদিন এখানকার সব তদারকি করতে পারেন, ঠাকুর-চাকরে মিলে চুরি করে শেষ করে দিচ্ছে, মাসিমা বলছিলেন।"

"আর আমি?"

"তুই পড়বি, পরীক্ষা দিবি, পাস করবি। তোর আবার কী। বুঝছিস না, সব তোরই জন্যে, বুঝছিস না?"—বলতে বলতে তোমার গলা নেমে আসা সন্ধ্যার মতো ভারী হয়ে এল।

বুঝেছি। আমারও জন্যে একটা ভূমিকা ঠিক হয়ে ছিল, তখন জানতাম না। অথবা আমিই সেই ভূমিকাটা ঠিক করে নিয়েছি।

বুঝেছিলাম আরও কিছু। বুক থেকে একটা বিষম ভয়ের ভার নেমে যাচ্ছে, তাই তুমি এত খুশি। তাই, মা, "সব তোর জন্যেই তো", ভারী গলায় এই কথাটা বলে উঠেই হঠাৎ আবার বাচ্চার মতো গলায় হেসে উঠেছ তুমি।

"কী হল?"—জানতে চেয়েছি।

"একটা কথা মনে পড়ে গেল কি না। তুই শুনেছিলি, মাসিমা আমাকে আন্নু বলে ডাকছিলেন না, বলছিলেন, "খুকি!"

"শুনেছি।"

"আর চশমা খুলে আমার মুখটা খুব কাছে নিয়ে দেখছিলেন, দেখেছিলি? চামড়া একেবারে কুঁচকে গেছে, চোখে ভালো দেখতে পান না তো, তাই টেরও বোধ হয় পেলেন না যে, আমি এখন গিন্নি-

বান্নি। হাসির কথা নয়? বল্, তুই-ই বল্, তোর বাবা তো আমাকে কবে থেকেই বলে, বুড়ি! ঠিক কি না বল্", তুমি চল্‌তি গাড়িতে বসেই আমাকে ঠেলছিলে, আর চোখ উপছে হাসছিলে!

হাসতে হবে না আর, আমি বুঝেছি। ধরে ফেলেছি তোমার ছেলেমানুষী খুশির আর-একটা মানে। আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে নির্ভাবনার হাসি, সে তো আছেই। কিন্তু কারণ আর-একটাও নেই কি? সেটা আছে ওই কথাটায়—"খুকী।" তোমার মাসিমার কাছে সেই জাদু, যা পলকে তোমাকে করে খুশী, তাঁর পাশে দাঁড়ালেই তুমি আধো-আধো সেই ছোট্টটি। ওঁর চামড়া কোঁচকানো, চোখে জ্যোতি নেই, দেখতে পান না ভালো করে—ওঁর চোখে এখনকার তুমি ধরা পড়বে না কোনও দিনও, সেই ভয় নেই বলেই, এত খুশী—এই তো! বুঝেছি।

(আমাদের হারানো বয়স আমাদের চেয়ে যারা বয়স্ক, শুধু তারাই আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে। তোমার তখনকার বয়সে পৌঁছে যাবার পর থেকে, মা, এই আনন্দের স্বাদ আমিও মাঝে মাঝে পাই, আজও পাচ্ছি।)

গলির ভিতরে আর গাড়িটাকে নিয়ে গেলে না। মোড়ে নেমে কোচোয়ানকে বললে, "মাসিমাকে বোলো, আমরা কাল কি পরশুই যাচ্ছি।"

চাপা গলি, ধসা দেউড়ি, নড়বড়ে সিঁড়ি। কয়েকটা চামচিকেকে উদ্বাস্তু করে দিয়ে আমরা অলীক থেকে আবার আমাদের প্রাত্যহিক সত্যে প্রবেশ করছি। এই সত্য পরিত্যাগ করে যাব।

কিন্তু কী করছেন বাবা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে? হাতে একটা মোমবাতি। ফিরে তাকালেন আমাদের পায়ের শব্দে, তারপরই আবার ঘুরে গেলেন জানালার দিকে।

"কী করছিলে? আমরা আসব বলে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছিলে?"—তোমার মন তখন হালকা, তাই তুমি ঠাট্টা করতে পেরেছ।

কিন্তু বাবার গলা শান্ত, সুদূর—"না। দেখছি।" কাপড় বদলাতে তুমি চলে গেছ আড়ালে, তখন বাবা একটা আঙুল নেড়ে আমাকে ডাকলেন।

"দেখতে পাচ্ছিস?"

দেখব কী—"কই, কিছু তো নেই!"

তখন কানের কাছে মুখ নামিয়ে বাবা গূঢ় কোনও সত্য ব্যক্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, "দেওয়াল বেয়ে বাইরে গিয়েও ওরা কিছু পায়নি, তাই ফিরে আসছে। সারে সারে। এবার দেখছিস?"

তখনও তুমি উনুন জ্বালোনি। বদলানো আটপৌরে কাপড়, পিছনে চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছিলে, যেন চিত্রার্পিত। আমাদের অংশ-টুকু তো বটেই, সমস্ত বাড়িটাই স্তব্ধ হয়ে ছিল।

আমাদের প্রাত্যহিক সত্য। এই সত্য পরিত্যাগ করে যাব।

আমরা যাব। সব গুছিয়ে তুলছ তুমি, পাটপাট করে রাখছ, গরীবের সংসারেও কত জিনিস জমে ওঠে, দরকারীর সঙ্গে অদরকারী, ওই কয়েক বছরে আমাদেরও জমেছিল, ছড়ানো ছিল বলে বুঝিনি, তুলতে গিয়ে টের পাওয়া গেল, বোঝা কত।

গাঁটরি আর পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে তুমি কপালের ঘাম মুছছ, ক্লান্ত পা ছড়িয়ে বলছ, "এ—ত!" কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি যেই বলে উঠেছি "থাক না, ওখানে তো সবই আছে", তুমি অমনই ব্যথিত, বলেছ "বা—রে। পরে আমাদের আবার আলাদা ঘরকন্না হবে না? বরাবর ওখানে থাকব নাকি। তোর বাবা একটু উঠে দাঁড়ালে, আর তুই মানুষ হলে আমরা আবার তো নতুন বাসা করব! করব না?"

"তবে থাক।" সায় দিয়ে আমি আবার অন্য দিকে হেলেছি।

"কিন্তু সব নিয়ে যেতে গেলে বোঝা হয়ে ওঠে যে, আবার ফেলে যেতেও মায়া লাগে। কোন্‌টা কবে যে কাজে লাগবে বলা তো যায় না।"

"ঠিক ঠিক", বাবা বলে উঠেছেন, "বলেছ ঠিক। কোন্‌টা যে কবে কাজে লাগে কিচ্ছু বলা যায় না।"

বাবাকে নিয়ে সমস্যা হবে, ওঁকে রাজী করাতে বেগ পেতে হবে, তুমি আর আমি আগে দু'জনই ভেবে ভয়ে ভয়ে ছিলাম, অথচ আশ্চর্য, বাবার মত পরদিন সকালেই একেবারে অন্য রকম। ভালো করেও সব শুনলেন না, তোমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "যেতে হবে? তা হবে বৈকি। পড়ে থাকা সম্ভব নয়, আমরা কেউ তো পড়ে থাকতে আসিনি।"

শান্ত, সম্মত বাবা একদৃষ্টে দেখছেন তোমার জিনিস গোছানো। কখনও বলছেন, "দরকারী-অদরকারীর কথা বলা তো যায় না, নিয়ে চলো, নিয়ে চলো সব", কখনও "ফেলে দাও, ফেলে দাও সব"—একটা যন্ত্রণার অস্থিরতা ওঁর মুখে আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি।

"ফেলে যাব?" হাত থামিয়ে তুমি বলেছ, "ফেলে যাব কেন?"

"কিচ্ছু বোঝো না তুমি, বরাবরই এক রকম। জানো না, একেবারে হাল্‌কা হয়ে চলে যেতে হয়?"

মাঝে মাঝে কী যে নিষ্ঠুর হয়ে যেতে তুমি! নইলে বাবার নিরাসক্ত, সুন্দর কথাটার ওইভাবে উত্তর দিতে হয়? তোরঙের তলা থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করেছ হলদে কাগজের বাঁধা বাণ্ডিলগুলো, এত দিন পরে দেখে চমকে উঠেছি, কঠিন গলায় তুমি বলেছ, "তবে বলো, ফেলে দিয়ে যাই এগুলোও?"

বাবা যেন চেনেননি।—"ওগুলো কী?"

"তোমারই কীর্তি তো, এ-সব। দেখছ না, সেই সব পালার পর পালা?"

তাকিয়েছিলাম। স্থির দৃষ্টিতে বাবাকে দেখছিলাম। একটু কেঁপে উঠেছেন। ঘন ভুরুর নীচে চোখের তারা একবার নড়ে উঠেছে। একটু ছায়া পড়ল কি, রুগ্ন-শীর্ণ মুখে খেলে গেল একটুখানি মায়া ? খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছেন, "তাই তো, ওগুলো ওগুলো", বিবর্ণ গলা, কিন্তু এই তো, মুখ সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, আঙুল বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছিঁড়তে চাইছেন কিছু, আপাতত যা অদৃশ্য, হয়ত-বা কোনও মায়া, ছিঁড়ছেন, টুকরো করে দিচ্ছেন হিংস্র হাতে।

মা, সেই মর্মান্তিক হিংস্রতার কাছে তোমার হিংস্রতা কিছুই নয়। ফেলে দিয়ে যাবে বলেছিলে ? ওই শোনো, বাবা কী বলছেন, কী স্পষ্ট, কী তীব্র, কী নির্মল-নির্মম ওঁর কণ্ঠস্বর, বলছেন "ফেলে দাও, ফেলে দাও সব।"

সেই বৈরাগী-গৈরিক আদেশের আঘাতে তুমি বিবশ, তুমি কাঁপছ। কাঁপা, অতি ভীত, অতি সঙ্কুচিত গলায় বলছ "স—ব ?"

বাবা এগিয়ে এসে তোমার পাশে বসেছেন। আলগোছে একটা হাত রেখেছেন তোমার পিঠে। নিবিড় স্বরে বলছেন, "ভয় পাচ্ছ ? মায়া হচ্ছে ?"

"তোমার মায়া নেই জানি। কোন-কিছুতেই নেই, কোনও দিনই না। জানি।"—কোনও রকমে বলতে পেরেছ, কিন্তু মা, তোমার শুকনো কণ্ঠস্বর।

"আছে। মায়া আছে। তুমি জানো না আন্নু।

(বাবা তোমার নাম ধরে ডাকছেন, আমার সামনে এই প্রথম। আমার উপস্থিতি কি সেই ক্ষণে ওঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে ?)।

"তুমি জানো না, মায়া আছে। কিন্তু সব ইন্দ্রিয়বৃত্তির মতো মায়াকেও স্থির করে ধরে রাখা যায়, সেই শক্তি আমি অর্জন করেছি। ফেলে যাও ওগুলো, যাও না। লেখালেখির ওগুলো একটা পর্যায় মাত্র, একটা পদ্ধতির নমুনা। আরও পদ্ধতি আছে, আমি শিখেছি।

আমার লেখালেখি এখনও চলছে, অনবরত, টের পাওনি, না? কত কী লিখি সাদা চাদরে, আঙুল দিয়ে দিয়ে, ছাখনি? সে-লেখা পড়তে পার না। লিখি আর মুছি বা নিজেই মুছে যায়, কালির লেখা তো নয়। মনে কিন্তু গাঁথা থাকে, সমস্ত, নিজের কাছে থাকে। সব লেখা দেখলাম, শেষ পর্যন্ত নিজেরই জন্যেই তো। কথাটা—আমি লিখতে পারছি কি না। পারছি। আগে কাগজে লিখতাম কালি দিয়ে, কালি বড়ো কালো, কালিই হল আসক্তি, তাই কষ্ট পেতাম। এখন সাদা চাদর, সাদা অক্ষর, আসক্তি নেই, কষ্ট নেই। আনু, যা ইচ্ছে এই বাক্স বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারো, যা ইচ্ছে তা ফেলে রেখে যাও, কিছুতেই আর আমার লাভ নেই, ক্ষতি নেই।"

কথাগুলো কঠিন, তার চেয়েও স্থির কঠিন ছিল সেদিন বাবার কণ্ঠ। আমি তাঁর সেদিনের নিরাসক্তিকে আমার আজকের যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে সাজালাম। ভাষা অবিকল হোক বা না হোক, তাঁর ভাবটাকে হয়ত প্রতিধ্বনিত করতে পেরেছি।

তোমরা যখন কথা বলছিলে, অভিভূত, আড়ষ্ট, আমি তখন কিন্তু ধীরে ধীরে এসেছিলাম সরে। যেন শুনছি না, এইভাবে দেওয়ালে আঁকা বসুধারা-চিহ্নটার উপরে চোখ রেখেছিলাম, আসলে সঙ্গে কী নেওয়া যায়, আর কী পড়ে থাকে, বিচার করে দেখছিলাম মনে মনে।

ওই বসুধারা চিহ্নটা। কবে আঁকা, তবু এখনও টকটকে। খুব অসহায়, কিন্তু অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেই মুহূর্তে খেয়াল হল, এই বসুধারা চিহ্নটি তো নিয়ে যাওয়া যাবে না; আবার কেউ মুছেও দেবে না ওই লেখাটাকে যাবার আগে। ওটা রয়ে গেল।

রয়ে যাবে আরও কত কী, টুকিটাকি, পরিত্যক্ত আত্মীয়ের মতো, এখন মূল্যহীন, কিন্তু কোন-না-কোনও দিনের স্মৃতি-বিজড়িত। নালিশ চোখে নিয়ে তারা পড়ে থাকবে, আমরা চলে যাব, অজস্র সেই অশ্রুত আর্তনাদ শুনতে পাব না।

চব্বিশ

ঘর-টর ঝাঁট দিয়ে, মুছে, তবে যেমন আসন পাতে, পূজায় বসে, তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, আমি রোজ বসছি সেই ভাবে। লম্বা এই চিঠিটার খেই ধরবার আগে উদ্দেশে নমস্কার করে নিই। লম্বা ঢিবি, একটি মিছিলের মতো ; কতো দূর থেকে আসছে, কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে! সারি সারি অক্ষর, মরুভূমিতে। সার্থবাহীদের উটের মতো। কিংবা মাথায় মোটঘাট বাঁধা সেকালের সব তীর্থযাত্রী। এরা কোন্ মন্দিরের অঙ্গনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়বে, কত দূরে সেই মোহানা অথবা সঙ্গম, এই লেখাগুলো ডুবে যাবে যার জলে? সেই জলে ধুয়েও যদি যায় তো যাক না!

অথবা আমি এখান থেকেই তাদের ভাসাচ্ছি। পাতায় করে কিছু ফুল, একটি আলো, একটার পর একটা নামিয়ে দিচ্ছি স্রোতে ; ফুল কাঁপছে, কাঁপছে আলো, পাড়ে বসে কাঁপছি আমি। অনেক দূরে চলে গেলে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

আমিও নেমে যাই না ওই জলে, মাঝে মাঝে ভাবি। তা-হলে আর পাতার নৌকো তৈরী করারও দরকার হয় না। নিজেই নিমজ্জিত, প্রশান্ত এক পাতালে স্থির হয়ে থাকি। অস্থিরতা যত, সব উপরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, বৈঠার ঘায়ে ঘায়ে ঢেউ ভাঙে, আমি জানি। নীচে এ-সব কিছু নেই। সেখানে অজস্র স্থির-পদ্ম প্রস্ফুটিত, নীল, পাটল কিংবা সোনালি, আলোর বর্ণ দিয়ে গড়া তাদের পাপড়ি, যে-আলো জলের উপরিতলে আছড়ে পড়ে নির্যাস তলদেশে চুঁইয়ে পড়ে।

সেই অসুখটার পর থেকে স্থায়ী সুখের জন্যে ব্যাকুলতাও আমার বেড়েছে। জরার হাত থেকে রেহাই নেই, কিন্তু জ্বালার হাত থেকেও বাঁচব কিসে, অস্থির হয়ে ভাবছি। নিরলম্ব শূন্যে আর ঝুলতে পারি

না, ওখানে যত নীচতা, ছোট ঈর্ষা, তাৎপর্যহীন ঘটনার ঝড় আমাকে নিরন্তর ঝাপটা মারে, পায়ের নীচে তাই খুঁজলাম মাটি—পেলাম। সেই মাটি এই লেখা। সেই মাটি তুমি। তদবধি তোমার আশ্রয়ে আছি। খুঁড়ছি, খুঁড়ছি, কখনও আবেশের বশীভূত হয়ে, কখনও নিষ্ঠুর আক্রোশে, তবু কোথাও দাঁড়িয়ে আছি। এই মাটি কেড়ে নিও না, জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্যে আর উদ্বাস্তু করে দিও না।

উন্মোচিত করো, সেই অতীত, তোমাকে আমাকে। প্রত্ন-রত্নগুলি ঘষে মেজে আমার হাতে তুলে দাও।

পরিপার্শ্ব, মা, আমাকে এখনও বিচলিত করে। আগে ঋতুর কথা লিখেছি। এখন দেখছি, এক-একটা দিনেরও নানা প্রহর আমার ধ্যানভঙ্গ করে। বর্তমানের ধুলো, রাজনীতি আর তার তুচ্ছতা ; সমাজ, পরিজন, তাদের কাছে প্রত্যাশা এখনও কিনা ছিটিয়ে পড়ছে আমার সত্তায়। চমকে উঠে আবিষ্কার করছি আমি আজও প্রকৃতির দাস, বৃত্তির সামান্যতার সুতোর জালে জড়িয়ে আছি, জড়িয়ে যাচ্ছি।

অথচ স্নান করে সব ধুয়ে শুচি হয়ে বসব, এই লেখার শর্ত তো এই ! তবু কোনও কোনও দিন এরই মধ্যে মন-মুখ তেতো হয়ে থাকে, কারও ভীরুতায় নিজের সংশয়ে মেজাজ যায় বিগড়ে, সেদিন আর এই জবানবন্দী শান্তিবারির মতো ঝরতে চায় না, আজ যেমন চাইছে না, অকিঞ্চিৎকর অনুভবের শরশয্যায় শুয়ে—বলো তো কি ? —মনে পড়ছে ছোট্ট একটি ছেলেকে। একবার তাকে দেখেছিলাম ! মেলার ভিড়ে হট্টগোলে হারিয়ে গিয়ে ভীষণ বিপন্ন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, দু'হাত বাড়িয়ে ফিরে ফিরে একটি কথাই শুধু বলছিল "মার কাছে যাব, মার কাছে যাব।"

একটি ছেলে কিংবা একটি মেয়ে। সব মেলাতেই যারা হারায়। মাকে ডাকে। তাদেরই মতো।

মা, কাল সারা রাত কতগুলো কষ্টের শকট আমার বুকের উপর

দিয়ে চলে গিয়ে আমাকে মথিত করে গেছে। এই প্রভাতেও তার বসে যাওয়া চাকার দাগে ব্যথা পাচ্ছি, প্রয়োজনীয় প্রসন্নতা কিছুতেই ফিরে পাচ্ছি না। সেই বাগানঘেরা বাড়িটাতে পৌঁছতে তাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অথচ সেখানে তো আমাদের পৌঁছতেই হবে! আমাদের মাল বোঝাই ঠেলা গাড়িটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই, পরে আমরা গিয়েও দেখলাম সেটা কাৎ হয়ে পড়ে। হয়ত সেটাই স্বাভাবিক, তবু বুকটা কেমন করে উঠেছিল, কাৎ হয়ে পড়ে-থাকা গাড়িটা কি আমাদের কুণ্ঠিত আশ্রিত অবস্থার প্রতীক? হয়ত কল্পনা, তবু অনাদরের চেহারা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

বাবা কিন্তু খুব খুশী। চার দিকে চেয়ে দেখে বলছিলেন, "বেশ, বেশ। কোন্ ঘরটা আমাদের হবে বল তো?"

"এসেই আগে ঘরের খোঁজ?" তুমি চাপা ধমক দিলে "অদ্ভুত মানুষ তো তুমি!"

"বাঃ, ঘরই তো চাই আগে। সবচেয়ে আসল কথা হল স্থিতি। কোথায় স্থিত হব, জানতে চাইব না?"

ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছিল যারা, দাস-দাসীই হবে, তারা কেউ দাঁড়াচ্ছে না, কথা বলছে শুধু নিজেদের সঙ্গে, তা-ও চাপা গলায়, আমাদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে অথচ আমরা তাকালেই ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ, ঠিক কী করব বুঝতে পারছিলাম না সেদিন— একটা নতুন অধ্যায় শুরু করার আগে কোন্‌খানে ঠিক কীভাবে ধরব, এখনও যেমন ভাবি।

"যাই মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি।" তুমি উপরে চলে গেলে।

বাবা ঘুরতে থাকলেন বাগানে। ঠেলাওয়ালাকে তো ছেড়ে দিতেই হবে। আমি এগিয়ে গেলাম সেখানে, তার সঙ্গে হাত লাগিয়ে খুলে ফেললাম দড়াদড়ি, জিনিস নামিয়ে তুলতে থাকলাম

রকে। বেশ পরিশ্রম হচ্ছিল। গেট দিয়ে তখন ঢুকল একজন লোক, মাঝবয়েসী, একটা শার্টের সঙ্গে সে পরেছে ধুতি, চেহারা দেখে মনে হল আধা-ভদ্রলোক। "আধা"—আধা কেন? যেহেতু—যদিও পিছলে পিছলে চরম দুর্দশায় তখন পড়ে রয়েছি—মধ্যবিত্ত শ্রেণীজ্ঞান আমাদের জন্মার্জিত এবং মজ্জাগত।

তার হাতে কী সব সওদা ছিল, আমার গলদঘর্ম দশা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা দয়াপরবশ। তার সহায়তায় জিনিস নামানো হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ঠেলাওয়ালা বিদায় নিল। তখন, কাঁধে-রাখা ঝাড়নে হাত ঝেড়ে ফেলে সে বলল "কোথা থেকে?" বোধহয় সে ঠিক করতে পারছিল না তুমি বলবে, না আপনি, আমার বেশভূষা আর বয়স থেকে।

"ঝামাপুকুর"—আপনি-তুমি এড়াতে আমিও একটি কথাতেই উত্তর দিলাম।

"ও বুঝেছি", সে বলল খুব প্রাজ্ঞ গলায়।—"মা বলেছিলেন বটে।" দূরে, বাগানের ধার ঘেষে বাবার পায়চারি-করা চেহারা দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলল "তাহলে এর পর উনিই হচ্ছেন এ-বাড়ির নতুন ম্যানেজার?"

ম্যানেজার? বাড়ির আবার ম্যানেজার কী। বুঝতে পারলাম না, আবার পারলামও যে, কথাটা যেন তেমন সম্মানের নয়। কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কী বলা যায় চট করে ঠিক করতে না পেরে, কতকটা অসংলগ্নভাবে কিন্তু ঝোঁক আর ঝাঁঝ দিয়ে, বলে ফেললাম "আমরা এদের আত্মীয়।"

লোকটা হাসল। সেই হাসিটার পুরনো প্রিন্ট নাড়াচাড়া করে এখনও বুঝছি না, ওই হাসির জাত কী। ধূর্তের? দার্শনিকের? যাই হোক, সে হেসেছিল। বলেছিল "আত্মীয় তো সবাই। আমার মামাও এখানে আসেন জ্ঞাতি হিসাবেই—এই গিন্নীমার শ্বশুরের আমলে। তা, কী হল? সেই মামা হলেন গোমস্তা, আর তাঁর

ভাগ্‌নে, এই আমি? বরাবর বাজার সরকার। শুনি আমি চুরি করি, তাই আমার উপরে তদারকির জন্যে ম্যানেজার বসাচ্ছে।"

তার স্বরে তিক্ততা হতাশা, ঈর্ষা, ঘৃণা; কিন্তু চোখে বেদনা ছিল। আমি মিলিয়ে দেখছিলাম। আবার, "ম্যানেজার—ম্যানেজার" শব্দটা কানের পটাহে বিকটভাবে বাজছিল। আরও জোর দিয়ে, যেন সেই কর্ণপটাহ ভেদ করে নিজেরই কল্‌জেকে শোনাতে আবার বলে উঠলাম "আমরা আত্মীয়। দিদিমা—দিদিমা নেই?"

মা, তোমার মাসিমাকে সেই প্রথম স্বেচ্ছায়, উপযাচকের মত দিদিমা বললাম। এ কয়দিন মনে মনেও যা মানতে পারিনি। "দিদিমা, দিদিমা" শব্দটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছি কাঙালের মতো প্রাণপণে। প্রাণ, অপমানবোধ, আমার সম্মান।

"না। ত্রিবেণী গেছেন পুণ্যিস্নানে। কালই ফিরবেন কি পরশু। তা সে-জন্যে ভাবনা নেই। বলে গেছেন আমাকে। সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। নীচের দুটো ঘর খুলে দিচ্ছি।"—বলে সে আর অপেক্ষা না করে হুকুম খাটিয়ে উঠিয়ে দিল আমাদের সব জিনিস ভিতরের উঠোনের সামনাসামনি দুটো ঘরে।

উপরে গিয়ে তুমি একটা দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছ, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলে "আয়। কিন্তু মাসিমাকে দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি না কোথায়। সেই তখন থেকে বসে আছি। মাসিমা বোধহয় চানের ঘরে ঢুকেছেন, কি পূজোর ঘরে। এখনও বেরোননি। ওকে জিজ্ঞেস করছি, অথচ ও কিছু বলছে না। কী যে করব!"

দেখলাম, দরজার সামনে দিয়ে দাসী-মতন কে চলে যাচ্ছে। দাসী? ও যদি দাসী, তুমি তবে কী? বাবা কোথায়, এখনও বাগানে ঘুরছেন? বাবাই বা এ-বাড়িতে কী? ম্যানেজার হবেন? ম্যানেজার—মানে তো নায়েব? বাবা যদি নায়েব, তুমি তবে কী?

বামুনদি যাকে বলে তাই?—হেড রাঁধুনি? শব্দটা মনের উপর গরম মোমের মত পড়ল। নায়েব—বাম্‌নি, নায়েব—রাঁধুনি, বারবার যেন দুটো মশা এসে জ্বালাচ্ছে, মারব বলে হাত তুলছি, ঠাস্ ঠাস্, শব্দ হচ্ছে, তবু কই, ওদের গায়ে লাগছে না তো, নায়েব-নায়েব, রাঁধুনি-রাঁধুনি—মশা দুটো ফিরে ফিরে ঠিক উড়ে এসে বসছে।

"খিদে পেয়েছে?" তুমি বললে "খেয়ে নে না খানিকটা চিঁড়ে, ত্যাখ গিয়ে বারলির পুরনো কৌটোটায় আছে। তোর বাবাকেও দে। জানিস, ও কোথায় আছে?"

জানতাম। একটা গাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে বসেছেন, উপরে উঠে আসার একটু আগে দেখেছিলাম। নেমে গিয়ে দেখি, তখনও তিনি সেইখানে। এক মনে কী শুনছেন, উপরের ডালপালার দিকে মাঝে মাঝে চাইছেন।

আমাকে দেখে ঠোঁট ছুঁচলো করে আস্তে একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন—আন্দাজে শব্দটা ওঁর ঠোঁটের ধরন থেকে পড়ে নিলাম—ঘুঘু। কিসের ডাক শুনছেন বুঝিয়ে দিলেন। আমার হাসি পেল। ঘুঘু?

হাত তুলে তখন আমাকে মারবার মতো করে একটা আদরের ভঙ্গি করলেন বাবা। "হাসছিস যে? দুষ্টু। ভিটেয় ঘুঘু চরে শুনেছিস, তাই হাসি পাচ্ছে বুঝি? মন দিয়ে শোন, তাহলে আর হাসি পাবে না। ভিটেয় হয়ত চরে, তবে আমি কখনও চরতে দেখিনি, জানি না, কিন্তু চরলেও ওর তো স্পষ্ট দুই রূপ? যখনই একা তখনই কী যন্ত্রণায় যে ডেকে চলে! শোন, শুনতে পাচ্ছিস, এখনও ডাকছে, ডেকে চলেছে—একটানা!"

ছাদ-টাদ ঘুরে অনেক পরে আবার নীচে যখন এলাম, তখন তোমাকেও দেখলাম নীচে। ওই লোকটা কিংবা অন্য কোনও পরিচারক-পরিজনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তোমার কিছু কথা হয়ে থাকবে,

দেখলাম, তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছ নীচের একটা ঘরে। পাশে একটা তক্তপোষ, বাবা পা ঝুলিয়ে সেখানে বসে।

তোমার মুখ থমথমে, কথা নেই। গুছিয়ে তুলছ, সাজিয়ে রাখছ, কিন্তু ঠিক যেন তোমার মনোমত হচ্ছে না, সাজাতে শুরু করছ ফের অন্যভাবে। বাবা নির্বিকার, বরং হাসছেন, তুমি এক-একটা কৌটো খুলে, ভিতরে কী সেটা গন্ধ শুঁকে পরখ করে তাকে তুলে রাখছ, বাবা বরং হাসছেন, আর তুমি ক্রমাগত কৌটো খুলে খুলে আর তার অন্ধকার ভিতরটা শুঁকে ক্রমাগত, তুমি, শুঁকে, বাবা হেসেই চলেছেন, হঠাৎ একটা কৌটোর কিনারায় কী ছিল, ধারালো টিনের কোনও টুকরো ছিল, তোমার আঙুলে লাগল, নাকি আঙুলটা বুঝি কেটেই গেল, কৌটোটা পড়ে গেছে হাত থেকে, ঠ—ন্! সেই শব্দের আমোদে বাবা হাসছেন, কিন্তু ইস, রক্ত! ইস, তুমি কেঁদে ফেলেছ। কেটেছে, কতটা, খুব বেশি? কিংবা কাটা-কাটা কিছু নয়, তুমি কাঁদতেই চাইছিলে, অসাবধানে কৌটোর ঢাকনা খুলতে যাওয়া ওটা ছুতো, তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ—কাঁদতে পারছ, অনেকক্ষণ গুমোটের পরে যেমন হঠাৎ বৃষ্টি ভেঙে পড়ে।

বাবা পা দুলিয়েই যাচ্ছেন খাটে বসে, তোমাকে কাঁদতে দেখে প্রথমে অবাক, খানিকটা চেয়ে থেকে কী বুঝে নিলেন। মাথা নেড়ে জ্ঞানী-জ্ঞানীভাবে বললেন, "নতুন বাসা হল নতুন জুতোর মতো। গোড়ায় একটু লাগে, পরে সয়ে যায়।"

নীচের ঘর, জানালায় জাল, কেমন চাপা-চাপা লাগছিল। সেদিন বোধহয় গরমও পড়েছিল খুব। উঠোনের ঝাঁঝরি দিয়ে তলাকার ভ্যাপসা পচা-পচা গন্ধ উঠে আসছিল। "আমরা এই ঘরেই থাকব বুঝি মা, এই নীচের ঘরে?"

"মন্দ কী", বাবা বলে উঠলেন "পাশের ঘরটাও খুলে দিয়েছে, আমি দেখে নিয়েছি। আমার তো খুব পছন্দ। নীচের ঘর, তাতে কী! ওখানে—ওখানে আমি নতুন সেই বিজনেসটা করব। বেবি

ফুড, শটি ফুড, তোমাকে একবার বলেছিলাম, মনে আছে? সেই যে ফরমুলাটা, যেটা আমি সেবার চিটাগং-এ আরাকানী লোকটার কাছে পেয়েছি। তোমাকেও তো শিখিয়ে দিয়েছিলাম একবার—সেই অনেক, অনেক বছর আগে। মনে নেই? আমার কিন্তু আছে। দেখো এইবার, ব্যাপারটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলব, এবার ফেলবই। আর এটা চললে ধরব সেই আর একটা ফর্মূলা, সেটাও শেখা আছে, শুধু হাতে কলমে করা হয়নি; আলাদা জিনিস অবিশ্যি সেটা, অন্য লাইনের জিনিস—স্কিন ডিজিজ-এর ওষুধ, নাম দেব "স্কিনোকিউরা", কেমন নাম? যে গাছড়া দিয়ে তৈরী হবে, সেটা কী আশ্চর্য জানো, এখানেই আছে, এই বাড়িতেই; গঙ্গার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে, আমি দেখে এসেছি। ভগবান নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন, নইলে এত জায়গা থাকতে এখানেই বা আমরা আসব কেন?"

বাবার চোখে স্বপ্ন জ্বলছিল। মাঝে মাঝে ওঁর গলা, বলার ধরন এত স্বাভাবিক লাগে! তখন মনের ভিতরকার চাপা মেঘগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কিংবা আশা ঝিলিক দেয় সেই মেঘে, ভয় নেই, আবার আমরা স্বাভাবিক হব, সুস্থ, নিজেদের উপর যাদের নির্ভর, বাবা সেরে উঠবেন, আর আমি, পাস-টাস করে, আমি সব ক'টা পরীক্ষা তরতর করে উতরে গিয়ে—তারপরে বলো তো মা, তারপরে কী!

"শটী ফুড, স্কিনোকিউরা। স্কিনোকিউরা-শটীফুড", বাবা কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলছেন, হাতের আয়না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেউ কেউ যেমন একই মোহিত মুখ দেখে, গুনগুন শটীফুড, গুনগুন স্কিনোকিউরা। জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ, সেই দৃষ্টি স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক? ধাঁধা লাগছিল, ঠিক যেন ধরতে পারছিলাম না।

বাবা বলছিলেন, "কোম্পানির নাম কী হবে বলো তো, এবার কোম্পানি হবে তোমার নামে। বিরাট করে লেখা সাইনবোর্ড—

অ্যানা প্রোডাক্টস। আন্নু নামটা একটু ইংরিজী ধাঁচে অ্যানা করে নেওয়া হবে। কেমন শোনাবে?"

সগর্বে তাকিয়ে আছেন বাবা, আমি এখন আর ওঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।

তুমি আস্তে আস্তে বললে, "ভালো। তবে আমার নাম আবার কেন? আমি তো অপয়া। বরং অন্য কোনও নাম ভাবো। সেই যে একবার কী নাম যেন দিয়েছিলে?

"মিম্।" বাবা বুকটা চিতিয়ে দিলেন। "মিসেলেনীয়াস ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোং—সংক্ষেপে মিম্। ইণ্ডিয়ান; স্বদেশী। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন—তখন যা করতাম তারই সঙ্গে একটা আদর্শ, বড় একটা আদর্শ, বড় একটা লক্ষ্য জড়ানো থাকত যে। তখনও সব এভাবে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েনি, আদর্শ ছাড়া কিছু হত না।"

এতক্ষণে বাবার বুঝি খেয়াল হল যে, ইতিহাসের যে অধ্যায়টার কথা বলছেন, তখনও আমি জন্মাইনি। আমার সুবিধার্থ, সুতরাং, ব্যাখ্যা করে করে বোঝাতে লাগলেন। "মিম্ ছিল কোম্পানির নাম —বুঝলি? আর ছিল কবরী-কল্যাণ, বিউটিবাম, মধু-সোডা, নবীন স্কোয়াশ, সব কবির নামে নাম, তুই দেখিসনি। তোর মা জানত, লোকের মুখে শুনেওছিল, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।"

"তখন করিনি।" তুমি বললে।

"এখন করো?" ওঁর মাথাটা তোমার মাথার কাছে নিয়ে গেছেন, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে তোমাকে বলছেন—"এখন করো?"

"করি।"—তোমার গলা কেঁপে গেল।

"ব্যস, তা-হলেই হবে।" বাবা সোৎসাহে বলে উঠলেন, "বিশ্বাসে সব হবে।" একটি শিশু যেন ওঁর গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তালি দিচ্ছিল। আমরা শুনছিলাম। আমরা দেখছিলাম। সেই শিশুটি খানিক পরে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার চোখ কড়িকাঠে। সে শ্রান্ত, শুধু অপলক; বুঝতে পারছিলাম সে স্বপ্ন দেখছে।

"একেবারে ভোলানাথ" ; তুমি আমার দিকে ফিরে বললে আস্তে আস্তে। সে-শব্দ বাবার কানে গেল। তক্তপোষেই কাৎ হয়ে ফিরে কনুইয়ে রাখলেন মাথা। বোঝা যায়, ওঁর দৃষ্টি এখন অনেক দূরে চলে গেছে—সামনে, না পিছনে ধরতে পারছিলাম না।

তারপর হঠাৎ উপুড় হয়ে কাঁপতে থাকলেন তিনি, যেন অসহ্য কোনও কষ্টে। সাঁতার জানেন না, কোনও রকমে উঠে যেন একটা কষ্টের পুকুরে পড়ে গেছেন, আসছেন অনেক হাবুডুবু খাওয়ার পরে, ভিজে শরীর, ভারী, জামাকাপড় শপশপে—সেই কষ্ট সামলে আবার মুখ ফেরালেন যখন, দেখলাম ওঁর চোখ দুটো লালচে।

"বিশ্বাস—বিশ্বাস", তিনি বলছিলেন ভাঙা ভাঙা স্বরে—"এই বিশ্বাসটা তখন যদি করতে আন্নু! হয়ত কিছু কিছু থেকে যেত, সব এভাবে ধসে যেত না, সবটাই নতুন করে গড়তে হত না। এখন কি কি আর পারব! কবে আমার ভাঙা শরীর আবার জোড়া লাগবে—এখন খুব দেরী হয়ে গেছে!"

"খুব দেরী হয়ে গেছে", বাবা বললেন আস্তে আস্তে। "আর পারব না।"

স্থির হয়ে দেখছি আমরা দুজনে। নীচের ওই ঘরটা, আজ তার যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি, যেন বিমূর্ত এক বিচারসভা ; কিন্তু কে অভিযোগকারী, কে অভিযুক্ত, সাক্ষীই বা কে? যেন পড়া হচ্ছে কারও জবানবন্দী, যেন কড়াকড়া জেরা করে কেউ তলব করছে কারও কৈফিয়ত—সেই দৃশ্যটি পুনর্নির্মাণ করতে বসে আজ এইসব দেখছি। অস্পষ্ট কোনও কাঠগড়াও যেন আছে, সেই কাঠগড়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না এমন অপরাধীর মূর্তি। মা! বলে দাও, সেই মূর্তি কার—আমার? তোমার?

ও-বাড়িতে বিজলী আলো ছিল, নীচের ঘরেও ছিল। মা, একটু পরেই তুমি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছিলে। এটা মানুষের

একটা সহজাত প্রবণতা, একটা স্বয়ংক্রিয়তা যা তার স্বভাবেরই অংশ—পরে নানাভাবে অনুভব করেছি। ভয় আর অন্ধকারকে আমরা এক করে দেখি। ভয় কাটাতে চাই যে, অন্ধকার দূরে সরে যাক, আলো জ্বালানোর অর্থ হল সেই আকূতি।

বৃষ্টি থেমে যাবার পরও যেমন পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ে, সেদিন তার পরেও ছোট ছোট ঘটনা ঘটছিল। উঠে বসে বাবা একবার হাত বাড়ালেন—"জল, এক গ্লাস।" ঠোঁট মুছে তাকালেন আমার দিকে। "খাতা কলম এনেছিস, এখানে আছে? দে তো।" চুপ করে বের করে দিলাম।

ক্রমশ বাবা সহজ হয়ে আসছেন। এই ছাখো খাতাটার উপরে ঝুঁকে পড়েছেন। তুমি দেখলে—সর্বাঙ্গে আড়ষ্ট—দাঁড়িয়ে। বাবা মুখ তুললেন। বাবা এখন হাসছেন। কী বলছেন বলো তো? বলছেন যে, "ভয় নেই। নতুন কোন পালা-টালা লিখতে বসেছি তাই ভাবছ বুঝি? দূর, তা আর হয় না! তারও খু-উ-ব দেরী হয়ে গেছে। সেদিন তুমি তো আমার লেখা টেখাতেও বিশ্বাস করনি, না? যদি করতে, তাহলে—কী হবে আর সেসব ভেবে, যাকগে। এখন আমি এই খাতাটায় অন্য একটু আঁকি-বুকি করি—ধরো নতুন যেসব দেশী শিল্পের কথা ভাবছি, তার স্কীম?"

"কিন্তু বেশী মাথা খাটালে যদি—তুমি এখনও খুব দুর্বল, ডাক্তার বলেছে বেশী চিন্তা করা মানা—"

"আঃ", কী প্রসন্ন সুখে, কী ক্ষমার রৌদ্রে ভরে গেছে বাবার মুখ—"তুমি খুব চালাক, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছ। ভাবছ, এটাও আমার খেয়াল, নতুন একটা পাগলামি, কেমন? বেশ তো, তাই নিয়েই না-হয় থাকি, থাকতে দাও না। একটা কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে? সবই কেড়ে নাও যদি, এই ছাখো আমি একা, আরও একা হয়ে পড়ছি, সবই কেড়ে নাও যদি, তবে কেন ওষুধ দাও রোজ? কেন দিচ্ছ বাঁচিয়ে রাখার যন্ত্রণা?"

ছ'হাতে কপাল টিপে বাবা আবার শুয়ে পড়েছেন, ছ'হাতে মুখ ঢেকে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছ। আমি দেখছি।

অনেক পরে, তখনও আমি দাঁড়িয়ে, টের পেলাম উনি আমাকে ডাকছেন। দুষ্টু দুষ্টু ধরনের হাতছানি। কাছে গেলাম। আমার মাথায় ওঁর হাত, ওঁর হাত আমার পিঠে। কয়েক বছর আগেকার সেই স্টেশনের রাতটা আবার ফিরে আসছে নাকি ? আমার অভ্যন্তরে শিহরণ, সম্মোহন, সব ঘটে যাচ্ছে।

"তোর মাকে আমি ঠিক কথাই বলেছি"—মিষ্টিমিষ্টি করে হাসছেন বাবা। "ও কষ্ট পেল, কিন্তু কী করব। আমার কষ্টটাকেও তো ভাগ করে দেওয়া চাই। এটা হল, পাশের লোকটার ওপরেও বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, লোকে বাধ্য হয়েই যা করে। ধর, তুই আর আমি এক সঙ্গে অনেক দূর যাচ্ছি, সব কটা স্যুটকেশ-বাক্স বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি একাই। তবু খানিক পরে, যদি না পারি, যদি বুকে লাগে, তাহলে তোর হাতেও আমি একটা স্যুটকেশ তুলে দিতে চাইব —চাইব না ? এ হল তাই।" বলতে বলতে বাবা আমার দু-হাত চেপে ধরলেন, "আর পারছি না। আমার কষ্টে-ভরা বাক্সগুলোর অন্তত একটা-দুটো তোরা তুলে নে।

তখনও তিনি বলে চলেছেন, গলা তো নয়, দূর থেকে ভেসে-আসা ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড়, আমি ব্যাকুল, আমি বিচলিত, বলছি "কেন বাবা, আপনার এত কষ্ট কেন ?"

"কষ্ট ? কেন ?" আমারই বাক্য থেকে বাবা শুধু দুটি শব্দ নুড়ির মতো কুড়িয়ে নিলেন, তখনই কোনও উত্তর দিলেন না। তারপর দম নিয়ে—"কষ্ট—কেন ? এই বয়সে তুই কি বুঝবি ? ধর, সকালে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলি, সারাদিন টো-টো করে ঘুরেছিস, কোথাও এতটুকু জিরোনো ছিল না, সন্ধ্যায় ফিরে এলি হয়রান হয়ে। দেখলি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিচ্ছিস; দরজা খুলছে না, অথচ তোর পা কাঁপছে মাথা ঘুরছে। এ হল গিয়ে সেই কষ্ট। কিংবা মাঝরাত্তিরে

কেউ ঠেলে দিয়েছে তোকে বাইরে, অন্ধকার, সব দিকে অন্ধকার, আকাশে একটা তারা নেই যে দিকের নিশানা পাবি, তুই সরে যাচ্ছিস, আরও সরে যাচ্ছিস—অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে; অথবা পায়ের নীচের মাটিই সরে সরে তোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরও দূরে—বুঝেছিস ?"

আমি পাতা ফেলছি না, ঘাড়ও নাড়ছি না।

"কষ্ট আরও আছে। যা করতে চাই তা করতে না পারা। যা বলতে চাই, বলতে না পারা, অথচ কত কী বলার আছে, ভেতরে ফুলে ফুলে উঠছে। নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার যন্ত্রণা, একটা পাহারাদার যেন ফাটকের মধ্যে আটকে ফেলেছে নিজেকে। চাবি খুঁজে পাচ্ছে না, বুট ঠুকে ঠুকে পাগলের মতো বাঁধানো শানটা ফাটিয়ে দিচ্ছে। হাসি-কান্না, কথা সব নিকাশ হয়ে যাবে, রোজ ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে ফেলার মতো, মানুষের মন তেমনই এক ঘর, নইলে সে সাফ থাকবে কিসে।" বাবা অস্থির হয়ে হাত নাড়তে থাকলেন—"অথচ আমি এসব কথা কিছুই বলতে-লিখতে পারছি না।"

"বেশ তো, লিখুন না।" আমি বলেছি "বাবা, সত্যিই আপনি আর কিছু লিখবেন না ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বাবা বুঝিয়ে দিলেন—না। বালিশে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন—"বলেছি তো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"কোনও দিন না ?"

"যদি লিখি তবে এই দেরি হওয়ার কথাটাই লিখব।" হঠাৎ দীপ্ত দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখ—"লিখব, বুঝেছিস ? লিখব! সেটা হবে আমার শেষ পালা। আমার শেষ পালাটা, ধর যদি এইরকম করে বাঁধি—বিয়ে করতে আসছে এক বর, তেপান্তর পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে—কিন্তু মাঝখানে এক পাহাড়; একবার একটা মরুভূমি, সে রাস্তা হারিয়ে ফেলল, চোখ জ্বলছে, চুল উড়ছে, মুখ শুকনো—শুনছিস ?"

নকল উত্তেজনার ভঙ্গি করে বললাম, "বাবা, তারপর ?"

"এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সামনে পড়ল এক নদী, তার বুকে ভীষণ ঢল, বড় বড় গাছ উপড়ে, পাথরের পর পাথরের চাঙর ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে স্রোত ছুটছে। সে থমকে দাঁড়াল। কী করে পেরোবে, ঘুরে যাবে ? এদিকে বেলা আর বেশী নেই। তখন যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, পারঘাটার এক বুড়ি, সে বলল, ভয় নেই, পাহাড়ী ঢল তো! এক্ষুনি নেমে গিয়ে সব খটখটে শুকনো হয়ে যাবে, একটু দাঁড়াও। হলও তাই। পার হল সে, কিন্তু বেলা আরও বয়ে গেল। তা ছাড়া ওপারে শুরু হল গভীর বন, সেখানে তখনই ছমছমে অন্ধকার, নানা দিকে নানা ডাকের কুহক, গর্জন, কলরব, রাস্তা চেনা যায় না, ঘোড়া যেন আর এগোয় না।"

"বাবা, বরটা পৌঁছতে পেরেছিল ?" যত ছেলেমানুষী গলায় আমি বলছিলাম তত ছেলেমানুষ আমি আর নই, শুধু ইচ্ছে করছিল খুব খোকা-খোকা হয়ে যেতে।

"পেরেছিল। কিন্তু তখন রাত্রি, নেহাৎ চাঁদ উঠেছিল তাই সে কোনরকমে পূব-পশ্চিম ঠিক করে ধরে বেরিয়ে এল।"

"তার মানে সে জানত কোন্‌দিকে তাকে যেতে হবে ?"

"জানত।" হঠাৎ খুশী হয়ে বাবা বিরাট করে পিঠ চাপড়ে দিলেন আমার। "ঠিক পয়েনটটা ধরেছিস। পথ হারায়, হারাক, তাতে কী এসে-যায় ; কোন্ দিকে যেতে হবে, সেটা যদি জানা থাকে ? সেটাই আসল কথা ; সেটাই জানা থাকা দরকার।"

বাকীটা বাবা শেষ করলেন এইভাবে : "শেষ পর্যন্ত পৌঁছল সে, কিন্তু অনেক রাত, লগ্ন পেরিয়ে গেছে, বিয়ে বাড়িতে আলো জ্বলছে না। ওর ঘোড়াটা সওয়ার নামিয়ে দিয়ে ধুঁকছে, মুখে গাঁজলা। আর তার কনে—"

"তার কনে, বাবা, তার কনে ?" যতটা পারি ততটাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বললাম, "কী হল সেই কনের ?"

"বর শুনল, অনেক ডাকাত হামলে পড়ে তাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেছে।"

"এই পালা ?"

"আপাতত এই। এই পর্যন্ত ভেবেছি।" বলে বাবা একটু অপেক্ষা করলেন "কষ্ট হচ্ছে ?"

এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "আর নেই ?"

"কী থাকবে আর ? লগ্ন পেরিয়ে যাবার পালা যে, বেলা বয়ে যাবার পালা। শেষ পর্যন্ত বর যদি-বা পৌঁছয়, কনে বসে থাকে না। বুঝতে পেরেছিস ? লিখব হয়ত এটা, আমার শেষ পালাটা"—সংকল্প বাক্যটা উচ্চারণ করেই বাবা কিন্তু ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, কাঁপতে থাকলেন থরথর করে, "কিন্তু লিখব যে, কে পড়বে ? এটাতে রূপকথার গন্ধ যে। একালে রূপ-কথা কেউ পড়ে না।"

"তবু লিখবেন।" একী ? আমি কি আদেশ করছি ? আদেশ, না আমি সান্ত্বনা দিচ্ছি তাঁকে ?

"লিখব" বাবা সম্মতি দিলেন, কিন্তু প্রগাঢ় ক্লান্তি তাঁর স্বরে। "লিখব। কিন্তু যদি শেষ করতে না পারি, তবে তুই শেষ করে দিস, দিবি তো ? তুই—তুই ইচ্ছে হলে অবিশ্যি আর-একটু বাড়িয়েও দিতে পারিস, টেনে নিয়ে যাস আরও খানিক দূর। ওখানে দাঁড়িয়েই সেই বর মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা নেবে, ঘোড়াকে ফের তেজী করে তুলবে দাবড়ে দাবড়ে। তারপর কনেকে নিয়ে যারা পালিয়েছে পিছু নিয়ে তাদের ধরে ফেলবে পারঘাটায়। তারপর—তুই তো বুঝতেই পারছিস কী হবে তারপর। সেটা অবিশ্যি অন্য গল্প হবে। লিখবি ?"

লিখব বলেছি কি বলিনি মনে পড়ছে না আজ কিছুই।

পঁচিশ

তোমাকে খুঁজে পেলাম ছাদে।

(শহরের এই ছাদগুলো অদ্ভুত এক বিস্ময়, নয় ? একতলাগুলো যেখানে ছোট মাপে শ্বাস নেয়, চক্রান্তের মতো চাপা গলায় কথা বলে, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে যত প্রকারের নোংরামিতে, সেখানে এই ছাদগুলো হঠাৎ বিরাট, অবাধ অকপট, হা-হা করে হাসে, বড় বড় চোখ মেলে আকাশের মায়া ছ্যাখে, মনে-মুখেও মাখে ; দিগন্তকে তুলে ধরে খানিক উপরে। সব ছাদেই কিছু-না-কিছু কল্পনার বিস্তার, অল্প-অল্প শিশিরে ভেজা স্বপ্ন।)

ছাদের উপরে একটাই মোটে ঘর, আকারে চিলেকোঠার চেয়ে বড়, কিন্তু তখন জানালা-টানালা সব বন্ধ, দরজাতেও তালা। সেই দরজার সামনে সতৃষ্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তুমি কারনিশের কাছে ছিলে। আস্তে আস্তে সরে এসে আমার পাশে দাঁড়ালে।—"কী দেখছিস ?"

"এই ঘরটা, মা।"

ওই একটা কথাতেই আমার মনের ভাব যদি না বুঝে ফেলবে তবে আর মাকে 'মা' বলেছে কেন।—"এই ঘরে থাকতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ?"—হেসে বললে "বসতে পেলে শুতে চায় !"

"সে-কথা নয়। এখানে থাকলে, খুব নিরিবিলি তো। পড়া-শুনোয় সুবিধে। পরীক্ষার কতই বা বাকী আর।"

"ঘরে তো তালা দেখছি। জানি না কে থাকে। দেখি, মাসিমা এলে বলব।"

"শুনেছি, কে এক দাদাবাবু থাকে। ওরা বলছিল।"

"দাদাবাবু?" তুমি একটু ভাবলে।—"তার মানে তবে নিশ্চয় মাসিমার সেই নাতি। শুনেছি ওর ঠাকুরমার সঙ্গে সে-ও ত্রিবেণী গেছে। সে যদি থাকে, তাহলে তো—তাহলে—" বুঝতে পারছি, ঘরটা পাব না সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে মা হিসাবে তোমার কষ্ট হচ্ছিল। "দেখি, মাসিমা আসুন তো।" শেষ পর্যন্ত এই বলে তুমি উপসংহার টানলে।

এদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি কম, দূরে দূরে কালো কালো ওগুলো কী, কলের চিমনি, আর গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গা, ছাখো, চল্‌কে চল্‌কে উঠছে। বোধহয় জোয়ার, তাই মনে হল নদী খুব কাছে এসে পড়েছে, এখন আছে বাগানের ঠিক নীচে ; ঠিক যেন অন্ধকারে একটা জন্তু জঙ্গলের ঝোপের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তার বড় বড় করে শ্বাস টানার শব্দ শুনছি।

গা শিরশির করে উঠল, পলকে ওই পরিবেশটাই হয়ে গেল কেমন প্রতিকূল, এই তো ছিল ছাদটা খোলামেলা, এই ছাখো, হঠাৎ সেখানে যেন অদৃশ্য শক্তির সমাবেশ অনুভব করছি—তাড়াতাড়ি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমার কাঁধে হাত রেখে তুমি বললে, "এই সাহস নিয়ে তুই ছাদের ঘরে একলা থাকবি ভেবেছিলি?" আদর করে, অথবা ঠাট্টা-ছলে আমার গালে একটা টোকা দিলে। লজ্জাটা কাটাতে, তাছাড়া যেহেতু আর সেই বয়স নেই যখন সব লজ্জা ঢাকতে তোমার বুকে মুখ লুকোতে পারি,

> (আদম আর ইভের মধ্যে সঙ্কোচের আমদানি যে করেছিল, তার নাম না-হয় শয়তান, কিন্তু মা আর ছেলের অবাধ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেও সঙ্কোচ যে ডেকে আনে তার নাম কী। সেই শয়তানটার কথা কোনও পুরাণ কিংবা কিংবদন্তী লেখেনি)

সেই হেতু আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "গঙ্গাকে তো খুব খুব পবিত্র বলো? গঙ্গাও কিন্তু বেশ হিংস্রুটে মা, বেশ রাগী। খুব ধার আছে ওর নখে, পাড়ের পর পাড় আঁচড়ে চিড় খাইয়ে দেয়, ধসিয়েও ফেলে; আমি দেখেছি।"

নিঃশব্দে যে-নদী হঠাৎ জোয়ারে বাগানের ঠিক নীচে এসে ঘন ঘন শ্বাস নেয়, তার বিরুদ্ধে আমি আর নালিশই বা জানাতে পারতাম কি?

"ঠিক আছে। এখন তো তুই নীচেই থাকছিস। পরে যা হয় দেখা যাবে।" একটু থামলে।—"তোর বাবার কিন্তু নীচের ঘরটাই খুব পছন্দ।" থামলে আবার। তারপর, মা, একী, তোমারও গলা কাঁপছে কেন, তুমিও কেন হঠাৎ বলে উঠেছ "আমারও ভয় করছে রে। অন্য একটা ভয়।"

কিসের ভয়? এবার তুমিই শক্ত করে চেপে ধরেছ আমার হাত —"তুই টের পাসনি? একটুও বুঝতে পারিসনি? শুনছিলি, এখানে আসার পর তোর বাবা যেন কেমন করে কথা বলছিলেন?"

"বরাবরই তো বলেন।"

"বলেন, কিন্তু এ তার থেকে আলাদা।"

"কেন, উনি অনেক কথা যা বলেছেন, তা তো খুব স্বাভাবিক। বরং নতুন করে ব্যবসা-ট্যবসা শুরু করার কথা বলছিলেন—"

"আমার ভয় তো সেই জন্যেই। ওকে আমি যে তোর জন্মের অনেক—অনেক আগে থেকে চিনি। ছাখ, সেই থেকে আমার কেমন যেন লাগছে। যে দিকেই হোক, ও আবার বদলে যাচ্ছে। হয় একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাবে, নয় তো হিসেবের বাইরে চলে যাবে একেবারে। ওকে—ওকে আমরা আর ধরে রাখতে পারব না।"

"আবার বেরিয়ে চলে যাবেন, তাই কি ভাবছ মা?"

তুমি হাসলে।—"চলে যাওয়া অনেক রকমের হতে পারে···যাই

বলিস আমার ভালো ঠেকছে না। কী-যেন চাপা দিতে চাইছে ও; একটা কষ্ট প্রাণপণে চাপছে।"

"কিসের কষ্ট, মা।"

"বুঝতে পারিসনি? ও যে সংসার চালাতে পারল না, সেই কষ্ট। এখানে এসে যে উঠতে হল, সেই কষ্ট। পরগাছা হতে হল আমাদের, নিজেও হয়ে গেল। বুঝছিস না? আজ তো আমরা পরগাছাই!"

মা, যা বলছ, আস্তে আস্তে বলো। এই খোলা আকাশে লক্ষ কোটি কৌতূহলী চোখ নীচু হয়ে চেয়ে আছে, দেখছ না? ওদের মধ্যে যেগুলো কিছু টের পেলেই মিটমিট করে ওঠে, অথবা দপদপ করে উত্তেজনায়, তাদের আমি বিশেষ পরোয়া করি না। কিন্তু স্থির হয়ে যারা ছাখে, দেখেও স্থির থাকে? মা, সেই তারারা বড় শয়তান আর সেয়ানা। ব্যক্ত হবে তো হও, তোমার ভয়টাকে বানান করে উচ্চারণ করো; কিন্তু ধীরে ধীরে; জনান্তিকে: ওদের বুঝতে দিও না।

"ওর মনে", তুমি বলছিলে, "ওর মনেও একটা কাঁটা ফুটে গেছে। সেই কাঁটাটা উপড়ে ফেলতে চাইছে। নইলে এতদিন পরে ওইসব পুরনো ব্যবসা-ট্যাবসার কথা ফেঁদে বসার অর্থ কী? আসলে আমরা যে আশ্রিত, আমরা যে অন্নদাস, সেটা জোর করে ভুলতে চাইছে। নিজেকে ভোলাচ্ছে।"

বুঝেছি মা, এখন একটু থামো। আশ্রিত আর অন্নদাস—শব্দ দুটোকে কাটা ঘায়ে নুনের মতো দিতে হবে না ছড়িয়ে। কোন্ লজ্জা বাবার, কীভাবে চাইছেন তাকে ঢাকতে, আমি উপলব্ধি করেছি। বে-আবরু কোনও মেয়ে কারও চোখে পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দু'চোখ ঢেকেছে, ভাবছে, কেউ আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাড়া-খাওয়া খরগোস দৌড়ে মুখ লুকিয়েছে ঝোপে। বাবা অতীতের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়ে বসে আছেন। স্বপ্নে বিভোর, যে-স্বপ্নটা ছলনা।

"ওঁর চোখ কথা বলতে কেমন হয়ে যাচ্ছিল, দেখেছিলি? ওই

দৃষ্টি আমি চিনি। একটুও ভালো ঠেকছে না। মন বলছে, একটা কিছু ঘটে যাবে।"

কেউ না কেউ আমাদের কথা শুনছিল নিশ্চয়ই ; নজর রাখছিল। নইলে বাগানের আমের গাছে এত বোল্, নিশ্চয়ই ঝিম্‌ঝিমে গন্ধ ছড়াত ; ডালগুলো দোল দিয়ে দিয়ে শিরশিরে হাওয়া বিলোতো, বিশেষ করে এতে কাছেই যখন নদী! একটু আগে চোরা জোয়ার এসেছিল না? সেই নদীও কি এই মুহূর্তে নিদ্রিত। নিদ্রিত অথবা জাগরিত, দুই নদীই বড় ভীষণ হয়।

ওই ছাদেও বিশ্রী গুমোট লাগছিল। উপরে আকাশজোড়া তারা, কিন্তু কোণে কোণে বিদ্যুতের ইসারা পাচ্ছিলাম। কোনও একটা ভয়ংকর সংকেত, যার শুধু ঝলসানি দেখছি, কিন্তু পড়তে পারছি না। যখন এইসব দেখা দিতে থাকে, তখন একটানা রোমাঞ্চ ঘটে চলে অনুভবে ; এই রাতের অন্ধকারে আর কী গুপ্ত আছে, আর কী-কী ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে তার পেট চিরে চিরে—আতঙ্কিত আমি ভাবছিলাম। ঝড়বৃষ্টি? দূর, শুধু ঝড়বৃষ্টিতে ভয় কী। আরও কিছু যা উড়িয়ে নিয়ে যায়, উপড়ে ফেলে, সেই সব সর্বনাশের কল্পনায় একদিন কাঠ হয়ে ছিলাম।

একটি ভয় আর-একটি ভয়ের উপরে ভর করে সাহস সন্ধান করছিল।

"চল্ যাই" তোমাকে বলতে শুনলাম। সাধারণ কথা, তবু শিউরে উঠেছিলাম অকারণেই, মনে আছে ফিসফিস করে বলেছি "কোথায়?" আমরা দু'জনেই ফিসফিস করে কথা বলছি, কণ্ঠনালীতে কোথায় একটা অদৃশ্য রন্ধ্র—সব কথা মুখে ওঠার আগে সেখান দিয়ে বাতাস হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"এখান থেকে। যেখানে হয়। এখানে আর না।" মা, তোমার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য সমুদয় উচ্চারিত হয়েও ফুরিয়ে যায়নি তবে, এতদিনেও না? কোথায় ছিল তবে এরা এতকাল, ভাসছিল

বুঝি তরঙ্গিত সময়ের অপার ইথারে? অথবা মুদ্রিত ছিল অলৌকিক কোনও শব্দধর যন্ত্রে, এই আবহমান জগতে প্রত্যেকটি ধ্বনি তাই থাকে, মুদ্রিত কিংবা সঞ্চিত, লয় হয় না, মাঝে মাঝে অলস-অসহায় কোনও কোনও ক্ষণে পুরনো রেকর্ডের মতো তাদের বাজিয়ে শুনি।

"এখানে আর না," তুমি বলছিলে "এখানে যা হবার তা তো হয়ে গেল। তবে আর থাকব কেন?"

(বড় কঠিন প্রশ্ন মা, এই "কেন।" সব হয়ে যাবার পরেও আসরের ফরাসে, ধুলোয়, নিবুনিবু বেলোয়াড়ি কাচের ঝাড়ের দিকে চেয়েও আমরা ঢুলতে থাকি কেন। কেন তোমার জিজ্ঞাসায় সেদিন চমকে আমি ভাবছিলাম, সত্যিই তো—কেন। এই শহরে আমরা আর পড়ে থাকব কেন, তুমি কি তাই বলতে চাইছ? গ্রাম থেকে যারা এখানে আসে, দর্শনীয় সব কিছু দ্যাখে, যথা যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, মনু-মেন্ট, গঙ্গাস্নান, সবই যখন সারা, তখন? তারপর? তারপরও পড়ে থাকার অর্থ শুধু ধরমশালার খরচ টানা, শুধুই পুনরাবৃত্তি, একই কারবনের কপির পর কপি? যত পরের কপি, তত তাদের রঙ ফিকে হয়ে আসে, অক্ষরগুলো আর চেনা যায় না।)

"আমাকে নিয়ে যাবি, পারবি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?"—তোমার কথাগুলো প্রার্থনার মতো শোনা যাচ্ছিল।

কোথায় ফেরার কথা বলছ, তার নাম যেন পড়তে পারছিলাম তোমার চোখের তারায়। তাই জিজ্ঞাসা করে নেওয়ার আর দরকার হয়নি।

"আমরা ফিরে যাই চল।" বুঝেছিলাম তুমি ফিরে যেতে চাইছ সেখানে, আমাদের সেই আধা-শহর আধা-গ্রামের বাড়িতে। সেই দীঘি, মাঠ, গাছের সবুজ শুধু এই সবের টানে নয়—অন্য কোনও অন্ধ

আকর্ষণ। যেখানে অনেক শোক, অনেক স্মৃতি আমরা রেখে এসেছি। তাদের হাত ছাড়িয়ে একদিন ট্রেনে চেপে ছিটকে এসেছিলাম বাইরে। হয়ত উপায় ছিল না বলে। হয়ত-বা এও ভেবেছিলাম, তাদের অস্বীকার করে আমরা নতুন স্থানে নতুন জীবন পাব।

লোকে যখন পুরনোকে ছাড়ে, সেইসব শোক আর স্মৃতি কি আহত, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে? পরিত্যক্ত হলেও মরে না, অপেক্ষা করে থাকে, যার যেথা স্থানে? যারা গেল, তারা ফিরবেই একদিন-না-একদিন—এই আশায়? আমরা তাই ভাবি বটে। ভাবি সব সেই থেকে একঠায় রয়ে গেছে, যেখানে যে যেমনটি ছিল; সেই খেজুরের গুঁড়ি পাতা পুকুরের ঘাটলা, যেখানে তুমি একদিন পিছলে পড়েছিলে—রক্তমাখা, মূর্ছিত, আমাকে কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বলো তো? বড়ঘরের বারান্দায় চালের নীচে বাবুই পাখীর বাসা—সেটা কি সেই রকমই আছে? পেয়ারা গাছের পাতার অন্ধকারে রাতবিরেতে বাদুড়গুলো কি তেমনই ডানা ঝাপটায়? আর সদর রাস্তায় ডাকাতের মতো ঝাঁকড়া-চুল অশ্বত্থ গাছটা, যেটা দিনের বেলা যেন পাগড়ি পরা পাহারাদার, আর রাত হলে, বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষে, তার ডালপালা থেকে নামিয়ে দেয় ছমছম ভয়, এখনও কি সেটা তেমনই জমকালো আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? মানুষই যদি নেই, তবে কাকে সে ভয় দেখায়? সেই কাঁচা রাস্তাটা, সেই—মা, পর পর সব মনে পড়ছে। ওরা আছে, শুধু তোমার নয়, আমারও বুকের ভিতরে চাপ-চাপ রক্তের মতো জমে আছে। যাদের ছেড়ে আসি, তারা এইভাবে শোধ নেয়। থেকে থেকে ডাকে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর টানে। যখনই ওরা টের পায়, পলাতকেরা অন্যত্র গিয়ে সুবিধে করতে পারেনি, তখনই পরিত্যক্ত স্মৃতিস্তূপ প্রবল, প্রাণবান, মূর্ত। আমরাও সাড়া দিতে চাই তার ডাকে, ক্ষীণ স্বরে বলি, "যাচ্ছি।" যেমন তুমি সেদিন বলেছ। যেতে চেয়েছ। কারণ তুমি অনুভব করেছিলে এই শহরটা আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে, সব কিছু;

ভিতরের বাইরের। সর্বস্বান্ত হবার আগে তাই তুমি যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু সেখানে ফিরে গিয়ে গচ্ছিত রাখতে চাও।

আমিও, মা, যখনই আঘাত পাই এখানে ওখানে, তখনই প্রত্যাবৃত্ত হতে চাই। কোথায়? অনেক দিন, আমাদের ছেড়ে-আসা সেই না-শহর না-গ্রামটি তার প্রতীক হয়েছিল। যখনই আমার স্বভাবের শামুকটা গুটিয়ে গিয়েছে ভিতরে, তখনই সে তার বর্জিত শৈশব-কৈশোরকে সেখানে সগৌরবে সংস্থিত দেখেছে। মন্দিরের নিভৃত গর্ভগৃহে দেবীপ্রতিমার মহিমা নিয়ে অধিষ্ঠিতা অতীত, কখনও-বা তিনি আবার স্বপ্নেও আবির্ভূতা হন।

"নিয়ে যাবি?" তুমি হয়ত বলেছিলে একবার, আমার কি শ্রুতিভ্রম ঘটেছিল? আমি কি সেদিন ওই একটা অনুরোধকে চক্রাকারে বারবার ফিরে আসতে দেখলাম?

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে"—রাত্রি গভীর হলেই আমার ওই ছড়াটার কথা মনে পড়ে। মীন কারা? ছোট ছোট শব্দরা। দুপুরে, বিকেলে তারা মিলিয়ে থাকে অগাধ সলিলে, কিন্তু জেগে ওঠে সন্ধ্যার পরে; ক্রমশ, যত রাত বাড়ে। আশ্চর্য নয় কি, ওরা জেগে থাকে, কেউ কেউ সিপাই-শান্ত্রীর মতো দাপটে পা ফেলে ফেলে চলে, আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি! যেদিন আমরাও জাগি, সেদিন ওই শব্দরা আর আমরা, ক্রমাগত দেওয়া-নেওয়া নেওয়া-দেওয়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শেষ রাত আর সকাল অবশেষে আমাদের নির্জীব দেহগুলি দখল করে নেয়।

ওই বাড়িতে প্রথম রাত্রিটি ভুলতে পারছি না বলেই এত কথা লিখলাম। বাবা আর আমি একটা ঘরে, তুমি অন্য ঘরে। কখন এসে শুয়ে পড়েছ, টের পাইনি।

আরও খানিক পরে, বাবা যখন শোবেন, তখন দরজায় একটা টোকা, কার যেন গলা খাঁকারি—"প্রণববাবু ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?"

অবিনাশের গলা। লোকটা অপেক্ষা না করেই ভিতরে এল—"দেশলাই আছে, দেশলাই ?" বাবার দিকে তাকিয়ে কেমন স্বরে যেন বলল। বাবা বললেন "আছে।" ওর হাতে বাক্সটা দিলেন। লোকটা হাতের পাতা আড়াল করে একটা কাঠি জ্বালল, সেটা নিবে গেল, সে জ্বালল আবার, আবার কাঠিটা নিবল। "থুঃ", জানালার কাছে গিয়ে থুথু ফেলে অবিনাশ বলল "বিড়িটা ধরতে চাইছে না। নিবে নিবে যাচ্ছে।" শুয়ে শুয়েই কাঠির আলোয় জ্বলজ্বলে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি। কোনও মতলব কি আঁকা সেই চোখে, গূঢ় কোনও ফন্দী ? বুঝতে পারছি না। ভালো লাগছে না। ছটফট করছি। ধরাতে পেরে লোকটা বিড়িতে একটা লম্বা টান দিল, তারপর আগের মতোই অন্তরঙ্গ ঢঙয়ে বাবার দিকে একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল "চলবে নাকি ?" আমার অদ্ভুত লাগছিল, আমি ঘামছিলাম। সমস্ত রোমকূপ যখন চোখ হয়ে ফুটে উঠতে চায়, তখন তাদের সব কান্না কুলুকুলু ঘাম হয়ে যায়।

"চলবে নাকি ?" সে বলল আবার, বাবাকে ছুঁয়ে প্রায় আলগোছে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "নিন না মশাই, একটা। কাশি হবে না। এর নাম হল গিয়ে মেনকা বিড়ি।" বাবা কী বললেন শুনতে পেলাম না, অথচ দেখলাম কিছু না বলে তিনি বিড়িটা নিচ্ছেন। নিচ্ছেন, উনি নিয়েছেন। আমি ঘামছি। চাদর ভিজে যাচ্ছে। অবিনাশ বলল, "রেখে দিন আরও দু'তিনটে, রাত্রে যদি লাগে ?" বলে সে বিছানায় আরও বিড়ি ছুঁড়ে দিল, আমি ঘামছি, মা, বাবা দেখতে পাননি, আমি চোখও মুছছি, অবিনাশ বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘর, চারধারের যত শব্দ, সব বিকট রব তুলে আমাদের আক্রমণ করল, তার কোন্‌টা ঝিঁঝিঁ, কোন্‌টা কর্কশ কোনও রাতজাগা পাখি, আমি জানি না, কিন্তু একটা স্বর চিনি—কুকুরের। হঠাৎ মাথায়

কী রোখ চাপল, ছুটে গেলাম বাইরে, কুকুরটাকে তাড়া করে বাগান অবধি দিলাম তাড়িয়ে। ফিরে এলাম। বাবা তখনও বসে, দুটি হাত চোখের সামনে মেলে, শূন্য করতল। আমাকে দেখে তিনি আস্তে বললেন "এক গ্লাস জল।" দিলাম। খেলেন। ওঁর ভঙ্গি ভাঙা-ভাঙা, ভেঙে-পড়া, চোখ চকচকে, তবে জলে নয়। তেমনই ক্লান্ত স্বরে বললেন "কোথায় গিয়েছিলি ?"

"কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম, বাবা। বিশ্রী ডাকছিল।"

"তাই তাড়িয়ে দিয়ে এলি ?"—বাবা মাথা নেড়ে নেড়ে ফের বললেন, "আর তাড়াসনি।"

অবাক হয়ে চেয়ে আছি, তাই আবছা আলোয় দেখা গেল, বাবা অল্প হাসলেন। নিষ্প্রভ হলদে আলোর সঙ্গে সেই হাসি মিশে গেল।—"কেন মানা করছি ? কুকুরটাকে বাইরে থেকে দেখি নোংরা, কিন্তু সব তো আমরা জানি না। ওরা হল রাতের পাহারা। কিংবা বিবেক। বিবেক বলে একটা জিনিস আছে জানিস তো ? রাত্রির জাগ্রত আত্মাই হয়ত ওর কণ্ঠে কণ্ঠ পেয়ে আর্তনাদ করে।"

এসব অর্থহীন কথা, মা, আমি বুঝতে পারছিলাম, অন্য কোনও আর্তনাদ চাপা দেওয়ার কঠিন চেষ্টা। বিছানার উপরে তখনও ছড়ানো দু'তিনটে বিড়ি।

"বাবা", আমি ফিসফিস করে বললাম, "ওই লোকটার কাছে কিন্তু দেশলাই ছিল, আমি টের পেয়েছি। ও যখন চলে যাচ্ছে তখন পকেটে হাত ঠেকতে বাক্সটা বেজে উঠেছিল।"

"আমি জানি", প্রশান্ত মুখে বাবা বললেন, "আমি জানি। ও ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করে গেল। বুঝিয়ে দিল ও আর আমি দু'জনে সমান-সমান। এ বাড়ির চাকর দু'জনেই।"

সেই স্তরহীন তরঙ্গহীন স্বর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "কিন্তু বাবা, কাল কি পরশু তো দিদিমা এসে পড়বেন। তিনি এসে পড়লেই—"

বাবা খুব অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠলেন।—"হ্যাঁ, তাহলে একটা বিহিত হবে বটে। ঠিক বলেছিস। প্রোমোশন পাব—চাকর থেকে ঘরজামাই।"

ঝুঁকে পড়ে আমার গাল টিপে দিলেন তিনি, আর তেমনই জোরে হাসতে থাকলেন।

কতক্ষণ পরে ঘরে ঢুকেছিলে তুমি, তখনই ওই হাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়ে, না আরও অনেক পরে? চোখ ফোলাফোলা, এদিক-ওদিক চাইছিলে। বসা-বসা গলায় বললে, "কী ব্যাপার?"

বাবা আর হাসছিলেন না, কিন্তু হাল্কাভাবের রেশটা তখনও ধরে রাখতে চাইছিলেন। ভীষণ কোনও ব্যথাকে ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে দেওয়ার ওই ব্যাপারটাকে আমি এখন বুঝি, ফুঁ দিয়ে দিয়েই বলতে কী, আমিও তো এখন বেঁচে আছি, বাবা বলছিলেন, "কী আবার, আর-একটু পরে এলে আমাকে আর পেতে না।"

"ও আবার কী রকম কথা?"

"আবার বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তাম আর কী। তুমি তখনও ঘুমোতে থাকবে। বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব কেন গৃহত্যাগ করেছিলেন, জানো? আসল কারণটা আমি বুঝেছি। মানুষ যখন ঘুমোতে পারে না, ছটফট করে, প্রহরের পর কাটে প্রহর, তখন যদি দ্যাখে, তার আশে-পাশের যারা, বিশেষত তার স্ত্রী, নিশ্চিন্ত ঘুমে অচেতন, তখন সংসারকে মনে হয় বড় উদাসীন, তুমি কার, কে তোমার, পরিবার-পরিজন স্বার্থপর, বুদ্ধদেব আর শ্রীচৈতন্য তাই—"

গম্ভীর মুখে তুমি বললে "থামো। তুমি বুদ্ধও নও, চৈতন্যও নও।"

এতক্ষণে বাবার মুখে ছায়া পড়ল, হাসিহাসি মুখের উপরে আঁকা হয়ে গেল যন্ত্রণা। একটি শ্বাস চেপে তিনি বললেন, "জানি। আমি কেউ না। কিছু না।"

নিজের অন্যায়টা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছ তুমি।—"ছিঃ, ভেঙে পড়লে চলে না।" আমাকে দেখিয়ে বললে "ও তো আছে। ভাগ্যে থাকলে ও দাঁড়াবে। আসবার সময় বাড়িওয়ালাকে বড় মুখ করে বলে এসেছি যে, আমরা পালাচ্ছি না। আমার ছেলে মানুষ হবে, আপনার পাওনা প্রতিটি পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবে।" বলতে বলতে তুমি আমার মাথায় হাত রাখলে—"কী রে, দিতে পারবি না?"

কোনরকমে বললাম "পারব।" একটি জাগতিক বিষয়ে বস্তুত অনভিজ্ঞ, অপরিণত বয়সী ছেলেটি তখনও নিশ্চয়ই বোকা ছিল, নইলে ঠিক ওই মুহূর্তে কথার পিঠে কথা দিয়ে সে বড়াই করত না। আর, আমার বিশ্বাসী মা, তুমি বাবার দিকে ফিরে তখন গাঢ় স্বরে বললে "ভগবানকে ডাকো। সব নিশ্চয়ই আবার ঠিক হয়ে যাবে। পরীক্ষার ফল ভালো হবে, ভালো হয়ে যাবে তোমার শরীরও। ভগবানকে ডাকো।"

"ডাকব না।"—চমকে দিয়ে স্পষ্ট গলায় বাবা বলে উঠলেন "ডাকব না।"

"বিশ্বাস করো না?" তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলে তুমি, "এখনও না?"

"করি", বাবা বলছেন ধীরে ধীরে, জানালার বাইরে পড়েছে জ্যোৎস্না, সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে "করি। করি বলেই তো ডাকব না।"

"সেই হেঁয়ালি?"—তুমি বললে বিদ্রুপের সুরে।

"হেঁয়ালি নয়, হেঁয়ালি নয়," বাবা অস্থির গলায় বলে গেলেন "তুমি বুঝতে পারছ না? আমাদের খুব ছোট ছোট দরকারে তাঁকে ডাকি কিনা, তাঁকে কাজে লাগাতে চাই, তাই বৃহৎ কিছুর বেলায় আর পাই না। কত সামান্য ব্যাপারেও তাঁকে স্মরণ করি, ভাবো তো। বাড়ি ফেরার পথে মানুষ যদি মেঘ ছ্যাখে, প্রার্থনা করে 'হে ঈশ্বর! আধঘণ্টার মধ্যে যেন বৃষ্টি না নামে। যেন আমি যে গাড়িতে চড়েছি সেটার অ্যাকসিডেন্ট না হয়। যেন ছেলেটি ভালভাবে পাশ করে।

যেন চাকরি না যায়',— কত আর নমুনা দেব। মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থে আর খুচরো কারণে অহরহ তাঁর সাহায্য চায় বলে ঠকে; অন্তত আমি চেয়েছি আমি ঠকেছি।"

"অন্তত আমি চেয়েছি" এই আত্মধিক্কারের পরে বাবা তাঁর আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠকে মুক্ত করতেই বুঝি থামলেন, তবু কষ্টে বিকৃত হয়ে গেল তাঁর স্বর "চেয়েছি বলেই তো যেখানে সত্যিকার দরকার ছিল, সেখানে না পেলাম তাঁর কৃপা, না করুণা। সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছিলাম, দেশের মুক্তির জন্যে আন্দোলনে। সেখানে পিছিয়ে পড়লাম, সরে এলাম। আর লেখা? সেখানে আরও কঠিন শাস্তি দিলেন তিনি—কই, আমাকে দিয়ে তাঁর উপযুক্ত কিছুই তো লিখিয়ে নিলেন না! ভাবলাম, তোমাদের নিয়ে একটি মায়ার সংসার তৈরী করব শেষের কদিনের জন্যে—তা সেই স্বপ্নও আমার শরীর আর স্বাস্থ্যের সঙ্গে ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন।"

কোনও কথা বলছিলাম না আমরা, তখন কথা বলছিল না কেউ, রাত্রির যত বিচিত্র প্রগল্‌ভ কলরব, এক সুবিশাল দহে ডুবে গিয়েছিল।

"তাঁর দয়া লাগে গভীর শোক মুছে ফেলতে; তুমি পেয়েছ কিনা জানি না। তাঁর দয়া লাগে বিপুল কোনও প্রাপ্তিতেও, অপার কোনও আশার পূরণে। আমি পাইনি।"

বাবা বলছিলেন এক প্রত্যয়াদিষ্ট কণ্ঠস্বরে "স্তব, মন্ত্র, জপ আমরা ভাবি এসব করি আর পড়ি তাঁর জন্যে। আসলে আমাদের প্রয়োজনে—আমরা মুক্ত হব বলে। তাঁর তো এ সবের কিছুতে দরকার নেই। জীবন যাতে খুব দম বন্ধ করে না ফেলে, তাই মানুষের জন্যে কয়েকটা ঘুলঘুলি ফুটিয়ে দিয়েছেন তিনি; জানালা খুলে দিয়েছেন। যাতে মানুষ ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। শিশুকে বাইরে কোথাও গেলে বড়রা যেমন নজর রাখে তার ভাল লাগছে কিনা। তার হাতে ভেঁপু বাঁশি দেয়, ভুলিয়ে রাখতে। আমাদের সব রচনা, সব স্তব-স্তোত্র, শিল্পসৃষ্টি, সংসারও সেই ভেঁপু বাঁশি, আমাদের

নিজেদেরই খুশির খেলনা। আনন্দের আস্বাদ দেয়, ভরপুর রাখে আমাদেরই। এ সব কিন্তু তাঁর নিজের কোনও কাজে লাগে না।"

বলতে বলতে বাবা, অন্যমন অথবা বিহ্বল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম বারান্দায়, স্তম্ভিত একটি মূর্তি, অপার্থিব জ্যোৎস্না লুণ্ঠিত যেখানে। খুব মৃদু অথচ মর্মভেদী স্বগত ভেসে আসছিল কানে : "তোমার কাছে অনেক ছোট-ছোট প্রত্যাশা পুষে রেখেছি বলেই তোমাকে পাই না। ভক্তি তো নেই-ই, শুধু ভয়, আর একটু বিশ্বাস আর সামান্য কৃতজ্ঞতা। কত সামান্য কাজে তোমাকে ব্যবহার করব বলে বাহু বাড়াই। অন্য সব মোহ থেকে—কাম, কামনা, অর্থ, স্বীকৃতি—মুক্ত না হলে তোমাকে পাব কী করে!"

মা তুমি আমার দিকে তাকালে। চোখে উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক।—"কী বুঝছিস?" তোমার চোখের তারা বলছিল, "এখানে এসে ওঁর অসুখটা কমেছে। না বেড়েছে?"

"বুঝতে পারছি না," আমি চোখ বুজে বললাম মনে মনে "কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এই বাড়িটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে; মা, এখানকার সব-কিছু ছাড়িয়ে যেতে চাইছে আমাকে।"

ছাব্বিশ

সুধীরমামা বললেন, "কী ছেলেমানুষি করছিস? আয়, এখানে আয়।"

(মানুষের ভাষায় যত ডাক আছে তার মধ্যে এই "আয়" ডাকটা সবচেয়ে সবুজ, সুশীতল, তৃষ্ণার কোনও পানীয়ের মতো। গভীর অর্থবহ, আশ্বাসে অনুরণিত ওই কথাটা—"আয়।" ওই আহ্বানে লোকে কখনও সাড়া দেয়, কখনও দেয় না, অবহেলায় উদাসীন থাকে। কিন্তু ওই ডাক যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন কখনও ক্লান্ত, কখনও জর্জর, আবার কখন শোনা যাবে, এই আশায় মানুষ অধীর অস্থির হয়ে থাকে।)

সুধীরমামা বললেন, "আয়।" সেই সুধীরমামা, মা! তোমার মনে পড়ছে?

কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হল জিজ্ঞাসা করছ? বলছি, আমাকে একটু স্থির হতে দাও।

তার পরের দিন সারা সকাল খুব বিশ্রী কেটেছিল। কিছু ভালো লাগছিল না, ওই বাড়ি না, বাগান না, গঙ্গা তো নয়ই, নদীটাকে মনে হচ্ছিল একটা নোংরা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার নালা। কে আমাকে খেতে দিল, কোথায় বসে খেলাম, স্যাঁতসেতে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে, না তার পাশের কামরায় রাখা তকতকে সাদা পাথরের টেবিলে, এ-সব দিকে কিছু মনোযোগ নেই, কোনও রকমে মাথা হেঁট করে খাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারি, খাওয়া তো নয়, অসম্মানের মুঠো,

তা-দিয়ে শুধু পেটের হাঁ বোজানো, খাচ্ছি আর ঠিক করছি, শেষ হলেই ছুট দেব।

দেব, কিন্তু যাব কোথায়, কলেজে? ভাল লাগছিল না, একবর্ণ লেকচার ঢুকছিল না মাথায়, আমার প্রিয় কত কাব্য, সব তেতো, তেতো, ঢঙ আর ন্যাকামি। যারা পরাশ্রিত, তাদের ওসবে অধিকার নেই।

ক্লাস থেকে পালিয়ে গেলাম স্টেশনে। সেই স্টেশন, বহু দিন আগে, কত দিন আগে হে ভগবান, কোন্ কালে?—যেখানে এক সন্ধ্যায় এসে নেমেছিলাম। স্টেশনটা আমাকে এখনও অবশ আবিষ্ট করে, অন্তত অনেকদিন অবধি করত। আমরা যেখানটা ছেড়ে এসেছি আর এসেও যাকে পাইনি, এই দুই বিন্দুর মধ্যে এই স্টেশনটা একটা সম্পর্কের সূচক, একটি পেতে দেওয়া লোহার লাইনে আর টেলিগ্রাফের তারে তারে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে।

এক-একটা গাড়ি চলে যায়, আমার চোখের পাতা কাঁপে ঈর্ষায়, আমি দেখি। কামরার বাইরে কাঠের তক্তায় লেখা এক-একটা নাম, বানান করে করে পড়ি। সেদিনও পড়ছিলাম, দগ্ধ হচ্ছিলাম। এই ট্রেনগুলো কখনও সোজা, কখনও সর্পিল পথ ধরে উধাও হয়ে যায়, কোথায় যায়? যেখানেই যাক, আমার কাছে সে-সব শুধু ফলকে-লেখা নাম, তারা কোথায় কতদূরে আমি জানি না, সে-সব স্থানে আমার যাওয়া হবে না।

কিসের টানে তবু যেতাম স্টেশনে? কিন্তু যেতাম প্রায়ই। সেদিনও গেলাম। কারণ তো বলেইছি, মন টনটন করছিল, ফিরতে ভালো লাগছিল না। আর ফিরবই বা কোথায়, সেই বাড়িতে? যেখানে বাবা বাজার সরকার, ম্যানেজার, না ঘরজামাই, আর তুমি? মুখে আনা দূরে থাক, মা, মনে মনেও যে উচ্চারণ করা যায় না, তুমি কী। সেদিন স্থান-কালের আধারে রেখে তোমাকে দেখছিলাম বলে কষ্ট হচ্ছিল, আজ সব কিছু ছাপিয়ে ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছ,

তুমি যা তাই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি বেরিয়ে গিয়েছ, আমি পড়ে আছি।

সেদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে কিন্তু তোমারও মুক্তির কথা ভেবেছি। তিষ্ঠোতে পারছ না তুমিও, চলে যেতে চাইছ যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেখানে।

(কত পিছনে, মা, কত পিছনে? পুরো দূরত্বটা সাহস করে অথবা মায়ার ডোরে জড়িয়ে পড়ে ভাবতে পারি না, যদিও অস্পষ্ট আকারে সে আমাদের ঢাকনা-দেওয়া চেতনায় থাকে ; তাই তাকে মোটে কয়েকটা মাস আর মাইলের হিসাবে মাপি। যেন এই ক'টা বছরের পৃষ্ঠা পিছন দিকে ওলটালেই পারব বেঁচে যেতে। লড়াইয়ে মার-খাওয়া সৈন্যরা এইভাবেই পিছু হঠে, দিব্য পরিকল্পনা মাফিক, কিন্তু পিছু হঠতে হঠতে কত দূর আর যেতে পারে? যদি কঠিন কোনও দেওয়াল থাকে, অথবা কোনও অতল গহ্বর? ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সেদিন যে আমরা ফিরতে চেয়েছি প্রাক্-কলকাতা পর্বে, সেও তো একটা হিসাবী আপস, একটা ভীরু আত্ম-ছলনা? অত্যাচারী জীবনের হাতে পরাস্ত-পর্যুদস্ত মানুষ ভীষণ ভয় পেয়ে আসলে হয়ত পূর্বজন্মে ফিরে যেতে চায়। সে উপায় নেই যখন স্থির জানে, তখন পরজন্মের দিকে সতৃষ্ণ হয়ে তাকায়।)

•

হঠাৎ সেদিন একটা কাণ্ড করলাম, একটা গাড়ি দম নিয়ে আস্তে আস্তে যেই স্টেশন ছাড়ছে, অমনই জানি না কী করছি, খেয়াল করিনি আমার টিকিট কেনা নেই, ঝুলে পড়লাম তার হাতল ধরে, পা-দানিতে পা রাখলাম।

(জন্মভীরুও হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটা সাহসী কাজ করতে পারে, হিসাবীরাও সহসা বে-হিসাবী হয়ে যায়।)

প্রথমটা বেশ লাগছিল, গাড়ির দোলানির চমৎকার একটা আবেশ আছে, বিশেষ করে যদি দাঁড়িয়ে থাকা যায়। টলমল, টলমল, গাড়ি খালি নিজেই দোলে না, চারপাশে যা কিছু বাঁধানো ছবির মতো স্থির, তাদেরও তীব্র বাঁশিতে চমকে দেয়, ধরে ধরে দোলায়। যাত্রী যারা, তারা কেউ কাগজ পড়ছে, তার মানে পারিপার্শ্ব থেকে সরে গিয়ে নিজের মত তৈরি করে নিয়েছে আলাদা একটা জগৎ; কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে হাসিতে গল্পে গড়িয়ে পড়ছে। তার মধ্যে আমি, অপরিচিত অনধিকারী এক আগন্তুক, আমারও একটা আলাদা জগৎ—অস্বস্তির, ভয়ের। কোথায় যাচ্ছি, যাচ্ছি কেন, কী হবে গিয়ে, এই সব প্রশ্নের কুটকুট শুরু হয়েছিল।

বৃদ্ধমতন এক ভদ্রলোক জানালার বাইরের বিকালটির সঙ্গে নিজের চোখ দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন, একবার ভাবলাম তাঁর পাশে বসি, কিন্তু ভরসা হল না, তাঁর দিকে ঝুঁকে নীচু হয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, "এই গাড়ি কোথায় যাবে?"

তিনি চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। মাথা থেকে পা, এক নজরে আমার আন্দাজ নিয়ে বললেন, "আপনি—তুমি কতদূর যাবে?"

"অনেক দূর", আমি থতমত খেয়ে বললাম।

(তাই তো, ঠিকই তো, অনেক দূরই তো আমি যেতে চাই।)

একটু সন্দেহের চোখে বাঁকা ভাবে তাকালেন তিনি।—"এ গাড়ি তো অনেক দূর যাবে না।" তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরের বিকালে মগ্ন হয়ে গেলেন।

তখনই সে এল, সেই চেকার। পা-দানী বেয়ে বেয়ে কী অবলীলায় যে আমাদের কামরায় এসে ঢুকল। "টিকিট কই, টিকিট!

টিকিট, টিকিট!" ঘুরে ঘুরে সে সকলের সামনে দাঁড়াচ্ছিল, ঘুরে ঘুরে একই কথা বলছিল।

এক সময়ে আমার পালা।—"টিকিট?" মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন করেছেন স্যার, উত্তর দিতে পারছি না।

সে-ও আমার আপাদমস্তক মাপ নিল। চোখটা ছুঁচের মতো ফুটিয়ে দিয়ে বলল, "নেই?" তখন পুতুলনাচের বোবা কোনও নকল বীরের মতো শুধু মাথা নেড়েছিলাম?—মনে নেই।

সে আবার বলল, "কোথায় যাবে?"

(আহা, তা-ই যদি জানতাম! অথচ টের পেলাম ও-ও আমাকে তুমি বলছে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল।)

বলে ফেললাম "শেয়ালদা।"

শুনে চেকারটা নিজের মুখটা খুব কুৎসিত করে হেসে উঠল। সকলকে শুনিয়ে বলল, "শুনছেন? এই ছোকরা বলছে শেয়ালদা যাবে।" তখন কোলে ঝাড়ন বিছিয়ে যারা তাস খেলছিল, তাদের একজন মুখটাকে উটের কায়দায় উপরে তুলে সেই হাসিতে তার হাসি মেলাল।

চেকার বলল, "ছোকরা, ফোকোটের প্যাসেঞ্জারি করতে চাইছ, কিন্তু ফাঁকি দেবার বিদ্যেটা রপ্ত করোনি। বুদ্ধির ঘট ঠনঠন বুঝি? এই গাড়িটা আসছেই তো শেয়ালদা থেকে, হ্যা—হ্যা। নাকি ওই বদমায়েসি করেই পার পাবে ভেবেছ, ওহে ছোকরা।"

ছোকরা, ছোকরা, বারবার ওই একটা কথার ছ্যাকা লেগে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। ফশ্ করে বলে উঠলাম, "নন্‌সেন্‌স! কাকে কী বলতে হয় জানো না?"

সে আমাকে "তুমি" বলেছিল বলে আমিও তাকে "তুমি" বললাম। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল সে, ক্ষিপ্র পায়ে। আমার জামার কলার চেপে ধরে ক্ষেপে গিয়ে দিতে থাকল ঝাঁকানি, একটা কুকুরের মতো গর্‌র-গর্‌র গলায় বলতে থাকল, "তুমি জানো? আজ তোমাকে জানিয়ে দেব। জানো, জানো, নন্‌সেন্‌স কথাটার মানে জানো?"

কলার চেপে আমার প্রায় টুঁটি টিপে ধরেছিল সে, আমার চোখ আপনা থেকেই উছলে উঠতে চাইছিল। তখনও ক্রমাগত ঝাঁকানি, আর কানে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিমরুল হুল ফুটিয়ে বলে চলেছে, "জানো, জানো, নন্‌সেন্‌স-এর মানে জানো।"

একটি কেঁচো তখন কাতর ভাবে আমার গলায় লেপটে নিস্বরে বলছিল, "ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও" আর হাত দুটি অস্থিহীন অবশ হয়ে সরীসৃপের মতো ঝুলছিল, আর কত কেন্নো যে হাঁটছিল শিরশির করে ওঠা শিরদাঁড়ার মজ্জা বেয়ে বেয়ে, মা, সেই লজ্জা লেখায় লেপে দেওয়া অসম্ভব।

"জানো, জানো, মানে জানো?" যখন ক্রমশ পরদা চড়াচ্ছিল সে, তখন সেই অন্য লোকটি, যে উটের মতো মুখটি তুলে হেসেছিল খানিক আগে, হাঁক দিয়ে বলে উঠল, "যেতে দাও, যেতে দাও হে মল্লিক। ছেলেটার চেহারাটা কী, দেখছ না? নন্‌সেন্‌স কাকে বলে ও জানে না। আহা, জানলে কী আর বলত?"

চেকার কলার চেপে ধরায় আমার শুধু দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, কিন্তু ওই লোকটা যে-ই বলল "জানে না, আহা!"—ওই 'আহা' কথাটা আমার মাথার উপরে এক বোতল কালো কালি যেন উপুড় করে ঢেলে দিল।

গাড়ির গতি কমে এসেছিল। ধস ধস শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা স্টেশনে। যদিও তখনও চেকারটা তড়পাচ্ছিল, "জানিয়ে দেব আজ আচ্ছা করে, ভালো করে শিক্ষা দেব", তবু অন্য সকলের কথায় শেষ পর্যন্ত কলারের মুঠি আলগা করল সে, গাড়ি থামতেই ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে শীতল পিছল প্লাটফরমের উপরে ছুঁড়ে দিল।

চোখ ঝাপসা, তাই কি ছানি-পড়া গোছের দেখছি সব, সেই স্টেশনের চারধারে সরষে ফুলের মতো আলো। মিটমিট করে জ্বলছে, আলো না বিড়ির ফুলকি ওগুলো? অজস্র বিড়ি জ্বলছে

দেখতে পাচ্ছি, এধারে ওধারে—কাল না অবিনাশ এগুলোই ছুঁড়ে দিয়েছিল বাবার বিছানায়? অপমানের সেই ফুলকিগুলো এতদূর অবধি উড়ে এল কী করে?

অপমান, অপমান, এই ফুলকিগুলো অপমান। অপমান এই ইসটিশনের গরম হাওয়ার হল্‌কায়। প্লাটফরমের শেষ অবধি গেলাম, গাড়িটা ছেড়ে গেছে, কিন্তু তার টলমল ভাব রেখে গেছে আমার চলায়, ভিতর থেকে কী সব যেন ঠেলে উঠবে, বমি, বমি হবে নাকি আমার, না, এই যে একটা কল, ঝাপটা দিলাম মাথায় জল, ঠাণ্ডা জল, আঁজলা ভরে—আ-হা! কলের ঝর্ঝর ধারায় স্নেহ আর সান্ত্বনা সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকল, আমার স্নায়ুতে, শিরায় শিরায়।

তখনই শুনতে পেলাম, "আয়।" চমকে চেয়ে দেখি, সুধীরমামা।

সেই সুধীরমামা। যদি বলি দেখামাত্র চিনলাম সেটা চটক দেওয়া একটা মিথ্যা কথা হবে। মা, তোমাকে তো ঠকাতে পারব না। যেই তিনি আবার বললেন, "আয়", তখনই চেহারায় নয়, তাঁকে তাঁর কণ্ঠস্বরে চিনলাম। ওই ডাক আজন্ম আমার চেনা না? অনেক—অনেক সময়ের স্তর পার হয়ে কতদিন পরে এল, আবার এল। যেন আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে ছিলাম সেই মেলে রাখা চোখের পাতার উপরে "আয়", এই দুটি অক্ষর নয়, টপ টপ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ল।

সুধীরমামা একটা বেঞ্চে বসে ছিলেন, আস্তে আস্তে যেই বললেন, "কী হয়েছে", তখন, সেই জল, টের পেলাম আমার চোখ ছাপিয়ে যাচ্ছে। "কী হয়েছে" তিনি বললেন, আবার। আমার চোখ ছাপিয়ে যাচ্ছে, জবাব দেব কী, আমি বসে পড়েছি ওঁর পায়ের কাছে, সেই বেঞ্চটার নীচে, চোখ ছাপিয়ে যাচ্ছে আমার, বসে পড়েছি, সেই একদিন যেমন বসতাম, এক দিন, কত দিন···এতক্ষণ আটকে রেখে-ছিলাম, এখন আর জলের তোড়ে সব ভাসিয়ে আমার ছেলেবেলার

ফিরে আসা ঠেকাতে পারছি না, আমার বয়স, এই ক'-বছরের পেকে-ওঠা, আমার কলকাতা, সব মুছে যাচ্ছে, আমি ওঁর হাঁটুতে মুখ ঠুকছি, আমার সুধীরমামার, লাগছে, মুখে নয়, আমার বুকে, তিনি কাঁপা-কাঁপা হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে ধরে দেখতে চাইছেন।

"কী হয়েছে" আর জিজ্ঞাসা করলেন না, আমার গালে হাত বোলাতে গিয়ে কী অনুভব করে একটু সরে আমাকে দেখতে থাকলেন।—"বড় হয়ে গেছিস", বললেন বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করে।

আর আমি, উতলা অবোধ আমি তখনও তাঁর পায়ে মাথা ঘষে ঘষে বাক্যহারা অভিমানে আর অস্বীকারে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম, বড় কোথায়, বড় কোথায়, যা ছিলাম তাই আছি, কিংবা তাই হতে চাইছি, চোখ নেই, চোখ নেই আপনার? আপনি বুঝতে পারছেন না? আমার চোখের নীচের কালি মিথ্যে, গালের টসটসে ব্রণগুলো মিথ্যে, আর ভাঙা গলা? কোথায় ভাঙা গলা, এই তো আমি সেই ছেলেবেলার সুরেলা গলায় মনে মনে ডেকে উঠছি "সুধীর মামা!"—শুনতে পাচ্ছেন না? আমরা সারাজীবন কতবার এক-একটি ক্ষণে নিষ্কলুষ ধৌত হয়ে যাই, ফিরে পাই আমাদের সেই প্রথম-কে।

অন্তত আমি পেয়েছিলাম। "বড় হয়ে গেছিস" শোনার পরে ভালো করে আমিও তাকিয়ে দেখলাম তাঁকে। কতটা বদলে গেছেন তিনি? গায়ের রঙ সেই আগের মতোই আছে, তামাটে, তবু উজ্জ্বল, নাকের গড়ন, চাউনি—ও-সব আবার বদলায় নাকি! শুধু হাত দুটি যে আরও শীর্ণ, সেটা অনুভব করছিলাম আমি, আমাকে যখন ধরে ছিলেন তখন বোধ করেছিলাম তাঁর করতলের কম্পন।

"কী দেখছিস?" তিনি স্মিত মুখে বললেন।

"আপনি কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছেন, সুধীরমামা", বললাম লাজুক স্বরে। "বুড়ো আর আরও রোগা।"

"বুড়ো ?" তিনি হাসলেন আগেকার মতোই, বুকের সব দরজা জানালা হা-হা করে খুলে দিয়ে।—"তা হয়েছি। বয়স কম তো হল না। রোগা হয়েছি ? সে তো ভালোই, চরবি-টরবি ঝরেছে। শুধু কি চরবি, অনেক কিছু ঝরে গেছে।"

আহত খিন্ন গলায়, কিন্তু মনে মনে আমিও তাঁকে বলতে থাকলাম, মানে বলতে চাইলাম, "সুধীরমামা, আমাদেরও সব কিছু ঝরে গেছে। কলকাতা কেড়ে নিয়েছে সব একে একে, বাবার শরীর ভাঙা, সেই বলিষ্ঠ মানুষটা এখন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। মা—"

"ওরা কেমন আছে রে ?" কী আশ্চর্য, মনের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমার চিন্তা যেখানটায় পৌঁছেছিল, উনি কি টের পেয়ে সেখানেই হাত বাড়িয়ে তাকে খপ করে ধরে ফেললেন ? ওরা মানে কারা, ওরা মানে কে, মা, আমার বুঝতে এক নিমেষও লাগল না।

সংক্ষেপে বললাম, "ভালো না", তারপর তাড়াতাড়ি "ভালো।"

চশমার ফাঁকে চোখ পিটপিট করছিল তাঁর। "ভালো না—ভালো ? তার মানে ? কলকাতায় এসে এই ক' বছরে বুঝি খুব হেঁয়ালি শিখেছিস ? আমি গ্রাম্য মানুষ, তায় সেকেলে, জানিসই তো। আমাকে একটু বুঝিয়ে বল ?"

একটা হঠাৎ উচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম, "কলকাতা আমার ভালো লাগে না, সুধীরমামা।" আর কিছু বলতে পারলাম না, যদিও বুকের মধ্যে অনেক কথা আগুন-লাগা বাঁশের মতো ঠাস ঠাস ফেটে যাচ্ছিল। টের পাচ্ছি উনি এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন, মূর্ছিত রোগীর নাড়ি ধরে অপেক্ষমান ডাক্তারের মতো। সেই রোগী তখন মূর্ছাঘোরে বলছে, "তাই তো আজ ট্রেনে উঠেছিলাম, কিন্তু কী যে হল ! মন-খালি চলে যেতে চাইছিল—কোনোখানে। ভগবান দিলেন না, আবার খানিকটা দিলেনও। সশরীরে ফিরতে পারলাম না বটে, তবু যেখানে ফিরতে চেয়েছিলাম, তারই খানিক, তারই প্রতীক সুধীরমামা হয়ে ফিরে এল।"

এসব কথা অবশ্য বললাম না, মুখে পরিস্ফুট করে যেহেতু বলা যেত না। বোকা বোকা গলায় হঠাৎ বললাম, "এটা কোন্ স্টেশন, সুধীরমামা?"

এবার তিনি সত্যি অবাক হয়ে গেলেন। "কেন, দমদম! কোন্ স্টেশন তা-ও জানিস না, তবে এলি কী করে?"

সবটা বুঝিয়ে বলতে হল না, উনি আমার পিঠে রেখেছিলেন একটা হাত, স্পন্দন থেকে কিছু একটা আন্দাজ করে নিলেন। "পালিয়ে যাচ্ছিলি?" কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, "ধরা পড়েছিস? তাই ওরা নামিয়ে দিল? তাই কাঁদছিলি?"

এ গলা তো তিরস্কারের নয়, সমব্যথীর। আমি আর সুধীরমামা কবে সমব্যথী ছিলাম, কখন, কোন্খানে, মা, অতীতের কয়েকটা পৃষ্ঠা সেলাই ছিঁড়ে শুকনো পাতার মতো ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াতে থাকল, আধো-কাঁদো গলায় আমি কেবল বলতে পারলাম, "আমার টিকিট ছিল না যে।"

তিনি শুধু বললেন, "আর পালাস না। টিকিট যতক্ষণ না মিলছে ততক্ষণ গাড়িতে উঠতে নেই। নেমে যেতে হবে কিংবা ওরা নামিয়ে দেবে।" তখনও খুব নীচু তাঁর কণ্ঠস্বর, বলার ধরন সেই আগেকার মতন, "যেমন আমাকে কতবার নেমে যেতে হয়েছে। পালাতে—কোথাও চলে যেতে আমিও কি চাইনি? তবু।"

তিনি থেমেছিলেন। সেই সময়টাতে আমার দৃষ্টিভ্রম, শ্রুতিভ্রম, সব ঘটে যাচ্ছিল। কাকে দেখছি, মুখটা ভালো ধরতে পারছি না তো, কার কণ্ঠস্বর? মা, তখনই আমি, সেই বোধহয় প্রথম, দু'জনকে এক হয়ে মিলে যেতে দেখলাম, সুধীরমামাকে আর বাবাকে। একজন ছিলেন চিরকাল আত্মসমর্পিত, অন্যজন উদ্ধত, বিশৃঙ্খল। কাল তাল তাল কাদার মতো দু'জনকে পিটে পিটে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছে, একই কারাগারে, বদ্ধ, বন্দী, বিপরীত চরিত্রের দুটি মূর্তি, সময়ের হাতের নিশানায় একত্র মিলিত, একাকার।

"আমিও চলে যেতে চেয়েছি তো, পারি নি। তা ছাড়া এখন আরও পারব না। এই যে লাঠিটা দেখছিস, এটা আগেও ছিল, কিন্তু এখন আমার একান্ত নির্ভর। এটায় ভর না দিয়ে এক-পা নড়তে পারি না। বাতে এই লম্বা শরীরটাকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। কতটা নুইয়ে দিয়েছে, উঠে দাঁড়ালে দেখিস। একেবারে বাঁকা—যা ছিলাম তার চেয়ে অন্তত সাত-আট ইঞ্চি কম।"

(তার মানে, সেখানেও এখন বাবার মতন, কথাটা একবার ঝিলিক দিয়ে গেল, তবে ঐ গাঢ় পরিবেশ সস্তা কোনও কথার চালাকি বরদাস্ত করত না।)

"মজবুত ছিলাম যত দিন", সুধীরমামা বলে যাচ্ছিলেন, "এক দিন টের পেলাম, সত্যি সত্যি খুব দূরে যাওয়ার দরকার হয় না। বসে বসেই যাওয়া যায়। রাত্রে কখনও ট্রামে উঠেছিস? কিংবা বাসে, সামনের সীটে? একটু অভ্যেস করলেই মজার খেলাটা শিখে যাবি। খালি চোখ বুজে থাকবি, শুনবি শোঁ-শোঁ-শোঁ, কিন্তু কক্ষনো চোখ খুলে বাইরে চাইবি না, কোথা দিয়ে যাচ্ছিস জানতে চেষ্টা করবি না, খালি ওই শব্দ, শোঁ-শোঁ-শোঁ; গতির অনুভূতি শুধু—মনে হবে দূর থেকে কত দূরে ভেসে চলেছিস।"

সম্মোহিতের মতো শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, "আর একটা খেলা, এইটেরই রকমফের, আর-একজন লোক, সে এই স্টেশনেই আমাকে শিখিয়ে দিল্। সে ছিল ক্যানভাসার, বছরের পর বছর শুধু গাড়িতে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল, শেষে একদিন কাটা গেল ওর একটা পা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি, হাসপাতালে অজ্ঞান হয়েই কাটল তিন দিন। সেখান থেকে ছাড়া পেতে পেতে আরও দু'তিন মাস। ওর সঙ্গে আমার মুখচেনা ছিল। একদিন ওকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। '—কাজ শুরু করেছেন নাকি আবার, সেই ঘোরাঘুরির কাজ?' জিজ্ঞাসা করলাম। সে পাশে রাখা কাঠের পা-টা দেখিয়ে দিল। —'সেই কাজ আর করব কী করে। এখন—এখন একটা

দোকানে খাতা লিখি।' বললাম 'তবে যে এখানে?' শুনে ও শুধু হাসল। বুঝলাম। ঘোরাঘুরির নেশা রক্তে ঢুকেছে যে। সেই টানে আসে। চেয়ে চেয়ে ছাখে, সব ট্রেনের আসা-যাওয়া গোনে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই লোকটি ক্লান্ত হয়ে চোখের পাতা বন্ধ করল। দেখলাম, চোখের কোণ থেকে কষের মতো ধারা গড়াচ্ছে। বুঝলাম না, কী কষ্ট পাচ্ছে। এ কি সেই কষ্ট, অপঘাতে মৃত মানুষের আত্মা যে-কষ্টে কাছাকাছি ঘোরে, মোহমুক্ত হতে পারে না? পরে, জানিস, ভেবে দেখলাম চোখের পাশের ওই জলের রেখা আনন্দেরও তো হতে পারে? চোখ বুজে প্রত্যেকটা চাকার ঘুরে-যাওয়ার আওয়াজের সঙ্গে হয়ত ওর বুকের আওয়াজ মেলাচ্ছে? চল উঠি।"

সুধীরমামা উঠলেন। আগে দাঁড় করিয়ে দিলেন ওর নড়ি, সেটাতেই ভর দিয়ে পরে দাঁড়ালেন নিজে। অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছেন, তবু ততটা ঢ্যাঙা লাগছে না দেখতে, পিঠ ধনুকের চাপের মতো হয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

স্টেশনের ছাউনির নীচে যতটা অন্ধকার লাগছিল, বাইরে ততটা নয়, দূরে-কাছে গাছের আগাগুলো আর কোন-কোনও বাড়ির ছাদ তখনও যেন বেশ খানিকটা খুশি মেখে ছিল। আকাশটা মস্ত একটা থালা, খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরও তার কিনারাতে খানিকটা রোদের এঁটো লেগে আছে।

রাস্তায় ভিড়ও ছিল, কয়েকটা তরি-তরকারির ঝুড়ি ঘিরে ছোট-খাটো একটা বাজারও বসেছিল। একটা জায়গায় সুধীরমামা কিছু কিনবেন বলে দাঁড়ালেন। অন্য খদ্দেরদের কাটিয়ে সামনে যেতে সময় লাগছিল। কী কিনলেন শেষ পর্যন্ত? তাকিয়ে দেখলাম, বেশী কিছু নয়, একগোছা বাসী ফুল। তারপর আবার চলতে থাকলেন।

বুঝতে পারলাম, একটু হাঁপিয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। হাতের লাঠিটা ঠিক জায়গায় পড়ছে না। বললাম, "সুধীরমামা, আপনার চলতে কষ্ট হচ্ছে?" মাথা ঘুরিয়ে বললেন, "ও কিছু না। এইটুকু কষ্ট

করতেই হয়—বাঁচতে হলে। তোকে একটু আগে যা বলছিলাম না? পুরোপুরি ঠিক নয় কথাগুলো। কিংবা ততটাই ঠিক, সব আদর্শ যেমন। সবটা খাটানো যায় না। মনসা মথুরাং গচ্ছামি, মনে মনেই যাওয়া যায় মথুরায়—ওটা আসলে শুধু বিশ্বাস। অভিজ্ঞতা নয়। পঙ্গু সত্যিই যদি গিরি লঙ্ঘন করতে চায়, তবে তাকে কষ্ট করে কয়েক পা হাঁটতেই হবে। নইলে, যে পা-খোয়ানো ক্যানভাসারটির কথা তোকে বললাম, সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেশনেই বা আসবে কেন? ঘরে বসে ছাপানো টাইমটেবলের হরফে আঙুল বুলিয়েই দূর থেকে দূরে যাওয়ার স্বাদ পেয়ে যেত। তা হয় না"—সুধীরমামা বললেন, "যে বধির সে স্বরলিপি পড়ে আসল গান শোনার আনন্দ কিছুমাত্র পায় না। ওটা নিজেকে ভোলানো, দুধের বদলে অশ্বত্থামাকে পিটুলি-গোলা খাওয়ানো। বুঝতে পারছিস!"

একটা গলির মুখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "না। কিন্তু সুধীরমামা—" যে কথাটা মনে এসেছিল অনেকক্ষণ আগে, মুখ ফুটে সেটা বলেই দিলাম এতক্ষণে—"আপনি ঠিক বাবার মতো কথা বলেন।"

"বলি বুঝি?"—একটু কি চমকে উঠলেন তিনি, কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে বললেন, "হতে পারে। ঘরে ফিরে আমরা হয়ত একটা জায়গাতেই এসে পড়েছি। হতে পারে।"

বলতে গিয়েও, মা, সুধীরমামা একবার কাশলেন, ওঁর গলা কেঁপে গেল একবার।—"কী বলেন তোর বাবা—প্রণববাবু?"

"সে কি আমি আপনাকে বলতে পারব? খুব শক্ত শক্ত কথা যে! খুব অসুখ হয়েছিল তো বাবার, এখনও সারেন নি। সেই থেকে কেমন আলাদা আলাদা ধরনের কথা বলেন। মানে—" যত এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল আমার কথা আমি ততই ব্যগ্র হয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম সুধীরমামাকে—"বাবার, মানে, আজকাল খুব বিশ্বাস। ভগবান মানেন।"

"মানেন?" সুধীরমামা উপর দিকে তাকালেন, যেন ভগবান ওখানেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন কিনা দেখতে চাইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "কই, আমি তো বিশ্বাস করি না।"

"করেন না?"

সুধীরমামা বললেন, "না। তবে—তবে কয়েকটা রুচি-অরুচি, ন্যায়-অন্যায় মানি।" হাতের হলুদ ফুলগুলো দেখিয়ে বললেন, "যেমন এগুলো। সকালেও তো কিনতে পারতাম? কিন্তু তখন ওরা খুব টাটকা থাকে, মায়া হয়। এখন দেখছিস কেমন মিইয়ে এসেছে। এখন আর ওদের নিতে বাধা নেই। জীবনের সাধ যাদের আছে, তাদের নষ্ট করে দিতে আমার কষ্ট হয়। যারা শুকিয়ে এসেছে বা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাদেরই আমি নিই, নেড়েচেড়ে স্বস্তি পাই।"

"তাই তো বললাম সুধীরমামা, আপনি ঠিক বাবার মতো কথা বলেন।"

তিনি বললেন, "কই! তাঁর বিশ্বাস আছে, আমার নেই।"

ফশ্ করে তখন বলে ফেললাম, "সুধীরমামা, বাবার উপরে আপনার খুব রাগ, তাই না?"

বলেই বুঝেছিলাম মূর্খের মতে কাজ করেছি। উনি রেগে যাবেন এক্ষুনি, হাতের লাঠিটা কাঁপতে থাকবে। কিন্তু কাঁপল না, উনি রাগলেন না। শুধু আতঙ্কগ্রস্তের মতো বলে উঠলেন "রাগ? না। একটুও না।"

আমরা আবার চলতে শুরু করেছিলাম, তখন হঠাৎ একটু হাওয়া উঠে সব সহজ করে দিচ্ছিল। উনি সব খবরাখবর নিচ্ছিলেন। একবার বললেন "তুই তো জেনটলম্যান হয়ে গেছিস।" কোথায় আছি শুনে বললেন, "তবে তো বিশেষ দূর নয় এখান থেকে। কাছেই —এই রাস্তা ধরে চলে যাবি, সোজা পশ্চিমে, মাইল দুই মতন হবে বোধ হয়। আমি? আমি থাকি এই গলিটার শেষে—ওই যে টালির চালাটা দেখছিস্, সামনে কল, ওইটে।" একটু অপেক্ষা

করলেন সুধীরমামা, বললেন—"আচ্ছা।" তার মানে বিদায় দিচ্ছেন। তবু একটু ইতস্তত করছি দেখে আবার কাছে এলেন—"যাবো একদিন তোদের ওখানে। তোর ভাই কত বড়টি হয়েছে– ভাই, না বোন রে? —দেখে আসব।"

বলেই তিনি আস্তে আস্তে তাঁর বাসার দিকে এগোতে থাকলেন, আমার কয়েকটা কৌতূহল থেকেই গেল। ওই বাসায় আর কে আছে– ভামতী? ভামতীর কথা জিজ্ঞেসই করা হল না।

সাতাশ

সেদিন যখন ফিরছি, তখন একটা স্থখাবেশ সবুজ ঘাসের মতো মন ছেয়ে ছিল। একটু একটু হিমও জমছিল সেই ঘাসের শিসে শিসে —ভয়ের হিম। না-চেনা রাস্তা, তখন আবার সন্ধ্যার পরই এসব দিক একেবারে নিঝুম হয়ে যেত। সোজা চলছি, এইটেই ঠিক পশ্চিম তো? আকাশে কোনও চিহ্ন লেখা নেই। স্থধীরমামা বলেছিলেন, সোজা পশ্চিম। স্থধীরমামা, এক-একটা রক্তোচ্ছ্বাস থেকে থেকে বুকের ভিতরটা ছাপিয়ে যাচ্ছিল। স্থধীরমামা—অবিশ্বাস্য। একটা মৃদু ভূকম্পও চাপা গুরুগুরু ধ্বনি তুলছিল।

শেষে, অনেক হাঁটার পরে চেনা জগৎটা আবার দেখা দিতে থাকল, কখন এক ঝলক গঙ্গাও দেখা গেল, তারপর—এই তো সেই ফটকটা। রাত হয়েছে তাই দরজা বন্ধ, কিন্তু তার শক্ত ইস্পাতের কবাটটা বিরাট একটা আশ্বাসের মতো। পেয়ে গেছি। কবাটের ঠাণ্ডা লোহায় হাত রেখে হাঁপ ছাড়লাম আমি, দম নিলাম। এই তো খুঁটি, এই তো আশ্রয়—গোহালে ফিরে গাভী যেরকম বড় বড় আরামের শ্বাস নেয়, আমিও তাই নিচ্ছিলাম। একে ছেড়ে কোথায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছি—পাগলামি। ট্রেনে চেপে বসাটা একটা পাগলামি ছাড়া কী। যারা ভীতু, তারা মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজের ইজ্জত ফিরে পেতে এইরকম সস্তা কাণ্ড করে। ফটকটার সামনে পৌঁছতে পেরে বেঁচে গিয়েছিলাম।

প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে, সে তো হবেই, জানি। অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে, না-জানি খেতে হবে কত বকুনি, সে-সব চট করে চাপা দেব কী করে ভাবতে ভাবতে সব চেয়ে যেটা স্বাভাবিক, সেইটাই বলে ফেললাম, ভিতরে যা টগবগ করে ফুটছিল তাকে উচ্ছ্বাসের তোড়ে বের করে দিলাম।

"সুধীরমামাকে আজ দেখলাম, জানো মা!"

তোমার মুখে এতক্ষণ যে-চামড়া ছিল কোঁচকানো চাদর, তা যেন এইমাত্র মসৃণ টানটান করে পাতা হল। ফ্যাকাশে গলায় একবার বললে "কে?" আর একবার "কী—কী বললি?"

"সুধীরমামা।"

কোথায় সেই একটু আগেকার রুক্ষ রূপ, তুমি একেবারে ভাব-লেশশূন্য সাদা হয়ে গেছ। এতক্ষণ আমি ছিলাম ভয়ে ভয়ে, হঠাৎ যেন জোর পেয়ে গিয়েছি, সব রহস্যের চাবি আমার মুঠোতে। খুলব, একটু দেখাব, মুঠো বন্ধ করব আবার, দুষ্টুমির নেশাটা মাথায় বেশ জমছিল। তারপর—সেই আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যাওয়া, জেরা আর জবাব একটানা, তুমি তো জানো। আমি আজ শুধু তার কাঠামোটা লিখি।

কী? আর কী? —আর কিছু না। —কেমন দেখলি? —ভালোই, বললাম তো। —ভালো? তা তো থাকবেই। কী বলল? —খবর নিলেন, আমাদের। —আমাদের মানে? কার কার? —বাবার, আমার। —তোর বাবার আর তোর? ও। আর কী? —আর কিছু না। —কোনও কথা না? —কথা অনেক, বলেছি তো। বাবার ওপর আর রাগ নেই। —নেই? তোর বাবার ওপর রাগ নেই? ও। আর? —আর কিছু না।

"বাবার ওপর রাগ নেই," কথাটায় বিস্ময় বা হতাশার এমন কী ছিল, মা, আমি তো জানি না। আমার জবানবন্দীর ওই একটি বাক্য তুমি স্বগত-উক্তির মতো বার দুই নিজেই বলে বলে বাজিয়ে নিলে কেন? ঠিক তখনই বাবা উপরে এসে পড়েছিলেন, তাই। নইলে ওই জেরা জবাব, স্বগত-সংলাপ কতক্ষণ চলত, ঠিক নেই। তুমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলে, "শুনেছ, সুধীরদার সঙ্গে তোমার

ছেলের আজ দেখা হয়েছে। সেই সুধীরদা। উনি কী বলেছেন জানো?"

বাবা চোখ তুলে তাকালেন।

"বলেছেন, তোমার ওপর ওঁর আর রাগ নেই। যেন খুব মজার কথা, তুমি এইভাবে বলেছ। যেন খুব মজার কথা শুনলেন, বাবা হেসেছেন সেইভাবে। "রাগ তা-হলে কোনো কালে ছিল বলো?" —এই পালটা প্রশ্ন করার সুযোগটা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলেন। বরং নির্মল গলায় বললেন "নেই তো? আমি জানি, থাকবে না। আমারও নেই। রাগ কেন, কোন কিছুই বেশী দিন থাকে না, উবে যায়, জুড়িয়ে যায়, মিলে যায়। বুঝেছ?"

তুমি তীব্র-দ্রুত বেগে বললে "বুঝেছি। তোমরা দু'জনে মিলে গেছ। বুঝেছি।"

বাবার চোখ তখন আকাশে। মগ্ন কণ্ঠে বলছিলেন "মন দিয়ে দেখলে সর্বত্র এই মিলে-যাওয়ার ব্যাপারটা দেখতে পাবে। আমরা যাকে তীক্ষ্ণ, তির্যক অথবা সরল রেখার মতো সটান ছিটকে ছুটে যেতে দেখি, সে-সবই কম সময়ের পরিসরে। সংঘর্ষ যত ঘটে, তা-ও সীমিত কালের গণ্ডীর ভিতরে। সময়ের সুতো ছাড়তে থাকো, দেখবে একটা সীমার বাইরে গিয়ে আর কোনও বিরোধ নেই, কারও সঙ্গে কারও না, সেখানে শুধুই বিস্মরণ, সেখানে শুধুই ক্ষমা। পুরোটাকে এক সঙ্গে দেখতে হলে খালি একটু ধৈর্য, একটু অপেক্ষা চাই—বুঝলে না?"

"না, না।" দাঁতে ঠোঁট চেপে তুমি বললে, "ওসব বড় বড় কথা আমার মাথায় আসে না। পুরো-টুরো দেখার সাধ নেই, ধৈর্য আমার ধাতে নেই—কিচ্ছু না।"

দাঁতে ঠোঁট চাপা, তোমার মুখের রঙ মুছে যাচ্ছে কেন, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। দাঁতে—ঠোঁটে, মা, কোথায় তোমার যন্ত্রণা?

আমি আস্তে-আস্তে বললাম "সুধীরমামা একদিন আসবেন বলেছেন, জানো? বলেছেন, সে ভারী মজার কথা, আমার ভাই না বোন কত বড়টি হল, দেখে যাবেন।"

কথাটা মজার বলে, নাকি অন্য কোনও কারণে, তোমার মুখ থেকে কষ্টের ছাপটা ম্যাজিকের মতো মুছে গেল। ওই একটা সাধারণ কথায় পলকে সহজ হয়ে গেলে তুমি। সহজ, স্বাভাবিক।— "আগে বলিসনি কেন এই কথাটা?" তুমি হাসছিলে।—"সুধীরদা মিছে কথা বলেছে, বুঝলে?" বাবার দিকে তাকিয়ে বললে "রাগ একেবারে পড়েনি, একটুখানি পুষে রেখেছে, বুঝলে ভোলানাথ? তা না-হলে ভাইবোন-টোনের কথা বলত না।"

ওই বাড়িতে আমাদের আশ্রিত জীবন কীভাবে কাটতে থাকল তার রোজনামচা রাখিনি, তবে মনে আছে কষ্ট, অপমানবোধ ইত্যাদি ছুঁচগুলো ক্রমশই তাদের সূক্ষ্মতা হারাচ্ছিল। প্রথম দিনটাই ছিল ভারী—একটা বইয়ের মলাটের মতো। মলাটটা খুলে দিলেই হাওয়ায় পাতার পর পাতা যেমন আপনা থেকেই উড়ে উড়ে যায়, এক একটা দিনও সেইভাবে কাটছিল। অন্ধকার ঘরে প্রথম ঢুকলে চোখে কিছু পড়ে না, তারপর দৃষ্টি নিজে থেকেই ফুটতে থাকে, কাছে-দূরের খাট, আলনা, আসবাব ইত্যাদি ক্রমশ অস্পষ্ট আকার নেয়। দুঃখ, বেদনাও তাই। তার সঙ্গে সহবাস ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যায়, আমাদেরও হচ্ছিল। জানছিলাম যে, সবই শেষ পর্যন্ত সহনীয়, বিশেষ করে প্রতিষেধক ওষধি যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

বাগানের আনাচে-কানাচে, গঙ্গার পাড়ে, বাবা যখন নানা গাছ-গাছড়া খুঁজে বেড়াচ্ছেন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে আনছেন কোনও-কোনটাকে—এই দৃশ্য এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই। এবং এ-ও বুঝি, ব্যবসার উপাদান সংগ্রহ করা ওটা আসলে ছিল অছিলা, বাবা নিজের জন্যেই খুঁজছেন ওষুধ—সম্মানবোধ জাগিয়ে রাখার কোনও

শিকড়, কিংবা এমন-কিছু যাতে অপমানবোধটাকে অন্তত ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়।

আর আমি? আমার নিজের জন্যও ওই রকম একটা ওষুধ আমিও পেয়ে যাই দৈবাৎ—মা, সেদিন তুমি বোঝোনি, বুঝতে চাওনি, তবু আজ আবার বলছি, সেদিন আমার মনের তলাটা দেখতে যদি, তবে কিসমিসকে নিয়ে ঘটনাটা তোমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলত না। কেন যে কী ঘটে, হঠাৎ কী কুড়িয়ে পেয়ে কেউ বেঁচে যায়, আজ আবার গুছিয়ে বলতে বসেছি—তোমার এজলাসে এই আমার জবান-বন্দীতে। এই আমার শেষ চেষ্টা।

ওই ঘটনাটা ঘটল বলেই তো আমি বেঁচে গেলাম, সেই নেতিয়ে-পড়া দিনগুলোতে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রত্যয় ফিরে পেলাম। আজ এতদিন পরেও লিখতে লিখতে ভাবছি, আঃ, কিসমিস যদি ওই বাড়িতে গোড়া থেকেই থাকত! তা তো না, সেই এল সব চেয়ে পরে, তার আগে আমার অনেকগুলো নিংড়োনো, শুকনো, কষ্টের দিন কেটেছে!

তোমার মাসিমা, ওই বাড়ীর যিনি কর্ত্রী, তিনি অবশ্য দিন দুই পরেই ফিরেছিলেন। সঙ্গে তাঁর নাতি। ওরা আসতে আসতেই বাড়িটায় কেমন সাড়া পড়ে গেল, বদলে গেল আবহাওয়া।

সত্যিই চমৎকার মানুষ তোমার মাসিমা, আমার দিদিমা। আমি সেদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, যেন ধূম পড়ে গেছে। ঝাড়পোঁছ, ধোয়ামোছার ঘটা। আড়ষ্ট পায়ে উপরে গিয়ে তাঁকে যেই প্রণাম করলাম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার থুঁতনি তুলে ধরলেন।—"আহা, যেন কেষ্ট ঠাকুরটি!"

"দিদিমা, আমি তো কালোই", লজ্জা পেয়ে বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাল দিলেন টিপে।—"লাগল বুঝি? আমি কিন্তু ভাই গায়ের রঙের কথা বলিনি। ঢলঢল ভুলিয়ে-দেওয়া মুখখানি—তাই

বলেছি। কেষ্টঠাকুর, তোমার এই রাধা কিন্তু থুত্থুরে বুড়ি। মনে ধরবে তো? দেখো, শেষে ঠকিয়ো না।"

আরও লজ্জা পাচ্ছিলাম আমি, তার উপরে তুমি ছিলে পাশেই, জুতসই রসিকতা দু'একটা মনে এলেও মুখে আনার জো ছিল না। তুমিই তাড়াতাড়ি বললে "কী যে বলছেন মাসিমা? এখনও এমন রূপ আপনার! সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা। রঙ যেন জ্বলছে। আমার মাসিমা বলে মনেই হয় না।"

তুমি ওঁর মন জোগাচ্ছিলে, বোঝাই যাচ্ছিল। ঠিক ধরে নিয়েছ তোমার যা কাজ। কিন্তু আমার কাজ কী? তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এইটুকু টের পেয়েছিলাম যে, পরমা রূপবতী উনি খুব বুদ্ধিমতীও—আমার গ্লানিটা মুছে দিতে চাইছেন। কিন্তু কেষ্ট-ঠাকুর বললেই কি প্রকৃত সত্যটা ঢাকে? সেই সত্য এই—উনি অন্নপূর্ণা, আর আমি অন্নদাস অন্নপূর্ণার।

হঠাৎ খেয়াল হল চৌকাটের বাইরে দাঁড়িয়ে কে একজন আমাকে থেকে থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রঙ টকটকে ফরসা, কিন্তু সে ছেলে না মেয়ে সেটা চট করে চেনা যায় না।

দিদিমা সেইদিকে চেয়ে বললেন, "আমার নাতি।"

নাতি? ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম আবার। কোনও ছেলে এত লম্বা চুল রাখে, আগে দেখিনি। চুল তো নয়, বাবার। সে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল ঘরের দিকে, তাই তার চোখের সুর্মা, গলার কাছের পাউডারের ছোপও একে একে দেখতে পেলাম। গায়ের জামাটাও ফিনফিনে; পানজাবিই—কিন্তু ছাঁটে যেন ঢিলে সেমিজ। আর সে অসম্ভব রোগা, ফ্যাকাশে একটা পাটকাঠি। কাছে এসে আবার চোখ টিপল সে, বুঝলাম উঠতে ইসারা করছে। তখন তুমিই বললে "যা না। ওর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আয়।"

নীচে নামতে নামতে সে নাম জেনে নিল আমার। ভ্রুভঙ্গি করে করে বলল "বয়স?" শুনে থুঁতনিতে কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে সে ঘাড়

বেঁকিয়ে কী ভেবে বলল, "আমার বড়, না ছোট ?" কোনও ছেলেকে ওমনি কায়দায় ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি। আসলে ওর গলা যতবার শুনছিলাম, ততবার চমকে চমকে উঠছিলাম। রিনরিনে মিষ্টি স্বর, বাঁশিতে ফুঁয়ের মতো। সেই গলাতেই সে বলছিল "আমার নামও বাঁশি। বোধ হয় আমার এই রকম গলা বলেই ওরা এই নাম রেখেছে। ভালো নাম ? আমার ভালো নাম নীলা—নীলাচল।" ওর কোমল স্বর সন্ধ্যার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপছিল। ওর কালো দুটি চোখের দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে ছিল। অন্তত আমি বিশেষ কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমরা বসলাম একটা গাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে। তার আগে সে পকেট থেকে রুমাল বের করে জায়গাটা সাফ করে নিল। আমি কথা বলছি না দেখে সে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত দুলিয়ে আমাকে অদ্ভুত কায়দায় একটা ধাক্কা দিল।—"আমি জানি তুমি কী ভাবছ", তার হিল্লোলিত শরীরে অপর্যাপ্ত সুবাস, সে টেনে টেনে বলছিল। —"ভাবছ এই ছেলেটা কী ভীষণ মেয়েলী, তাই না ?" সে আমাকে আবার একটা ঠেলা দিল।

আমার নাকে উগ্র সুগন্ধি লাগল বলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, একটু সরে বসলাম।—"তুমি —তুমি সেন্ট মাখো কেন ?"

সে ঢুলুঢুলু কাতর চোখে তাকাল।— "মাখি। পাউডারও মাখি তো। অভ্যেস হয়ে গেছে। নইলে গা ঘিনঘিন করে। নিজের কাছে নিজেরই বমি-বমি ভাব আসে।" বলে, বিলোল হেসে সে বলল, "ঘেন্না করছে ?"

"আর এই কাজল ? মাখো কেন ?"

"চোখ স্নিগ্ধ থাকে। সব সুন্দর দেখি। নইলে এমনি অভ্যেস যে, চোখের পাতা পোড়ে। চারদিকে সব দাউদাউ জ্বলতে দেখি। বিশ্বাস করো। নইলে কিছু সহ্য করতে পারি না আর। বিশ্বাস করো।"

সেই কথায় অনুভব করলাম, এই যে বাঁশি, ছেলে হয়েও যে কোমল, লবঙ্গ লতিকাপ্রতিম, তার ভিতরেও কোথাও একটা জ্বালা, একটা প্রতিবাদ জ্বলছে।

একটি লোক তখনই সেখানে এসে জানাল চা জল-খাবার তৈরী। বাঁশি বলল, "নিয়ে এসো না! এইখানেই নিয়ে এসো।"

একটি থালা এসেছিল মোটে। সে অবাক হয়ে তাকাল। মানে বুঝে, বিশেষ করে ওই পরিচারকটির অস্বস্তি অনুমান করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "আমি—আমি তো বিকালে বিশেষ—" চাকরটাও সুযোগ বুঝে সায় দিয়ে বলল, "উনি, উনি তো—" ঝনঝন করে একটা কাঁসার থালা বেদীর শানে কে আছড়ে ফেলল, আওয়াজ শুনলাম, সেই মেয়ের মতো দেখতে ছেলেটি সাংঘাতিক রেগে গেছে, ওর সারা শরীর কাঁপছে।

চাকরটি ভয় পেয়ে বলল, "বেশ তো উনিও খাবেন তো, আসুন না।"

"না, না। চলো, আমিও যাবো।"

দু'জনে মিলে বসেছি খাবার টেবিলে। থালা গ্লাস, সব আবার এল। দু' প্রস্থ। আমি যে এই কয়দিন ঠাঁই পেতে খেতাম রান্নাঘরের মেঝেতে, সেটা আর বাঁশিকে বললাম না। সাপের মতো ঠাণ্ডা যার শরীর, সে তখনও সাপের মতো ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলছিল।

সেই থেকে আমারও খাবার জায়গা টেবিলেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

আর রাত্রে তুমি বললে "বাঁশি বলেছে ওর ঘরে তোরও বিছানা নিয়ে যেতে। ওঘরে শুতে পারবি তো, শুবি?"

সোজা জবাব না দিয়ে বললাম, "আর তুমি?"

"আমি থাকব মাসিমার ঘরে।"

বাবার কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন হত। বাবা একাকী, এ আর নতুন কথা কী! চিলেকোঠা চেয়েছিলাম, অযাচিতভাবে সেই চিলেকোঠাতেই প্রোমশান পেলাম। মা, সারা জীবনে এইভাবেই

অনেকের তাচ্ছিল্য, অপমান, অবহেলা আমাকে ছ্যাঁকা দিয়েছে। কিছু দাগ থেকেই গেছে। অনেক তুচ্ছতাকে আবার মুছতে মুছতে এগিয়েছি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে আঙুলের ডগায় ক্রীম তুলে মুখে ঘষছিল। পায়ের সাড়া পেয়ে আমাকে বলল "এসো।"

ঠাট্টা করে বললাম, "তুমি এর পরে চুলও বাঁধবে বুঝি?" আমার সাহস বাড়ছিল। কিন্তু চাহনি খুব করুণ করে সে তাকাল। লম্বা লম্বা চুলের গোছা মুঠো করে ধরে বলল, "ঠাট্টা করছ? করো। সবাই তো করে।" তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এগিয়ে এসে সে তার একটা তুলতুলে হাতে আমার হাত ধরল।—"আমাকে দেখলে কার কথা মনে পড়ে, সত্যি করে বলো তো? ঠিক যেন বৃহন্নলা, না?"

বলতে গেলাম "তা কেন, তা কেন, সে কী।" বাধা দিয়ে বাঁশি বলল, সেই সুরেলা গলা কিন্তু বিষাদে আক্রান্ত "মিছিমিছি আমাকে ভোলাতে চেও না। আমি জানি। আমি বৃহন্নলাই তো। অর্জুন নই, অর্জুন কোনদিন হতে পারব না।"

একটা ব্যর্থতা বলয়ের পর বলয়, তৈরী করে ছড়িয়ে পড়ছিল। একটু পরে ক্লান্ত গলায় সে বলল, "আলোটা নিবিয়ে দাও। রাত হল। এসো শুয়ে পড়ি।"

অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। মৃদু একটা সৌরভ বিজলী পাখার ঝাপটায় ছড়িয়ে পড়ছিল। আরও খানিক পরে বুঝলাম বাঁশি উঠে এসে বসেছে আমার শিয়রে।—"ঘুমিয়েছ?"

বললাম "না।" ও কী বলবে তার অপেক্ষা করে রইলাম।

"একটা কথা বলব বলে উঠে এসেছি। এক বাড়িতে এক ঘরে আমরা থাকব, আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভালো। শোনো, বৃহন্নলা আমি ইচ্ছে করে হইনি। ওরা আমাকে সবাই মিলে করেছে।"

"সবাই—মানে ?"

"সবাই মানে সবাই। মা, বাবা, ঠাকুমা—সক্‌কলে। মা আর বাবা আজ নেই, কিন্তু বুড়িটা রয়েছে।" একটা ঘৃণা অন্ধকারেও ওর গলায় হিসহিস করছিল। ও কি কাউকে ভালবাসে না এই পৃথিবীতে ?

নিজে থেকেই এই প্রশ্নটা ধরে নিয়ে বাঁশি বলল, "কাউকে না। আমার বাইরেটাকে আমি ঠাণ্ডা কাদা দিয়ে লেপে রেখেছি। ভেতরটা রাগে ফাটছে। আমার বুকে হাত দিয়ে ছ্যাখ।"

আন্দাজে হাত বাড়িয়ে সে আমার একটা হাত ধরে তুলতে গেল। ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, "বুকে হাত-টাত, এসব ঢঙ মেয়েলী।"

"মেয়েলী, মেয়েলী !" রুষ্ট হয়ে স্যুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল সে।—"আমাকে মেয়েলী করল কে ? ওরাই তো।" বাঁশি বলে গেল "সে ভারী মজার গল্প, জানো ? একটি বোন হয়ে মরে যায় আমার আগে। আমার মা পাগলের মতো হয়ে গেল। শোকে পাথর হয়ে গেল ওই বুড়িও। সে কী রকম, বুঝতে পারছ ?"

আস্তে আস্তে বললাম, "পারছি। আমি দেখেছি।"

"তার তিন বছর পরে এলাম আমি। ওদের কী হল জানো ? বুড়ি নাকি কোন্ তীর্থে গিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, মার আবার মেয়েই হবে। যে গেছে, সে-ই ফিরে আসছে। মরা মানুষ ফিরে আসে, এ কি হয় কখনও ?"

মাথা নেড়ে নেড়ে বললাম "হয় না। কিন্তু মানুষ ভাবে। স্বপ্ন ছ্যাখে।" মা, তোমার একটা পুরনো ছবি ভেসে উঠছিল।

বাঁশি বলছিল, "হলাম আমি। ওরা আবার ঘা খেল। সেই দুঃখ ভুলতে, সেই মেয়েটা ফিরে না আসাতে কী কাণ্ড করল জানো ? অবাক হবে শুনলে। আমাকে বরাবর মেয়ে সাজিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চাইল। ফ্রক, চুড়ি, হার, বালা এসব তো ছিলই—এমন কী এই ছ্যাখো, আমার নাকে নাকছাবির, কানে মাকড়ির

ফুটোও আছে। যত মেয়েলী হাবভাব, ধরুন, সব ওই বুড়ি আমাকে বসে বসে শেখাত।"

"তুমি শিখতে কেন?"

"বারে! আমি কি বুঝতাম অতোশত? অনেক দিন অবধি আমি আমার বয়সী আর কোন ছেলে দেখিনি।"

"আষাঢ়ে গল্প।"

"আষাঢ়ে নয়। এই তো আমি তোমার সামনে বসে আছি জলজান্ত।" সে একটু থামল। বলল, "পরে আমার একটি বোন হল অবশ্য। তুমি এখনও ছ্যাখনি, তার ডাকনাম কিসমিস। ওদের মেয়ে হল, কিন্তু—কিন্তু আমার আর ছেলে হওয়া হল না।"

বললাম, "শুধু ওদেরই দোষ দিচ্ছ কেন। তুমি নিজেও কেন বদলে যেতে পারলে না?"

বাঁশি ম্লান হাসল।—"পারলাম না। অভ্যাস চামড়ার মতো সেঁটে গেল যে। ইচ্ছে করলেই নতুন হওয়া যায়। টম্‌বয় টাইপের মেয়েও আছে শুনেছ তো? ইচ্ছে হলে তারাই কি আর মেয়েলী হতে পারে? পারেনা।"

আমি বললাম, "সব বাজে কথা। ইচ্ছে করে তুমি এমনি হয়ে আছ। দোষ তোমারও। কেন, কেন এই লম্বা চুলগুলো রেখেছ? এগুলো ছাঁটতে বাধা কী?"

"বাধা? কিচ্ছু নেই।" বলতে বলতে বাঁশি শক্ত মুঠোয় ধরল ওর গুচ্ছগুচ্ছ কেশরের মতো ফাঁপানো চুল—"কাঁচি নিয়ে এসো, আমি এক্ষুনি সব কুচিকুচি করে কেটে ফেলতে পারি। কিন্তু"—দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, গা এলিয়ে দিল "তা-হলেও কিছু হবে না। আমি দু'বার তো কেটে দেখেছি। মাথা মুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল না? আমার বাবা আর মা মারা যাবার পরে? আমার সারা মাথায় চাকা চাকা দাগ—সব বেরিয়ে পড়ল একেবারে। আমাকে একা কি ওরা, ভগবানও নানা দিক থেকে মেরে রেখেছেন।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে। অতো বড়ো ছেলেকে আমি এভাবে কখনও কাঁদতে দেখিনি।

বাঁশি বলছিল "কদমছাঁট চুল রেখেও দেখলাম—সে আরও কুৎসিত দেখায়। আয়নায় নিজেকে দেখে ভয় পেতাম। আমার এই বসা চোখ, তোবড়ানো গাল, বড় বড় চুলে তবু খানিকটা ঢেকে যায়।" টুকটুকে ঠোঁটে সে একটুখানি হাসি ফোটাল, বলল "বলেছি তো ভগবানের মার। নইলে বাইরেটা না-হয় ওরা সাজিয়েছিল, কিন্তু আমার গলার স্বরও ছেলেদের মতো হল না কেন—ধরো এই তোমার মতো?"

মা, আমার কণ্ঠস্বর নিয়ে কোনও কালে কিছুমাত্র অহংকার ছিল না, বরং মোটা আর ভাঙা ভাঙা বলে লজ্জাই পেতাম, বিশেষ করে যখন থেকে জেনেছি আমার গলা বেসুরো, তখন থেকে মন রীতিমত খারাপ, এ-গলায় গান আসে না, চলতে ফিরতে কত সুরই তো শুনি, সারা জীবন শুনেই যেতে হবে আমাকে; শোনা গান নিজের গলায় কখনও তুলতে পারব না, ভারী বিশ্রী, সে ভারী অক্ষমতা মা! এ-নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত মনে কষ্টের একটা ভিমরুল পুষে রেখেছি, সেই ভিমরুলটা আমাকে মাঝে মাঝেই হুল ফুটিয়ে দিত। আজ যে আমার এতখানি বয়স, ওই ভিমরুলটাও অবশ্যই জরাগ্রস্ত, তবু তার ওই হুল ফোটানোর স্বভাব গেল না। মানুষ যত বাড়ে, ততই চারধারের দিকে তাকিয়ে আর সকলের তুলনায় তার কী আছে কী নেই তার হিসাব করে। আরও যত বড় হয়, যখন ফুরোনোর শুরু, তখন কী থাকবে, শেষের কালে কী নিয়ে থাকতে হবে, থাকা যাবে, মনে মনে তা-ও মেলায়। ব্যাঙ্কের পাশবই খুলে বসার মতো। আমি যেমন আজ দেখছি, আমার বিশেষ কিছু নেই। আমার আকর্ষণ অন্যের কাছে, অন্যের প্রয়োজন আমার কাছে, ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, সঙ্গ-অসঙ্গ, নেশা, প্রার্থনা, অর্থহীন সব। দু'পাশে হুড়মুড় করে

ভেঙ্গে পড়ছে ঘর বাড়ি, মাঝখানে সরু রাস্তা একটুখানি, প্রাণপণে তারই ভিতর দিয়ে ছুটছি, ইদানীং চোখ বুজলে প্রায়শ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। সব মানুষকেই অবশেষে বাস করতে হয় নিজেরই সঙ্গে। আর কেউ নেই, আর কেউ না। একা হবার পরে অহরহ কাটাব যে আমার সঙ্গে, কী আছে আমার? খুব গোপনে, নিজের মুখের দিকে চেয়ে আমাকে আচমকা প্রশ্ন করে বসি; দেখি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমিই বরপক্ষ, আমিই পাত্রী।

—(রাঁধতে জানো? —না। গান জানো, গান?
তা-ও না! তবে ছবি আঁকতে? ছি-ছি-ছি, কিছুই
যখন জানো না তখন তোমাকে নিয়ে করব কী!)

আমার সকাল, আমার বিকাল, আমার রাত্রি—আঃ, এই জীবনের শেষ এই কয়টা রাত্রি—যে-আমি পরিপূর্ণ করে তুলতে পারবে না, তার সতত-সান্নিধ্যের বিধিলিপি, সাধ যায় যে চীৎকার করে অস্বীকার করি। মা, একটু ছবিতে তুলির টান দেওয়ার বিদ্যা সময় থাকতে থাকতে শিখে রাখতাম যদি, ক্ষতি ছিল না। একটা উপকরণ হয়ে থাকতে পারত সেই বিদ্যাটা, অনেকেরই প্রৌঢ় বয়সে হয় যেমন।

কিংবা গান! যার গলায় আছে, তার শৈশব, যৌবন, সর্বকাল সুরে সুরে ধন্য হয়ে আছে। আছে শেষ বয়সেও, আর কিছু না হোক, নাই বা হল অন্য কারও জন্য—অন্তত শেষ পারানির কড়ি হয়ে নিজের কাছে!

আমার গান নেই, কোনও কালে ছিল না। এই শুষ্ক বঞ্চনার যন্ত্রণা বরাবর বহন করেছি। ভিতরটা যখন শব্দে-স্বাদে স্পন্দিত-মধুর, দেহও কখনও কখনও কোনও কোনও স্পর্শে হয়ে উঠতে চায় গান, গুনগুন, গুনগুন, হৃদয়-মন যেন আকুল একটা মৌচাক, তখনও গলা ফোটাতে পারি না, বোবার যে-কষ্ট, সেই কষ্ট পাই। তার কারণ আমি কণ্ঠহীন সুরহারা।

কিন্তু বাঁশিকে সেই চিলেঘরে খাটের উপর বসিয়ে এ আমি কোথায় এলাম। বেশী বয়সের মুশকিলই এই ; মুখের রাশ, ভাবনার বাঁধুনি, কথার সংযম থাকে না। প্রৌঢ় বয়সের ঘাটে বসে কম বয়সের কথা লেখা, এ কী কম জ্বালা ! বেশী বয়স বারে বারে এসে সব ঢেকে ফেলে, বড় বউ হঠাৎ-হঠাৎ শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে ; ছোট বউকে হটিয়ে খাটের দখল নিতে চায়, তার আঁচলেই সব চাবি বাঁধা কিনা !—সেই জোরে। এই বয়সের আমিও বারে বারে সেই রোগা বয়সের আমির সঙ্গে সেই ব্যবহার করছে।

থেকে-থেকেই তাই ভাবছি, দূর ছাই ! যুবকেরা যৌবন আর যুবকদের কথা লিখুক ; আমি প্রৌঢ় এই বয়সে যা পারা যায় তাই করি ; আমি বরং প্রৌঢ়ত্বের কথাই লিখে যাই। উজানে আস্থা না রেখে ভাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসি।

বসতামও হয়ত। কিন্তু তা-হলে শ্রীচরণেষু—মা ! তোমাকে প্রণাম করা যে সারা হয় না।

বাঁশি দুলে দুলে উঠছিল, বাঁশি নির্নিমেষ নীল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। বুঝলাম ও আমাকে হিংসা করছে। আমার এই ভাঙা-ভাঙা গলাকেও যে হিংসা করার কিছু আছে, সেই প্রথম টের পেলাম। বাঁশি কাঁপছিল। ওর ফুলের কলির মতো তুলতুলে আঙুল দিয়ে আমার কণ্ঠনালীর একটা শিরা স্পর্শ করল। আমি ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম। তখন ও আরও কাঁপতে কাঁপতে আরও এগিয়ে এল, আমার চোখের পাতা প্রায় স্পর্শ করে ওর নীল চোখ রাখল। আমি ছটাস করে হাত ওঠালাম। ও চমকে বলল "কী ?" বললাম, "মাছি।" মাছি ? এত রাত্তিরে এই ছাদের ঘরের হাওয়ায় মাছি ? ও যেন বিশ্বাস করল না, বিষণ্ণ দুটি চোখ দিয়ে খুঁজতে থাকল—আমার চোখের মধ্যেই সেই মাছি কিনা !

বললাম, "ছি, এ-রকম করে না।"

অদ্ভুত আচ্ছন্ন স্বরে ও বলল, "কী রকম?"

কথাটা কীভাবে বলব ঠিক করতে না পেরে বললাম "এই রকম। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এ-রকম করে না। করতে নেই।"

"ছেলে?" ফ্যাকাশে গলায় বাঁশি বলল "আমি কি ছেলে? তবে ওরা আমাকে কেন খালি মেয়ের পার্ট দেয়, বলে আমি নাকি খুব ফাইন করতে পারি? আমাদের পাড়ার ক্লাবের যে-কটা প্লে-তে নেমেছি, সব মেয়ের রোলে। আমার সংযুক্তা শুনবে? শুনিয়ে দেব একদিন। সেবার একটা সীনে এমন ফীলিংস দিয়ে করেছিলাম যে, হীরো সেজেছিল যে, সে উইংস-এর পাশে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে, তারপর জাপটে—"

বাঁশি হাঁপাচ্ছিল, বাঁশি ঘামছিল। আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিলাম। ওর চোখ চিকচিক করছিল।

ধরা ধরা গলায় সে বলল, "আমাকে ওরা একবার হসটেলে পাঠিয়েছিল। ছেলেরা কী অসভ্য তুমি ধারণা করতে পারবে না। ওরা আমাকে খ্যাপাত, দেখি দেখি বলে চিমটি কাটত, কাতুকুতু দিত শরীরের যেখানে-সেখানে। দু'তিন সপ্তাহ—সপ্তাহ তো নয়, যেন দু'তিন মাস, আমি রোজ কাঁদতাম, শেষে পালিয়ে এলাম। বুড়ি আবার আমাকে আর-একটা হসটেলে পাঠাবে পাঠাবে করছে, কিন্তু—" জোরে জোরে মাথা নেড়ে বাঁশি বলল, "আমি আর যাব না।" হসটেলে বিভীষিকার ছাপ ওর মুখ তখনও বিবর্ণ করে দিচ্ছিল, আমি ওকে শুয়ে পড়তে বললাম।

আটাশ

মেয়েলী ওই ছেলেটি, যার নাম বাঁশি, সে আমার জীবনের ওই অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত, গৌণ চরিত্র কিনা, এখন ভাবছি। আর ভাবছি এই অংশটা একটু কেটে দেব কিনা। কিন্তু গৌণই যদি হবে, তবে এতক্ষণ ধরে সবিস্তারে কেনই বা লিখলাম! নিশ্চয়ই ও তবে গৌণ নয়, আসলে গৌণ হয়ত কেউই নয়। যত জনকে আমরা জীবনভোর দেখি, যত জনের সংস্পর্শে আসি, তাদের প্রত্যেকেই ছাপ ফেলে, পুকুরে যেমন আকাশের সব তারারই ছায়া পড়ে। যে-ছাপ মুছে যায় বলে ভাবি, তা-ও বস্তুত মোছে না, তারা হঠাৎ হঠাৎ ফিরে আসে, শোধ নেয়, যেমন আমার এই শেষ লেখার খেলাটায় একে একে ফিরে আসছে অনেকে। ঠেকাতে পারি না। বাঁশি, প্রথম দিনই যে বালিশে মুখ ডুবিয়ে বলছিল ককিয়ে ককিয়ে, "আমি জানি, আমি, তোমরা যাকে হিজড়ে বলো, একরকম তাই", তাকে কি আমি একটু মমতাও করছিলাম, আর মমতা করতে পেরে নিজেই বেঁচে গেলাম?

মা, কথাটা বোধহয় একটু জটিল হয়ে গেল, কিন্তু কথাটা একটু জটিলই। এ-বাড়িতে আমরা আশ্রয়ের ভিখারী, সেই যন্ত্রণা-জ্বালা অপমানের কাঁটাতারের তারে মন যখন আষ্টেপিষ্টে বাঁধা, তখন সেই তার-টারগুলোকে খানিকটা আলগা প্রথমে করে দিল যে, সে তো ওই বাঁশিই। করুণার দাস সহসা জানল আরও করুণার পাত্র আছে একজন। ভিখারী হাতের মুঠো খুলে ভিক্ষা দিতেও শিখল, আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল তার। বাঁশি আর আমার সম্পর্ক মোটের উপর এই ব্যাপার।

সে বিচিত্র, সে অস্বাভাবিক, কিছুটা অসুস্থও, সেইজন্যেই কি তার

জন্যে মমতা আর কৌতূহল একটু বেশী খরচ করে ফেলছি? কিন্তু জানো, অসুস্থ, অস্বাভাবিক—এসবও বোধহয় দেখা, বোঝা আর বলার ভ্রান্তি। দ্বিপদ যে-প্রাণীর নাম মানুষ, তাদের মধ্যে ঠিক ঠিক অর্থে সুস্থ কে? আটপৌরে মানুষ, সাদাসিধে মানুষ—অসুস্থ প্রত্যেকে। যে-গাছটাকে দেখি সোজা উঠে গেছে, তারও তলার দিকটা খুঁড়লে, মাটি কুপিয়ে তুললে দেখতে পাব সে-ও অজস্র সরুমোটা শিকড়ের জালে জড়িয়ে রয়েছে। মাহাত্ম্য, মহত্ব এ-সবও এক অর্থে অস্বাভাবিক, কারণ আতিশয্য আছে। কেউ দয়াধর্মে অস্বাভাবিক, কেউ পরম-কারুণিকতায়—বুঝতে পারছ? কোথাও একটা কিছু গোলমাল না থাকলে কেন এক রাজপুত্র স্ত্রীপুত্র ফেলে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কিনারা খুঁজতে, জগতের যত কিছু দুঃখের রহস্য বুঝতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে? আবার অকিঞ্চিৎকর যে, সে-ও অস্বাভাবিক, যেহেতু সে সব কিছু তার রুগ্ন, অসহায় দৃষ্টি দিয়ে ছাখে। কাম্‌লার চোখে সব হলদে হয়ে যায়।

বাঁশিরও ব্যাধিটা ছিল কঠিন, সেদিন যা বুঝেছিলাম, ওর মন তার চেয়েও জটপাকানো ছিল।

মা, তোমাকে আজ সব কথাই বলা যায়, অন্তত আমি তো বলতে পারছি। বাঁশির একটা বাঁধানো খাতা ছিল। তাতে আঁটা ছিল রাশি রাশি ছবি। কিসের ছবি বলো তো? দূর, তুমি পারবে না, যা ভাবছ তা না। সে সব ছবিই ব্যায়ামবীরদের আর পালোয়ান-দের। ছবির নীচে ছাপানো ছোট-ছোট পরিচিতি।

যেদিন খাতাটা দেখাল, ভাবলাম একটু ঠাট্টা করি।—"তুমি এসব ছবি রেখেছ কেন?"

"ওদের মতো আমি হতে পারব না, তাই বলছ তো? জানি।" বাঁশি আহত গলায় বলল, "তাতে কী। ওদের পূজো তো করতে পারি?"

"হীরো ওয়ারশিপ্?"

"বলতে চাও, বলো। বোধহয় বলবে এই অভ্যেসটাও মেয়েলী ?"

"না, না। আসলে ছেলেরা কিন্তু মেয়েদের ছবিই লুকিয়ে জমায়, বিশেষ করে বিলিতি ফিল্ম্ স্টারদের। আমদের ক্লাসের কেউ কেউ জমায়, দেখেছি।"

ভুরু উপরের দিকে তুলে বাঁশি বলল, "মেয়েদের ছবি জমিয়ে আমি করব কী ? কোনও মেয়ে তো" এবার সে যেন বুকের ভিতর থেকে কল্‌জে ছিঁড়ে শিরা বের করল "কোনও মেয়ে তো আমাকে তার পায়ের নখ দিয়েও ছোঁবে না ! আমার নরম হাত, তুলোতুলো গাল—"

ওকে হাসাবার জন্যে আমি বললাম, "গালে টোল পড়ে", কিন্তু বাঁশি হাসল না। আমার হাতের পিঠ ওর চিবুকে গালে ঘষে বলল, "একটা দাড়িও আজ অবধি গজায়নি। এই গলা, এই গাল, তোমাকে বলেছি তো, সব দিক থেকে আমাকে নিয়ে মজা করেছেন ভগবান।" হঠাৎ উত্তেজিত হাহাকারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে-যাওয়া স্বরে সে বলল, "পারবে, পারবে তুমি আমাকে কোনও একটি মেয়ের ভালবাসা এনে দিতে ? একটির—যে-কোনও।" আমার হাতের পিঠ পুড়ছিল। নরম একটা মানুষের শ্বাস এতও গরম হতে পারে ?

আস্তে আস্তে আমি বললাম, "আমি তোমাকে বদলে দেব।"

ওই অঙ্গীকার অর্থহীন, তবু বললাম। বদলানো খুব সহজ একটা ব্যাপার, ওই সময়ে আমি তাই ধরে বসেছিলাম নাকি ? একটি গ্রাম্য ছেলে যেমন অনায়াসে শহুরে হয়ে গেছে, একটি মেয়েলী ছেলেও তেমনই চট করে বদলে যেতে পারে, সত্যিই কি বিশ্বাস করেছিলাম ? তবে তো তখনও বিশ্বাসের সারল্য আর প্রাবল্য দুই-ই ছিল আমার। আমি তখনও কি প্রকৃতভাবে কৃত্রিম, যথার্থরূপে শহুরে হতে পারিনি ?

সে স্থির চোখে চেয়ে আমার কথা শুনল, ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল,

"দাও, দাও। দাও, দাও।" কী দিতে বলছিল সে? তার রূপান্তর-জন্মান্তর ঘটিয়ে দিতে? সেই আর্ত প্রার্থনা ভুলতে পারব না।

কেন ছেলে হতে এত সাধ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল ওর চিত্তে—শুধু একটি মেয়ে, অথবা মেয়েদের প্রেম-প্রীতি পেতে? কোন বিপন্ন নৃপতির ঘোটক-প্রার্থনার মতো? এ পর্যন্ত যেটুকু লিখেছি সেইটুকু লিখলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু মা, এখনও ওই বৃহন্নলা বাঁশির আর-একটা দিক দেখাইনি।

এক দিন টের পেলাম, আরও একটা কঠিন অসুখে সে ভুগছে। ওর সেই দিকটায় জ্যোৎস্নার মেয়েলী মায়া নেই, সেদিকটা নিরন্তর পুড়ছে।

সেই অঙ্গারবর্ণ জ্বলন্ত দিকটা দেখতে পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। "ছেলে করে দাও, দিতে পার যদি, তোমাকে সব দেব" এটা তার সংলাপের একাংশ মাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভঙ্গিতে দ্বিতীয়াংশ উচ্চারণ করল তা বিস্ফোরণের মতো: "ছেলের মতো হব যেদিন, হে ঈশ্বর, যদি হতে পারি, তবে—"

"তবে কী?"

"আমি একটা লাথি মারব।"

"কাকে?"

"সবাইকে। সবচেয়ে আগে এই বাড়িটাকে। এর দেয়াল থরথর করে কাঁপিয়ে, এর দরজা মড়মড় করে ভেঙে চুরে ছিটকে বেরিয়ে যাব।"

"কোথায়?"

"যেখানে পারি, যেখানে প্রাণ চায়। এখানে নয়। তুমি জানো না, আমি এই বাড়িটাকে কী ভীষণ ঘৃণা করি। কত রাগ পুষে রেখেছি।"

"এ তো তোমাদের নিজেদের বাড়ি!"

"নিজেদের? থুঃ!" সে বিকৃত গলায় হাসল।—"সব বাজে।

জোচ্চুরি! নিজেদের কিচ্ছু না। আমার বাবা, তুমি জানো না, আমার বাবা ছিল ওই বুড়ির দত্তক?"

"জানি—শুনেছি।"

"তবে আর নিজেদের কী। উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। আমার বাবার বাবা, মানে আসলে যিনি বাবা তিনি ছিলেন গরীব। লোভে পড়ে ছেলে বেচলেন—বড় মানুষ আত্মীয়কে। সেই পাপ, প্রথম পুরুষের পাপ। পাপ করলেন বাবাও—সুখে মজে নিজের মাকে ছেড়ে অন্য একজনকে মা বললেন। মা বদলানো, এ কি কম পাপ?"

কিছু বুঝছিলাম, কিছু বুঝিনি। ওই মিনমিনে ছেলেটির কথার তোড়ে এবার আমার তোতলামির পালা। বোকাবোকা ভাবে বললাম, "কিন্তু তুমি তো কোনও পাপ করোনি?"

"সকলের পাপ আমার সারা গায়ে বিষ্ঠার মতো লেগে আছে", সে অস্থির স্বরে বলল, "পাপ করেছে ওরা, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। তার আগে আমাকে সত্যিকারের ছেলে হতে হবে।"

এতক্ষণ ওর একটা মুখ দেখতে পেয়েছি—যে-মুখ ফ্যাকাশে, রঙ-মাখা, সঙ সেজে থাকা। এইবারে টের পেলাম বাঁশির মনের প্রবল, সাহসী কোনও দুঃখের দিক; হঠাৎ সন্দেহ হল, ইচ্ছে করে ও সঙ সেজে থাকে। ওর এই নকল সাজ ওর আসল মনের একটা প্রতিবাদ। অমায়িক নপুংসক ওই আকারটা ভিতরে ভিতরে প্রকারে সাহসী, বক্র আর কঠিন রূপ নিচ্ছে। যারা কৃত্রিম করেছিল ওকে, আরও বেশী কৃত্রিম হয়ে ও তাদের সকলের পরে শোধ নিচ্ছে। "ছাখো, ছাখো", সে চেঁচিয়ে বলছে "কৃত্রিমতার শেষ বিকৃতিতে।"

কথাটা হয়ত স্পষ্ট হল না। ছোট্ট একটা আলো হাতে নিয়ে মনের খনির অন্ধকার খাদে যখন নেমে যাই, তখন প্রায়ই এই অসার্থকতায় ভুগি। দম বন্ধ করা কড়া গ্যাস মাঝে মাঝে নাকে এসে লাগে, হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে ফিরছি আমি সুড়ঙ্গপথে, গোলকধাঁধা

গ্যালারিতে, হাতে অস্ত্র আছে আমার, কিন্তু সেই ক্ষণে অনুভব করি অস্ত্রটা যেন ধারালো নয় তেমন, চতুর্দিকে চাপা স্বর, ছমছম, নিজেরই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনি, শ্বাসপ্রশ্বাস কি ফিসফিস, আর এদিকে-ওদিকে পিছল দেওয়াল, চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে, কোথাও জল, কোথাও ফাটলের ফাঁকে উষ্ণ ধোঁয়া, বাঁশির মনের গভীরে যখনই কথার কুলি-কামিন হিসাবে নেমে গিয়েছি—বাঁশির, অথবা অন্য কারও—তখনই ওই জল আমার হাতে ফোঁটা ফোঁটা পড়েছে, ওই গরম শ্বাস, গ্যাস বা বাতাস লেগেছে আমার নাকে।

সেদিনও লেগেছিল। ওর তলাকার ভিতরকার দেওয়ালে হাত দিয়ে প্রথমে বুঝলাম, ভিজে, স্যাঁতসেতে; পরে দেখলাম, সে-দেওয়াল পাথরের। যথোপযুক্ত শব্দগুলো পিছলে পিছলে যাচ্ছিল। আজও যাচ্ছে।

অত কসরতে কাজ কী। একটা করুণ কাহিনীকে সে বিদ্রূপের রূপে পরিবর্তিত করেছিল, বরং এইভাবে বলি। তা-হলে বলা আর বোঝা দুই-ই সহজ হবে।

মা, পরগাছা, তখনকার মতো পরগাছা, বলে আমার যে-কষ্ট, সেই কষ্ট বাঁশিরও। আমরা পরগাছা, সে পরভৃত। 'আমার গলা এত মিহি কেন জানো,' সে একবার হাসতে হাসতে বলেছিল 'আমি যে কোকিল। কোকিল যদি নিজের বাসায় বড় হত, তবে তার গলা সুরেলা না-হোক, সবল হত। আমরা ওর সুরে ভুলি, আসলে কিন্তু কোকিলের কান্নাকে গান বলে ভুল করি।'

ক্রমে যত বড় হয়ে ওঠে বাঁশি, ততই ওর মনে ওই ধারণাটা দানা বাঁধে যে, ও পরভৃত। ও, ওর মা, বাবা সবাই। যেখানে থাকার নয়, সেখানে থাকছে। যা পাবার নয়, তা পাচ্ছে। স্বাভাবিক, সঙ্গতভাবে বেড়ে উঠছে না, অনর্জিত ওই পর্যাপ্ত প্রাপ্তি স্বাভাবিক না। যেখানে ওর নিজস্ব পরিবেশ, সেখানে যদি জন্ম হত, সেই ধুলোয় কাদায় আছাড় আর গড়াগড়ি খেয়ে যদি বড় হত, তবে গড়ে-পিটে

পিটে ও যথার্থ মানুষ হত—একটা বিচিত্র বিচারবোধ থেকে সে এই থিয়োরিটা তৈরী করে নিয়েছিল। ওর মধ্যে খেদ ছিল। খেদ এই যে, ও কিন্নর।

("কিন্নর মানে শুধু কি নাচ-গান? হাবভাব ছলা-কলা মিলিয়ে কুৎসিত যে নয়, তাকেই বলে কিন্নর," বাঁশি আমাকে বলেছিল "ব্যাকরণের বইয়ে শব্দটার এই মানে দেখি। দেখে চমকে উঠি। অথচ কী দরকার ছিল আমার কিন্নর হবার? ঘামে রক্তে মাখামাখি জীবন, যে-জীবন খেটে খাওয়ার, প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার, সেই খাঁটি জীবন হলে ক্ষতি ছিল কী? আমি কেন অলস, নকল, ধনী হয়ে আছি?")

বাঁশি এইসব বলত। হয়ত এত পরিপাটি করে নয়, মাঝে মাঝে ফিনকির মতো ফুটে উঠে।—"ওরা নিজেরা এই হল, আমাকে এই-রকম করল। তাই তো ওদের আমি ঘৃণা করি, যে দু'জন মারা গেছে, আমার বাবা আর মা, মারা গেছে, কিন্তু ওদের ভূতটাকে আমার উপরে চাপিয়ে গেছে। তাই আমিও শোধ নিচ্ছি। সার্কাসের সব খেলা জানা ক্লাউন যেরকম ভাঁড় হয়ে থাকে, সেই রকম। মুখে চুন মেখে আর সুর্মার টানে টানে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এই জন্ম, এই জীবন, একটা ভাঁড়ামি।"

এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা প্রথম দেখেছিলাম বাঁশির মধ্যে। তার প্রতিবাদের পৌরুষ একটা উৎকট ক্লীবতার ছদ্মবেশ নিয়েছিল। তারপরে দীর্ঘকাল জুড়ে সময় যত জটিল হয়েছে, এই প্রতিবাদেরই রকমফের দেখেছি নানা মানুষের মধ্যে নানা আকারে। যারা রূপোর চামচে মুখে নিয়ে বড় হল; মানুষকে তৈরী করে দেয় যে লড়াই, কত লবণাক্ত অভিজ্ঞতা, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। মনের দিক থেকে অপুষ্ট থাকে তারা; অপুষ্ট আর অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাবোধ ধীরে ধীরে নিজের রাস্তা খোঁজে। বাঁশির মধ্যে খুঁজেছিল একভাবে, অন্যদের

মধ্যে খুঁজে নেয় অন্যভাবে। কিন্তু কোন-না-কোন আকারে বেরিয়ে পড়ে।

বেরিয়ে পড়ে—কী? একটা পাপবোধ, যা ব্যক্তিগত; একটা অন্যায়বোধ যা সমাজগত। সমাজের প্রতি ওরা একটা অপরাধ করছে, সচেতন বা অচেতন মনে এই পীড়া। ওরা ফলে হয় উৎকেন্দ্রিক। কোন-না-কোন নিয়মের বেড়া ভাঙতে চায়, ভাঙে। বিবেকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া যার দৃষ্টান্ত অগণিত গণিকার প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নানে, অকাতর দাতাদের দানে উন্মুক্ত সেবাসত্র অথবা আতুরাশ্রমে, কিংবা পানীয় জলের সরোবর খননে; মন্দির নির্মাণে। অযাচিত, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত প্রাচুর্যের প্রহারে জর্জরিত কেউ-বা মুক্তি খোঁজে ভীষণ দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক স্বপ্নে, কেউ গুরুবাদে, কেউ ধূমসমাচ্ছন্ন তূরীয় ভাবে বিভোর, বিদেশের গোঠে গোঠে, হাটে মাঠে বাটে নামগান কণ্ঠে ধরে। মূলে এক মনস্তত্ত্ব—একঘেয়েমির গারদে কয়েদীদের পালানোর প্রয়াস।

বাঁশি বেশীদূর পালাতে পারেনি, শুধু কিম্ভুত থেকে কিম্ভূততর করে নিজের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে চলেছিল।

মাঝে মাঝে ওই বাঁশি আমাকে দস্তুরমত খাবি খাইয়ে দিত। শুধু একটি মেয়েলী ধরণের ন্যাকা ছেলে হলে এত ভাবনা হত না।

সকালে যখন বাগানে বেড়াত সে, শিস দিত, গলা নকল করত দোয়েলের, কোকিলের, তার যা পার্ট তাই যখন করত সে, তখন কোথাও কোনও গোল আছে বলে মনে হত না। পায়ে লপেটা, কাচিপাড় ধুতি, পায়ের তলায় কোঁচা লোটানো—সেই কালের সেই বাবুদের প্রতিমূর্তি একালে আর বিশেষ চোখে পড়ে না। বাড়িতেও বরাবর ওই বেশে থাকত বাঁশি, কিংবা রেশমী পা-জামায়, মুগা বোনা পাঞ্জাবি, যার সর্বদাই গিলে করা আস্তিন—আর? লপেটার বদলে

কখনও-বা জরির কাজ-করা নাগরা। ওটাও ওর একটা প্রতিবাদ নাকি, ফাঁপানো বেলুনের ভিতরে গিয়ে সেটাকে ফুটো করে দেওয়া? "নবমীর গৌরীশৃঙ্গে বসে পা নাচিয়ে দেখছি," সে বলত হেসে হেসে, গন্ধভরা রুমালে খালি খালি ঘাড়-গলা মুছে মুছে "দেখছি যে কেমন লাগে। ভাল লাগবে না যে-ই, অমনই ঝাঁপ দেব ঝপ করে।"

যদিও সে হাসত, তবু আমার বুক ঢিপ ঢিপ করত।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলাম "বাঁ—শি"। সে শান-দেওয়া থামাল। তার চোখ তার হাতের ক্ষুরটার মত ঝকঝক করছিল। শান্ত গলায় বাঁশি বলল, "ভয় নেই। গলার রগ-টগ কিছু কাটব না। আমি শুধু পরখ করছি। এতেই ভয় পেলে? তুমি ভাই, আমার চেয়েও মেয়েলী।"

তার স্বর স্বাভাবিক, তার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই স্বাভাবিক, কিন্তু চেয়ে দেখেছি, সেই দৃষ্টি পাগলের।

তবু সেই দৃষ্টি দিয়েই সে যেন ভরসা দিতে চাইল আমাকে।— "ভয় নেই। রক্তারক্তি কিছু ঘটাব না। বড় জোর গালের চামড়া কেটে-টেটে ফেলতে পারি। তার বেশী না।"

"তুমি—তুমি দাড়ি কামাবে?"

চোখ টিপে সে বলল, "বাঁজা ডাঙায় চাষ, না? হা-হাঃ—হাঃ।"

"তোমার সব ঢঙ, সব থিয়েটারি।"

"থিয়েটারই তো করি। ওই একটা জিনিসে এখনও যা মজা পাই। মেয়ে সেজে স্টেজে নামি, কেউ এতটুকু খুঁত ধরতে পায় না। সব্বাইকে ঠকাই, ছি-ছি। নতুন একটা প্লে নামছে ক্লাবে—এটা দারুণ নতুন ব্যাপার, সোস্যাল। যাবে রিহার্সাল দেখতে?"

বললাম, "যেতে পারি।"

পর পর কয়েকদিন সত্যিই পার্ট নিয়ে মেতে রইল সে। একটা খাতা এনে মুখস্থ করছে সারা সকাল, কখনও গভীর রাত্রে আমাকে-জাগিয়ে তুলছে।—"শোনো শোনো এইখানটা। কেমন তুলেছি?"

সত্যি ওর উচ্চারণে, ভঙ্গিতে কোনও খুঁত ছিল না, টেরচা করে তাকানোর কায়দাও ছিল অদ্ভুত। বুকের উপর মাথা রেখে খানিকটা হয়ত আমার প্রাণস্পন্দ শুনল সে, তারপরেই ঠেলে দিয়ে বলল, "পার্ট করছি তো! ভাই, রাগ করলে?"

রাগ?—ওর উপরে করা যেত না, তবে গা যেন কেমন করত।

তবু ওর হাত থেকে ক্ষুরটা কেড়েই নিতে হল একদিন। সেদিন ও কাঁপছিল। ধমক দিয়ে বললাম, "ছি, করছ কী। আজ রিহার্সালে যাবে না?"

"গিয়েছিলাম। আর যাব না। যেতে হবে না।" যে আঙুল দিয়ে ক্ষুরের ধার একটু আগে চেপে ধরেছিল সে, সেখানে যেন সদ্য সকাল হচ্ছে, এই রকম কয়েকটা দীপ্ত রেখা ফুটছিল।

সেদিন মুখে কিছু মাখেনি বাঁশি, মর্মাহত দুটি চোখ সুর্মার ব্যাপারেও নির্লিপ্ত ছিল। হাতের পাতায় চোখ ঢেকে সে বলল, "আর যাব না। আমাকে ওরা বোধ হয় ওই নায়িকার পার্টটা আর দেবে না। একটা মেয়ে এসেছে। কোথা থেকে ওরাই ধরে এনেছে।"

"মানে?"

"মেয়ে মানে মেয়ে। বুঝতে পারলে না? মেয়ে দিয়ে মেয়ের পার্ট করানো আজকালকার হাওয়া—পাবলিক স্টেজে আগেই ছিল, এখন এইসব ক্লাবেও লেগেছে। আমি করতাম, সেটা ক্লাবের দু'চার-জন মাতব্বরের পছন্দ হচ্ছিল না। তবে অনেক টাকা চাঁদা দিই তো, তাই চট করে সোজাসুজি বলতে চাইছে না আমাকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। সেই মেয়েটা আজ এসেছিল। সারাক্ষণ বসে থেকে থেকে আমার পার্ট বলা শুনল। একবার এক-জনের ইশারায় উঠে এসে কী করে কোমর দুলিয়ে গোড়ালির ওপর ঘুরে যেতে হয়, আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি সব বুঝতে পারছিলাম, আমার পা কাঁপছিল; মুখস্থ পার্ট তো! আমার তাও ভুল হয়ে

যাচ্ছিল। যে ছেলেটা হীরো, সেই যে, আমাকে যে একবার ফীলিংস-এর মাথায় উইংস-এর কোণে···, সে কী করল তখন? মুখ ভেংচাল, আমাকে ঠেলে দিল। আমি বুঝতে পেরেছি, এই ছেলেটাও লোভে পড়েছে, ও চাইছে ওর অপোজিট রোল-এ ওই মেয়েটাকে কাছে পেতে। আমি বুঝি না?"

তকতকে মেঝে, আলো-জ্বালা ঘর, কিন্তু সেখানে একটা সাপ হিসহিস করছিল!

"আমি বুঝি!" বাঁশি বলছিল, "বুঝি সব। ওরা মিছিমিছি আমাকে মিথ্যে কথায় ভোলাতে আসছে। আমি বুঝেছি আগেই। সেক্রেটারি, ধাড়ি উকিল ব্যাটা, তারও নোলা ঝরছে, সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে কত কী বলল, ইনিয়ে বিনিয়ে। আমি যেন কিছু মনে না করি। যুগ পালটাচ্ছে! যুগের রুচি, যুগের দাবী—এইসব মেয়ের পার্টে ছেলে দেখলে এখনকার লোকে নাকি নাক সিঁটকোয়, ছ্যা-ছ্যা করে।"

রক্তশূন্য মুখে বাঁশি চেয়ে ছিল। দৃষ্টির শূন্যতাও এত ভয়ঙ্কর হয়, উপস্থিত দ্বিতীয়জনকে আক্রান্ত করে—আমি দেখিনি আগে।

"ওরা এখন ছ্যা-ছ্যা করে, করুক।" বাঁশি আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু আমি করব কী? এতদিন ধরে মেয়ের পার্ট করার বিদ্যে যে রপ্ত করলাম, সব হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল? আমি করব কী! আমার অন্য এক লাইন রোলও জুটবে না যে। প্রতিহারী, কাটা সৈনিক—কিছুতে আমাকে তো নেবে না। মেয়ের রোল গেল, ছেলেদেরটা পাব না, আমি, আমি তবে কি একটা না-মানুষ হয়ে যাব?"

"করব কী", "করব কী"—দেয়ালঘড়ির লক্‌লকে জিহ্বার মতো একটা জিজ্ঞাসা তালে তালে ঠকঠক করে বাজছিল।

বাঁশির হাত থেকে ক্ষুরটা একটু একটু খসিয়ে নিলাম আমি। পকেটে পুরে বললাম, "সব ঠিক হয়ে যাবে, কাল তোমার সঙ্গে রিহার্সালে যাব, কেমন?"

কোন্ ভরসায় সেদিন বলেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে? রিহার্সালের ওখানে কী ঘটবে কেউ কি আমাকে তার আভাস দিয়েছিল, আমি কি জানতাম? কত ঘটনা সামনের দিকে লম্বা লম্বা ছায়া আগে থেকে ফেলে রাখে?

এটা ঠিক, বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল, অবাক হয়েছিলাম। অথবা ততটা হইনি যতটা হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কলকাতা অনেক আগে থেকেই ভোঁতা করে দিয়েছিল আমার অবাক হওয়ার ক্ষমতা।

বাঁশি আগে থেকেই ছিল ওখানে, আমি একটু পরে গিয়েছিলাম। বুকের উপরে মুখ ঝুলে পড়েছে, বাঁশি বসেছিল একটা চেয়ারে। পার্ট বলছিল না, যদিও মহলা শুরু হয়ে গেছে। বলছিল অন্য একজন। আমি বাঁশির কাঁধে হাত রাখলাম, সে চোখ তুলল। মাছ মরে গেলে যে চোখে তাকায়, সেই চোখ। আমাকে সে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বসতে বলল, চোখের ইশারাতেই আসরের দিকে দেখিয়ে দিল।

> (মা, আমি মাঝে মাঝে চৌবাচ্চায়, পুকুরে শিশি ডুবিয়ে মজা করেছি। ব্রু-ব্রু-ব্রু, ডুবতে থাকা বোতল-শিশি কী বলতে চায়, বুঝতে চেয়েছি। কখনও কখনও মনে হত আমি যেন ওই অর্ধস্ফুট ভাষা বুঝতে পারি। সেদিন মনে হল, পড়তে পারছি বাঁশির চোখের ভাষা—"ওই যে। ওই তো। সেই মেয়েটা। আমাকে হঠিয়ে দিয়েছে। আজ পার্ট বলছে।")

আমি দেখলাম—দেখলাম কাকে?

মা, যদি অনুমতি করো, তবে এই ব্যাপারটার ঘণ্টাখানেক পরে শোনা একটা সংলাপ দিয়ে শুরু করি।

"আমি ট্যাক্সি হয়ে গিয়েছি।" বুলা বলছিল, ওই আসরে নয়, ওদের ঘরে বসে। কিংবা "বসে" বলা ঠিক হল কি?—আধশোয়া হয়ে।

আধশোয়া হয়ে বুলা বলল, "তুই বুঝিসনি এখনও? আমি ট্যাক্সি হয়ে গিয়েছি।"

ট্যাক্সিতে আমরা তো এইমাত্র এলাম বুলা। মানে, তুমি এলে, আমি তোমার সঙ্গে এলাম। ট্যাক্সি হয়ে যাওয়া আবার কি?

এইসব কথা নাড়াচাড়া করছিলাম মনে মনে, আমি, মা, তোমার ছেলে, ভ্যাবা গঙ্গারাম আমি। কিন্তু বুলা বুঝল। এমনিতেই বরাবর পাকা সে, তাতে আবার বিশেষ একটা বয়সে, বিশেষ করে এক-একটা পরিস্থিতিতে, সব মেয়েই অন্তর্যামী। বলল "বুঝিসনি? তার মানে তোর এই ক'বচ্ছরের কলকাতায় থাকা বৃথা গেছে। যা ছিলি তাই আছিস, সেই একই রকম গাঁইয়া।" বুকের উপরে একটা বালিশ এনে সিলিং-এর ফ্যানটার দিকে তাক করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল বুলা, ফের লুফে নিচ্ছিল, চেপে ধরছিল বুকে, সাধের বেড়াল-ছানাকে যেমন চেপে ধরে। আর যেহেতু আমি তখনও গাঁইয়া, ব্যাখ্যাও করে দিল সেই।—"ট্যাক্সি মানে হল গিয়ে ট্যাক্সি। আচ্ছা, বাড়িগাড়ি বুঝিস তো? বাড়িগাড়ির ক'জন মালিক থাকে?"

থতমত খেয়ে বললাম, "একজন। একজনই থাকে বলে তো জানি।"

"বাঃ, এই তো চাই, এই তো। ঠিক বলেছিস। আর ট্যাক্সির?"

"মালিকের কথা জানি না, তবে—তবে সবাই চড়ে।"

"আবার ঠিক। তবে ফুল মার্কস হল না একটুর জন্যে। চড়ে কথাটা শুনতে বিশ্রী। চড়ে না, চড়ায়।—স্টেজে। ট্যাক্সির যে নিয়ম একদম তাই। যে ভাড়া দেয়, সেই চড়তে পারে।"

বলে উঠে বসল বুলা। গালে হাত রেখে আমাকে দেখল। অনেকক্ষণ ধরে, চোখ ভরে। ওর চুলের একটা ফুল ছিঁড়ল, শুঁকল,

চটকালো তার পাপড়ি, ছড়িয়ে দিল বিছানার চাদরে। খুব জহুরীর গলায় বলল, "তুই বদলে গেছিস—অনেক।"

"আমার কিন্তু সব শোনা হল না বুলা। টেনে এনেছ, অথচ সেই থেকে খালি বাজে কথা বলছ। তুমি—তুমি, বদলেছ তো তুমিও।"

"মেয়েরা বদলায়। তাড়াতাড়ি।" বুলা বলল, ফের সোজা হয়ে বসে ঢেকে ঢুকে বসার ভঙ্গি করল।—"এই! ওভাবে তাকাবি না বলছি। তাহলে চোখ গেলে দেব। আর ক'বছর আগে হলে তোর নাক টিপে দুধ গেলে দিতাম।"

খোলাখুলি সব লিখছি বলে যত বড়াই করেই না থাকি, তবু, মা, কীভাবে তাকাচ্ছিলাম, তোমাকে খুলে লেখা যাবে না। কীভাবে তাকাচ্ছিলাম, কিংবা বুলা তাকাতে দিচ্ছিল।

একটু পরে হাই তুলল সে, "যাই গা ধুয়ে আসি" বলে উঠে গেল। "তুই যেন পালাসনি। কী খাবি, চা? না, আর কিছু? আমি যাব আর আসব। বড় জোর দশ মিনিট। গা ঘিনঘিন করছে, গুলিয়ে উঠছে বড্ড। মাকে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"মা? তোমার মা বুলা? লীলা মাসি? তিনিও কি—"

"এখানে থাকেন।" বেরিয়ে যেতে যেতে বুলা ঘাড় ফিরিয়ে হাসল—"মা আর মেয়ে দেখছ তো, আবার একসঙ্গে মিলেছি।"

দেখছি। ঘড়ির দুটো কাঁটার যে সম্পর্ক, বিশেষ দুটি মানুষের সম্পর্কও মাঝে মাঝে দেখা যায়, কতকটা তাই। ছেড়ে ছেড়ে যায়, আবার ঘুরে এসে এ ওকে জড়িয়ে ধরে। বুলা আর তার মার ব্যাপারটাও তাই কি না ভাবছিলাম, এক সঙ্গে মিলেছি, এক সঙ্গে মিশেছি, বুলার ছুঁড়ে দিয়ে যাওয়া কথাটার তাৎপর্য কী, দেখছি কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে।

('মিলিনি। মিথ্যে কথা'। লীলা মাসির গলা বাজছে ঢংঢং করে।—'এই পর্যন্ত বলতে পার, আমি ওর এখানে আছি। আছি, উপায় নেই বলে'—'এটা ওর

শে. ন.—২৬

বাড়ি মাসিমা, মানে বুলার?'—'বুলারই তো। ও ভাড়া দিচ্ছে, কিংবা ওর হয়ে কেউ দিয়ে দিচ্ছে।')

রাগে লীলা মাসির মুখ আরও বড় দেখাচ্ছে, সম্প্রসারিত ভাবার্থের মতো, বেশ কিছুকাল পরে ওঁকে দেখছি তো, মুখের সেই লম্বা ডিমের ছাঁদটা একেবারেই নেই, পুরনো খাদ মাটিতে বুজে আমার মতো চাপ চাপ মাংসে ভরে গিয়ে মুখটা গোলাকৃতি দেখাচ্ছে।

আগে লীলা মাসির চাউনিও ছিল যেন অন্যরকম—বলো তো কী রকম? ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে, খিদে পেলে যেমন খিনখিনে দেখায়, কতকটা সেই রকম। কখনও কখনও সেই চোখে উনি অন্য ভাবও আনতেন। চোখ দুটো এখন বেশ খানিকটা নীচে, কুয়োতে দড়িবাঁধা বালতি খানিকটা নেমে, আরও নামবে কিনা সেই অপেক্ষা করছে।

বয়স, এ কি বয়স, আমি ভাবছিলাম। তার ব্যবহার-আচার দেখছিলাম। বুলাকে বদলে দিল কে মোটে এই কয় বছরে?—বয়স। চমৎকার একটা সাজির মতো করে সাজিয়ে দিল। আবার তীরের মতো তীক্ষ্ণ লীলামাসিকে এমন থপ্‌থপে কে করে দিল, তিনি বসেছেন প্রায় গোটা চেয়ারটা জুড়ে, দেবার নাম করে কে তাঁর অনেকখানি, ঠিক কী-জিনিস জানি না, কিন্তু অনেকখানি কেড়ে নিল—কে, কে? সেও ওই বয়সই তো! একজনকে যে দেয়, অন্যজনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। একই মালিক একদলকে বহাল করছে, ছাঁটাই করছে অন্য দলকে। কেউ ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে হয়ে লাথি মারল একটা কুকুরকে, অথচ আর-একটাকে কোলে তুলে নিল। সময়েরও সেই পক্ষপাতী রীতি, লীলামাসীকে দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম।

নিজেদের আমরা সর্বদা দেখি না তো, অথবা একটানা দেখি বলে তফাতটা টের পাই না, চমকে উঠি অনেকদিন পরে পরে এক-একজনকে দেখতে পেয়ে। দিন, মাস, বছর,—বছর মানে একটা সময়ে শুধু পাওয়া, আর-একটা সময়ে খালি হারানো, ফুরিয়ে যাওয়া।

উনত্রিশ

চেয়ারে বসে আছেন লীলামাসি, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, হাত দুটি কোলের উপরে বিন্যাস করা। কোথায় সেই টানটান সোজা ভাব, উদ্ধত গ্রীবা, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ক্রমাগত চাওয়াকে ছড়িয়ে যাওয়া, আমি সেই লীলামাসিকে কোনওখানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কোলে রাখা হাতের আঙুলে আর একটা আঙুল ওঠা-পড়া করছিল তাঁর। জপ করছেন? নখ খুঁটছেন? ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

আবার সেই অলৌকিক ব্যাপার ঘটল, আমার চেনা চরিত্র-গুলোকে নিয়ে জীবনে বারবার যা ঘটতে দেখেছি। যাকে এক ভাবে দেখে দেখে একটা ধারণা রপ্ত করে নিয়েছি, ধরেই নিয়েছি একে আমি চিনি, সে হঠাৎ তার মুখের অন্য দিকটা ফিরিয়ে একেবারে সব হিসাব ভুল করে দিল। তা-ছাড়া—যাকে বলছি অলৌকিক—একজনের মুখে অভাবিত একজনের ছায়া পড়েছে। যেমন লীলামাসির মধ্যে সেই সময়টাতে দেখতে পাচ্ছিলাম তোমাকে। সেই বিষাদে বিরাট হয়ে যাওয়া প্রতিমা। জানি এই ছায়া স্থায়ী নয়, এই চিহ্ন থাকবে না, তবু মুছছে না যতক্ষণ, ততক্ষণ দৃষ্টিকে আতুর করে রাখে।

লীলামাসি উঠলেন, বন্‌বন্‌ পাখাটার সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে সেটার গতি কমালেন, বাড়ালেন একবার, আসলে বোঝা যায় উনি চঞ্চল, কোথাও অস্থির, হয়ত বা আমার হঠাৎ এসে পড়াতে কুণ্ঠিত, অপ্রস্তুত বুঝিবা, অথবা সেই উনি আর এই উনি, নিজের এই পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাচ্ছেন আমার চোখের আয়নায়, তাই উঠে যাচ্ছেন একবার, ফের বসছেন, নইলে ওই ফ্যানের বন্‌বন্‌ বাড়ানো-কমানোটা আসলে কিছু না।

"বুলার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?"

বললাম "থিয়েটারে—এক থিয়েটারে। ক্লাবের মহলায়।

"কী বই?" আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন একবার, অথচ নামটা যখন বললাম তখন শুনলেন না কি শুনতে পেলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, নিজেই বললেন একটু পর, "হ্যাঁ, ওর তো আজকাল বেশ নাম। ডাক আসে নানা জায়গা থেকে।"

('ট্যাক্সি হয়ে গিয়েছে', ওই কথাটাই কি অন্যভাবে বলতে চাইলো লীলামাসিমা?)

মাঝখান দিয়ে তরতর সময় বয়ে যাচ্ছে, দু'জন বসে আছি দু' পাশে। মাঝে মাঝে কথা থাকছে না। বুলা এল না কেন এখনও, দশ মিনিট বলেছিল, না পনেরো? যতই হোক, নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে? এক-একটা মিনিট এক-এক সময় যেন সোলা কিংবা পাখির পালক, হাওয়ায় ওড়ে; কখনও বা প্রতিটি সেকেণ্ড হয়ে ওঠে পাথরের টুকরো, যা দিয়ে মেয়েরা মালা গাঁথে।

কিছু বলব কিন্তু কী বলা উচিত ঠিক করতে না পেরে একবার বললাম, "আপনার সেই গানের স্কুলটা—নেই বুঝি মাসিমা?" বললাম খানিক ইতস্তত করে।

"গানের স্কুল, গানের স্কুল", উনি মাথা নেড়ে চলেছেন, কথাটার যেন ঠিক অর্থ বুঝছেন না।—"কিসের স্কুল বললে? গানের তাই না? ছিল বুঝি? ও হ্যাঁ-হ্যাঁ ছিল। কিন্তু নেই তো। উঠে গেছে। না, না, না", হঠাৎ তীব্রস্বরে বলে উঠলেন তিনি—"তুমি ভুল বলছ। কোনও দিন ছিল না।"

"বুলা বলত যে।"

"মিথ্যে কথা বলত। আমার মেয়ে কী সাংঘাতিক, তুমি তার কতটুকু জানো!"

পা মচকে পড়লে যেভাবে লোকে যে-কোন রকমে উঠতে চেষ্টা করে, আমিও তখন তাই করছি।—"তা-হলে ওই যে বুলা বলত, প্লে-টে্ল।"

"না। ও-সবও কিছু নেই।" তিনি আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন মানে দূরে চলে গেলেন। এ-ও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তোমরা তোমাদের কালেও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ? যারা ধরো এক আসরে আছে, হাসি-মশকরা চলছে, তারা কাছাকাছি আছে। কিন্তু যেই কেউ চুপ করে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুদূর হয়ে গেল। কথা থামলেই পরস্পর বলে কিছু থাকে না, সবাই পর-পর।

"বুলা আপনার গুণ পেয়েছে। মানে পার্ট-টার্ট করার আর কী।" আমি মরীয়া হয়ে বললাম। আমি তোতলামি করলাম।

"বুলা আমাকে ছাড়িয়েছে।" তিনি সংক্ষেপ করে দিলেন।

আরও খানিক সময় যেতে লীলামাসি, তখন আর বিষণ্ণ বলা যায় না তাঁকে, গম্ভীরও নন ঠিক, বরং উদাস কিছুটা, শেষ মাঘের হাওয়ায় হিম-টিম শুকিয়ে গিয়ে যে ঔদাস্য থাকে, বললেন, আস্তে আস্তে "তারপর কেমন আছ তোমরা। মা? বাবা? ভালো, সবাই ভালো তো?" যেন এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে তাঁর, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, অথচ জরুরী খবরাখবরগুলো তো নেওয়া হয়নি?

"বাবা বিশেষ ভালো নেই, মাসিমা।"

"তোমরা সেই বাসাতেই আছ তো। তোমার বাবা ওই থিয়েটারেই আছেন তো?"

"আপনি কিছু জানেন না?" বলেই বুঝলাম অবাক হওয়ার মানে নেই। ওঁর কিছুই জানবার কথা নয়।

"না, মানে, আমি—আমরা তো—।" বুঝলাম লীলামাসি যে অনেক আগেই ওই বাড়িটা ছেড়েছেন, সেটা বলতে চাইছেন। কিন্তু সোজাসুজি নয়, কারণ তাঁর কাছে প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর।

তখন সব বলাম তাঁকে। বাবার ভীষণ অসুখ, অক্ষম হয়ে যাওয়া, এইসব। কেবল মা, বললাম না, বলতে পারলাম না যেখানে তখন আছি সেই বাগানওয়ালা বাড়িটার কথা, বলতে পারলাম না যে, আমরা আশ্রিত।

লীলামাসি শুনলেন সব। মন দিয়ে শুনলেন, অথবা মনের মধ্যেই মগ্ন হয়ে গেলেন। আমার কথা ফুরোতে বললেন, কতকটা খাপছাড়া ভাবে, "তোমার বাবা পালা-টালা, মানে নাটক লিখছেন নাকি আর ?" ওঁর স্বরে সামান্য ঠাট্টার ছোঁয়াও ছিল কিনা সেটা আবিষ্কার করব বলে আমি ভালো করে তাকিয়ে রইলাম।

ছিল না। তখন বললাম, "মাসিমা, বাবাকে ইদানীং তো ছাখেননি আপনি। উনি একেবারে আলাদা মানুষ। বোধ হয় ছেড়েই দিলেন সব। বোধ হয় কিছুই আর লিখবেন না।"

"ছেড়ে দিলেন ?" মনে হল লীলামাসি একটু যেন নড়েচড়ে বসলেন, একটু যেন উৎসুক হলেন।—"ছেড়ে দিলেন সব তো ধরে রাখলেন কী ? আমি জানি, কী। কিচ্ছু না।" এতক্ষণে ওঁর মুখে খানিকটা হাসি দেখা গেল, খানিকটা হালকা হলেন।—"কিচ্ছু না। একটা সময়ের পরে লোকে শুধু যে-যার চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরতে পারে। আর কখনও-কখনও পারে পাশের বালিশটা চেপে ধরতে। আর কিছু ধরে রাখতে পারে না।"

এই কঠিন কথাটা বলার পরেও বসে ছিলেন লীলামাসি। অল্প অল্প হাসছিলেন। ওই হাসি আমি চিনি। পরাস্তের হাসি, প্রহৃতের ; কিন্তু সে-হাসি দিব্য। আমি চিনি। বাবার মুখে দেখেছি।

লীলামাসি চেয়ারটাকে আর-একটু কাছে টেনে আনলেন। সেই হাসির সঙ্গে একটা লজ্জা চটকানো হয়ে গিয়ে অপূর্ব এক আচার তৈরী হয়ে গেছে, সেই আচারে ওঁর ঠোঁট মাখামাখি, আমি দেখতে পাচ্ছি, লীলামাসি গলা নামিয়ে বলছেন, "তোমার বাবাকে একটা কথা বোলো, বলবে তো ? উনি যেন সামলে নেন। আমি ইচ্ছে করলেই ওঁকে সেদিন নাট্যকার করে দিতে পারতাম, উনি হয়ত এই ধারণাটা নিয়ে বসে আছেন। ওঁর অভিমানও থাকতে পারে। ওঁর পালা আমি সেদিন পছন্দ করিনি, ঠিক। কিন্তু বোলো, তুমি তো দেখে গেলে, তুমি বোলো, আমার ইচ্ছে কি ওঁর ইচ্ছেয় কিছু যায়

আসে না। আমাদের সকলের ইচ্ছের ওপরে আরও একজনের ইচ্ছে আছে, তিনি আমাদের দু'জনকেই খারিজ করে দিয়েছেন। খারিজ—নাকচ—বাতিল। আমারও আর অভিনয় করা হয়নি। মেয়ের হাত তোলা খেয়ে বেঁচে আছি। বোলো। তুমি তো দেখে গেলে।”

“উনি—উনি যেন মনে কোনও দুঃখ না রাখেন।”—একটু থেমে লীলামাসি আবার বললেন।

“বাবার তো কোনও দুঃখ নেই মাসিমা।”—কী ভেবে বিমূঢ়ের মতো বললাম।

লীলামাসি এক দৃষ্টে চেয়ে কথাটা শুনলেন।—“দুঃখ নেই?”—বলেই তিনি আমাকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসলেন। “তোমার বুক পকেটে কী?” চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিলাম। জড়োসড়ো হয়ে বললাম, “কই, তেমন কিছু তো—” মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বললেন, “নেই। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার জামার ভেতর-পকেটে কী আছে, তা তো বলতে পারব না।” একটু থেমে, মেঝের উপর দিয়ে টুকরো কাগজ উড়ে যাওয়ার স্বরে লীলামাসি বললেন, “কার যে কোথায় কী লুকোনো থাকে, তুমি জানো না।”

ভিতরের প্যাসেজে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। লীলামাসির মুখের ভাব বদলে গেল অকস্মাৎ, গলার স্বরও। বললেন, “তুমি আজ কী-করে এখানে এসেছ জানি না, হয়ত বুলাই ধরে এনেছে তোমাকে। কিন্তু তুমি আর এসো না। বুলা—বুলা অন্য ধরনের মেয়ে। নিজের মেয়ে, তবু বলছি, তুমি কী রকম পরিবারের ছেলে তা জানি তো, তুমি পারবে না।”

(ট্যাক্সি হয়ে গেছে? সেই একটি বাক্য যেন রেকর্ড হয়ে গেছে, সেটাকেই আর একবার বাজালাম

মনে মনে, লীলামাসির মুখের দিকে চাওয়ার মতো ভরসা ছিল না। তিনি চেয়ারটাকে ফের নিয়ে গেছেন একটু দূরে টেনে। এক খণ্ড মেঘ একটুখানি বৃষ্টি ঝরিয়েই গেছে।)

ঘরে স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম একটু সৌরভ ছড়াচ্ছিল কোনও জলোদভিন্ন সতেজ, সবুজ শৈবালের যে-সৌরভ থাকে; সদ্য-স্নানে মানুষেরা যে-গন্ধ পায়, তাই ছড়াচ্ছিল। ঘাড় ফেরাইনি, তবু টের পেয়েছি বুলা এসেছে।

দুটি অঙ্কের মাঝখানে সে-আমলে কনসার্ট বাজানোর চমৎকার একটা নিয়ম ছিল, বাঁশি-বেহালা প্রভৃতি সহযোগে মনমাতানো এক বাদ্যবৃন্দ। শেষ হল যে-দৃশ্য তার রেশ ধরে রাখত সে, পরবর্তী উত্তোলন-উন্মোচনের জন্যে উৎসুক করে রাখত।

তোমাকে নিবেদিত এই পত্রে, কতকটা অর্ধচেতন ভাবে আমিও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি নাকি! এক-একটা ঘটনার অবতারণা করি, ছত্রের পর ছত্রে আঁকা হয়ে যায় এক-একটা চরিত্র, তারপর? তার-পর কী? যেই একটু বিরতি, অমনি ফাঁকটুকু নিজের কিছু ভাবনায় ভরে তুলি।

যেমন এক্ষুনি। বুলা ঘরে এসেছে, থাক; না-হয় অপেক্ষাই করল কিছুক্ষণ। তাকে দাঁড় করিয়ে বরং একটু ভেবে দেখি, লীলামাসির ছবিটা এত যত্ন করে আঁকলাম কেন এতক্ষণ।

তার কারণ, মা, আমি ফিরে ফিরে এই লেখাটার যেটা মূল সুর, তাকে ফিরে পেতে চাইছি। মূল সুরটা কী? জগতের কাছে একটা ফরিয়াদ, একটা জবানবন্দী। যারা ভুল বুঝেছে আমাকে, অন্যায় করেছে আমার প্রতি; অবরেণ্য অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে যাদের তাদের ধিক্কার দেব, অভিযুক্ত করে যাব। অথচ কী আশ্চর্য, লিখতে

লিখতে অনুভবে হঠাৎ এই কথা এল যে, যারা যতই ভুল বুঝে থাকুক আমাকে, আমিও তো ভুল বুঝে থাকতে পারি অনেককে? আমার বোঝাটাই ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে? উপলব্ধিটা লেখার ধাঁচটাই বদলে দিল, জেনে গেলাম কিনা যে শেষ বোঝাপড়া বলে কিছু নেই, বোঝাপড়ার কোনও অর্থ নেই বৃহৎ কালের পরিধিতে মহৎ পরিবেশের বিশাল ছায়াতে নালিশ-টালিশের ব্যাপারগুলোই সঙ্গতি-হীন, অসঙ্গত। ফলে অভিযোগ অন্তরিত হয়ে গেল ক্ষমায়—ক্ষমা করায় আর চাওয়ায়।

আর যেহেতু মা, এই পর্ব আগাগোড়া অধিকার করে নিলে তুমি, আচ্ছন্ন করে রইলে, তাই সব নিবেদন হয়ে গেল তর্পণ। সেই তর্পণই আমাকে চকিত করে বলে দিল, আমার পক্ষে যা সত্য, তা তো সত্য হতে পারে তোমার পক্ষেও।

মা, তুমিও তো যত দিন বেঁচে থেকেছ, অনেক জ্বালা পেয়েছ আর অশেষ যন্ত্রণা, অবিচার আর অবহেলা। দৈবী আর মানুষী স্বভাবের ক্রমাগত পালাবদল প্রত্যক্ষ করেছি তোমার মধ্যে : এই ক্ষণে উদাস, এই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। পরিচিত আর স্বজনের কতজন ভুল বুঝেছে তোমাকে। কিন্তু—কিন্তু মা, সহসা মনে হল, তুমিও যদি ভুল বুঝে থাকো তাদের কাউকে কাউকে? যদি তাদের সম্পর্কে ক্ষোভ, অ-ক্ষমা, ঘৃণা নিয়েই তোমার মৃত্যু হয়ে থাকে? তবে তো চলে গিয়েও মুক্তি পাবে না তুমি, ইহজাগতিক কষ্ট ওই লোকেও তোমাকে অনু-সরণ করবে। এই তর্পণটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

তাই তো, মা, প্রথমে যদিও ভেবেছিলাম, খালি আমার কথাই বলব, আমার পাপ, আমার অন্যায় সব কিছুর স্বীকারোক্তির প্রক্ষা-লনে তোমার কাছে সাফ হয়ে যাব, তবু ক্রমে ক্রমে মনে হল ডেকে আনি আর সবাইকে : বাবা, সুধীরমামা, ভামতী, এমন-কী লীলামাসি। এপিঠ-ওপিঠ করে দেখাচ্ছি প্রত্যেককে : ছাখো, ছাখো, তোমারই মতো ভালো-মন্দ মিলিয়ে সকলে। সম্পূর্ণ সাফ কেউ না, কেউ হতে

পারে না, কিন্তু সকলেরই ভিতরে একটি করে বেদনার বিশ্ব আছে। অন্ধকার গুহায় যাদের বাস, তারাও কখনও না কখনও বাইরে বেরিয়ে আসে, পা টিপে টিপে জীবনে অন্তত একবার-দু'বার চূড়ায় চড়ে।

তাদের পেশ করছি। তাদের স্বার্থে, আমার স্বার্থে, তোমার স্বার্থে। কেন বলছি তোমার স্বার্থে? না-হলে তুমিও, বিরাটের মধ্যে যদিও স্থিত তবুও, ক্ষুদ্রতায় বদ্ধ থাকবে। প্রেতের অতৃপ্তি যাকে বলে। মা, সেই জ্বালা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে চাইছি, নেবাতে চাইছি একটি চিতা, যে-চিতা মরণের পরেও জ্বলে। এই তর্পণ, এই কৃত্য সেই জন্যে।

"তুমি এত দেরিতে এলে বুলা?"

"দেরি কোথায়, বা-রে! বলেই তো গেলাম, গা-টা ধোবো। বলিনি?"

"কিন্তু বুলা—"

"এতক্ষণ বলিনি তোমাকে। আমাকে বারবার 'বুলা বুলা' কোরো না তো। আমি বিচিত্রা।"

"তোমার নতুন নাম, বুলা?"

"কিন্তু ফেমাস নাম। জানো না? শোননি?"

"ট্যাক্সিটার নাম বুঝি বিচিত্রা"?

মনে কোরো না লীলামাসি তখনও ওখানে বসে ছিলেন। কিংবা তাঁর সাক্ষাতেই ঠারে-ঠোরে আমাদের ওই সংলাপ চলছিল। তিনি কখন উঠে গিয়েছিলেন, হয়ত বুলা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই।

"বাহ্, এই তো কথা বেশ কথা ফুটেছে দেখছি।" বুলা তারিফ করল, না ঠাট্টা, স্পষ্ট বোধগম্য হল না, তবে সে আমার গাল টিপে দিল।

"তোমাকে এভাবে দেখব ভাবিনি বুলা।"

ভ্রূভঙ্গি করল সে। "কোন্ ভাবে?"

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "ভালো লাগছে, এই জীবন ?"

"বয়স এখনও কম তোর, তাই এইভাবে ভাবছিস। কোন্ জীবন ?"

"কষ্ট দেওয়ার, কষ্টের।" অনেক কষ্টে আমি বললাম। "কষ্টের কথা থাক", সে বলল, "কষ্ট দেওয়ার কথা কী বলছিলি ?"

আবার কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, "বলছিলাম—এই জীবন। ভালো লাগছে।" তৎক্ষণাৎ সে-ও একই কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "বয়স অল্প তোর, নইলে জানতিস। ভালো কিছুই নিজে থেকে লাগে না। ভালো লাগাতে হয়। নইলে বড় জোর সব চলে যায়, সয়ে যায় এই পর্যন্ত।"

"তোমার মাকে দেখলাম বুলা। লীলামাসি অনেক বদলে গেছেন কিন্তু।"

বুলা মুচকে হাসল। ওর চোখ দুটো নাচছিল। বলল, "আর আমি ?"

"বদলে যায় তো সবাই বুলা, কেউ কি আর যা ছিল তাই থাকে নাকি! তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সব কেমন গোলমেলে লাগছে—"

"তার মানে ইতিহাস শুনতে চাস ? এই ক'বছর, যখন আমাদের দেখা হয়নি, সেটা হল তোর পড়ার বিষয় ? আমি বলে যাব আর তুই মুখস্থ করে নিবি ? বেশ তো ?" বলে বুলা চেয়ারটাতে পা তুলে আসন করে বসবার মত করে বসল—"কেমন লাগছে দেখতে ? ব্রতকথা শোনাব বলে বসেছি—ঠিক যেন সেই পোজ, না-রে ?" এইবার একটু গম্ভীর হল সে, চাহনিতে, কথার ধরনে সংবৃত। আগেও এই ক্ষমতা দেখেছি ওর মধ্যে—নিজেকে জালের মতো ছড়িয়ে নিয়ে অদৃশ্য হাতে হঠাৎ গুটিয়ে নিত।

"বলার তেমন কিছুই নেই, জানলি। ভেসে তো গিয়েছিলাম আমরা দু'জনে, মা আর আমি। আবার ঘাটে এসে লেগেছি। হ্যাঁ,

খুঁজে পেয়েছিলাম আমার মাকে, বেশী দেরি হয়নি, খুব উঠে পড়ে লাগলে কতদিন লাগে আর, মা হাবুডুবু খাচ্ছিল, সাঁতার জানে না তো, কী আর করবে, আমি ওকে টেনে নিয়ে এলাম ঘাটে। বুঝতে পারছিস ?"

আমার দিকে তাকিয়ে বুলা একটুক্ষণ অপেক্ষা করল।—"তেমন কিছু মজা দিয়ে বলছি না বলে ভালো লাগছে না তোর, না ? রস-টস পেলে মজে যেতিস। কিন্তু এটা তো লড়াইয়ের গল্প, আমাদের। লড়াইয়ে রস-টস কোথায় ? মেয়েদের লড়াইকে তোরা অবিশ্যি লড়াই-টড়াই বলতে চাস না। 'জীবন-সংগ্রাম'-এর মতো ভারী ভারী বাছাই করা শব্দ শুধু ছেলেদের জন্যে রেখেছিস। আমাদেরটা খালি বিকি-কিনির হাট বলতে চাস, নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে আঁশটে গন্ধ পাস, সব জানি।"

ছোট্ট একটি শ্বাস চেপে বুলা বলল, "সব জানি!" সেই কণ্ঠস্বর, মা, কী বলব তোমাকে, যেন মৈত্রেয়ীর মতো। সেই যে কোন্ ঋষিপত্নী না—যার গল্প বাবা একবার শুনিয়েছিলেন আমাদের? অবিকল তাঁকেই শুনতে পাচ্ছি একটি হালকা-চটুল মেয়ের স্বরে—কোন্ মেয়ে ? যে বলেছে যে সে নাকি ট্যাক্সি হয়ে গিয়েছে! এমন সব অসম্ভব ঘটনাও দেখা যায় সংসারে!

"মাকে ঘাটে টেনে এনেছি", বুলা বলছিল মেঝের শানের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করে,—"আমার মা আর কোনও দিন জলে নামবে না!" সে থামল, পরে হঠাৎ বেগে, আবেগে বলে উঠল, "আর আমি—আমিও ঘাটে এসেছি বটে, কিন্তু পাড়ে উঠতে পারছি না। একেবারে খাড়া পাড় যে, ধসে গেছে এখানে-ওখানে, আগাছাতেও ভরা। তোর কি—তোর কি কখনও এমন হয়নি, কখনও ? মানে জল ছেড়ে ডাঙা পেয়েছিস, কিন্তু কাদা, চারধারে নোংরা, ওপরে ওঠার রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছিস না ?"

"তুমি হেঁয়ালির ভাষায় বলছ, বুলা। ঠিক এভাবে ভেবে দেখিনি।"

শান্তস্বরে বুলা বলল, "অন্তত আমি তো পাচ্ছি না। জলের ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। জলেও ছিল শ্যাওলা—সেই গন্ধ আমার গায়ে লেগে আছে," বলেই সে করল কী, কাচের বাসন আছাড় দিয়ে ভাঙার ভঙ্গিতে দু' হাত তুলে খিলখিল হেসে উঠল। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করার তালে তালে বলল, "ঠকে গেছিস তুই, একদম বোকা বানিয়ে দিয়েছি তোকে। প্লে-তে যেমন পার্ট থাকে, তারই একটা পুরো স্পীচ আগাগোড়া উগরে দিলুম, তুই ধরতেই পারলি না। দূর, ওর একটা কথাও আমার নয়। বইয়ে আছে, বলে দিয়েছি। বই মানে হল নাটক রে, নাটক।"

সম্বিত ফিরে আসছিল আমার, মনে পড়ে গেল ওখানে গিয়েছি কী কারণে। বুলাকে রাজী করাতেই হবে। নিজে যে এত দুঃখী, সে আর একজনের দুঃখ বুঝবে না?

বললাম, "তুমি আমাদের পাড়ার ওই ক্লাবের পার্টটা ছেড়ে দাও বুলা।"

এত চটপটে, চতুর যে, সে-ও আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

"মানে কী আবার। ওই পার্টটা না করলে কী চলছে না তোমার?"

বুলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে, তার সপ্রতিভ ভাবটা ফিরে পেয়েছে। পায়ের আঙুল শানে ঘষতে ঘষতে বলল, "চলবে না কেন। ও-রকম কত পার্টি তো আমি পা দিয়ে ঠেলে ফেলি, এইভাবে।" কী-ভাবে, সেটাও সে তার পায়েরই একটা ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিল—কোনও শাহজাদীর মতো।—"কিন্তু তুই ছাড়তে বলছিস কেন।"

"আছে, কারণ আছে।"

বুলা বুদ্ধিমতী। বলল, "বুঝেছি। তুই কারো হয়ে ফড়েগিরি করছিস। কে রে? বল না। তোর কেউ আছে? জুটিয়ে ফেলেছিস কাউকে?" বুলা উঠে এসে আমার কাঁধ ঘেঁষে বসল। একটা হাতে

লম্বা লম্বা নখ রেখেছিল সে, আলতো ভাবে আমার ঘাড়ে তাই ফুটিয়ে দিচ্ছিল ; ব্যথা নয়, আমার লাগছিল সুড়-সুড়ি, হাসি পাচ্ছিল, মনের খুশি থেকে যে হাসি ফুটে বেরোয় সে-হাসি নয়, এ হল যকৃৎ অথবা তলপেটে কোথাও পেশি সঙ্কোচনে যা তৈরী হয়, সেই হাসি ! আর ওই হাঁচি ! লিখতে খুব হাস্যকর লাগছে, তবে আমার হাঁচিও পাচ্ছিল। তার কারণ ওই গন্ধ, বুলার শরীরটাই একটা সৌরভ হয়ে ছিল। এক একটা পানীয় যেমন স্নিগ্ধ, শীতল, আবার এক-একটা উগ্র, তপ্ত ; বিভিন্ন সান্নিধ্য ও তেমনই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এইসব অভিজ্ঞতায় প্রথম দিককার পাঠের কথা বাদ দিলে জবানবন্দী সম্পূর্ণ হয় না, তাই লিখলাম। প্রকৃতিনামা প্রধানা এক শিক্ষিকা আমাদের ভিতরেই নিহিত থাকে।

বুলা বলছিল, "কে সে বল না, তাকেই বুঝি পার্টটা দিবি তুই, তাই ধরতে এসেছিস আমাকে ? তোর সাহস তো কম না ! একটা মেয়ের জন্যে আর একটা মেয়েকে তুই—"

কথা গড়াতে গড়াতে নাগালের বাইরে চলে যায় দেখে তাড়াতাড়ি বললাম, "বুলা, সে মেয়ে নয়।"

বাঁশি যে মেয়ে নয়, সেটা জোর গলায় বলতে একটু আটকাচ্ছিল বইকি, হয়ত সেই দ্বিধা, সেই একটু ঠোঁট-কাঁপা থেকেই বুলা ধরে ফেলল, সহর্ষে বলে উঠল, "বুঝেছি। সেই ন্যাকা-ন্যাকা ছেলেটা। আরে, ও তো মেয়েই।"

যতটা গভীর হতে পারি ততটাই হতে চেষ্টা করে বললাম। "বুলা, ও বড় আঘাত পাবে বুলা। আর কিছু নেই ওর, এই নিয়ে ভুলে থাকে। এইটুকুও কেড়ে নিও না।"

সোজা হয়ে বসল বুলা, যেন ছিলা ছিঁড়ে টানটান হয়ে গেল ধনুকের পিঠ। খুব দ্রুত কথা বলতে শুরু করেছিল সে এবারে, খানিক আগেকার সেই আয়েসী ভাবটা আদৌ ছিল না।—"ওর কিছু নেই—নেই বুঝি ? আর আমার—আমার বুঝি সব আছে ? কী আছে

আমার, কী-কী-কী; বল, বলতেই হবে তোকে। আমার মধ্যে কী দেখেছিস? ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব—তাই না? বেশ, দিলাম। কিন্তু ছেড়ে দিলে তোরা আমাকে দিবি কী? কিছু দিবি তো, না বিনে পয়সায় বন্দোবস্ত করতে এসেছিস?"

সে হাঁপাচ্ছিল, না হাসছিল বোঝা যাচ্ছিল না, হয়ত দুটোই, কখনও কখনও বিকারের ঘোরে আমাদের মধ্যে অনেক বিপরীত মিশে গিয়ে থাকে, বুলারও যাচ্ছিল।—"কী দিবি আমাকে, কী-কী-কী" শুনতে লাগছিল উৎকট খি-খি-খি হাসির মতো। আমি বললাম, মানে তোতলামি শুধরে যতটা বলা যায় সেই ভাবেই বলতে চেষ্টা করলাম, "তুমি যদি দয়া করো বুলা, তবে ও মানে ওই বাঁশি তোমাকে ক্ষতিপূরণও দিতে পারে। ওর—ওর অনেক টাকা।"

টাকা শব্দটা শুনেই জোরে জোরে হাসতে শুরু করেছিল বুলা, হাওয়ার দোলে সুপুরি গাছ যেমন টলে টলে হাসে, পরে চোখের কোণ ছুঁচলো করে সে বলল, "অনেক টাকা বুঝি, অ—নে—ক? কত টাকা, কত? কে রে, ছেলেটা, কী নাম বললি, বাঁশি? তোর কে হয় রে?"

বললাম, "আত্মীয়।" আমরা আসলে আশ্রিতও যে, বললাম না, বলতে পারলাম না।

বোকার মতো আবার বললাম, "ওদের অনেক টাকা।"

"টাকা, টাকা, খালি টাকা শোনাচ্ছিস, তুই কাকে?" বুলা হঠাৎ যেন খেপে গেল, হাতও তুলল, সে কি আমায় মারবে বলে, কই, না তো, হাত আর সুর দুই-ই নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে—"তুই তবে টাউট —দূত হয়ে এসেছিস? যাঃ, তবে আর তোকে মারব না। দূত তো অবধ্য। তুই যার দূত, তাকেই বরং পাঠিয়ে দিস এক দিন, বোঝাপড়া করতে হয় তো করব তার সঙ্গেই। বোঝাপড়া, মানে যা বলেছিলি তুই—টাকা, টাকাকড়ি।"

হাতের বুড়ো আঙুলে তর্জনী ঠেকিয়ে বুলা পর-পর অনেকগুলো অদৃশ্য রূপোর টাকা নিঃশব্দে বাজিয়ে গেল।

নিয়তিকে কেউ মাকড়শা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পেরেছে কিনা জানি না, অনেক খুঁজেও কিন্তু মা, আমি ওর চেয়ে ভালো একটা উপমা বের করতে পারিনি। সে আছে, নিশ্চিত, নিপুণ, জাল ছড়াচ্ছে। মন আর দৃষ্টি স্থির করে কেন্দ্রবিন্দুতে বসে লক্ষ্য করছে বদ্ধ কীট আমরা, বন্দী ; সেই জালে সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ চক্রান্তের অন্ত পাব কী করে।

আমাকে নিয়েও অন্তরালে কিছু চলছিল, টের পাচ্ছিলাম। তার আগে বাঁশির কথায় ফিরে আসি।

"দেবে, দেবে, পার্ট ফিরিয়ে দেবে, সত্যি, বলছ ?" তার মুখটা সকাল বেলাকার ফুলতলা হয়ে গিয়েছিল।—"যদি দেয়, যদি ওকে রাজী করাতে পারো, তবে দেব, দেব, সব দেব আমি।" বাঁশি ব্যাকুল গলায় বলছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ছায়া পড়ল ওই ফুলতলাতে —"কিন্তু কী দেব, কী দিতে পারি আমি, দেবার মতো আমার কী আছে।"

তবু সে দিয়েছিল, দিতে পেরেছিল। আমার একটি নিয়তিকে এনে দিয়েছিল আমার কাছে। আমি তাকে দিয়েছিলাম তার নিয়তি। আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা বিনিময় ঘটে গিয়েছিল।

তাকে প্রথম যখন দেখি, চিনতে পারিনি। কিংবা ভুল দেখেছিলাম। আমাদের জীবনের অনেক প্রবল সংবাদ প্রথমে ভ্রান্তির রূপ নিয়ে আসে।

ভুল করাটা আরও সহজ হয়েছিল যেহেতু যেদিনের কথা লিখছি সেদিন ঘুম থেকে উঠে বাঁশিকে দেখতে পাইনি। তারই ফলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ-ও মনে পড়ছে, খুব সুন্দর একটি অনুভবে মনটা ভরে গিয়েছিল। তার ভরে যাওয়ার কথা কিনা, মন তাই তাকে আজও সযত্নে তুলে রেখেছে।

তার সারা জীবনটা কেমন যাবে সেটা যদি বিধাতা পুরুষ স্থির করে দেন নবজাতকের সূতিকাঘরে, তবে এক-একটা দিনের অদৃষ্টও নির্দিষ্ট হয়ে যায় এক-একটা সকালে, এ সত্য আমি পরে জেনেছি। "সকাল দিনকে দেখায়" শুধু এই বিদেশী প্রবাদটার প্রতিধ্বনি করছি না, দেখায়, মা, সত্যি। তুমি বিশ্বাস করো। আমি প্রায় প্রতিটি প্রভাতের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই অমোঘ নিয়মটিকে জেনেছি।

সকালে উঠেই আজও যদি খোলা নরদমার ভক্‌ভক্ নাকে লাগে, সারা দিনটাই বিগড়ে বিষিয়ে যায়, প্রথম থেকেই সব কেমন তেতো-তেতো লাগে। সেদিন তখনই জানি, আজকের দিনটির উপর ঈশ্বরের করুণার বৃষ্টি ঝরবে না। চায়ের কাপ ফসকে যাবে, লিখে লিখে পণ্ডশ্রমের চিহ্ন কাগজগুলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলব ছুঁড়ে, কোনও না কোনও রকমের অপঘাত ক্রমপর্যায়ে ঘটবেই, সংস্কারে আচ্ছন্ন আমি টের পাই। তাই বেতারের কান মুচড়ে তাকে বোবা করে রাখি, সঙ্গীতেও সেদিন গোলোকে গমন নেই। জানি। সকালের যে-রৌদ্র সোনালী ডানার কোনও বিপুল পক্ষী অথবা পক্ষীরাজ, সেদিন সে ডোরাকাটা হিংস্র হালুম হয়ে চামড়ায় দাঁত বসাবে। জানি। এ-ও জানি যে, প্রত্যহ উষাকালে যাদের খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে হয়, তারা তৎক্ষণাৎ সামান্যতায় আক্রান্ত হবে, এটা এক-রকম অবধারিত, সেই হতভাগ্যদের অন্তত সেই দিনটিতে উদ্ধারের আশা নেই, তাদের করুণা করি। প্রাতরাশে বসলে রাশি রাশি কালো হরফের পিঁপড়ে তাদের চোখে কুটুস কুটুস কষ্ট হবে, সেই কালো পিঁপড়েরা তাদের মগজ কামড়াবে, তার পরে তারা সেই পিঁপড়েরা, মগজ ফুঁড়ে কণ্ঠনালী বেয়ে নেমে, তখন তাদের গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে যে ওয়াক-থুঃ, তাকেও জানি।

এবার সেই দিন। সেই দিনটি কিন্তু ছিল আশীর্বাদের মতো। কেননা, জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই দেখেছিলাম শালমঞ্জরী—অজস্র অজস্র, সুকারু কোনও কর্ণাভরণের মতো। বাগানে

নাগকেশরগুলি অদম্য হয়ে উঠছিল। নাগকেশর, সমগ্র পুষ্পের বিশ্বে একমাত্র যাকে মনে হয় পুরুষ। আর দেখেছিলাম কিছু নীল—কিছু। নীল তো একটা রঙ, কিন্তু নীলের রঙ কী। সেদিন জেনেছিলাম। আজও তাই জেনে বসে আছি। নীল আমার রঙ। না, সবুজ না, সেই কাঁচা কালেও সবুজ আমার রঙ ছিল না। সবুজ, মানে বড় বেশী উচ্চারিত। লাল ? সে তো শুধু চীৎকার। গৈরিকে বৈরাগ্য আছে, শুনেছি, কিন্তু কখনও অনুভব করিনি। আর সাদা। যদিও সহাস্য, নির্মুক্ত, নিরাসক্ত সে, তবু এই পরিণত কালেও সে আমার রঙ হল না। এই হেতু যে, দেখতে যদিও সর্বত্যাগী সে, তবু বিজ্ঞান বলে, সাদাই নাকি সর্বগ্রাহী, অতএব তার আপাত ভালমানুষির মধ্যে কোনও লুকোচুরি আছে। বাকী রইল কালো। কিন্তু কালোকে কেউ তো গ্রহণ করে না, সে-ই গ্রাস করে সকলকে, রাত্রির মতো, মৃত্যুর মতো। কালো অনিবার্য।

কিন্তু নীল, আমার নীল ? তাকে যে আমার মধ্যে ছুপিয়ে নিয়েছি, সেকি সে নিবিড় বলে, নরম বলে, চেয়ে চেয়ে সাধ মেটে না এমন কোন কোনও নয়নের মতো বলে ? আকাশ আর সমুদ্র দুই-ই নীল, নীল দূরের অরণ্যও—এরা সবাই অশেষের স্বাদ এনে দেয় বলে ?

তা-ও বোধ হয় নয়। নীল আমার প্রিয়, নীল আমার রঙ, এর পিছনে কোনও নীলাম্বরী অনুষঙ্গ নেই, নীল দিগন্তও নয়, আসলে রঙের মধ্যে একমাত্র নীলই নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারে। বাকী সব রঙ বড় বেশী ব্যক্ত, তাই না ?—যেন ফেটে ফেটে পড়ে। একমাত্র রঙ যে নীলের কাছাকাছি তার নাম ধূসর। সে কিছু আঁকে না, ফেটেও পড়ে না, প্রগাঢ় বিষাদে সে শুধু সব মুছে দিতে জানে।

এই সব দেখলাম সেদিন। দেখলাম বাবাকেও—বাগানে। ঘুরছিলেন, কিন্তু পাশে ও কে ?

একটু এগিয়ে গিয়ে খেইটা ধরি।

বাঁশিকে বলেছিলাম "তুমি কি শাড়ি পরে একটু আগে বাগানে বেরিয়েছিলে নাকি?"

বাঁশি হাসল। নিজেকে নিয়ে একটু তামাশা করা ও শিখেছিল। —"শাড়ি পরে, আমি? না, আমি না। মেয়ে হতে আমাকে শাড়ি পড়তে হয় না। স্টেজের বাইরে শাড়ি আমি পরিও না। তুমি বোধ হয় কিসমিসকে দেখেছ।"

"কিসমিস?"

"আমার বোন। হস্‌টেলে থাকে, জানো না? কাল রাত্রে এসেছে। ইস্‌টারের ছুটি, ক'দিন থাকবে।

শুধু ওইটুকু বলে থামলেই তো চলত, কিন্তু খানিক আগে নিয়তির কথা বলেছি না? সেই মাকড়শার সূক্ষ্ম নির্দেশে বাঁশি গলাটা হঠাৎ নামাল কেন, কেনই বা বলল "তোমার বুলাকে যদি রাজী করাতে পারো, মানে ওই পার্টটা আমাকে ছেড়ে দিতে—তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে কিসমিসের আলাপ করিয়ে দেব।"

কীট-জগতের কোনও চতুর অধিপতি তখন তাঁর জালের কেন্দ্র-বিন্দুতে বসে বুঝি একটু টান দিলেন। সরু সরু লূতাতন্তুতে আমার চিত্ত কি জড়িয়ে গেল? তখনই টের পাইনি।

মানুষের প্রথম প্রলুব্ধক কী হেতু সর্পরূপে এসেছিল, আমি জানি না। বোধ হয় তার শিরদাঁড়া ছিল না বলে। বাঁশির সঙ্গে তার মিল আমি খুঁজে পাচ্ছি এইমাত্র। এখনও বাঁশির সেই ভঙ্গি মাঝে মাঝে দেখি, যেন স্বপ্নে। সাপের মতোই তার নিরস্থি শরীর হেলছিল, দুলছিল। তার চোখে সাপের মতোই ইশারা খেলছিল অথবা খেলছিল না, আমি কি আমারই এক অবচেতন ইচ্ছাকে সাপের আকারে দুলে উঠতে দেখেছিলাম?

ত্রিশ

"আমার বোন।" অতি সাধারণ কথা তবু কেন যে বাঁশি অত ফিসফিস করে বলছিল।—"তবে আমি যেমন ছেলে হয়েও মেয়েই, ও কিন্তু মেয়ের বেশে ছেলে না। আমার বোন মেয়েই।"

এই সব বলছিল বাঁশি, কেন বলছিল? শুধু কৌতূহল নয়, সে কেন করুণাও জাগিয়ে তুলতে চাইছিল? আমি জানি না। বাঁশি বলেছিল, "শুধু ওর একটা কষ্ট আছে। চোখে খুব কম ছ্যাখে। বোধ হয় অন্ধ হয়ে যাবে।"

"অন্ধ?" যাকে দেখিনি, দূর থেকে যাকে শুধু তার ভাইয়ের মতো ঠেকে চমক লেগেছিল, তার আসন্ন কোনও ভীষণ হাসির জন্যে সহবেদনা নয়, হয়ত আপনা-আপনি, যান্ত্রিক ভাবেই প্রশ্নটা বিদারিত হয়েছিল।

"ওর দোষ নেই", বাঁশি বলল আস্তে আস্তে "আমার বাবার পাপ। তিনি পালিয়ে গিয়েছেন, তবু এক দিক থেকে সেই পাপ বহন করছি আমি, আমার বোনও তার ভার বইছে।"

এ-কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলাম না। জানতাম, বাঁশি পূর্বপুরুষদের প্রতি কী ঘৃণা পোষণ করে।

বাঁশিকে দরকার হল না, সে নিজেই ছাদে উঠে এসেছিল বিকালে, মা, তোমার সঙ্গে। মনে আছে?

যেন চকখড়ির একটা লেখা, ঋজু শুভ্র একটি রেখা, আবার মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে সে টবের প্রতিটি চারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল, যত তুলসী, ফণীমনসা, কিংবা এলানো যত লতা ছিল—সব। শুধু তার চোখে অসুন্দর ঘষা কাচের একটা চশমা ছিল।

"জল দেন মাসিমা, রোজ জল দিতে হয় এই গাছগুলোতে?

কেন, নিজে থেকে বাঁচতে পারে না ওরা ?" সে বলছিল, শেষ বেলার হলদে রোদে মিলে-যাওয়া কয়েকটা ফুল দেখিয়ে। অনেক প্রজাপতি বাতাসে সাঁতার দিতে দিতে চলে যাচ্ছিল গঙ্গার দিকে, আবার ফিরেও আসছিল, ওকে ঘিরে চক্রাকারে ঘুরবে বলে।

"জানেন মাসিমা, মেসোমশাই আজ চমৎকার একটা কথা বলেছেন কিন্তু, আজ সকালে। যখন বাগানে নেমেছিলাম। ফুলগুলো দেখে দেখে বেড়াচ্ছিলাম, তখন উনি অদ্ভুত একটা কথা বললেন। কালো এই চশমাটা চোখে ছিল তো, মেসোমশাই কী বললেন জানেন ? বললেন যে, কালো চশমা পরে নাকি আলোয় বের হতে নেই। অথচ আমরা তো আলোর জন্যে চোখে ঠুলি পরি ? উনি কিন্তু বললেন, 'যদি তাঁকে দেখতে চাও তবে কালো চশমা পোরো না। এই তো ছাখো, ফুলগুলো, ওরা তাঁর দিকে সটান তাকায়, চেয়ে চেয়ে ছাখে। ফুলেরা কি কখনও সানগ্লাসে চোখ ঢেকে রাখে ? অদ্ভুত কথা, নয় মাসিমা ? ভালো বুঝলাম না, কিন্তু দারুণ ভালো লাগল।"

"ও তো খুব ভালো কথা বলতে পারেই" তুমি বললে, কোন-প্রকার উত্তেজনাহীন কণ্ঠস্বরে।

মা, লেখাটা আমার জীবনে আমি বারবারই দেখেছি, জ্বরের মতো, জোয়ারের মতো। কম্প দিয়ে আসে, মাঝে মাঝে, সব ভাসায়, কিন্তু স্থায়ী হয় না, ছেড়ে যায় সরে যায়। তখন সব হিম, ভীষণ শীতল, এমন-কী মৃত, বরফের তলে মেরুদেশের মতো দীর্ঘকাল আচ্ছাদিত থাকি। ছাড়ে ধরে, আবার পরমা কোনও প্রণয়িনীর মতো সে আমাকে অধিকার করে, এবং যদিও তখন সম্মোহিত আমি তার করতলগত, তবু তখনই আমি জীবিত, একমাত্র তখনই, অন্যথা এই জীবন শুধুমাত্র চিকিৎসা-বিদ্যাতেই স্বীকৃত একটা মরুশুষ্ক অস্তিত্ব।

যে-সময়টার কথা লিখছি, তার কিছু আগেই আমি নতুন করে

লেখা ধরেছিলাম। আমি তাকে ধরেছিলাম, না সে ধরেছিল আমাকে, বলা কঠিন, কেননা, একটু আগেই বললাম যে, মা, তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না, বললাম না যে আমার লেখা কোনও চঞ্চলা রমণীর মতো, যতটা আমার প্রতি বিশ্বস্ত, অবিশ্বস্ত ততটাই, সে ছেড়ে যায়, আবার ফিরে ফিরে আছড়ে পড়ে আমাকে মারে, মেরে বাঁচায়। আমার ঈশ্বরও আমার কাছে সেই মত একই সঙ্গে আমার প্রতি এত নির্মম অথচ মমতাঘন আমি কাউকে দেখিনি।

আমি তখন লিখছিলাম। নাটক? না, তখনও না। নাটক আসে পরে, অনেক পরে, অনেক অভিজ্ঞতার স্তর পার হয়ে, যখন উপলব্ধি হয় সমস্ত জীবন, গোটা জগৎটাই একটা নাটক, ঘাত প্রতিঘাতে কণ্টকিত অথবা অভিঘাতহীনতায় অতি-প্রশান্ত, শুধু সে বিয়োগান্ত না মিলনান্ত, একজন ছাড়া কেউ জানে না। কে সেই জন? নাট্যকার নামে নাম যার ছাপা সে? দূর, সে তো কেবল নিমিত্ত, তার তো শুধু হস্ত, যে জানে সেই লেখে, লিখিয়ে নেয়, নাটক কেন সবই। কবিতা, কাহিনী—সব। তারই কথা, বস্তুত সংলাপমাত্র তারই সঙ্গে কথোপকথন। আমার হাত কাঁপছে, মা, তোমাকে লেখা এই চিঠিও বুঝি তাই।

তখন লিখতাম—কী? মনে পড়ে না। কাকে, কার উদ্দেশে? জানা নেই। নৈর্ব্যক্তিক নিরুদ্দেশ কেউ—সেই উদ্দিষ্ট। শুধু একটা বেদনা ছিল, একটা প্রার্থনা। কেউ আছে, কোথাও আছে, যে আমার অপেক্ষায় আছে, আমাকে যে অপেক্ষায় রেখেছে—সে। তপ্ত হাওয়ার স্পর্শে, পত্র-পল্লবের ব্যাকুলতায়, রক্তাক্ত রৌদ্রে, রক্তাল্প জ্যোৎস্নায় তাকে পেতাম, সব-কিছুর আঘ্রাণে, শ্রাবণে, সেই অদর্শনার বিভোর কামনা, সব মুহূর্ত, তার জন্যই তো, সর্ব ইন্দ্রিয়ের উচ্চৈঃস্বর সংকীর্তন। তার নাম? হয়ত অপূর্ণতা, তার নাম হয়ত অভাব। ভাব-আবির্ভাব ঘটলে সে থাকে না। থাকলেও সেইভাবে না।

বুলাদের বাড়ি বাঁশিকে পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন হয়ত—দোতলার জানালা থেকেই হয়ত—সে আমাকে দেখেছিল। আমি দেখিনি তাকে। খাতাটা খুলে লিখতে বসে গেছি, তখন লিখতে বসাটাই ছিল মুক্তি, অপ্রতিরোধ্য কোন-কোনও জৈব বেগের মতো।

ছাদেও এসেছিল সে, কোন-কোনও উপস্থিতি মৃগনাভির মতো, অপ্রত্যক্ষ, তবু স্বতঃই আমোদিত। দিন কয়েক আগেকার সেই চরিতার্থ প্রজাপতিগুলিকেই কি খুঁজছিল সে? আমি জানি না। আমি তখন শব্দের পর শব্দের সিঁড়ি ভেঙে আরোহণে ব্যস্ত।

সেই সময় ভীষণ আওয়াজ করে বে-নোটিস একটা ঝড় উঠল বলে, অথবা ঝড় ওঠেনি, দিগ্বিদিক রুদ্ধশ্বাস হয়ে যায়নি ধুলোয়, বাগানের একটা ডালও মড়মড় করে ভেঙে পড়েনি, ওসব আমার শুধুই ভুল, শুধু অনুমান, তবে আকাশে মোষের মত রাগী-রাগী রঙের মেঘ ছিল, নিশ্চয় ছিল, তারা গাঁ-গাঁ জন্তুটার মতো ডাক ছাড়ছিল আর—। আর তাইতেই সে ভয় পেল, অথবা সে কি ভয় পেয়েছিল ওর চশমার কাচের রঙ পাঁশুটে মেঘের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল বলে?

কিন্তু সে এল। এল তাড়াতাড়ি, ত্রস্ত, তার চশমা খুলে কাচ আঁচলে ঘষছিল।—“কী লিখছেন, দেখি।”

ওই কথাটা সে বলেছিল কতক্ষণ পরে? আজ আমার মনে নেই। অনেক সময়ের শব্দতরঙ্গ পেরিয়ে “কী লিখছেন, দেখি,” এই বাক্যটি আবহমান বাজছে।

নিশ্চয়ই বেশ কিছুক্ষণ পরে কথাটা সে বলেছিল? প্রথমে প্রথামত একটু চমকে যাবার পরে, কালো কাচ খুলে সে যখন ভারী পাওয়ারের পুরু কাচের চশমা পরে নিল, আমাকে দেখল, তারও পরে? সহজ হবার জন্যেই কি হঠাৎ সে বলল ওই কথাটা, “কী

লিখছেন, দেখি”—প্রকাশ করল নারী-স্বভাবের ওই স্থায়ী-সম্বাদী সুরের ঔৎসুক্যটা, অথবা তার আগেই আমাদের আরও কিছু-কিছু মৌখিক আলাপ হয়েছিল ? মনে নেই।

তাকে দেখালাম। সেদিন যা লিখছিলাম, সেই না-কাব্য, না-গদ্য লাইন ক'টা। সাদা পাথরের মতো ভারী আর পুরু চশমার কাচে লুকোনো চোখ দিয়ে, যেহেতু লুকোনো সেই হেতু চোখ দুটি দেখতে পেলাম না ভালো করে, সে পড়ে গেল :

“বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন আমার ভরপুর স্বপ্নগুলির অন্যতম। যদি কোনো রাত—একটি রাত্রিও—সেখানে কাটাই, তবে পত্রে-পুষ্পে সমাচ্ছন্ন হয়ে যাই। পত্র-পুষ্প, অথবা অনুভূতি ? অনুভূতি, না উপলব্ধি ?...”

এই পর্যন্ত সে পড়ল। ধীরে ধীরে, প্রতিটি স্বরে ভর করে, পিছল উঠোন লোকে যেমন প্রতিটি পাতা ইটের উপর ভর দিয়ে পার হয়। —“কিছু বুঝলাম না কিন্তু”, সে বলল “এর মানে কী ?”

বললাম “এর মানে নেই।”

“যাঃ। মানে তো একটা থাকবেই।

“সব সময়ে নয়। কিংবা থাকে, শুধু একজনেরই কাছে। এক-একটা ঘর বা বাক্সের চাবি যেমন একজনের কাছেই থাকে, একা সে-ই খুলতে জানে।”

“আপনি খুলতে পারেন ?”

“পারি, তবে বললেই নয়। চাবিটা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায়।”

দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল। আবার আর-একটা পাতা টেনে পড়ল :

“দীঘিতে হাওয়ার অত্যাচার দেখেছি, সে-ছবি যেন আসক্তির। কিন্তু আসক্ত হাওয়া, তা-ই কি তার সব স্বরূপ ? তাকে অন্যত্রও দেখেছি, প্রান্তরে যখন ঝড় বয়ে যায়। কিছু মাখে না, কোন চিহ্ন

রাখে না, প্রান্তর আর ঝড় দুই-ই উদাসীন। একজন সয়ে যায়, বয়ে যায় আর-একজন।"

পড়ে সে বলল, "বুঝিয়ে দিন।"

"বোঝানোর দরকার কী?"

আসলে তার পুরু কাচে সুদূর চোখ দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। এ-সব চাপা দিয়ে চাইছিলাম অন্য কথা টেনে আনতে। আপনি কাল এসেছেন? কালই, কিন্তু আপনি কেন, আমি তো ছোট।—ছোট-বড় বুঝি না। ও কী, ও কী, কালো চশমাটা আবার পারবেন না। —পরব না কেন?—বিশ্রী দেখায়।—কাকে, আমাকে?—আপনাকে কেন, আমাকে; আপনি যা ছাখেন তার সমস্তটাকে।

সে বলল, "ঠিক। সব কেমন কালো দেখায়।" বলে সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের ধারে গেল। গন্ধ তেল আর ক্রীম, ক্রীম আর পাউডারের কৌটো-শিশিগুলো তুলে তুলে বলল, "দাদা মাখে। আপনিও এ-সব মাখেন বুঝি?"

"আমি? কখনও না।"

"আমি মাখি না।" সে বলল বিষাদের সুরে।

"তোমার দরকার হয় না।"

"হলেও মাখতাম না। দেখছেন না আমাকে? একেবারে সাদাসিধে/শুকনো/খসখসে।"—কথাগুলোকে সে যেন নীচু হয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঠোঁটে তুলে বলছিল, তার প্রসাধনহীন অধর আর ওষ্ঠ তখন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি আমার উপরে ন্যস্ত করে সে বলল, "জানেন না? আমি যে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।"

"তার সঙ্গে প্রসাধন করা না-করার সম্পর্ক কী?"

"দেখব না", সে দুঃখিত অথচ প্রতিজ্ঞ স্বরে বলল, "পৃথিবী আমাকে আর বেশীদিন তাকে দেখতে দিতে চায় না, অন্তত সুন্দররূপে নয়। আমিই বা তবে তাকে দেখব কেন, দেখা দিতে চাইব কেন!"

বলতে বলতে কোথা থেকে আরও একটু জোর পেল সে—"দেখব না, দেখতে চাই না, দেখা দিতেও না।"

"কিসমিস" আমি বললাম, "কিসমিস, এত নিষ্ঠুর হয়ো না। এই নিষ্ঠুরতা তোমার নিজের প্রতি।" জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল সে, যেন তার ফুল-ফলগুলি কেউ আঁকশি দিয়ে পেড়ে নিচ্ছে। "কিসমিস? কে বলল আমার নাম কিসমিস? আমি তো ফাজিল ফূর্তিবাজ একটা মেয়ে নই, ওই ডাক নামটা আমাকে মানায় না। আমার আসল নাম কী জানেন? জানেন না? আসল নাম হল রজনীগন্ধা।" বলে সে অপেক্ষা করল।—"খুব ভারী নাম, না?"

"সুগন্ধিও।"

"দিনে থাকে না।"

"থাকে", আমি বললাম "যদি জল পড়ে। যদি ভিজে-ভিজে থাকে। যদি—"

তার চোখ দুটিও ভিজে ভিজে হয়ে এসেছিল, সাদা-কালো দুটো চশমাই খুলে সে টলটলে চোখে চেয়েছিল, সেই চোখের মণি নীল, কিন্তু বড় নিষ্প্রভ নীল, হেমন্তের ম্রিয়মাণ সরসিজের মতো; কিন্তু চোখের পাতা যেন জলজ দীর্ঘ ঘাসে পূর্ণ, তার গলা ভিজে-ভিজে হয়ে এসেছিল। "যদি জল পড়ে, যদি—" আমার কথার একাংশ কেড়ে নিয়ে সে-ও বলল "যদি—?" তারপর অপেক্ষা করে রইল।

মা, এইখানে সেই বাক্যটি লেখা কঠিন, কিন্তু কাজটা আরও কঠিন, দুঃসাহসিক ছিল। লিখতে তবু পারব—এই বয়স আর বছরগুলো তো ফিল্টারের কাজ করে—পারব আরও এই কারণে যে, তুমি ঘটনাটা জানো, হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে দেখে ফেলেছিলে।

তার চোখের সেই দীর্ঘ জলজ ঘাসের শিসেও ভিজে-ভিজে ছোপ লেগেছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে কাঁপা কাঁপা পাতা মুছে ফেলে সে ভীত অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "এ কী!" রজনীগন্ধার ডাঁটা থেকে ডগা অবধি শিহরিত হচ্ছিল। যদিও আমিও তখন থরথর, তবু প্রবল

প্রগাঢ় আবেগে তাকে বলতে গেলাম "এমন আর কিছু কী। ঘৃণা হচ্ছে, খারাপ লাগছে ?"

তার দু'হাতে চোখ ঢাকা ছিল, হাত সরাতে তার চাহনির পাণ্ডুরিমা পূর্ণিমা হয়ে গেল। তার চোখে ক্লান্তি ছিল, ঈষৎ মথিত, আড়ষ্ট ভাব, আড়ষ্টভাবেই সে আরও আনত হয়ে পড়ে বলল, "ঘৃণা ? না, ঘৃণা না।"

আরও সাহসী হয়ে আমি তার পিঠে হাত রাখলাম। পরিম্লান দৃষ্টিতে যত বিস্ময় ছড়ানো যায়, ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে বলল, "কিন্তু কেন।"

"ওই চোখের দৃষ্টির অস্বচ্ছতা মুছে দিতে, পৃথিবীকে তোমার চোখে আরও সুন্দর করে তুলতে"—কিংবা এই রকমই অনেক কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে তাকে বলতে থাকলাম, ক্রমাগত, কিন্তু মনে মনে, আর যদিও মনে মনে তবু আমার মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে যাচ্ছিল, এত সৎ, এত শুদ্ধ তথাপি এত বিচলিত এর আগে কখনও বোধ করিনি, মনে যা বলছিলাম, মুখেও তাই হয়ত আনতাম, বলতাম একটি অন্ধপ্রায় মেয়েকে, প্রায়ান্ধ একটি সন্ধ্যাকালকে সাক্ষী রেখে, কিন্তু মা, তখনই তোমার ছায়া পড়ল, আড়াল থেকে তোমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

তুমি কখন এসেছ, বাইরে কতক্ষণ ছিলে ?

সে বলেছিল "এ কী!" তুমিও বললে "এ কী, এ-সব কী ?"— কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন সুরে। তুমিও কাঁপছিলে—রাগে। টেনে, আমার হাত মুচড়ে মুচড়ে নীচে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকলে।

"এ-সব কী।" নীচের ঘরের একটি কোণে, সেখানে জানালা নেই, জায়গাটা আপনা থেকেই কেমন ফাঁদ মতন হয়ে যায়, সেই ঘরে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছ তুমি, হাতুড়ি-পেটার মতো শব্দ করে

বলছ "এ-সব কী", পিটছ বটে হাতুড়ি, কিন্তু তোমার গলা যেন কোনও ভারী ধাতু, ধপধপ আওয়াজ বের হচ্ছে।

আমার হৃদ্‌পিণ্ডও সেই ধাতুতে তৈরী হয়ে গেছে। তোমার চোখ? সীসের গুলি দিয়ে যদি তৈরী হত অক্ষি-গোলক, দেখতে এই রকমই হত। আমার চোখও কোনও ধাতুতে পরিণত হয়ে গেছে টের পাচ্ছিলাম আমি—পারা, বা অনুরূপ কোনও চঞ্চল ধাতুতে, ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো আমি ছটফট করছিলাম। ব্যূহে বদ্ধ কোনও অসহায় সৈনিকও হতে পারি, কিন্তু কোথায় আমার তীর-ধনুক, কিংবা তরোয়াল? খুঁজে পাচ্ছি না, বিনা যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে নাকি, আমার সামনে দুই হাত বাড়িয়ে রাস্তা আগলে যে দাঁড়িয়ে সে কে, মা না রাক্ষসী? রাক্ষসী ধারালো নখে ছিঁড়ে খাবে নাকি, ভীষণ ভয় পেয়ে ভীষণ ঘৃণা করে, হ্যাঁ মা, তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করার পাপ তখন চাপ-চাপ রক্তের মতো আমার বুকে জমাট, আমিও কঠিন করে নিয়েছি নিজেকে, আত্মরক্ষা আমাকে করতেই হবে, কিন্তু কী-ভাবে, কী ভাবে, কী বলব আমি তোমাকে?

"কী আবার, কিছু না।" বললাম শুষ্ক স্বরে। "এসব কী" এই প্রশ্নটার উত্তরে।

"কিছু না। কিছু না?" ভাগ্যিস ওখানে, ওই কোণটাতে আলো পড়ে না, তবু আমি দেখছিলাম তোমাকে, দ্বিতীয় রিপুটি দখল করে নিয়েছে, পরাক্রান্ত সেই ক্রোধ আমার আর কী করবে, তার আগে তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, অন্ধ তুমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না, আমার আর ভয় কী তোমাকে, আমিও তখন বেপরোয়া, কোমরের কাছে ছুরি-টুরি পাওয়া যায় কিনা খুঁজছি।

তারপর? তুমি বললে "তুই তবে শুধু বদমাশি নয়, মিথ্যে কথা বলাও শিখেছিস? কিছু না, এখনও বলছিস, কিছু না? অথচ আমি নিজের চোখে যা দেখলাম—"

"হাত ছাড়ো" হঠাৎ আমার গলায় জোর এল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখ

ভরে গেল। কী বলছি কী করছি খেয়াল ছিল না। বললাম, "হাত ছাড়ো", শুধু যে বললাম তাই না, জোর করে হাত ছাড়িয়েও নিলাম। আমার সাহস এসেছিল, কিংবা আমি মরীয়া হয়ে যাচ্ছিলাম জানি না; তবে পরে অনেক অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক-একটা পরিস্থিতিতে মানুষ, জন্তু সবাই মরীয়া হয়ে যায়, হিতাহিত, সম্মান, শ্রদ্ধা-টদ্ধা কিছু অবশিষ্ট থাকে না, গুরুজন, তো গুরুজন, ঈশ্বর এমন-কী তাঁর নির্দেশ, বিধান সব কিছুকে অস্বীকার করে। আমিও করলাম—তোমাকে। 'হাত ছাড়ো' এই কথাটা বলার ভঙ্গিতে কিছুমাত্র ভালবাসা ছিল না, হাত ছাড়ানোর ধরণের সবটাই বেঁকে-দাঁড়ানো, বেপরোয়া, নিষ্ঠুরও, কারণ আমি জেনেছিলাম নিষ্ঠুর হয়ে তোমার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তবে বাঁচতে হবে, পাঞ্জা লড়ব আমি, তোমার ছেলে, তোমার সঙ্গে, তার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছিলাম, বিষাক্ত বাতাসে বুকের ভিতরটা বেলুনের মতো ফুলিয়ে নিলাম, পরে সব ঢেলে দেব বলে। মা, পালাও, সরে দাঁড়াও, এখনও কোন্ ভরসায় তাকিয়ে আছ, কী নীচ, কী ভয়ানক হয়ে উঠছি আমি—টের পাচ্ছ না? পরশুরামে পরিণত হয়ে যেতে পেরেছি এত দিনে, আঃ এতদিনে, কিন্তু একালের পরশুরাম তো, কুড়ুলের মতো প্রবল অস্ত্র সে পাবে কোথায়, সে খালি কোমরে গোঁজা চকচকে ছুরিটা বের করতে পারে।

আমি তাই করলাম। বিশেষ করে তুমি যখন বললে "ঠিক তোর বাবার স্বভাব পাচ্ছিস—ও যেমন ছিল।"

"চুপ করো।"—তোমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলাম "বাবাকে এর মধ্যে আর টেনে আনা কেন?"

"সেই ছলনা, ভোলানো, ধরা পড়ে গিয়েও মিছে কথা—সব তার মতো।"

"কার মতো ঠিক বলা যায় না।" ঠিক তখনই সাবধানে সেই গুপ্ত ছুরিটা বের করে দেখিয়ে দিলাম আমি—"তোমার মতোও তো হতে পারি!"

চমকে গেলে তুমি।—"কার মতো, কার মতো বললি?"—"তোমার মতো, তোমার মতো," বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছিল, আমার গলার স্বরে চমকে যাচ্ছিলাম আমি, ঝলক ঝলকে বলে গেলাম, কথা তো নয়, রক্ত; বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে, গলগল করে—"তোমার মতো"। তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু আমি জানি। আজ কী দেখে জানি না, তবে জেনে রাখো, আমিও অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু জানি।

"কী দেখেছিস, কী জানিস?" শ্বাস-নালী থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই বুঝি গলার কাছে রেখেছ একটা আঙুল, একটু পিছনে সরছ, বিবর্ণ, তোমার চোখ মুখে আতঙ্ক, তোমার স্বর নীরক্ত, তোমার পুত্র আততায়ী, সেই আততায়ীর হাতে ছুরি দেখে মা, তুমি ভীত।

"দেখেছি, একজনকে দিনের পর দিন আসতে। দেখিনি? কেন আসত, তার মানে কি জানি না? জানি। বাবাও জানতেন নিশ্চয়ই। তাই তো—" আমি বললাম "তাই তো তিনি ওখানে বিশেষ যেতেন না। সব জানি।"

দিয়েছি, বিঁধিয়ে দিয়েছি সেই শানানো ছুরিটা এতক্ষণে, রক্তাপ্লুত একটা দেহ টলে পড়ে যাচ্ছে, ঘাতক তথাপি উল্লসিত, সে সরে যাচ্ছে নাচতে নাচতে, শোণিতে স্নাত শানিত ছুরিটা নাচাতে নাচাতে, একটি মৃতবৎ দেহকে শোনাতে শোনাতে, "তাই তো বললাম, বেশী ঘাঁটিও না, চাপা থাক, ঢেকে রাখো। নইলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। বাবার মন বিরাট তাই শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন, নিয়ে এলেন আমাদের—"

"তুই এইসব বলছিস—তুই?" কে, কে বলল কথাটা, যে-কথা আর্তনাদের মতো? একটা মৃতদেহই তো, আমার হাতে যে নিহত হল এইমাত্র, এখন ভূলুণ্ঠিত, মৃতের কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত? কে করে! আমি করলাম না, দেহটির পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

সমস্ত জীবনে এই ভাবে কত মড়া দেখেছি, মড়ার মতো মুখচ্ছবি।

বাবার, তোমার, সুধীরমামার। কতবার। এতবার মৃত্যু ঘটে, দাহ হয় শুধু শেষবার, হিসাবে সেইটেই টোকা থাকে। আমিও বারে বারে মরি নিশ্চয়ই—শুধু নিজের বলে মড়া-মুখটা দেখতে পাই না। মৃত্যু ঘটে স্বজনের হাতে, যাকে বড় ভালবাসি, যাকে বিশ্বাস করি, যে-কাছাকাছি, সেই মারে, বস্তুত মারতে পারে একমাত্র সেই, অন্য কারও আঘাতের মর্ম স্পর্শ করার তো সাধ্য নেই। আর-একপ্রকার মৃত্যু ঘটে—নিজের হাতে। সে আরও জটিল ব্যাপার, আরও যন্ত্রণার, ভীষণ লোভ যখন পেয়ে বসে, অথবা অন্ধ ক্রোধ; কোনও ক্ষুদ্রতা, বিশেষ করে ঈর্ষা, আত্মপরতা; অপরের প্রতি অপরাধ—এর প্রত্যেকটাই অভিমানী মনে কাতরতা আনে, সত্তা মুছে গেল বলে চিত্ত করে হাহাকার। নিজের মৃত্যুতে নিজের শোক, সেই কান্না চলে সঙ্গোপনে। অন্য শোকের সঙ্গে তার তফাতও এই—সেই কান্না কেউ শুনতে পায় না, কাউকে শোনানো যায় না। পৌনঃপুনিক মৃত্যুর দৃশ্যরূপ পাই চাঁদে, চন্দ্রমার রাহুগ্রাসে।

আরও কী মজা ছাখো, সব হত্যাকাণ্ড হয়ত, একতরফা ঘটে না। ঘাতক নিজেও তৎক্ষণাৎ মরে, জানি না, সব ঘাতকের বেলায় ব্যাপারটা ঘটে কিনা, তবে সেদিন আমার ঘটেছিল। একটি শবের পাশ কাটিয়ে যখন চুপে চুপে বেরিয়ে এলাম নিশুতি বাগানে, ফাটা বেদীটার উপরে বসতে গিয়ে দেখি, সেই ছুরিটা মুখ ফিরিয়ে আমার বুকেও বিঁধে বসে আছে। ঘাতকের স্পর্ধা তখন কই আর, চোরের মতন বেরিয়ে এসেছিলাম, চোরের মতোই ফিরে গেলাম।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে আস্তে আস্তে বললাম "মা!" সেই দেহটি কেঁপে উঠল, একটি মুখ বস্ত্রাবৃত, বলছিল "আর কেন। আমাকে মা ডাকিস না। যা। তোর মা নেই।"

মা নেই? মৃত মুখের অভিশাপ যে কী কঠিন, ওই একটা কথা আমার দিগ্বিদিক লুপ্ত করে দিল, মা নেই। ছিল না? ছিল। এখন

নেই। আর থাকবে না। একটা অস্তিত্ব মুছে গেল, মিথ্যে হয়ে গেল সেই ছেলেবেলার চাঁছিমুছি, জিভের ডগায় তুলে ধরা ছেঁচা পানে ঠোঁট রাঙানো দিনগুলো, যেহেতু মা বলে কেউ রইল না। সেই তখনকার কোলের কাছ ঘেঁষে গুটিসুটি হয়ে শোয়া, মিথ্যে, মিথ্যে সব, মানে মিথ্যে হয়ে গেল। যা মৃত, মিথ্যে তাই তো। অথবা মিথ্যে বলেই মৃত।

মা, তবু বেহায়ার মতো "মা" বলেই ডাকছি, তোমাকে সেদিন নৃশংসের মতো আঘাত করেছি ঠিক, কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তার সম্পূর্ণ অর্থ জানতে না। আগেই রাগে অন্ধপ্রায় হয়ে গেলে, বলার সুযোগই বা পেলাম কই। আর, বুঝিয়ে বলাও হয়ত যেত না।

ওই ঘটনা হয়ত আকস্মিক, কেন না এক-একটা মুহূর্তে আমরা মানুষেরা বিচার বিবেচনা রহিত, শুধুই প্রবণতার বশে চালিত—সবই ঠিক। তবু আমার অবচেতনায় যে প্রতিশোধস্পৃহা ছিল, তাকেও মুক্তি দিলাম—হতে তো পারে। মুক্তি দিলাম, মুক্ত হলাম—আমি নিজে ; তোমাকেও মুক্ত করলাম। হ্যাঁ মা, তোমাকেও। ও-বাড়িতে আমরা তিনজন অন্নদাস বৈ তো নই! আমরা স্রোতের শ্যাওলা, ভাসতে ভাসতে এসেছি। বাবা গোমস্তা কি ম্যানেজার, আর তুমি ? লিখতে বাধা নেই, তুমি দাসী, সম্ভ্রান্ত হলেও দাসীই তো! প্রধানা তত্ত্বাবধায়িকা। আর আমি ? আমার কথা থাক। আমি লজ্জায়, গ্লানিতে মাখামাখি একটা প্রাণী, বাইরে মানিয়ে নিয়েছি খানিকটা হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে, মনের উঁচু-নীচু নানা স্তরে একটা ছদ্মবেশ পরা আক্রোশ ফুঁশতে থাকে। সেই অবস্থায় ওই ব্যাপারটা। সেটা বয়সের ধর্মবশে হঠকারী একটা কর্ম হয়ত, কিন্তু যেই আমি নীচু হয়ে তাকে, ওই মেয়েটিকে···আমার ঘুষ-ঘুষে জ্বর যেন ঘাম দিয়ে ছাড়তে থাকল। আরোগ্যের কত রাস্তা আছে তুমি জানো না। প্রতিশোধ, প্রতিদান, একে যা-খুশি-তাই বলো, কিন্তু ওই মেয়ে, ও সেই মুহূর্তে ওই বাড়ির

প্রতীক হয়ে গেল, আমি যে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলাম, সে কেবল আমার শরীরের কোন ব্যাপার নয় ; বলেছি তো, মনের দিক থেকেও আমার মুক্তি। আমার, আমাদের। আমি আর দাস রইলাম না, সুতরাং তুমিও রইলে না দাসী। তার ঘুঁটেকুড়ুনি মায়ের দুঃখ একটি ছেলে ঘোচাল—সেই পুরনো রূপকথাটা। লেখা হয়ে গেল, নতুন ধরনে, মা, তুমি তার মানে বুঝলে না ?

একত্রিশ

শ্রীচরণেষু—শ্রীচরণেষু—শ্রীচরণেষু। আজ সকাল থেকে এই পর্যন্ত অনেক কাটাকুটি করে একটা কথাই খালি লিখতে পারলাম "শ্রীচরণেষু।" মানে কি কথাটার, শ্রীচরণেষু মানে কি প্রণাম, শ্রীচরণেষু মানে কি ক্ষমা-প্রার্থনা? না, না, এই শেষ সময়ে বানানো একটা মিথ্যে দিয়ে নিজেকে, তোমাকে, আর আমার এই স্বীকারোক্তি যে ক'জন শুনছে তাদের সবাইকে ভোলাব না।

প্রণামের কোনও বিকল্প হয় না, কাগজে-কলমে শতকোটি নিবেদন-মিদং লিখলেও না। প্রণাম একটি আনত, বিনম্র ভঙ্গি, সর্বাঙ্গ দিয়ে যা তৈরী করতে হয়, সেই ভঙ্গি, সর্বস্ব দিয়ে মিলিয়ে উচ্চারিত এক নির্বাক ভাষা, লিখতে হয় নিজেকে হটিয়ে দিয়ে, কথা নেই তাতেই অনেক বলাবলি, যার পড়বার সে ঠিক পড়ে নেবে, সে তুলেও নেবে সস্নেহে। আশীর্বাদ আর প্রণাম মিলে যাচ্ছে একটি মুহূর্তে, এর চেয়ে পবিত্র দৃশ্য হয় না।

কুৎসিৎ-কুরূপ যাই হোক, যে-মুহূর্তে কেউ প্রণাম করতে পারল, তার মানে নিরভিমান, আত্মবিস্মৃত সমর্পণ, সেই মুহূর্তেই সে সুন্দর হয়ে গেল। পঞ্চভূতে তৈরী শরীর প্রণামের চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ আরও করে থাকে, করতে হয় তাকে; কিন্তু প্রণামের চেয়ে সুন্দর কোনও চিত্র শরীর দিয়ে রচনা করা যায় না।

কারও পদতলে অথবা কোনও প্রতিমার বেদীমূলে উজাড় করে দেওয়া—"শ্রীচরণেষু" কি তার বিকল্প হতে পারে? ও তো আচরিত একটা পাঠ, তৈরী একটা গৎ। তাকেই শিরোধার্য করে পাতার পর পাতা ভরছি বলেই কি ঘুরে মরছি, গোলোকধাঁধার ভিতরে, আর মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছি, যেমন আটকে গেলাম এই ক্ষণে, আমাদের দু'জনের সম্পর্কের একটা চরম সংকটের সময়ে?

যেন একটা দেওয়াল উঠে গেছে। কিংবা তার চেয়েও বেশী—যেন কোনও গিরিশ্রেণী, আন্দোলিত প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করে যাদের তরঙ্গিত চলে যেতে দেখি, নতুবা তারা স্থির, প্রকৃতপক্ষে নড়ে না, পথও দেয় না, দুই দিগন্তের মধ্যে পাহাড় এক-একটা আড়াল, এক-একটা আড়ি।

সেই পাহাড়ের তলদেশে দাঁড়িয়ে আছি। উপর দিকে চাইছি। ডাকছি, "মা, ও মা!" তুমি সাড়া দিচ্ছ না। দূর নক্ষত্রকে ডাকলে সেও ফিরে একটু ঝিকিমিকি ইশারা জানায়। তোমার কাছ থেকে আজ তা-ও পাব না।

তবে এই লেখা-টেখা থাক, আরও ডাকি, ডাকি চীৎকার করে—প্রাণভয়ে? না, প্রাণ নিয়ে ভয়-ডর আমার আর বিশেষ নেই, ও তো যাবেই, কিন্তু কী থাকবে, কী রেখে যেতে পারব, একটি পাপী-তাপিত কণ্ঠের মা ডাক ছাড়া?

তাই ডাকি। কতকাল ডাকিনি—তোমার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে মুখ খুলে আর তো ডাকতাম না! তার শাস্তি এই লেখা।—লিখিয়ে নিলে। সেই লেখাও না-হয় উড়ে যাক, শুধু ডাকটা থাক। আমার প্রায়শ্চিত্ত। বারে বারে বোধ করছি, বিশেষ করে এই লেখাটা ধরার পরে, লেখার সবচেয়ে সামান্যতা—লেখাটা হয় কালি দিয়ে। তা-ই সে থেবড়ে ছড়িয়ে যায়, ফিকে হয়, কিংবা মুছে আসে। চোখের সাদা জল দিয়ে যদি লেখা যেত, সে-লেখা থাকত। শুধু তাই নয়, সেই জলের ধারা নিজের পথ নিজে খুঁজে নিত।

আমি আজ পথ দেখতে পাচ্ছি না, ঝাপ্‌সা, সব ঝাপ্‌সা, অথচ এটা কুয়াশার কাল নয়, আঁধি, তবে কি এটা আঁধি? সেই যে ধূলিঝড় উঠল দু'জনের মধ্যে, তারপর থেকে নিরন্তর তা কি বইতেই থাকল?

মা আর ছেলে। এই পৃথিবীতে যে সম্পর্ক প্রথমতম। তাকে নিহত করে কত দিন ছুরিটা ফের খাপে পুরে নির্বিকার ঘুরলাম। দূর থেকে দূরে চলে এসেছিলাম, তাই সেলার কালীপূজায়—

রজনীগন্ধা বলল, "এ কী, তুমি প্রণাম করলে না?"

আমরা সবাই মিলে মণ্ডপে দাঁড়িয়েছিলাম। খুব ঘুরেছিলাম, তার আগে দেওয়ালীর সন্ধ্যায়। অনেক আতসবাজি ঝলসে গেল আকাশে, অনেক হাউই তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ছুটে গেল। পটকা ফাটছিল ফটাফট, কত ফুলঝুরি চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে ফুরিয়ে গেল।

রজনীগন্ধা বলল,—ওকে তখন আমি ওই ভারী গহনার মতো নামেই ডাকতাম, কারণ ডাকনাম কিসমিসটা খুব খেলো শোনাত—"যতক্ষণ জ্বলে, ফুলঝুরিগুলো ততক্ষণই ভালো। নইলে ওদের বড় কষ্ট, না?"

"কষ্ট কেন?"

"দেখছ না? শুধু ছাই আর শক্ত, সিঁটিয়ে যাওয়া একটা শিকই থাকে যে। তখন খানিকক্ষণ শুধু ছ্যাকা দিতে পারে, তারপর?—একেবারে ঠাণ্ডা, শীতল।"

"রজনী", আমি বললাম, "রজনী, তুমি বড় বেশী ভাবো।"

"রজনী বোলো না," সে বলল, "ডাকতে হয় বরং পুরো নামেই ডেকো। রজনী শুনলে কেমন ভয় করে।"

"ভয় কেন?"

"বঙ্কিমচন্দ্রের বই—মনে নেই? সেই রজনী অন্ধ ছিল। আমি—আমিও তো অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।"

বলতে পারতাম, তোমার প্রকৃত দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। বললে কুরুচিপূর্ণ ঠাট্টার মতো শোনাত। তাই কিছু না বলে এগিয়ে গেলাম একটা মণ্ডপের দিকে। সেখানে সবে জোর ঢাকের বাজনা শুরু হয়েছিল। বুলা আর বাঁশিও ছিল, একটু দূরে। বুলা একটা ভ্রূভঙ্গি করে কানে হাত দিল। দূর থেকে একটু জিভ্ বের করে আমাদের ডাকছিলও সে।

কাছে যেতে বুলা বলল, "এই ছাখ্, আমিও মা-কালী হতে পারি। জিভ্ বের করাটা ঠিক তেম্নি হয়নি, বল ?"

"হয়েছে।" বলেই পাশ কাটাতে চাইছিলাম, বুলা আমার জামার আস্তিন ধরে টানল আবার। বলল, "দাঁড়া! হয়েছে বটে, হয়নিও আবার। মহাদেব কোথায় ? নেই তো!"

বাঁশি ছিল পাশে, সে-করুণ চোখে চাইছিল। বুলা হুকুম করলে ও যেন শুয়ে পড়ে তখনই, তার পায়ের তলায় শিব হয়ে যায়।

বুলা বলল, "ভাঁওতা। আসলে পুরুষেরাই মেয়েদের রেখেছে পায়ের নীচে, এই কালী প্রতিমায় সেটাকেই উল্টে দিয়ে মেয়েদের ধাপ্পা দিচ্ছে।"

"ধাপ্পা নয়" আমি আস্তে আস্তে বললাম, "সুন্দর একটি কল্পনা, চমৎকার একটা উপহার। পুরুষেরা আজ অবধি মেয়েদের যত উপহার দিয়েছে এর চেয়ে ভালো তার একটাও নয়। এ উপহার সম্পূর্ণ বশ্যতার।" রজনীগন্ধার চোখে চোখ রেখে শেষ কথা কয়টি বললাম।

তারও খানিক পরে, যখন চলে আসছি, রজনী বলল, "এ কী, তুমি প্রণাম করলে না ?"

"প্রণাম আমি করি না, কাউকেই না।" খুব তুখোড় একটা ঝোঁক দিয়ে বললাম ; ওদের কাছে আমি যেন আরও, আরও শহুরে বলে নিজেকে চালাতে চাইছিলাম—ছাখো ছাখো, আমি ডিম-টিম ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি, কোনও গেঁয়ো সংস্কার আমার নেই—ভাবখানা এই।

অবাক হল রজনী। আহত গলায় বলল, "মাসিমাকেও না ?"

তখন তো তোমার-আমার মধ্যে সেই দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, অনায়াসেই তাই বলে দিলাম, "ওই মাঝে মাঝে ঠেকাই। নেহাৎ ঠেকাতে হয় তাই।"

"ছি", ওর চোখ ছু'টিকে আরও আয়ত করে রজনীগন্ধা বলল,

"প্রণাম করতে হয়। মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে। তাতে দেখবে নিজেরই ভালো লাগবে।"

"ওই মাটির মূর্তিকে? ফুঃ," বলে সব কিছু উড়িয়ে দেবার নেশার ঘোরে সেদিন সরে এসেছি।

সেই মূঢ়তার, সেই সীমাহীন অশ্রদ্ধার প্রায়শ্চিত্ত তখনকার মতো তোলা রইল, কিন্তু এড়ানো গেল না তো। সময় নামে যে যন্ত্র, তার দাঁতে সব অহঙ্কার-অস্বীকার একটু একটু করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সময় মন্দিরে মন্দিরে আমাকে দিয়ে মাথা ঠুকিয়েও নিয়েছে, কী নিষ্ঠুর প্রতিশোধ! কত তীর্থের চত্বরে আমি পরবর্তী কালে কপালে কপালে সিঁদূর লেপেছি, পবিত্র গাভীর লেজ ধরে, ভক্তিভরে, পাণ্ডারা যেমন বলে দিয়েছে, সেই মত পরিক্রমা করেছি, আরও শত শত ভক্ত নরনারীর সঙ্গে, তাদের মধ্যে মিলে গিয়ে ভক্তি, বিশ্বাস, মুক্তি এই সব খুঁজেছি। খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। কিছুই পাইনি কি? কিছু পেয়েছি নিশ্চয়ই। আর্ত প্রার্থনায় আমার পাপবোধ অন্তত সাময়িকভাবে হালকা হয়ে গেছে।

ঈশ্বরের কথা থাক। মা, সবচেয়ে বড় শোধ নিয়েছ তুমি নিজে। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে যে-কোন উৎসবের দিনে—নববর্ষ, বিজয়া কি জন্ম দিন—সকাল থেকে কেবলই মনে পড়ে কত দিন তোমাকে প্রণাম করা হয়নি। কোনও দিন আর হবেও না, তোমাকে এ-জীবনে প্রণাম করতে পারব না। সামান্য ক্ষতি, কিন্তু ওই অনুভূতিটাই ছড়িয়ে যায় ধীরে ধীরে, ভিতরটা ছেয়ে আসে।

সব চেয়ে কষ্ট হয় যে-কোনও ছুটির দিনে, যেদিন কেউ আসে না। অপেক্ষা করে থাকি। আসে না। টের পাই, আমি নিঃসঙ্গ। আমাকে কারও প্রয়োজন নেই, ওরা আসবে না। যাদের পরিত্যাগ করেছিলাম আমি, তারাও আমাকে ত্যাগ করেছে একে একে। বিশেষ করে এক-একটা উৎসবের দিনে মনের ভিতরে এই সব ঘটে।

আর প্রণাম, সে আরও যন্ত্রণা। কেউ পায়ের কাছে মাথা নীচু করলেই গুটিয়ে যাই, ভাবি শুষ্ক নিয়মরক্ষা করছে মাত্র, এর ভিতরে প্রাণ নেই। আমার গুরুজনদের আমি প্রণামের নামে যে-ছলনা করতাম, ফিরে পাচ্ছি সেই ছলনা।

আর? সেই ভাবনাটা আরও ভয়ের। ধরো দিনটা কোনও বিজয়া। স্নেহের কেউ প্রণাম করতে এলে চমকেও উঠি। ভাবি, এই বছরও পেলাম, কিন্তু আসছে বছর? তা-ও হয়ত পাব? তার পর? কোনও একটা-বছর নিশ্চয়ই আসবে, যখন পাব না, কেন না, আমি থাকব না। অথচ তখনও বিজয়ার পর বিজয়া আসবে, শুধু একটি প্রণাম আর আশীর্বাদের পাট উঠে যাবে।

শুধু কি বিজয়া? কোন্ দোলের দিনে কাকে রঙ দিতাম, আর দিই না, কোন্ পার্বণে কার হাতে পিঠে খেতাম, আর খাই না, এক-একটা জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি— জীবন মানে এই তো!

সমুদ্রের ধারে সতত যে হাওয়া বয়, বাতাসও সেখানে নিঝর, লিখতে বসে নিয়ত তার শন্ শন্ শুনি। কিন্তু কোন কোন দিন শুনিও না। সমুদ্রের হাওয়াও যেমন কখনও-কখনও পড়ে যায়। তখন লেখা আসে না। অন্তত খেই থাকে না।

যেমন আজ কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছি না, কোন্ কথাটা আগে লিখব। বুলা-বাঁশি-রজনী আর আমি এই ক'জনে মিলে যে চৌকো ছক তৈরী হয়ে যাচ্ছিল, সেই কথাটা? অথবা সুধীরমামা যেদিন এসেছিলেন, সেই দিনটি?

সত্যিই উনি এসেছিলেন একদিন। বলেছিলেন, আসবেন। কথাও রাখলেন। বাঁশি উপরের ঘরে এসে খবর দিল "তোমাদের কে একজন আত্মীয় এসেছেন নীচে, ডাকছেন তোমাকে।" গেলাম।

চৌকাটে-রাখা জুতোর সাইজ দেখে কে এসেছেন বুঝলাম। তখনই ঢুকিনি কিন্তু। কারণ ? এখন আর লুকিয়ে লাভ নেই, ওই ঘটনাটার পরে চট করে তোমার সামনে যেতে পারতাম না আমি, ওর পরেও সহজ হওয়াটা সহজ ছিল না।

তোমার মুখের একাংশ ঢাকা। কানে এল, "তুমি এখানে যে আছ জানতাম। এত দিনে বুঝি খবর নিতে এলে ? ছাড়া পেলে ?"

"ছাড়া ? না আনু, ছাড়া আমি এখনও পাইনি। ভীষণভাবে বাঁধা পড়ে আছি। আজ আর তোমাকে সে-সব বলব না। তুমি—তোমরা কেমন আছ বলো।"

"দেখছ তো।" তুমি বললে, মাটি থেকে একবারও চোখ না তুলে।

আলাপ জমছিল না, ছেঁড়া সুতোর দু'টুকরো দু' দিক উড়ে এসে আর জুড়ছিল না। সুধীরমামা বললেন "চলি", বেশ হঠাৎই বললেন, আর তুমি শুধু শুকনো একটা "এসো।"

"আসব। আমি আরও একদিন এসেছিলাম কিন্তু। প্রণববাবুর সঙ্গে দেখা হল। উনি বলেননি ?"

"বোধহয় ভুলে গেছেন।"

বাইরে এসে সুধীরমামা আমাকে দেখতে পেলেন। ডেকেও নিলেন—"আয়। একটু এগিয়ে দিবি।"

গেটের বাইরে এসে উনি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে শক্ত করে ধরলেন আমার একটা হাত।—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। মিথ্যে বলবি না। তুই কি আনুকে খুব দুঃখ দিচ্ছিস ?"

মাথা নীচু করে রইলাম। দুঃখ ? উনি জানেন না। দুঃখ বলতে আর কতটুকু বোঝায়। আমি তো নিহত করেছি তোমাকে।

সুধীরমামা বললেন, "ছি, মাকে দুঃখ দিতে নেই।" যেতে যেতেই বললেন, "কথাটা কেন মনে হল ভাবছিস ? মনে হল আনুকে

দেখে। ওর চেহারায়, ভাবে-ভঙ্গিতে। তা-ছাড়া ওর একটা কথা আমাকে চমকে দিল। বলল, সব তো হয়ে গেল সুধীরদা, এখন শুধু চলে যেতে চাই। বলল কেন?"

শুকনো গলায় বললাম, "আপনিই বলুন না, কেন।"

"বললাম তো। খুব সম্ভব তোর জন্যে। চাপা মেয়ে তো, বরাবরই। ভেঙে বলল না।"

তেতো গলায় বললাম "অন্য কারণও তো থাকতে পারে। সে-সব ভাবছেন না কেন। আমরা এই বাড়িটায় পড়ে আছি, বাবা সেই অসুখটার পর আর সেরেই উঠলেন না।" আসলে আমার মনে তখন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটছিল, আমার অপরাধবোধ বদলে রঙ নিচ্ছিল রাগের, হিংসার—এই সব ঘটে। তাই সহ্য করতে পারছিলাম না ওই লোকটিকে। মা, সুধীরমামা, সেই সুধীরমামাও তখন হয়ে গিয়েছিল স্রেফ "লোকটি", আমাদের সংসারে যার অনাহূত ছায়া বারে বারে পড়ে, ওঁর গায়ে-পড়া উপদেশ, নাক গলানো এ সব কিছুই বরদাস্ত করতে পারছি না, উনি আবার এলেন কেন।

ওঁর চোখে ধরা পড়ার ভয়, আমিই যে ঘাতক, তোমার হত্যাকারী, উনি টের পেলেন কী-করে, নিজে থেকেই পেলেন, না তুমি বলে দিলে, ছি, মা, ছি! তাই আমি কঠিন হয়ে উঠছিলাম।

"অন্য কারণও থাকতে পারে, ঠিক।" গলা সাফ করে সুধীরমামা বললেন, "তবে সে-সব কারণের ছাপ আলাদা, আমি জানি। তাছাড়া আনুকে তো চিনি, সেই কবে থেকে—"

"থাক, কবে থেকে চেনেন সেসব শুনতে চাই না, জেনে দরকার নেই আমার", ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠলাম আমি, তখন স্নায়ু-রোগীর মতো কাঁপছিলাম, নিজের স্বর নিজেই চিনতে পারছিলাম না। একটা অতিকায় গাছের শাখাপ্রশাখার বিস্তারের নীচে নিহিত হয়ে ছিলাম, একটু দূরে পুকুরে একটা শালুক ফুল তখনও দেখা যায়, তারই

একটাকে লক্ষ্য করে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে আমি ছুঁড়লাম। ছপ করে শব্দ হল, কাকে আঘাত করলাম?

সুধীরমামা বিবর্ণ হয়ে গেলেন, অস্পষ্ট আলোতেও আমার মুখটাকে পড়তে চেষ্টা করেছিলেন ঝুঁকে পড়ে, খুব লম্বা মানুষ তো, ঝুঁকে পড়ার জন্যে এখন হাতের লাঠিটার সমান, কিন্তু আমি দমছি না, দম বন্ধ করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—মনে মনে একটা পার্ট পড়ে নিচ্ছি—'পালান সুধীরমামা, পালান, পালান, আমি আরও ঢিল ছুঁড়ব কিন্তু, আমি একজন হত্যাকারী, আমার চোখে ছুরি ঝলসাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না? পালান।'

সত্যিই খুন চেপেছিল আমার মাথায় সেই সময়ে। একটা পাপ করে ফেলার পর আর পাপের সীমাবোধ থাকে না। একটা সম্পর্ক, তোমাকে দিয়ে নষ্ট করেছিলাম বলে বাধা-বাঁধ কিচ্ছু আর ছিল না, কালাপাহাড়ী রক্ত টগবগ করছিল রগে-রগে—সব নষ্ট করব এই খ্যাপামি। কোনও সম্পর্ক মানব না।

হাতের লাঠিটা আগে আগে রাস্তা দেখাল, সুধীরমামা তার পিছে-পিছে যাচ্ছেন, যান না। আমি ভাবব না। যাচ্ছেন—যাওয়াটা যদি ঠিক হয়, তবে আবার আসবেন, যাওয়া-আসা নিয়েই তো সব। শেষ যাওয়া কিংবা শেষবারের মতো আসা বলে কিছু যদি সত্যিই থাকত, তবে পৃথিবী, পৃথিবীর কক্ষপথ, ইত্যাদির আকার বৃত্ত বা বৃত্তবৎ হত না।

আমি আস্তে আস্তে সেই পুকুরের জলের দিকে নামতে থাকলাম। হাত ধোব। ধুয়ে ফেলব। কী? নিহত প্রীতি স্মৃতির রক্ত নাকি? আমি তখনও কাঁপছিলাম।

রজনী বলল, "সে কি আমার জন্যে?"

বাড়ি ফিরে আসার পরই সে-আমাকে ডেকে নিয়েছিল একটি

নিরালা কোণে। গিয়েছিলাম। না, সঙ্কোচ রাখিনি, ভয়টয়ও তখন আমার বিশেষ ছিল না, তুমি তো জেনেই গেছ, সুতরাং আমার আর ভয় কী ; আর বাঁশি, ওর দাদা বাঁশি ? তাকে আবার পরোয়া কে করে, সে নিজেই তো সবার কাছে নত হয়ে আছে।

রজনী বলল, "মাসিমা এখান থেকে চলে যেতে চাইছেন—"

"চাইছেন নাকি ?"

আমার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সে বুঝি আহত হল।—"তোমার মা, আর তুমি জানো না।"

"মার সব কথাই ছেলে জানবে, এমন কোনও কথা আছে নাকি ?"

"উনি কিন্তু ছেলের সব কথা জানেন।" রজনী বলল স্থির স্বরে। "তাই তো জিজ্ঞেস করছি, যেতে যে চাইছেন সে আমার জন্যেই কি ?"

"জানি না। কিন্তু যেতে চান তোমাকে বলল কে।"

"দাদা। দাদাকে ডেকে উনি জিজ্ঞেস করছিলেন সে ওঁকে তোমাদের দেশের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা। ভেবে ছাখো, ওঁকে পৌঁছে দেবে দাদা ? যে একা-একা রেলেই চড়তে পারে না, সে নাকি হবে চলনদার !"

"রেলে চড়তে পারে না, কিন্তু বাঁশি ওদিকে কিন্তু বুলাকে খুব ট্যাক্সিতে ঘোরাতে পারে !" আমাদের আলাপে ঠাট্টার ছোঁয়া লাগতে বললাম !

"সে-ও তোমারই কীর্তি। তুমিই ভিড়িয়েছ। দাদার সর্বনাশ করছ। ছিল থিয়েটারের নেশা নিয়ে, এখন ছেলে হওয়ার পাগলামি ওকে পেয়ে বসেছে। টাকা পেয়ে বুলা দাদার পার্টটা দাদাকে ছেড়ে দিয়েছিল তো, দাদা নাকি পার্টটা আবার বুলাকেই ফিরিয়ে দেবে। পার্টে ওর আর দরকার নেই বলছে, যদি বুলাকে পায়।"

"পেয়েছে তো।"

"ওকে পাওয়া বলে না। বুলা শুধু ওকে নিয়ে খেলছে।"

"যেমন আমাকে নিয়ে তুমি ?"

রজনী হাসল না—"কিংবা তুমি আমাকে নিয়ে। তাও তো হতে পারে ? তুমি—তুমিও হয়ত বুলাকেই—"

আমি ওর মুখে হাত চাপা দিলাম। হাত সরিয়ে দিল সে, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে নয়, সন্তর্পণে দোল দেওয়ার ধরণে। অন্ধকার জমছিল।

রজনী বলল, "এই কোণটাতে তোমাকে ডেকে আনি কেন জানো ?"

"আন্দাজ করতে পারি।"

লাজুক গলায় সে বলল, "না, না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমার বোধটোধ বলে কিচ্ছু নেই। এই অনুভূতি নিয়ে তুমি আবার লেখক হবে! শোনো, এখানে আসি এই জন্যে যে, এই কোণটাতে আমরা দু'জনে সমান হই।"

তবু চেয়ে ছিলাম। রজনী বলল, "আমার দৃষ্টি ক্ষীণ, অন্যখানে যেখানে আলো, সেখানেও ভাল করে দেখতে পাই না। অথচ আর সবাই পায়, তুমি পাও। এখানে আলো নেই, তাই সমান। আমি তো দেখতে পাচ্ছিই না, তুমিও না।"

সে থেমেছিল। আর-একটু সরে আসবে বলেই বুঝি চুপ করল। —"দ্যাখ, মাসিমা সব জানেন। আমি বরং হস্টেলেই ফিরে যাই। তুমি ওঁকে কষ্ট দিও না।"

ভাঙা কর্কশ গলায় বলে উঠলাম, "কষ্ট ? কাউকে কষ্ট দেব না, আমি একাই সব কষ্ট পাব, এমন কোনও কড়ার করে তো আসিনি ?" বলেই শিউরে উঠলাম, নিজের স্বরের রোমশ নিষ্ঠুরতায় এই মাকড়শার জালে ঘেরা অন্ধকার কোণে আরও একটি কোমল সম্পর্কের টুঁটি টিপে ধরব নাকি। কত হত্যাকাণ্ড এই দুটি হাত দিয়ে ঘটবে, হে ঈশ্বর!

"তুমি ঠিক বলছ না", সে আস্তে আস্তে বলল, "সবাই আপনার

কষ্টটাই বড় করে ছাখে, অপরেরটা দেখতে পায় না। এই যেমন—” যেন অনেক যন্ত্রণা চাপা দিতে দিতে সে বলল, “অন্ধদের কত স্তোক দেয় লোকে। তাদের চোখের আলো নাকি বাইরে থেকে ভেতর দিকে। অন্তরটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তারা উঠে গেছে ওপরে, এইসব আর কী। সব বাজে কথা, কথার চালাকি। অন্ধ হইনি, তবু এখনই বুঝতে পারি, তাদের কী কষ্ট, কী যন্ত্রণা।”

আমি এখন শুধু দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর চোখের পাতা স্পর্শ করে কষ্টটা অনুভব করতে চেষ্টা করছি; মা, বিশ্বাস করো, তার চেয়ে গর্হিত আর কিছু না। আর এতদিন পরে, আমিও যখন ছ'মাস অন্তর চশমার পাওয়ার বাড়িয়েই চলেছি, রক্তে চিনির অনুপাত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে ধীরে ধীরে, তখন আমিও বুঝতে পেরেছি, চোখের আলোর ক্ষতিপূরণ কোনও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হয় না। বাইরের জগৎকে দেখার তৃষ্ণা চক্ষুহারাদের যায় না। তারা বরং অভ্যাস করে, নকল করে দৃশ্য জগতের চলাফেরার, সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে সূচীমুখ করে ক্ষতবিক্ষত হয়। যেমন, জরাগ্রস্ত অক্ষমেরাও কি কখনও উপভোগের সাধে জলাঞ্জলি দেয়? দেয় না।

হঠাৎ শিউরে উঠে রজনী চাপা গলায় “ওই শোন।”

মৃদু অথচ স্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর সত্যিই ভেসে আসছিল, সে কি স্বগত কোনও উচ্চারণ, অথবা আর্ত প্রার্থনা কোনও?

“সন্ধ্যা হল, এখন আমাকে হাঁসের মতো ডেকে নাও। সারা দিন সাঁতার দিয়েছি, আর পারি না, এখন পাড়ে তোলো।”

কে বলছিল, কাকে? আরও সন্নিহিত হয়ে এল রজনী, ফিসফিস করে বলল, “শুনতে পাচ্ছ? মাসিমা।”

পেয়েছিলাম। কোথায় যেতে চাও তুমি মা, সাঁতারে ক্লান্ত; উঠতে চাও কোন্ পাড়ে? ভয় করছিল, যাকে মৃত বলে জানি, তাকে জীবিত হয়ে উঠতে দেখলে যেমন ভয় করি। কঠোর হয়ে তীব্রস্বরে

তিরস্কার করেছিলে যেদিন, সেদিন তো ভয় পাইনি, তবে তখন পেলাম কেন। কথাগুলো কান্নার মতো, কান্না আবার মন্ত্রের মতো লাগছিল বলে? ওই রোমাঞ্চিত কোণে সেই ক্ষণে আমারও চোখ ঝাপ্‌সা। আমি আর রজনীগন্ধা সত্যিই সমান হয়ে গিয়েছি।

বত্রিশ

এই সময়টাতেই বাবার অসুখ আরোও বাড়ল। অনেক গাছ-গাছড়া আর পুরনো-টিনের কৌটো জড়ো করে রেখেছিলেন তিনি, তার মধ্যেই বসে থাকতেন, কী-সব লিখতেন, কিন্তু দেখতে দিতেন না, নতুন পালা-টালা? বাবা তাড়াতাড়ি সব লুকিয়ে ফেলে বলতেন "না। পালা? ওসব আমি আর লিখব না। ওগুলো ছিল পরের জন্যে। আর এগুলো? আমার নিজের জন্যে। এখন থেকে যা লিখব, সব আঁকিবুকি, কিন্তু সবই আমার।"

স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন নিয়ে একটা প্রবন্ধও ফেঁদেছিলেন, সেটাও আগলে রাখতেন, দেখতে দিতেন না। আমি জেনেছিলাম ওটাও ফাঁকি। ফাঁকি ওই গাছগাছড়া, টিনের কৌটোগুলো আসলে দেওয়াল—বাবা ক্রমশ নিজের জন্যে একটা আড়াল তৈরী করে নিচ্ছেন।

সেই লেখা আমি পরে পড়েছি। মা, তুমি কোথাও যেতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারোনি; বাবা কিন্তু চলে গিয়েছিলেন অনেক দূর। কোথায় পৌঁছেছিলেন, ওই নিজের লেখাগুলোতে তার আভাস ছিল। তার কিছু তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

"আনু একটা ভুল করিতেছে। আমার প্রতি, নিজের প্রতি, সকলের প্রতি। তার ধারণা, আমি বুঝি সুধীরবাবুর বিষয়ে এখনও বিদ্বেষ পোষণ করি। তাই সেদিন সুধীরবাবু যখন আসিলেন, আমার সহিত দেখা করিতে দিল না। ও জানে না, ঈর্ষাবিদ্বেষের যে স্যাঁতসেঁতে জমি, সেখানকার বাস আমি কবে তুলিয়া লইয়াছি। আছি কোথায়? সেইটাই তো বুঝিতে পারি না। একবার ভাবি, আমার এই নূতন বাসগৃহের নাম দিই 'আনন্দ'। হ্যাঁ, আনন্দও একটা-বসবাসের স্থান, তবে অতি অল্পকাল হইল সেটা জানিয়াছি।

"এই একটা মস্ত অসুবিধা—জানিতে জানিতে, জায়গাটা খুঁজিয়া পাইতে বড় দেরী হইয়া যায়। মধ্য বয়সে সবে থিয়েটারের সংস্পর্শে যখন আসিয়াছি, তখন সব্যসাচীবাবু একদিন বলিয়াছিলেন, 'সুরাপানের দোষ কী, জানো হে? পর পর অনেকগুলি পেগ্ না চড়াইলে জমে না, জমি তৈয়ারী হয় না—ওই মুশকিল।'—তাঁহার সেই কথাটা আজ এই শেষ বয়সে অন্য কোণ হইতে দেখিতেছি। দেখিতেছি যে, অনেক-গুলি বৎসর পার করিয়া না দিলে যথার্থ কোনও উপলব্ধি হয় না—না আনন্দের, না বৃহত্তর কোনও সত্যের। আমার তো প্রায় জীবন-কালটাই বহিয়া গেল।

"তা যাক। কিছুটা যে আভাস পাইয়াছি এই ঢের! আনু পায় নাই, তাহার সুধীর দাদাও না। ভদ্রলোক সেদিন সামনে আসিলেন না বটে, আগে যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন আমার দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর দেখিয়া বোধহয় রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়েন। সেদিন দেখা হইয়াছিল বাগানে, পত্রপল্লব আর সূর্যরশ্মি মিলিয়া যেখানে অপার্থিব এক মমতায় ঘন হইয়া রহিয়াছে। তিনি কথায় কথায় হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন তাঁর প্রতি আমার মনোভাব তেমনই বিরূপ রহিয়াছে কি না। আমি হাসিলাম। সেই হাসির তিনি অর্থ বুঝিলেন না। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল 'রাজর্ষি' নামে একটি উপাখ্যানের কথা। বলিলাম 'অরণ্যের একটা মহান মায়া আছে, জানেন না? মায়াবী পরিবেশে ভ্রাতৃহত্যায় কৃতসংকল্প নক্ষত্ররায়ের হাত হইতেও ছুরিকা খসিয়া পড়িয়া যায়।' তিনি তবু বুঝিলেন না, বলিলেন 'এই বাগানটা কি একটা অরণ্য?' হাসিয়া বলিলাম 'বাগান নহে, অরণ্য হইল এই বয়স, যাহা স্বভাবকে গভীরতা দেয়। পরিবেশের মতো বয়সেরও আবেশ আছে, হাত হইতে বিদ্বেষের ছুরি সেখানেও খসিয়া পড়ে।' সুধীরবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, 'তার মানে আপনার মধ্যে এখন ক্ষমা-ধর্মই প্রবল হইয়াছে?' বলিলাম 'ক্ষমা? সুধীরবাবু, কে কাহাকে ক্ষমা করে। ওটা অহমিকা আর

অভিমান বৈ তো কিছু না! যাহাকে ক্ষমা করা হয়, তাহার কী উপকার হয় জানি না, তবে ক্ষমা যে করে, বাঁচিয়া যায় সে। শান্তি পায়, নিজের কাছে নিজে শান্ত হইয়া রহে। যে ক্ষমা করে, তাহার স্বার্থেই কাজটা বেশী জরুরী।”

মা, আরও পড়ব? এর পরে বাবা লিখেছেন: “ওই শান্তি। যেমন দুর্লভ তেমনই আশ্চর্য। কে যে কীভাবে কবে পাইয়া যায়, তাহার ঠিক থাকে না। যেমন সব্যসাচীবাবু। শক্তি, জনপ্রিয়তা থাকিতে থাকিতেই তিনি হঠাৎ এক দিন স্টেজ ছাড়িয়া দিলেন। কেন, কেহ জানিত না; কানাঘুষায় বিস্তর কুৎসা রটিতেছিল। আমি তো জানিয়াছি, তিনি এখন সন্ন্যাসী, একটা মঠেই প্রায় সারাক্ষণ কাটাইয়া দেন। গেরুয়া ধরেন নাই বটে, তবু সন্ন্যাসী। সাদাসিধা পোশাক, নিরহংকার চালচলন। মাস দুই আগে হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা। চিনিলেন, ডাকিতে গিয়া নিজেই উঠিয়া কাছে আসিলেন। কয়েকটা কথা মাত্র, তাহাতেই বোঝা হইয়া গেল! সব ছাড়িয়াছেন। বলিলেন ‘কী করি। কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম কিনা, তাই ছাড়িতেই হইল। কিছু তাড়াতাড়ি।’ ভাল বলেন নাই? দেখিলাম, সেই দিব্য কান্তি তেমনই আছে, বরং ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়াছে। অর্থ? আগে উড়াইয়া, পরে বিলাইয়া দিয়াও ফুরাইতে পারেন নাই। তবু এই পথেই আসিয়াছেন। কেন না, উঁহারই ভাষায়, সব কিছুর হিসাব কোথাও মাপা আছে। মানুষের জীবনকেও মহাভারতের মতো পর্বে পর্বে ভাগ করা যায়: সুখ-দুঃখের পর উঁহার এখন চলিয়াছে শান্তি পর্ব।

“সব্যসাচীবাবুর কথার ঘরানা সেই রকমই আছে, পরিহাসমিশ্রিত, একটু নাটকীয়। হাসিয়া বলিলেন ‘এ কেমন শান্তি শুনিবেন? আমার স্বাস্থ্য এখনও ভাল, জানি নানা রমণীতে এখনও লিপ্ত হইতে পারি—কিন্তু হই না। যত খুশী মোটরবিহার করিতে পারি, কিন্তু করি না। টাকা খরচ করিয়া যে-সব বিলাস আর আরাম ক্রয় করা সম্ভব, তাহার সবই এখনও আমার আয়ত্তে—কিন্তু ছুঁই না। এই যে

প্রত্যাখ্যান, ফিরাইয়া দেওয়া, মুখ ফিরাইয়া লওয়া, ইহার মধ্যে শুধু অগাধ শান্তি নহে, অনির্বচনীয় একটা শক্তিও আছে। আজ আমি প্রতিদিন সেই শক্তির স্পন্দনও অনুভব করি।'

"আমি সব্যসাচীর মতো ভাগ্যবান নহি, তাই ওই শক্তির স্বাদ পাই নাই, যেটুকু পাইয়াছি তাহার নাম শান্তি। সুধীরবাবু আরও কম ভাগ্যবান, এই শান্তিও পান নাই। কিন্তু পাইবেন। বৃত্তাকার পথে মিছিল চলিয়াছে, একে একে আসিতেছে সকলে—সুধীরবাবু, আনু, প্রত্যেকে। সকলেই শান্তির সন্ধানী। তবে সুধীরবাবু যে পাইবেন, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। নহিলে সেদিন যাওয়ার আগে আমার কথা শুনিয়া তিনি ভাঙিয়া পড়িবেন কেন। কেনই-বা শেষ পর্যন্ত ভাঙা ভাঙা গলায় বলিয়া যাইবেন 'শুধু কাড়িয়া লওয়া কিংবা চুরি করাই পাপ নয়, মনে মনে কামনা করাও পাপ—প্রণববাবু, আমি আজ বুঝতে পারছি, কিন্তু দরজা খুলছে না যে!'

"খুলিবে। ওই স্বীকারোক্তিই সুধীরবাবুকেও মুক্তি আনিয়া দিবে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।"

সেই সময়টা কেমন ছিল বলো তো, যখন প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ কিছু বিশ্বস্ত চর খুঁজে পেত? তারা কী ঘটবে, ঘটতে চলেছে, বা ঘটল এইমাত্র, মানুষকে তার খবরাখবর এনে দিত।

কোথায় গেল সেই ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমী, যারা তাদের ডালে বসে মানুষকে শুনিয়ে শুনিয়েই যা হবে তার খোলাখুলি আলোচনা করত? হয় সেই পাখিরাই আর নেই, সেই প্রজাতিটি একেবারে লুপ্ত, অথবা মানুষের ভাষা ভুলে গেছে তারা, কিংবা আমরাও আর তাদের কথা বুঝতে পারি না। এ-ও হতে পারে, মানুষের ব্যবহারে বিরক্ত ওই পাখিরা আর মানুষের সুহৃদ নয় আদৌ, তাই কোন সংবাদ আমাদের আর দেয় না। এই অসহযোগে অসুবিধা হয়েছে আমাদেরই। কিছু টের পাই না আগে থেকে।

অথবা আমাদের চোখ গেছে, তাই "বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল" এ-সব দেখেও দেখি না, উপরন্তু শহরে ও-সব প্রাণী পাবই বা কই! আসন্ন অমঙ্গলকে আগে আরও কত চিহ্ন থেকে জানা যেত। গায়ে টিকটিকি পড়া, চোখের পাতা নাচা, এ-সব কবে থেকে উঠে গেল?

অথচ ঘটনারা আজও আসে, দৈত্যের মতো লম্বা-লম্বা পা ফেলে, শরীরের সম্মুখভাগে তাদের সবিস্তার ছায়া পড়ে। দেখতে পাই না। তুলনায় অবোধ প্রাণীরা এখনও সুখী; ছাখো না কখন ঝড় উঠবে, আবহ-বার্তার বর্ণমাত্র না পড়েও তাদের বোধে-অনুভবে তা অগ্রিম রটে যায়, ব্যস্ত পিঁপড়েরা সার বেঁধে উঠে পড়ে, আর? ত্রস্ত পাখি কুটো মুখে বাতাসের আগে আগে ঘরে ফেরে।

এত জ্ঞানী মানুষ, অথচ এ-সব বিষয়ে সবচেয়ে অজ্ঞান। নইলে কিছু যে একটা ঘটতে যাচ্ছে, তখনই টের পেতাম।

কিন্তু স্বপ্ন, মা, শেষ রাতের স্বপ্ন! তা তো ছিল। তাদের মূল নিহিত মনের ভয়ে, সেই বিষাক্ত লতার মত স্বপ্ন এক-একটা রাত্রে ভীষণ জ্বলুনি ধরিয়ে দিত।

বারবার ফিরে আসত সেই দৃশ্যটি: জলে নেমে সাঁতরে সাঁতরে কেউ কেবলই দূরে চলে যাচ্ছে, দূর থেকে দূরে, পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছি, সে সাড়া দিচ্ছে না, শুনছে না, কই, তার মুখটাই বা কই, মুখ সে কেন তোলে না, একবারও ফেরায় না? আমার ভয় করে। জলে আমিও নামব নাকি ভাবছি, তখন জলের উপর দিয়েই তার গলা ভেসে ভেসে এল "নামিস না। তোর এখনও সময় হয়নি।" সেই কণ্ঠস্বরে তাকে চিনলাম: বাবা। বাবা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছেন, গিয়েছিলেন তো আগেই—আরও যাচ্ছেন। আমি চীৎকার করে বললাম। "আর সময় হলে—?" উত্তর এল "নামবি।" আবার বললাম "তখন আপনি—?" "থাকব, ওপারে থাকব", বলেই মাথাটা জলের তলায় ডুবে গেল।

সেই জলের তলাতেও তাঁকে কখনও কখনও শয়ান দেখি, সে অন্য

স্বপ্ন, অন্য দৃশ্য, কিংবা পূর্ব-দৃশ্যেরই অনুক্রম। স্বচ্ছ জল, স্ফটিকের মতো নুড়ি, সেই তাঁর শয্যা, চারপাশে নানা উজ্জ্বল উদ্ভিদ, নানা রঙের মাছের খেলা, কিন্তু তিনি কিছুই দেখছেন না, তিনি ঘুমন্ত, তিনি শয়ান।

বাবার সেই প্রশান্ত নিমগ্ন মুখমণ্ডল এখনও মাঝে মাঝে ঘুমঘোরে দেখি।

তখন ক্রমশ ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন উনি, অসুখ বাড়ছিল।

তোমার আমার মাঝখানের দেওয়ালটা থরথর করে উঠেছিল দুই বার, মনে পড়ে? আমার দু'টি চীৎকারে। দু'বারেরই ভাষা এক—তীব্র, তীক্ষ্ণ "মা!" দেওয়াল ভাঙুক না ভাঙুক, ওই ডাক মাঝখান দিয়ে যাওয়া-আসার একটা পথ তৈরী করে দিল।

মাঝারি সাইজের সেই পত্রিকাটি আমার হাতের মুঠোয়, চোখ বিস্ফারিত, বিস্মিত আমি দৌড়ে আসছি, বাইরের ফটক ঠেলে, বাগান পার হয়ে আসছি, এই যে অবিনাশরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কিন্তু ওদের দিকে তখন চেয়ে তাকায় কে, আমি ছুটছি, আমার হাতে তখন বিরাট কোনও সম্পদ, কাকে দেখাব আগে, কাকে, রজনীকে? হয়ত তাই ঘটত, কিন্তু ঠিক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলে তুমি।

যা ঘটবার তাই ঘটল, যা ঘটা উচিত তাই। কোথায় সেই দেওয়াল, দেখতে পেলাম না, যত চাপা আবেগ, যত উত্তেজনা উজাড় করে বলে উঠলাম "মা!" দেওয়ালটা দুলে উঠল "এই ছাখ। বলো তো কী?"

"কী?"

"ছাখোই না। এই লেখাটা।"

"কার?"

"নামটা তো ওপরেই ছাপা আছে। পড়তে পারছ না?"

জ্বল জ্বল করছিল নামটা, কালো কালিতে নয়, যেন সোনার জলে ছাপা। গোটা লেখাটার।

"তোর?" একই সঙ্গে বিস্ময়, অবিশ্বাস, উল্লাস ইত্যাদি অনেক কিছু অনাগত কোনও গানের সপ্তস্বরের মতো তোমার মুখে খেলে গেল, সেই মুখে সপ্তবর্ণের আশ্চর্য সম্পাত ঘটছিল। "তোর?" আর কিছু বলছ না তুমি, বলতে পারছ না, খালি একটা কথাই ফিরে ফিরে বলা হয়ে যাচ্ছে "তোর—তোর—তোর?"

"আমারই তো। পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

"ওরা ছাপল?"

"পড়ো না মা, একটু পড়ো। কবিতাই তো, কয়েকটা তো লাইন মোটে।"

ঝকঝকে ছাপা পৃষ্ঠাটা তখন প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা মাটির মতো সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছিল, তখন নতুন বইমাত্রেরই পাতায় পাতায় একটা গন্ধের আবেশ থাকত, এখন থাকে না, অথবা থাকে, আমি তার খোঁজ পাই না, নিজের নাম ছাপা দেখে সেই সচকিত বিভোর ভাব উবে গেল কবে? এখন চোখ শুধু তার কৃত্য করে, আর সেদিন? ওই লেখাটার প্রতিটি অক্ষর কখনও উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল জলোচ্ছ্বাসের আকারে, হৃদ্‌পিণ্ড লাফিয়ে উঠছিল তালে তালে, কখনও সেই বর্ণমালা যেন এক-আকাশ ব্যাপ্ত মেঘ, কখনও ভারী চমৎকার কোনো ঘনকালো নির্ঝরিণী,—পড়ো না মা, কয়েকটা লাইন তো মোটে!

পড়বে কী, পড়া কি যায়, চোখ যদি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, দিগন্ত ছাপিয়ে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে যদি? পড়া হল না, কিন্তু দেয়ালটা ধুয়ে যেতে থাকল। জলে ধুয়ে যাবে বইকি, মাটির দেওয়ালই তো!

"আমাকে শোনাবে না?" রজনী বলল, সেই চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে!—"কবিতাটার কী নাম দিয়েছ দেখি।"

গাঢ় গলায় আমি বললাম "রাত্রি।"

"ও," সে বলল "আমার নামেরও ওই মানে।"

"সে তো এক ভাগের। সম্পূর্ণ নামে তুমি ফুল—রাত্রির পুষ্প। কিন্তু দিনেও থাকো।"

পাতাটা জড়ো করে বুকের কাছে রাখল সে, ঘ্রাণ নিল। ফিরিয়ে দিয়ে বলল "তুমি পড়ো।"

"তুমিই পড়ো না।"

"পারব কি? যদি ভুল পড়ি?

তবু সে পড়ল, ধীরে ধীরে, মুদ্রিত প্রত্যেকটি বর্ণকে যেন তার ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে দিয়ে। রাত্রিকে প্রাণদাত্রী বলেছ তুমি? বলেছি। বুঝেছি কেন। শুধু মেলাতে। এই কবিতাটায় তো মিল নেই। নেই? বেশ। যা বলেছ তাতে বিশ্বাস কর? বিশ্বাসের চেয়ে ঢের বেশী করি।

তখন সে চোখ বুজে পর্যাপ্ত একটি শ্বাস হৃদয়ের মধ্যে টেনে নিল। তারপর ফের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হোঁচট খেল: 'রাত্রিতে আবার আকাশগঙ্গাও দেখি।'—এর মানে কী? লিখেছ তখন ভয় করে, মনে হয় এক-একটি মরা নক্ষত্র এক-একটি বিশাল ছায়াপথের অধিপতি।' "কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে দেবে?"

"বুঝলে আমিই কি লিখতাম? বুঝিনি বলেই তো লিখেছি।"

সে আবার বলল "আমার ভয় করছে।"

"ভয় আমারও করে।" আমি তাকে ধরে ফেললাম, একটা পা ভুল বাড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কবাটে তার মাথা ঠুকে যেত।

সেইদিন রাত্রে তুমিও কী ভুলটা করতে যাচ্ছিলে, কী ভয়ংকর অন্যায়, বলো তো?

কত দিন পরে নিজে থেকে পাতে সব দিয়ে দিয়ে খাওয়ালে তুমি, বাঁশি উপরে উঠে গেল, তুমি চট করে সিঁড়ির মুখটা আগলে দাঁড়ালে।

"আয় এদিকে, আয় না একটু। দুটো কথা বলি দু'জনে, বলবি না?" ইস্ মা! তোমার গলা অভিমান আর অনিশ্চয়তার সর্দিজ্বর-লাগা কেন, ও-রকম কাকুতি মিনতির সুরে কথা বলছ কেন। আমাকে তো তুমি ইচ্ছে হলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পার, তাই না? মাঝের ফাঁকটুকু কতখানি 'হাঁ' হয়ে আছে আমি ভাবছিলাম।

আমার মাথায় একটা হাত রাখলে, সসঙ্কোচে, কত সন্তর্পণে, আর কত কাল পরে। সেই ছোঁয়াতেও ভাবি বা নিশ্চয়তা ছিল না। অধিকারের অহংকার? তা তো একেবারেই না।—"আর তো রাগ নেই, না রে?" তোমার গলা কাঁপছিল। "রাগ?" আমি হাসলাম, "কার ওপরে?" যদিও তোমার প্রশ্নটা ঠিকই বুঝেছিলাম।

(একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে বোকা মেয়ে, মনে মনে তোমাকেও বললাম বোকা মেয়ে, সেই এক কালের মতো আদরে, বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেল না? রাগ মানে তো রোদ, রাগ থাকবে কী-করে? তুমি কিচ্ছু বোঝ না।)

"রাগ করার কিছু নেই মা", আমি আবার বললাম। সেদিন যা বলা হয়নি তোমাকে এখন বলছি, শোন। অনেক ঠেকে, প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান পেয়ে, এতদিনে বুঝেছি, রাগ দিয়ে কিছু লেখাও যায় না। রাগ হল লালকালি, বড় কড়া,-চোখ কড়কড় করে, ও দিয়ে শুধু খাতার পাতায় ঢ্যাড়া মারা যায়। কত জনের উপরে কত রাগ নিয়ে এই লেখাটা শুরু করেছিলাম। আস্তে আস্তে সব উত্তাপ, উষ্মা জুড়িয়ে যাচ্ছে, দেখছ তো। লেখার ধরনটাই বদলে গেছে, মা। আমি সেই কবে থেকে ভালোবাসা দিয়ে বাকীটা ভরে ফেলতে চাইছি।

"সেই বইটা কই", তুমি হঠাৎ বললে ফিসফিস করে।

"এই তো।" পত্রিকাটা তখনও আমার পকেটেই ছিল।

"দে, আমাকে দে।"

কারণটা আন্দাজ করে উৎফুল্ল গলায় বলে উঠলাম "বাবাকে দেখাবে ?"

ঠোঁটে আঙুল তুলে তুমি বললে "এই। আস্তে। উনি শুনতে পাবেন।"

"বাবাকে দেখাবে না ? সে কী! তবে—তবে কি আমি দেখাব ? যাই দেখাই ?"

তুমি ধীরে ধীরে বললে "না। লুকিয়ে রাখতে হবে।"

"লুকিয়ে। কেন মা ?"

"তুই কিচ্ছু বুঝিস না। ওঁর শরীরের এই অবস্থা। আমি যা বলছি তাই ঠিক, কোনও আঘাত দেওয়া চলবে না ওঁকে। ওটা লুকিয়ে রাখতে হবে।"

ঠিক তখনই, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হল।—"কী লুকিয়ে রাখতে হবে, কী, কী ?" বাবার স্বর শুনতে পাচ্ছি, অনেক দিন পরে আমাদের দু'জনার গলা শুনতে পেয়ে কৌতূহলী বাবা ওঁর টিনের কৌটোর খেলার সংসার ছেড়ে, গাছ-গাছড়ার জগৎ ফেলে কোনও মতে কিছু ধরে ধরে উঠে এসেছেন, মা, দেখতে পাচ্ছ না ? শুনতে পাচ্ছ না যে বাবা বারবার বলছেন "কী লুকোতে হবে, কী—কী ?"

তুমি বললে না/বলছ না/বলবে না দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম আমি। বললাম "বাবা! এই যে!"

পৃষ্ঠাটা ওঁর চোখের সামনে মেলে ধরলাম, তুমি সরে দাঁড়ালে একটু। বাবা প্রথমে পড়তে পারছিলেন না, ফতুয়ার পকেট হাতড়ে বের করে নিলেন ওঁর সুতো বাঁধা চশমাটা, তার পরেই তাঁরও মুখে, মা, বিস্ফোরণ ঘটল, বিকালবেলা তোমার যা ঘটেছিল। অলৌকিক আলোকে প্লাবিত হয়ে যেতে থাকল একটি মুখ, পুরু ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, কানের পাশের নালীগুলি নীল এবং স্ফীত, বিড়বিড় করে উনি পড়ছেন, তারপরেই "তুই—তুই—তুই, তুই লিখেছিস" বলে

সোল্লাসে চীৎকার করে, হ্যাঁ মা, তুমি তো শুনেছিলে, কোনও জমাট বারুদজাতীয় পদার্থের মতো প্রচণ্ডভাবে বিদারিত হয়ে গিয়ে, কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে গোলাকার একটা ডেলা পাকিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন।

তোমার চোখে তখন তিরস্কার, যার মৌন মর্ম : 'কেন দিতে গেলি, কী হল দেখলি তো ? আমি আগে বলিনি ?'

একটু অপেক্ষা করো মা, পরে কী ঘটতে যাচ্ছে দ্যাখো। ওই যে বাবা নুয়ে পড়ে তুলে নিয়েছেন দোমড়ানো ডেলাটা, পাতাগুলো টেনে টেনে মসৃণ করছেন, পড়ছেন সবটা আগাগোড়া, মাথা নীচু করে, উনি এখন শান্ত, কই এতটুকু উত্তেজনার ভাব তো আর দেখা যায় না, উনি এখন নিস্তেজ, ওঁর সমস্ত মুখে এখন শুধু সংবৃত আনন্দের মহিমা।

"মৃত নক্ষত্র, মৃত নক্ষত্র", পড়া শেষ হলে উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন "চমৎকার ভাষা, কিন্তু তুই এসব বুঝিস ? একটু ছেলেমানুষি মিশিয়ে ফেলেছিস, তা ভালোই, যাক গে। কিন্তু ধর, একটা ছুটো নক্ষত্র নয়, মৃত যদি হন ঈশ্বর নিজে ? 'গাড়ির আড়ি' বলে সেই যে একটা গল্প পড়েছিলি না ? অন্ধকারে দুর্যোগে গাড়ি ঠিকই চলছে, তীরবেগে, কিন্তু তার ড্রাইভার বজ্রাঘাতে নিহত, অদৃশ্যভাবে মরে পড়ে আছে। গাড়ি তবু ছুটছে। এই বিশ্বের ব্যাপারটাও তেমন তো হতে পারে, পারে না ? কী সর্বনাশ বল্ দেখি। ঈশ্বর মৃত, কিংবা ধর মৃত না হলেও পাগল, কিংবা অর্বাচীন কারও হাতে ভার দিয়ে অবসর নিয়ে আছেন—ভেবে দেখেছিস ?"

আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম। উনি আবার পড়লেন লেখাটা, ছাপা হরফগুলোর উপরে মোটা মোটা আঙুল ঘষে কী যেন পরখ করলেন, তখনও তিনি শান্ত, তোমার দিকে এতক্ষণে দৃষ্টি পড়ল তাঁর।—"কিন্তু এটা তুমি লুকোতে চাইছিলে কেন বলো তো ?"

তুমি উত্তর দাওনি।

এবার বিষণ্ণ, বাবা আস্তে আস্তে বলেছেন "বুঝেছি। তুমি ভেবেছিলে আমি আঘাত পাব।"

তুমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছ "তোমার এই শরীর—"

বাবা আরও আস্তে আস্তে বলেছেন "শরীর নয়, সত্যি করে বলো। তুমি ভেবেছিলে আমি ঘা খাব মনে, তাই না?"

যেহেতু তুমি আবার চুপ, অতএব নিজের বাক্যটিকেই বাবা সুতোর মতো তুলে নিলেন ফের—"সারা জীবন ধরে আমি কত লেখা লিখেছি, তার একটাও ছাপা হল না, কেউ পড়ল না, কিন্তু আমার ছেলে? কলম ধরতে না ধরতে তার লেখা ছাপা হয়েছে, লোকে নিয়েছে—তুমি ভেবেছ সেটা আমার বুকে খুব বাজবে? আমি ব্যথা পাব? তাই, না?"

একটু থেমে বাবা, আরও গভীর, আরও ধীর, কিন্তু স্বচ্ছ অনর্গল কোনও জলস্রোতের মতো বলে চলেছেন, "ছিঃ আনু, ছিঃ! আমাকে বড় ছোট ভেবেছ তুমি। নিজে মা তুমি, অথচ পিতৃত্বের কথা জানো না। ছেলেকে সবাই জানবে, চিনবে, এই আনন্দ নিজের লেখা ছাপা হওয়ার চেয়ে এক তিল কম নয়। বরং বেশী, অন্তত এই বয়সে আমি তো বুঝতে পারছি, এই গৌরব ঢের বেশী। ছিঃ, না জেনে-বুঝে কাউকে ছোট করে না।"

আর তার পরে? মা, তার পরের মুহূর্তটিকে আর বর্ণনা করে কাজ নেই, বর্ণনা করার সাধ্যও নেই আমার, বরং এইখানে কলম থামিয়ে সেই মুহূর্তটিকে ধ্যান করি। কষ্টের যে-পুঁটুলিটা বুক থেকে সোজা উঠে এসেছে কণ্ঠমূলে, সেখানেই সে থমকে থাক।

বাবা ঘন হয়ে এসেছেন, ঘ্রাণ নিচ্ছেন আমার চুলের, ওঁর চোখে এক—কী? আনন্দ? আনন্দ কি বিদ্যুতের মতো এমন চকিত হতে পারে? আগে দেখিনি। দেখিনি কোনও মুখমণ্ডল সহসা হয়ে যায় পবিত্র এক যজ্ঞস্থলী।

উনি আমার মাথায় হাত রেখেছেন, সেই স্পর্শ অকম্পিত স্থির;

কিছু বলছেন, সেই উচ্চারণ প্রত্যয়ী, নিবিড় : "আমার আর ভাবনা নেই। আমি এবার মরতে পারব, কেন না জেনেই গেলাম আমি বাঁচব। জানলাম, যাব না। বা গেলেও আমি থাকব।"

আশীর্বাদ—আমাকে? আশ্বাস—নিজেকে? না, কোনও চতুর বিচার পদ্ধতি দিয়ে ওই গভীর-গম্ভীর আবৃত্তির মূল্যায়ন করব না। চোখ বুজলে আজও শূন্যোদ্যানে আকাশকুসুমের হৃদয়সন্ধানী বিপুল এক ভ্রমরের গুঞ্জন শুনি।

ঠিক তার পরদিন প্রভাতে, আমার সেই দ্বিতীয়বার চীৎকার— "মা—!" তুমি ছুটে এসেছিলে। চৌকাটে আমরা দু'জন পাশাপাশি, কতদিন পরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম ঘরের ভিতরে : চারধারে ছড়ানো টিনের কৌটো আর নানা উদ্ভিজ্জ, তাঁরই তৈরী স্বপ্নের সংসার, ছড়ানো সেই স্তূপাকার সংগ্রহের মাঝখানে—

বাবা শয়ান। ঘুমিয়ে আছেন।

একেবারে শিশুর মতো সরল এক সুখে, পরম কোনও তৃপ্তিতে। সকালের রোদ কতভাবে তাঁর শরীরের উপরে পড়ে তাঁকে তুলে দিতে চাইছিল, ক'টা উৎসুক চড়ুই ঘুরে ঘুরে তাঁর মুখ খুঁটিয়ে দেখছিল, তিনি নিস্পন্দ। পাশে রাখা গাছ-গাছড়ার পাতা থেকে একটা নিরীহ কীট বাহুমূল থেকে বেয়ে বেয়ে বুকের রোমশ অবারিত অরণ্যে নির্ভয়ে ঢুকে গেল, তিনি সহিষ্ণু, তবু নড়লেন না, কেননা তিনি কোনও প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত, অবিচল জলতলে মগ্ন তিনি শান্ত, চিরায়ত, তিনি ঘুমন্ত।

মা, এইবার চীৎকার করে ওঠার পালা ছিল তোমার, সহসা আকুল এক ঢেউয়ের মতো ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরে শতখান্ হয়ে গেলে।

যেন এইমাত্র মন্দিরে কারও জন্য প্রার্থনা হল, উপাসনা শেষ, সকলে তবু স্তব্ধ বসে আছি। নীরবতাই তবে কিছুক্ষণ বাঙ্ময় হোক। কথা কেবলি জলে দাঁড়ের মতো বাচাল আঘাত করে; নীরবতা টেনে নিয়ে যায় প্রসারিত শুভ্র পালের মতো, তাই থাক। ওই তো সুধীরমামা এসেছেন, আসবেন অবধারিত, কিন্তু চুপ। চুপ এই বাড়ির দাস-দাসীরাও, যারা আমাদের ঘৃণা করে। এই মুহূর্তে করছে না কিন্তু। তুমি দুপুরেও তোমার মাসিমার ঘরে কী একটা কাজের দেখাশোনা করতে যাচ্ছিলে, ওরা সবাই এসে তোমাকে সরিয়ে দিল। এই তো তোমাকে শুইয়ে দিয়েছে, ঠাণ্ডা মেঝেতে তুমি এখন বিশুষ্ক আঁচল পেতে। ওরা আজ তোমার সব কাজ করে দেবে। এক-একটা মৃত্যু এই সব ঘটায়, অনেককে স্পর্শ করে, প্রথমে সমবেদনা, পরে সেটাই মহৎ ভাবে আবিষ্ট হয়। হয়ত খানিকক্ষণের জন্যে। তবু অকিঞ্চিৎকর ঈর্ষাতুর মানুষকে ঈষৎ মহৎ ভাব কোনও মৃত্যুই দিতে পারে। দ্যাখো, সেই যে অবিনাশ, সে-ও কেমন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, উদ্ধত বিড়িগুলো আর টানছে না। জানি, মহত্ত্বের আশ্রয় থেকে ওরা বেরিয়ে আসবে অচিরে, আবার যে-কে-সে-ই হবে, তবু এই সময়টাতে যেটা সত্য তাকে ভুল করা উচিত হবে না।

সুধীরমামা বসে আছেন নীচু মুখে। তোমার দিকে এসে একবারই তাকিয়েছিলেন, তারপর আর না। মাটিতে দাগ টেনে টেনে কী কষছেন? অথবা উনি কি এখন এখানে নেই, পর্যটন করছেন স্মৃতিতে? কোনও অপরাধবোধ দ্বারাও আক্রান্ত কি?—"শুধু কেড়ে নেওয়া কিংবা চুরি করাই পাপ নয়, মনে মনে কামনা করাও পাপ", এই উক্তিটিকে মনে মনে উচ্চারণ করছেন ফিরে ফিরে, ওঁর শ্রাদ্ধের মন্ত্র এই একটাই?

কিন্তু আমি? আমি কোন্ মন্ত্র পড়ব? শ্মশান-অনলে দগ্ধ, বান্ধবদের দ্বারা পরিত্যক্তকে কোন্ স্নানে পানে সুখী করব?

তার চেয়ে থাক। কিছুক্ষণ মৌন থাকি, সেই কবে এই লেখা

লেখার ভেলায় ভেসে পড়েছি, ঘাটের পর ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে এলাম, এখন ক্লান্ত, মা, এই অধ্যায়ে আর একটাই তো মোটে ঘাট বাকী। সেখানেও যাব, নেমে যখন পড়েছি, তখন যাব নিশ্চয়, কিছু ভেবো না, সেই ঘাটও ছোঁব। আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে অর্পণ করব শেষ অঞ্জলি। যার হওয়ার কথা ছিল অংশত অভিযোগপত্র, তা হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। যাক।

তেত্রিশ

মা, এইমাত্র বেতারে বলল, "খবর বলা শেষ হল।" লেখা থামিয়ে রেডিওটা খুলেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করতে হল, কারণ, ওই ঘোষণাটা শোনামাত্র চমকে উঠলাম যে। "অ্যান্ড দ্যাট্ ইজ্ দি এন্ড অব দি নিউজ"—ওরা কত অনায়াসে বলে দেয়। আমি পারি না, যেহেতু আমি জানি সংবাদ, সংবাদের শেষ, উপসংহার? কী শেষ হয় মৃত্যুতে? যারা মৃত তারা ফিরে ফিরে আসে। যারা আসে না, এল না যারা, আমি তাদের অপেক্ষা করি।

লৌকিক অর্থে তাদের সবাই হয়ত মৃত নয়। চিরদিনের মতো চলে-যাওয়া সরে-যাওয়াকেও মৃত্যুকল্প ধরে নিয়ে এই সব কথা লিখছি। তাদের মুখোমুখি হওয়ার সাধ এখনও পোষণ করি। মোকাবিলা হোক, একবারটি দেখি। একটু কথা শুনি।

তা হয় না। যারা ত্যক্ত তারা আর ফেরে না। যারা পরিত্যাগী, তারাও না। দুরন্ত ঘোড়ার মতো আমার অতীত তার সওয়ারকে ফেলে দিয়ে, আমাকে অতিক্রম করে উড়ে গেছে, সে ফিরবে না।

তবে আমিই ফিরি। পা টিপে টিপে, পিছল পাতাল-পথে। যেখানে তখনও অবশিষ্ট সুধীরমামা, তুমি, বাঁশি, বুলা, রজনী ইত্যাদি।

কেন না তখনও তো নেমেছিলাম আমি, নামছিলাম। ফিরে গিয়েছিলাম। কেন না, মুহ্যমান হয়ে থাকে মোটে কয়েকটি মুহূর্ত। শোক সাময়িক। পৃথিবী তার শুষ্কতা দিয়ে সব শুষে নেয়। সেই দিক থেকে প্রতিটি শোক শুচি, প্রতিটি শোক যেন স্নান। স্নানের পরে সব আর্দ্রতা আমরা মুছে নিই, খড়খড়ে হাওয়ায় শরীরে আবার খড়ি ওড়ে, আমরা ফিরে যাই যে যার স্বরূপে, আবার সারা অঙ্গে ধুলো পড়ে, সায়াহ্নে বা পরদিন প্রভাতে আবার প্রক্ষালন। সময়

এমনিতে শূন্য, নিরাকার, নিরর্থক, তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে কখনও সুখ, কখনও শোক। তাৎপর্যে সাজায়।

"যখনই একা, তখনই তুমি।"—এই লাইনটা লিখলাম এর কতদিন পরে? মনে পড়ে না। খাতার পাতা অনেক দিন সাদাই ছিল। সেদিন কাগজ টেনে পর পর কয়েকটা শব্দ লিখে ফেললাম কেন কে জানে, লিখলাম, কাটলাম, দুটোই বেশ যত্ন করে, ফের লিখে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

রজনী কখন এসেছিল, খালি পায়ে। টের পাইনি। ঝুঁকে পড়ে লাইনটা সে যখন আস্তে আস্তে নিজেই পড়তে শুরু করল, চমকে উঠলাম!

"তোমার কোনও নতুন লেখা?" সে জিজ্ঞাসা করল। এর উত্তর দেওয়ার অর্থ নেই। নতুন লেখা? কী জানি। কথাটা হয়ত পুরনো, ভীষণ পুরনো। আসলে যখন কিছুই করার নেই, কিছুই নেই লেখার, তখনই মাঝে মাঝে এইসব ঘটে যায়। কেউ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে, কারও মনে শিমূলের মতো এক-একটা বীজ-সত্য ফেটে পড়ে—রক্তাক্ত সেই সত্য।

যখনই একা, তখনই তো। তখনই আমরা কিছু-না-কিছুর সন্নিধানে থাকি। তখনই খালি ঝড়, বিদ্যুৎ, মেঘ এইসব দেখি; কোনও শস্যের শিস, যা কামনায় কম্পিত। যখন একা, তখনই আমাদের সঙ্গী অনেকে—অজস্র সুখ, শিহরণ, কীর্তি-অকীর্তির স্মরণ, কত অপরাধবোধ, গ্লানি ইত্যাদি। বহুর সঙ্গ-জর্জর মুহূর্তগুলি কোনও ভাবনাকেই বিকশিত হতে দেয় না, তখন জীবন একটা ব্যস্ত মুদি-দোকান ছাড়া আর কী, কড়ি ফেলে ফেলে সস্তায় সওদা বেচাকেনা।

"তখনই তুমি"—সে অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করল আবার—"তুমি কে?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম "তুমি।"

"আমি ?" সুন্দর একটি আনন্দের হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

মা, আমি মিছে কথা বলেছিলাম তাকে। এই "তুমি" সে নয়, কেউ নয়, অনেকে। 'তুমি' একটা যৌথ শব্দ, বহুবচন, সমষ্টির প্রতিভূ। এক-এক সময়ে এক-একজন তুমি, আমরা যাকে যখন আবাহন করি, কিংবা যে যখন মস্ত হয়ে উদিত হয় সময়ের বিস্তীর্ণ ললাটে, প্রকাণ্ড একটা টিপের মতো আঁকা হয়ে যায়। এতে অন্যায় আছে কি, কোনও অবিশ্বস্ততা, কোনও পাপ ? জানি না। তবে নিয়মটা টের পাই। বিশেষ বিশেষ দিনে কিংবা ক্ষণে বাসনার সোনায় অথবা বিষাদের বেদনায় উতলা-অধীর করে তোলে বিশেষ কোনও জন, সেই মুহূর্তে সেই বিবেক ; সে আবার নিষ্ঠুর এক প্রভুও ; কষাঘাতে যখন জর্জর করে চলে, আমরা ভগ্নজানু, তখন করজোড়ে সেই আবির্ভাবকে "তুষ্ট হও" এই সকাতর প্রার্থনাই শুধু জানাতে পারি।

"কী ভাবছ," আমার মাথায় হাত রেখে—অশৌচান্তের মোটে তো মাস দুই তিন পরে, আমার মাথা তখন প্রথম কদম ফুল হয়ে আছে—রজনী বলল। কিছু বললাম না বলে সে নিজেই বলল, "আমি জানি, কী। মেসোমশাইয়ের কথা।"

চমকে উঠলাম। যখনই একা—তার মধ্যে বাবাও কি একজন 'তুমি' ? যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম একদিন, অন্তত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারিনি, শূন্য হাতে বিতাড়িত অকৃতার্থ একটি মানুষও বারবার যে ফিরে আসে সে কি আমাকে শাস্তি দিতে ? কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে, বলো, বলো, উতলা রাত্রে এই ক'মাস ধরে প্রতি রাত্রে তাকে ডেকে বলি। বাবা কথা বলেন না, শুধু হাসেন, নিজেকে বিখ্যাত এক বিদেশী নাটকের অস্থিরচিত্ত নায়কের সঙ্গে তখন মিলিয়ে ফেলি। প্রায়শ্চিত্ত করছি বৈকি, তারপর থেকে এই দীর্ঘকাল জুড়ে। যাবতীয় সংস্কার আর বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করে

সমসময়ের অবহেলা আমাকে ক্রমশ পরলোকে আস্থাবান করে তুলেছে: কোথাও নিশ্চয়ই আছে সুবিচার আর স্বীকৃতি। একটি মানুষ যে কত নৈরাশ্য সয়ে সয়ে সরে গেল, একটি মানুষ একা-একা কত কষ্ট পেল, মূর্খের মতো ভালবাসতে চাইল, ভালবাসাকে ছড়িয়ে দিয়ে হরির লুটের মতো, আবার গুঁড়ো গুঁড়ো বাতাসাগুলো কুড়িয়ে নিতে আরও মূর্খের মতো নুয়ে পড়ল, তার সেই শুষ্ক হাহাকার, চোখের পাতার গোপন সিক্ততা, তার প্রেম, তার পিপাসা, তার প্রতি বহুর উদাসীনতা, এক দিন এ-সব আবিষ্কৃত হবেই। কবে?—ইহ-লোকে আর নয়, আর সময় নেই, সময় নেই পরলোকে। সকল স্বজন সেখানেই।

"ছি, এত ভাবে না।" রজনী বলল করুণার প্রতিমা হয়ে।

"তুমি বুঝবে না", বললাম তাকে।

"বুঝব না?" অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সে। "শোক আমি পাইনি? আমারও—মা আর বাবা দু'জনেই—সে-কথা যাক। জানো ছেলেবেলায় একটা ফড়িং পুষেছিলাম আমি। বাগান থেকে বাবা ধরে এনে দিয়েছিলেন। সরু একটা সুতোয় কলমদানির সঙ্গে তাকে বেঁধে বাবার লেখার টেবিলটায় রেখে দিয়েছিলাম। পাখা নাড়ত ফড়িংটা, ফড়ফড় করে উড়তে চাইত। বাবা আর আমি দেখতাম, দু'জনেই মজা পেতাম। কিন্তু বাবা একবার বাইরে গেলেন, একদিন রাত্রে খুব হাওয়া উঠল, সকালে ফড়িংটা আর নেই। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে? খুব কাঁদলাম। কিন্তু পরে মনে হল ছেঁড়া সুতোটার চিহ্ন থাকবে তো? সন্দেহ হল। মাকে বললাম। মা স্বীকার করল, বলল যে "হ্যাঁ, আমিই উড়িয়ে দিয়েছি। ও কী বাজে খেয়াল! ফড়িংটা কষ্ট পাচ্ছিল, শুকিয়ে আসছিল—তাই।" আরও কাঁদলাম। মস্ত একটা কাগজ টেনে বাবাকে চিঠিতে লিখলাম "যে-ফড়িংটা তুমি এনে দিয়েছিলে, জানো বাবা, সেটা আর নেই। মা—তাকে—উড়িয়ে—দিয়েছে। কেমন চিঠি?"

"খুব সরল, সুন্দর।" আমি বললাম।

"এর চেয়ে মনের ভেতরের কথা বাইরে এনে কোন-কিছু আমি কখনও লিখতে পারিনি," রজনী বলল।—"তুমি সহজে অনায়াসে মনের সব কথা লেখায় ফোটাতে পার?"

"চেষ্টা করি।"

"ফড়িংটা উড়ে গেছে, মা উড়িয়ে দিয়েছে, দুঃখ ফোটাবার জন্যে এর চেয়ে বেশী কিছু লিখতে পারলাম না—তোমরা কত বড় বড় কথা জানো।"

"সে-সব দরকার হয় না। ছোট কথাতেই বড় দুঃখ বোঝানো যায়। ধরো, যেমন গানে।"

চমকে উঠে সে বলল "গানে? আচ্ছা, গান যে ভালবাসে, সে যদি হঠাৎ শুনতে না পায়, ধরো শক্ত কোনও অসুখ হল, কিংবা বেশী বয়সে—"

"দৃষ্টান্ত আছে," আমি বললাম "বইয়ে পড়েছি। বিদেশী এক সুরকার নিজেই—"

সে হাসল।—"দৃষ্টান্ত তোমার সামনেই আছে। কান নয়, আমার চোখ যাচ্ছে। জানো, ছেলেবেলা থেকে সব কিছু দেখতে এত ভালবাসতাম আমি। বাগানে, গঙ্গার ঘাটে, কিংবা এই ছাদে বসে দেখে দেখে সময় কাটিয়ে দিতাম। কত রঙ, লেখা আর মোছা। মোটে সাতটা রঙের কথা আছে তো? আমি কিন্তু ইংরেজি বই পড়ে পড়ে আরও অনেক রঙের নাম জেনে নিয়েছিলাম। ছবির অনেক অ্যালবামও আমার ছিল, ছাপানো, বাঁধানো বই সমস্ত। এখন সে-সব ছবি তত ভালভাবে আর দেখতে পাই না, বইগুলো মাঝে মাঝে বুকের কাছে টেনে তাদের গন্ধ নিয়ে থাকি।"

বলতে বলতে সে কাঁপছিল।—"আর আকাশ? অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের চোখ দুটো ঠিক পাখির মতো, না? দূরে দূরে উড়ে গিয়ে খুঁটে খুঁটে কত কী ঠোঁটে তুলে নিয়ে আসে, কত

রঙ, কত দৃশ্য, ছবি। মানে, আসত। আমার চোখ দুটো আটকা পড়ে যাচ্ছে, সুতোয় বাঁধা ফড়িংটার মতো। আর উড়ছে না, কিছু ঠোঁটে তুলে নিয়ে আসছে না।” একটু থেমে রজনী আবার বলল “সেই ফড়িংটাও আর ফিরে এল না।”

আমি তাকে বললাম “আসছে তো। এই তো এল, এইমাত্র। সে-ও আসছে, তুমি জানো না।”

মন-রাখা এই প্রবোধবাক্যটা সে আদৌ শুনল কিনা কে জানে, কেননা তখনও সে মাথা নাড়ছিল, বলছিল “চোখ দুটো গেলে সব চেয়ে দুঃখ কী জানো? তোমাকেও আর দেখতে পাব না।” অথচ, অতিশয় সৎ স্বরে সে বলছিল “অথচ রোজ দেখতে ইচ্ছে করে, তখনও করবে।”

“কিংবা কী জানি,” সে নিজেই নিজের জন্যে একটি আশ্বাস চয়ন করে নিল “তখনও হয়ত দেখতে পাব। যেমন এখনও দেখি। জানো, তোমার বাবা যখন গেলেন, অশৌচ চলছে তোমাদের, তখন তোমাকে দেখতে এত পবিত্র, এত সুন্দর হয়েছিল! এখনও চোখ বুজলে আমি তখনকার তোমাকে দেখি: তামাটে চুল, রুক্ষ, জট পাকানো। তোমার মা কলার পাতায় মালসা থেকে ঢেলে দিচ্ছেন আতপ চালের ভাত, ঘিয়ে মাখানো, কী মিষ্টি গন্ধ, ধোঁয়া উড়ত, স্নান করে সাদা কাপড়টি পরে, না-আঁচড়ানো চুল, তুমি যখন কম্বলে বা কুশাসনে বসতে, ঠিক সন্ন্যাসীর মতো লাগত।”

“সেই সময়ে”, রজনী বলে গেল “একদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছি, সকাল হল। ভালো করে আলো ফোটেনি, তখন কী বলো তো? দেখলাম, ওই কামরায় তুমিও আছ। ঘুমোচ্ছ বেঞ্চের ওপরে, অঘোরে। আমি তোমাকে আস্তে আস্তে ঠেলছি, তুমি তাকাচ্ছ। তখন কী? যেন ঘুমেজড়ানো গলাতেই তোমাকে বলতে শুনছি– ‘এই! তোমার কোলে মাথা রেখে আমি একটু শোব?’ তোমাকে টেনে নিলাম। আস্তে আস্তে আঙুল

ডুবিয়ে তোমার চুলের জট ছাড়িয়ে দিতে থাকলাম। দেখলাম, তুমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছ।"

রজনী থামল। বলল "এই আমার স্বপ্ন। তোমার জট ছাড়িয়ে দিচ্ছি, এই ছবিটা এখনও দেখি।" বলতে বলতে সে থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠল, হঠাৎ কেমন যেন না-চেনা গলায় বলে উঠল, "আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি, ভীষণ দুর্বল।" বলে সে আরও শান্ত, বিষণ্ণ, সংযত, আস্তে আনত হয়ে আমার একটি করতলে তার ঠোঁট রাখল।

["রোজ দেখতে ইচ্ছে করে", কে কবে বলেছিল আজ যে-জবানবন্দী তোমার কাছে, তার মাঝখানে সেই কথাটা ঢুকে পড়ল কী করে ? খুঁড়ে খুঁড়ে তাকে তুললাম আমি, ধুলোমাটি মুছিয়ে সব কথার পাশে তাকেও রাখলাম। তার একটা হেতু, আমি আজ লিখছি এক অবারিত প্রহরে, সব দরজা-জানালা খোলা, সারা ঘর ভরে গেছে হাওয়ার হাহাকারে আর শুকনো পাতার মর্মরে—কোনও আব্রু, আড়াল, ঢাকনা, পরদা কিছু নেই। তোমার কথা লিখতে লিখতে তাদেরও মনে পড়ে, মা, যারা এসেছিল। তুমিই প্রথম, কিন্তু তারাও ছিল। তারা, যারা ওইসব কথা বলত। কোথায় তারা, ডাকছি ত্রাহি স্বরে, তোমার সঙ্গে তাদেরও, যারা চলে গেছে, শুধু দুর্মর কয়েকটি স্মৃতি আর নিশ্বসিত কিছু মুহূর্ত রেখে গেল। সেই সব স্মৃতিই যেন তাদের সন্তান, উদাসীন মায়েরা সেই শিশুদের—স্মৃতিদের—তাদের পিতার কাছে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ, তবু হায়, শিশুরা মরেনি, বুকের মধ্যে তাদের লালন করে চলেছি ; রুগ্ন তারা,

শীর্ণ, তবু বুকের মধ্যে নড়ে চড়ে ওঠে, নখে আঁচড়ায়, কেঁদে ওঠে। কিন্তু কী করব আমি, ওদের পিতা? বিশুষ্ক-বয়সী প্রৌঢ় পুরুষ, আমি কোথা থেকে যোগাব ওদের স্তন্য? "রোজ দেখতে ইচ্ছে করে"—সেই শ্রুত কথাটিই তাই বারবার পাঠ করি চীৎকার করে, ওদের কথা ওদেরই ফিরিয়ে দিয়ে বলি "আজ আমারও ইচ্ছা করে।" কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছাই। কেউ ফিরবে না। যারা যায়, তারা ফেরে না। কিন্তু এত আসক্তি বুকে চেপে রেখে রেখে আমিই বা মুক্ত হব কী প্রকারে?

মা, দরজা-জানালা সব খুলে দাও। হাঃ হাঃ স্বরে উড়ে আসুক আমার অতীত, আমাকে উড়িয়ে সব বাঁধন খুলে ফেলে দিক কোনও নিস্তৃণ প্রান্তরে কিংবা কঠিন কোনও শৈলচূড়ায়। রজনীর যে ভয় ছিল, আজ সেই ভয় আমারও। চোখের সামনে থেকে সব রূপ মুছে যাচ্ছে, আমি কি অন্ধ হয়ে যাব? অথবা অচিরে পঙ্গু, অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত? এই ভয়। থেকে থেকে এই নিয়তিলিপি পাঠ করি, কিছুদিন থেকেই মনে হয়, কেবলই মনে হয়···অনেক শোধন বাকী, অনেক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। কৃষ্ণযবনিকা পড়বেই, তার আগে, তার আগে যদি এই কৃত্য এই পাপবিমোচন লেখাটার উপযুক্ত সমাপন ঘটাতে না পারি—হে ঈশ্বর! বাবা তাঁর অন্তত একটি রচনা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছেন: আমাকে। আমি রেখে যাব কাকে একথা যখনই ভাবি তখনই আক্রান্ত হই প্রবল পিপাসায়—জল, আকণ্ঠ তলিয়ে দেওয়ার মতো জল!

"তুমি কি নীচের ঘরে এখনও শুচ্ছ আনু, একা-একা ?" সুধীরমামা বলেছিলেন "একা-একা থেকো না। বিশেষ করে রাত্তিরে। না-হয় কাউকে ডেকে নিও।"

"কাউকে আমার দরকার হবে না", তুমি বলেছ, আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।

"না, মানে যদি ভয়-টয়—" সুধীরমামা কথাটা শেষ করার আগেই তুমি বলে উঠেছ "না, সুধীরদা, কোনও ভয়-টয় আমার আর নেই। আমাকে যারা ছেড়ে গেছে তারা আমার কাছে আর আসবে না।"

লজ্জিত গলায় সুধীরমামা বলেছেন—"না, মানে আমি প্রণববাবুর কথা ভেবে বলিনি। তিনি পুণ্যাত্মা মানুষ, মুক্ত হয়ে গেছেন। সত্যি, শেষের দিকে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল তাঁর। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

"তোমার পরিবর্তন হয় নি ?" জিজ্ঞাসা করেছ।

"কই আর। কেবলই উখো ঘষছি। হালকা হতে আর পারলাম না।"

"অনেক রাত হ'ল, এবার বাড়ি যাও সুধীরদা। কাছেই না কোথায় তোমার বাসা ?"

"ওই একটা ডেরা আর কী।"

"একদিন গিয়ে দেখে আসব।"

"যাবে, তুমি যাবে ? সত্যি, আনু ! বলতে ভরসা হয় না। গেলে কিন্তু দেখতে, এখনও কী সাংঘাতিকভাবে জড়িয়ে আছি।"

"থাক। দেখে কী করব আর। সুধীরদা, মেঘ করেছে, বৃষ্টি নামবে বোধ হয়।"

(কথাটাকে তুমি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে ?)

"হ্যাঁ, এইবার যাই।" সুধীরমামা বললেন, কিন্তু তখনই উঠলেন না।

উনি আসছিলেন, আসতে শুরু করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর

থেকে, সেটাই স্বাভাবিক। তোমার মাসিমার সঙ্গে গ্রাম সুবাদে একটু-একটু পরিচয় ওঁরও ছিল।

আসছিলেন, কেননা এই সময়েই মানুষ প্রিয়জনের কাছে আসে, আসতে হয়, যদিও সব সময়ে কথা থাকে না। দূর থেকে, কখনও বা কাছে এসে দেখেছি, তোমাদেরও থাকত না। চুপচাপ অনেক সময় কেটে যেত। মিছিমিছি কতগুলো মামুলী সান্ত্বনার কথা আওড়ানো সুধীরমামার স্বভাবে নেই। তাই বারান্দায় দুটি মোড়া পাতা, দু'জন দুটিতে, কথা নেই, সূর্য ডুবল, বাগানের গাছগুলো থেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো অন্ধকার ঝরে পড়তে থাকল, কথা নেই, অকস্মাৎ চাঁদ উঠে ফুল ফুটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, কথা বলছ না কেউ, বাসায়-ফেরা পাখিদের কলরবে এমন তন্ময় হয়ে যাওয়ার মত তোমরাই জানো কী আছে।

কানে দু'একটা কথা আসত মাঝে মাঝে, কোনও অসুখের, কিংবা ওষুধের। তোমার হাঁপানির কষ্টটা একটু কমেছে, সুধীরদা? আমার বাতের ব্যথাটা তো ক্রমেই বাড়ছে, বোধহয় অথর্ব হয়ে যাব। কী-একটা মালিশ আছে শুনেছিলাম না? আচ্ছা ওই যে ইতুগ্রামের সেই অবধূত, তাঁর কথা তোমার মনে আছে? হাঁপানির জন্যে নতুন কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে শুনলাম একেবারে ধন্বন্তরি—অব্যর্থ। আচ্ছা সুধীরদা—

আমি কি মজা পেতাম অথবা ওই কথোপকথনের তাৎপর্য কিছুই কি বুঝতাম না? মাঝে কত বছর তোমাদের দেখা হয়নি, এতদিন পরে যা-কিছু আলাপ সব রোগ নিয়ে ডাক্তার, সালসা, মালিশ, ঘুরে ফিরে খালি ওই, আর কোনও কথা নেই? অবাক লাগত। আজ একটা মানে পেয়ে গিয়েছি বৈকি, শেষ বয়সে ওই হয়, পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়া, চর্বিত-চর্বন। অসুখটাই একমাত্র সূত্র দু'জনের ওইখানে কিছু স্মৃতি যা যৌথ, অসুখ নিয়ে কথামালা গেঁথে যাওয়াও এক প্রকার সুখ।

"এমনও হতে পারে সুধীরদা, ক্রমেই যেমন শক্তিহীন হয়ে পড়ছি, একদিন তুমি হয়ত এলে আমি আর বেরোতে পারলাম না। বারান্দা থেকেই তুমি ফিরে যাবে। তুমি যে এসেছিলে আমি টেরও পাব না। না—না, পাব, পাব। তোমার লাঠিটা ঠকঠক করবে তো; তাতেই আমি জানব।"

"কিংবা আন্নু, এ-ও সম্ভব যে, একদিন আমিও হয়ত আর এলাম না। শরীর আরও ভেঙে পড়বে, আর আসতেই পারব না। হয়ত আমি আর নেই, অনেক দূরে চলে গিয়েছি সেইজন্যেও। আমি যে নেই, তুমি জানতেও পারবে না।"

প্রতিবাদ করলে না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে বললে "হতে পারেই তো। সবই হতে পারে। আচ্ছা, সুধীরদা, তুমি আর সেই ইস্টিশনে গিয়ে বসো না, যেখান থেকে নানা গাড়ি যায়, নানা দিকে?"

"যাই আন্নু। মাঝে মাঝে। সেখান থেকেই তো চলে আসি তোমাদের এখানে।"

"আমাকে একবার দেখিও তো। খুব ইচ্ছে করে!"

"বেশ তো। বাইরে একটু-আধটু বেরোনো তো ভালই। ওতে তোমার মন শান্ত হবে।"

"ও কী করছিস?" উপর থেকে আমাকে নীচে চাদর-বালিশ নিয়ে নেমে আসতে দেখে বললে।

"আজ থেকে আমি এই ঘরেই শোব, মা।"

দুটি বিছানা কাছাকাছি, দু'জন দু'জনের নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। খানিক পরে তোমার গলা: "সুধীরদা যা বলছিল শুনতে পেয়েছিস বুঝি? তুই একটা পাগল। দ্যাখ, ভয় নেই। সে আসবে না। আর আসেই যদি তোর জন্যেই আসবে। আমার জন্যে না।"

মনে মনে বললাম, বাবা আসবেন না! তিনি নিষ্কৃতি পেয়েই গিয়েছেন। যযাতির গল্পটার সঙ্গে মিলিয়ে নাও না। ভোগের সাধ

না মিটলে তবেই মানুষ চায় পুনর্যৌবন। তেমনই জীবনের সাধ যার মেটেনি, একমাত্র সেই আত্মাই চায় পুনর্জন্ম। সব সাধ থেকে মুক্ত হয়ে বাবা চলে গেছেন, তিনি আর আসবেন কেন। তুমি ভেবো না।

"তোকে সে বড় ভালবাসত", শুনতে পেলাম আস্তে আস্তে বলছ তুমি "তুই বড় হবি, সেই বিশ্বাটুকুকে নিয়েই সে গেল। তার বিশ্বাস তুই নষ্ট করিস না। মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াবি, এই প্রতিজ্ঞা কর। ছাখ, আগেও এসব বলতাম খানিকটা নিজের জন্যেও, ভাবতাম তোকে ধরে আমি দাঁড়াব। আজ আর সে সব ভাবি না। আমারও বেশী দিন বাকী নেই আর—আমিও যাব। এখন তোকে যা বলছি, সে তোরই জন্য।"

ঠিক তখনই দূরে জোরে জোরে কোথাও ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল।

সেই ঘণ্টাধ্বনি থেমে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, কোন-না-কোন সময়ে? —কারণ কিছুই বরাবর বাজে না। ভোরে অন্তত তার রেশও ছিল না। আমি আজও জানি না, এক-একটা শীতল প্রহরে কোথাও, সচরাচর খুব দূরে, কোনও ঘণ্টা বাজতে শুরু করে কেন, আর বাজে যদি, কী হেতু থামেই বা। বেজে বেজে কী বলে, কোন্ কোন্ জট আর গিঁট খোলে, অথবা থামার পরেও কিছু বলতে থাকে কিনা। নিখিলে নিহিত এইসব রহস্যের কিনারা খুঁজে লাভ কী, খোঁজা তো কেবলই কষ্ট, তার চেয়ে মা যেমন অবোধ শুয়ে আছি, তাই থাকি না! ওই তো ছাখ, তাকাও জানালার বাইরে, তারার ধারায় আকাশটা ধুয়ে যাচ্ছে, চমৎকার। এই পর্যন্ত বেশ, কিন্তু আর-একটু যেই এগোতে যাবে, অমনই চমকাবে। টের পাবে, গতকাল যত তারা ছিল, আজ হয়ত তত তারা নেই, রোজ যত তারা অস্ত যায়, পরদিন ঠিক-ঠিক হয়ত তত তারাই ওঠে না, কে বলতে পারে

প্রত্যহ একটি দুটি করে খোয়া যায় কি না-যায়। সেই লুপ্ত মৃত তারাদের কথা চিন্তা করা বৃথা। সব জেনে ফেলার অভিমান কাউকে কি সাজে, ওই সাধ শোভা পায় একমাত্র শিশু বয়সে।

কেন—কেন—কেন—আমাদের ছেলেবেলার মাঠটার সবটাই এই জিজ্ঞাসার চোরকাঁটায় ভর্তি। আকাশ নীল কেন, গাছের পাতা কেন সবুজ, শিশুরা শুধায় আর হাততালি দেয়, মূঢ় বড়োরা। আমিও পেয়েছি। সুধীরমামা বলতেন, "তোমার ছেলে কি বুদ্ধিমান দেখেছ আনু, ও নিশ্চয়ই—" ইত্যাদি। আজ তো জানি, ছেলেবয়সের ইচ্ছাটাকে বেশী বয়স পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে আনাটাই অর্থহীন, শুধু কষ্ট পাওয়া। তুমি পেয়েছ, পেয়েছেন সুধীরমামা, আর আমি? আমার কথা থাক। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কত সাপের যে ছোবল পেয়েছি। ইতিহাসের গল্পটা তুমি জানো না মা। ভয়ংকর সত্যকে জানতে গিয়ে সে দংশিত হয়েছিল। আর রানী সুদর্শনাকে নিয়ে সেই নাটক? তুমি পড়োনি। ভয়ংকর রূপ স্বচক্ষে দেখতে চাওয়ার অহংকারে তার জীবনটাই জ্বলে যাবার জো হয়েছিল।

জানব কী, জানা যায় কতটুকু। জানার চেয়ে না-জানা অনেক বড়, ঢের বেশী পরিব্যাপ্ত। যেমন 'হ্যাঁ'-এর চেয়ে 'না' কত ছড়ানো। যতগুলি 'হ্যাঁ' আছে, তার সব কটা ছোট্ট মুঠোয় ধরে, আর 'না'? 'না'-এর পর 'না' উপছে উথলে নিরন্তর স্রোতে ভেসে যায়।

মা, সব জানতে গিয়ে তোমাকে কাঁদতে দেখেছি। সব জানতে চেয়ে কেঁদেছি আমিও। আমাদের মনে একটা করে কান্নার ঘর চিরকাল থাকে, সেই কোণে। সব কান্না ফুরিয়ে তোমরা সকলেই মুক্ত হয়ে গেলে, আমারটা এখনও ফুরোল না! কষ্ট আর কান্না দিয়েই তো আগাগোড়া এই লেখা।

কান্না কেন? কষ্ট পাই বলে। কষ্ট—প্রাপ্ত কিংবা সৃষ্ট, দুই-ই। অথবা কৃত অন্যায়ের জন্য পরে কান্না। অপরাধগুলিই সকলে ছাখে, কিন্তু অনুশোচনা? কেউ ছাখে না।

যেহেতু সেই ঘণ্টাধ্বনি থেমে গিয়েছিল, আমি তাই অপরাধের ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছিলাম। তুমি অনুমান করতে, কিন্তু তখন অনেক সেয়ানা আমি আর খুব সাবধান, ধরতে পারতে না। খালি বুঝতে যে, একটা কিছু ঘটছে তোমার নজরের পরিধির বাইরে, নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দণ্ডিত করা ছাড়া আর কিছু তোমার সাধ্য ছিল না।

কী ছিল বুলার, যার সম্মোহন বলে সে আমাকে নিয়ত একটা কষ্টের গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যেত? কী ছিল না রজনীর, রজনী-গন্ধার, ওই শুভ্রতা আর সুবাসটুকুই কি তার সম্বল, শুদ্ধতাই কি স্বাদ-হীনতা? যেমন ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল, জানি তৃষ্ণা মেটাতে ঠাণ্ডা জলের কাছে কিছু না, তবু ঠাণ্ডা জলে সব সময়ে পিপাসা মেটে না, সব পিপাসাও না, জানি, জানি, তবু জেনে শুনে বিষপানের মতো, কিন্তু বুলা কি বিষ, কত বিষই না এইমত আমরা ঠোঁটে ছোঁয়াই, আর আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছি আমি, পৃথিবীতে তবে সুধা কোথায়, সুধা কী, সুধা কি একমাত্র যিনি মূল তিনি, যাঁর প্রতিরূপ জননী, সেই রক্ষয়িত্রী, বিশাল প্রতিমা, মাতৃমূর্তি—মা অথবা যে-রমণীরা মাতৃস্বরূপিণী? 'শ্রীচরণেষু তোমাকে', সেই সত্যেরই অন্বেষণ, মুক্ত যদি না-ও হতে পারি, স্থিত হতে চাই আমি, অন্তত প্রত্যাবৃত্ত।

একটি পাপের কথা লিখব বলে এত ভনিতা অথচ লেখার ঠিক মুখে বেনো জলের প্রক্ষিপ্ত রাশি রাশি কথা ঢুকে যাচ্ছে, আসলে ওটা কি এড়িয়ে যাবার ছুতো? ঘণ্টাধ্বনি ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলতেই হত না, যদি না শেষ মুহূর্তে সঙ্কোচ এসে সব বিপর্যস্ত করে দিত। বাধছে, তোমাকে লিখতে বাধছে। অথচ এসব ঘটেছে তুমি যখন জীবিত। তখন যা করতে আটকায়নি, আজ তা বলতে বাধে কেন। অস্বস্তি, ভয়? জীবিত মা'র চেয়ে তবে আমি মৃত মা'র ভয়ে বেশী ভীত?

তবু পরিত্রাণ নেই, লিখতেই হবে।

ছোট ছোট হাততালি দিয়ে বুলা বলল, "বুলা যাবে, বাঁশি যাবে, সঙ্গে যাবে কে ?"

"কোথায় ?"

"বাঁশি বলছিল কাল ওর জন্মদিন। ভাবছি একটা আউটিং করলে মন্দ হয় না। ধর, গঙ্গার ওপারে, আমার এক বন্ধুর ছোট্ট একটা বাংলো আর বাগান আছে। তাই বলছিলাম, বুলা যাবে বাঁশি যাবে, সঙ্গে—"

কিছু না ভেবেই ফশ্ করে বলে বসলাম "আমি।"

চৌত্রিশ

ভুরু কুঁচকে বুলা বলল, "তুই—তুই যাবি কেন?" ভুরু কোঁচকালো, যদিও সন্ধ্যার অল্প আলোতেও ওর ঠোঁটে বাঁকা হাসি দেখা যাচ্ছিল। ছাদে মাতুর পেতে বসেছিলাম আমরা, বাঁশি আধশোয়া, ওর বাবরি চুলওয়ালা মাথাটা হেলে প্রায় বুলার কোলে, চোখ আধবোজা বাঁশির, সম্ভবত কোনও সুখে, বুলার পা দুটি ছড়ানো, দুটি পায়ের পাতা যেখানে শেষ, সেখানে আমি। আমি উপর দিকে চেয়ে ছিলাম। বুলা যখন ভ্রূভঙ্গি করে বলল "তুই যাবি কেন," সঙ্গত কোনও উত্তর না পেয়ে বলে ফেললাম "কষ্ট পেতে।" একেবারে মিথ্যে বলিনি। ওদের দু'জনকে এতটা কাছাকাছি দেখলেই—জানি ওই সম্পর্কটা কিছু নয়, ভূয়ো, তবু—আমার গলার কাছটায় শুকনো একটা শিখা জ্বলতে থাকত, তার নাম হিংসা, আর তখন, সেই ছাদে পা মেলে দিয়ে বুলা আমাকে যা দিচ্ছিল, সে-ও মানসিক-শারীরিক মিশিয়ে এক রকম দুঃখ। এক হাতে বাঁশির লম্বা লম্বা চুলগুলো টেনে টেনে সোজা করছিল সে, আর ওই একই কালে ওর টকটকে পায়ের নখ বিঁধিয়ে দিচ্ছিল আমার কব্‌জিতে। বুলা এই সব খেলা পারত, আমার নরম মাংসে বিঁধছে, তবু সরে বসছি না আমি, শারীরিক ক্লেশ, হোক, একটু—একটুই তো! ওই নখের ছোঁয়াটুকু সরে গেলে ক্লেশ আরও পাব। সেই বশীভূত বয়সে এই সব সহ্য করেছি আমি কতদিন, কত স্বাদ, যা নোন্‌তা আর তিক্ত, রক্তাক্ত বা ঘর্মাক্ত।

বলতে কী, যতক্ষণ বুলা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিচ্ছিল, ততক্ষণ যতটা, তার চেয়ে বেশী কষ্ট পেলাম, যখন সে হঠাৎ একটা নাচের ঘুর্ণির মতো ঘুরপাক খেয়ে উঠে গেল।

কার্ণিসে ভর দিয়ে পলকে অবলীলায় সারস্ হয়ে গেল বুলা, সেই সন্ধ্যাকালে, যখন অজ্ঞাতকুলশীল এক-একটা হাওয়া হঠাৎ সহসা

উঠে এসে অতিকায় অথচ অদৃশ্য কোনও তিমি বা কুমীরের মতো পিঠ পেতে দেয় শুধু পাখিদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলে, নইলে পাখিরা ঘরে ফেরার সময়ে আকাশ পেত না। কিংবা ভেসে ওঠা কুমীর নয়, সেই হাওয়ারা দৈত্যকুলোদ্ভব, দুর্বৃত্ত—তারা অশালীন হস্তক্ষেপে ব্যস্ত করে যতেক ডালপালাকে। যে পাতারা কচি তারা সুখে অস্থির তিরতির করে ওঠে, কিন্তু কুড়মুড় ভাজার মতো ভাঙে সেই সব পাতা, যারা বীত-দিন, পীত। আকাশ তখন জ্যোৎস্নায় শুক্ল, অনেক দূরে আর বিপদের বাইরে বলেই সে হাসছিল, যেন কোনও সহাস্য রমণী, যে সাহসিকাও ; এক-গা গহনা, তবু তার ছিনতাইয়ের ভয় নেই।

"আমাদের এই ছাদে ফুল ফোটে না। এখানে খালি চৈত্রের ক্যাকটাস, আর কোনও কোনও বর্ষায় ক্যানা!"

বুলা বলছিল, কার্নিসে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে, এক প্রকারের ছুঁচলো পুলকে। অথবা সে গলায় আঙুল ডুবিয়ে বমি করার মতো, খেদকে বাইরে টেনে এনে বলছিল, তার স্বরে বিজড়িত হয়ে যাচ্ছিল শ্লেষ্মা, সর্দি প্রভৃতি যা-কিছু অনুষঙ্গ ; সে-স্বর তো নয়, যেন গোটা কতক চিড়চিড়ে চড়ুই, এবং তাদেরই গলা নকল করে বুলা বলছিল, কী বলছিল? বলছিল যে, ওদের ছাদে ফুল ফোটে না।

হাত বাড়িয়ে দিল বুলা, যেন এক যাদুকরী, সেই ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল বাঁশি, সেই দেখতে সখি-সখি বাঁশি এখন হতে চায় সখাসম, সেও দিল হাত বাড়িয়ে, যদি পারে বুলাকে ছোঁবে, কিন্তু বুলা কি ধরা দেবে, এই তো দিল, না, দিল না, দিল না, দুটি চেষ্টা, তার একটি কপট একটি প্রকট, কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো কেমন বেঁকে রইল, অসমাপ্ত একটা সাঁকো এখন দু'জনের মধ্যে ঝুলন্ত মাঝের ফাঁকটাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার, ছলায়-কলায় মিলে বুড়বুড়ি তৈরী হচ্ছে বালতিতে সাবানের টুকরো-গোলা জলে যে রকম বুড়বুড়ি হয়, ব্যক্ত আর অব্যক্ত ধরনে, আমি তাই দেখছি—আমি দর্শক, সাক্ষী আমি। সেই ক্ষণে অন্নদাস আবার অন্নদাস হয়ে গেছি।

বুলা একটু আগে বলেছিল কিনা ফুল ফোটা-না-ফোটার কথা, তাই তারই খেই ধরে সেই অন্নদাস বোকার মতো বলে উঠল "একটি ফুল কিন্তু ফুটেছে।" রজনীকেও অনেক দিন আগে যা বলেছিল।

বুলা সরে এসে জ্যোৎস্নায় ওর হাসি বিকশিত করে হাসল।—"ফুল? না বোধ হয়। সজ্‌নের ডাঁটাও তো হতে পারি।··· জানো, আগে সত্যিই একটা সজ্‌নের গাছ ছিল এখানে, আমরা যখন এ-বাড়িতে এলাম। রোজ ছাদে উঠে ফুল পাড়তাম। রোজ ওপরে ওঠা তখন থেকেই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। গাছটা মরল, কিন্তু অভ্যেসটা থেকে গেল। এখনও রোজ উঠি, সকালে কিংবা বিকালে।"

সেই শুক্ল জ্যোৎস্নায় বিকশিত হয়ে বুলা বলল "ফুল যদি দেখতে চাও, তবে চলো ওই বাংলোতে; ওখানকার বাগান ভরে আছে দেখতে পাবে।"

(বুলা আমাকে, তুমি বলত কখনও-কখনও; আবার পুরনো অভ্যাসে তুই-ও। গুলিয়ে ফেলত।)

"তুমি তো গ্রামের ছেলে, ফুল টুল নিশ্চয়ই খুব ভালবাস?"

ভাঙা গলায় বললাম, "বাসতাম, যখন তার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু বেরিয়ে এসেছি বুলা, আমি শহুরে হয়ে গিয়েছি।"

"ফুল টুল আর ভাল লাগে না তোমার?"

"লাগাতে চাই। নতুন করে আবার। হয়ত কোনদিন পারব। ফিরে যাব। বুলা, গোবিন্দলালের গল্পটা তো পড়েছ, সেই ভ্রমর, আর রোহিণী? রোহিণী হল শহর।"

"আর ভ্রমর হল গ্রাম—পল্লী?"

"গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে ফিরতে চেয়েছিল।"

"কিন্তু পারেনি।"

(বুলা নিতান্ত নিশ্চিত স্বরে দুটি মাত্র শব্দ সেদিন উচ্চারণ করেছিল, ও কি তখনই জানত যে ও

ত্রিকালজ্ঞ ডাকিনী? এক ব্যক্তি, একদা যেচে বর নিয়েছিল তার অন্য সত্তায় রূপান্তরিত হবে বলে, সে পরবর্তীকালে ধার করা মেকী মুখোশটা খুলে নাও, আমাকে আমার স্বভাবী রূপ ফিরিয়ে দাও বলে কাতর মিনতি জানাচ্ছে সেই বরদাতা দেবতাকে, কিন্তু বিমুখ দেবতা কিছুতেই ফিরিয়ে নিলেন না তাঁর বর—অথবা তখন যা বর নয়, অভিশাপ—এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলাম আমি, কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবু ওই ব্যর্থ প্রার্থনার থীম্-টা ফিরে ফিরে আসে। নগরবাসে জর্জরিত এক আত্মা বার বার অগত্যা নিয়ম করে প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন করে, এক মাস দুই মাস পরে পরেই—কখনও পর্বতে, কখনও বনে, কখনও সমুদ্রতীরে; তার উদ্দেশ্য কী? সে-ও আমার পৌনঃপুনিক বিষয় আর একটি : গ্লানি প্রক্ষালন করে শুদ্ধ হতে। ক্লান্ত ফুসফুস সবুজ পত্রপল্লবের কাছে যেমন অক্‌সিজেন বাঞ্ছা করে।)

বাঁশি একটু আগে নীচে নেমে গিয়েছিল, গাড়ি-টাড়ি ঠিক করবে বলে; সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বুলা একটা হাত রাখল আমার কাঁধে।—"কাল আসিস। দেখিস, ওখানে তোর ভালো লাগবে। আমার আজকাল কষ্ট-টষ্ট বেশী হয় না তো, তবু জানিস, তুই যখন বলছিলি একটু আগে যে, তুই শহুরে হয়ে গিয়েছিস? আমার বুকে ধাক্কা লেগেছিল। "শহুরে" কথাটা যেন ভাল মত শুনতে পাইনি। কী শুনেছিলাম জানিস? বললে তুই রাগ করবি। মনে হল তুই যেন বলছিস 'বেশ্যা হয়ে গিয়েছি।' দুঃখ পেলি তো? পাস্ না। আমিও

তো একদিন তোকে বলেছিলাম যে ট্যাক্সি হয়ে গিয়েছি, বলিনি ?" —বলে বুলা আমার পিঠে হাল্‌কা একটা হাত রাখল।

সেই বুলাই তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গেছে তরতর করে, বাঁশি বসেছিল গাড়িতে, তার গালে আলতো একটা চাপড় মেরেছে, ঢলঢল হয়ে বলেছে "কাল খু-উ-ব ভোরে, কেমন ?" আমার দিকে চেয়ে "তুই-ও আসিস।"

বুলাকে আমি বুঝিনি। বুঝিনি বলেই কষ্ট পেয়েছি বেশী। তবে কষ্ট পাওয়াও একটা নেশার মতো হয়ে যায়, কষ্টের দাঁত একটু একটু করে বসে মাংস-মজ্জা ছাড়িয়ে আরও অন্তলীন কোনও স্তরে ; সে-ও সুখ, একটু বিকৃত, তবু পেতে ভালো লাগে—মা, কতকাল থেকে আমি যে জানি যন্ত্রণাও আমাদের জীবনে নিমন্ত্রিত।

রজনী যে-ই শুনল, অমনই তার ভাসা-ভাসা চোখ তুলে বলল "আমি যাব না ? নিয়ে যাবে না আমাকে ?" আমার কিছু বলার অধিকার ছিল না, কিন্তু বাঁশিকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল। ভালবাসার বিশ্বাস বাঁশিকে বড়ো উদার করেছে।

নৌকো-বাঁধা ঘাটে রজনীকে দেখে হাসল বুলাও, কিন্তু আসলে হাসতে চেষ্টাই শুধু করল। যদিও বুলার মুখে মেঘের লেশমাত্র ছিল না, পাটাতনে উঠেই সে শাড়িসুদ্ধ পা ডুবিয়ে দিল জলে, তারপর আড়চোখে এদিক-ওদিক চেয়ে সেই জল নিংড়ে নিংড়ে নিল বের করে ; যদিও সে চলন্ত নৌকো টলমল করে দিয়েই এক পাক উঠল নেচে, অপাঙ্গে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি ইত্যাদি সব-কিছু করে বলল "দেখলে কত অল্প জায়গাতেও ঘুরে যেতে পারি, একে বলে বল্‌-বেয়ারিং কোমর, ইলেকট্রিক পাখায় আর সব নাচজানা মেয়ের কোমরেই থাকে", তবু সে সত্যিসত্যি হাসছিল না আদৌ, ও-পারে আমরা যখন বাংলোটাতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখনও না।

সেই বাগানে পৌঁছে সবটাকেই আমোদ আর ফূর্তি দিতে আমি বললাম "যদি তোমাদের ছু'জনকেই আমি ছটো ফুল তুলে দিই, তোমরা কী করো ?"

রজনী আস্তে আস্তে বলল "চুলে পরব, আবার কী ?"

আর বুলা বলে উঠল "আমি চটকাই।" বলে, সে সত্যিই একটা ফুল তুলে ছু'আঙ্গুলে তার সব ক'টা পাপড়ি চটকে ফেলল। তারপর কোথা থেকে মালীকে ডেকে বাংলোর দরজা-জানালাগুলো পটাপট খুলে ফেলল।

কিন্তু বদলে গিয়েছিল রজনী। সেই ফুলের বাগানে গিয়ে সে অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে গিয়েছিল। চটিটা সে খুলে ফেলল প্রথমেই, খালি পায়ে ঘাসে ঘাসে ঘুরল। কিংবা তখন তার পা ছুটিও বুঝি ছিল না, বা না থাকলেও চলত, কেন না সে পাখির মতো হয়ে গিয়েছিল। আলো পেলেই যার ডানা আপনা থেকেই মেলে যায় সেই পাখি।

"খুব ভাল লাগছে, সত্যি।" আয়ত চোখ তুলে সে বলল। একটু উঁচু হয়ে নুয়ে-পড়া একটা গাছের পল্লব পাড়ল। নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিয়ে তারপর বলল "কী সুন্দর।" কৃতজ্ঞতা তার চশমার পুরু কাচ ভেদ করে উঠে আসছিল।—"কই ঝাপ্‌সা নেই তো কিছু। ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। আমার ভাবে। গন্ধ, ছোঁয়া, এসব দিয়েও অনেক পাওয়া হয়ে যায়।"

"হয় বুঝি ?" একটু রহস্য-মতন করে বললাম।

"তোমরা বুঝবে না," বলে সে আবার ঘ্রাণ নিতে থাকল, বুকের কাছে গুচ্ছ করে ধরা সেই পল্লব, যার প্রতিটি পত্র দীর্ঘ টানাটানা নয়নোপম।

—

এমন সময় পিছনের বারান্দা থেকে বুলা আমাকে ডাকল। প্রথমে ইশারায়, পরে হাতছানি দিয়ে। ও যখন হাতছানি দেয় তখন ওর হাতটা ছোট্ট একটা ছোবল-তোলা সাপের মতো হয়ে যায়।

একটি ক্রীতদাস সেই হাতছানিতে গুটি-গুটি এগিয়ে গেল।

"কেন এনেছিস, কেন এনেছিস ওটাকে," বুলা বলল, সাপেদের গলায় ভাষা থাকলে তারা যে-স্বরে বলত।—"ও কি তোর রক্ষাকবচ, রক্ষা করবে তোকে?"

আমি কথা বলছি না দেখে, আমি কথা বলব না বুঝে নিয়ে, সে আমাকে ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিতে থাকল।—"কী পেয়েছিস তুই ওর মধ্যে? ও ফরসা, তাই? শুধু রঙ?"

আস্তে আস্তে আমিও তখন বললাম, "আর তুমি? তুমিই-বা কী পেয়েছ বুলা ওই ছেলেটার মধ্যে, ওই মাকাল ফলটার কী আছে?"

টাগরায় জিভ ছুঁইয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করে বুলা বলল "টা—কা।" বলেই নিষ্ঠুর কোনও কিরাতরমণীর মতো হিংস্র হয়ে সে আমার গালে একটা টোকা দিল।—"তোর যা নেই, সেই টাকা। নেই বলে ওদের ওখানে পড়ে আছিস। আমি সব জানি। দাঁড়া, ওকে মাকাল ফল বলেছিস, তোর বন্ধুকে এক্ষুনি বলে দেব আমি।"

বুলা চোখ টেরচা করেছিল, থেকে থেকেই আমাকে নিয়ে মজা করার জন্যে, ইঁদুরকে নিয়ে বিড়াল যেমন মজা করে, বলতে থাকল "যদি বলি, যদি বলে দিই?"

ওই দু'টি কথা ভয়ংকর একটা বোল্‌তার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি ভয় পেয়েছিলাম।

বাঁ পা একটু বাড়িয়ে বুলা আমার পায়ে আঘাত করল।—"বেইমান, বদমাস, যে খেতে পরতে দিচ্ছে, তাকে তুই মাকাল ফল বলিস, তুই নিজে কী জানিস? তুই-ও তাই। ওই মেয়েটার পেছনে হ্যাংলার মতো ঘুরছিস, পূজো করছিস ফুলটুল দিচ্ছিস। তার মানে তুই যে ওর চাকরের মতো, সেটা ভুলতে পারিস না। তার ওপরে উঠতেও পারছিস না। শোন্, মেয়েরা ফুলটুল চায় না, যে দেয় তাকে

বড়ো জোর করুণা করে। ওই মেয়েটা, ওই কিসমিস, আমি তোকে বলে রাখলুম, নির্ঘাত তোর হ্যাংলামির জন্যে তোকে ঘেন্নাও করে। ও তোকে ভালবাসবে, যদি—যদি তুই জোর করে ওর সব কিছু ছিনিয়ে নিস, ঝাঁপিয়ে পড়িস দস্যুর মতো। সে-সাহস তোর হবে ?”

বুলা হাঁপাচ্ছিল, বুলা দাঁতে একটা কাঠি কাটছিল।

কিসমিস আসছিল এই দিকেই। তাকে আবার দেখতে পেয়ে বুলার চোখে যেন আগুনের একটা ফিনকি ছুটে গেল। চাপা গলায় বলল “আয়, একটা মজা করি ওকে নিয়ে।”

কিসমিস তখনও কিছু দূরে, তখন বুলা অকস্মাৎ সেই কাণ্ডটা করল। কী করছে টের পাওয়ার আগেই দেখি সে আমাকে সাপটে নিয়েছে তার বুকের মধ্যে, তার ঠোঁট, তার জিভ্, তার দাঁত—তারা কোথায় ছিল, কী করছিল, যতই কেন না স্বীকারোক্তি হোক, আমি এখানে লিখি কেমন করে! বুলা ওই কাণ্ডটা ঘটাল। না, না, মিথ্যে কথা লিখলাম মা, ঘটালাম আমিও। আমিও যে শরিক হলাম, সুখ নিলাম, লেপটে রইলাম। সেই পাপের উপরে অবাধ্য শরীরটার লুব্ধ হওয়ার কথাটা চেপে যাওয়া আরও মহাপাপ হবে।

রজনী কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদিকে এল না, খানিকটা এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, হয়ত কিছু, শুনল, দুপুরের কোনও হরিয়ালের ডাক কি অন্য কিছু, তারপর আস্তে আস্তে অন্য পথ ধরল।

বাংলোটার বাবুর্চিরাও তখন সুস্বাদু এক পাখির মাংস চড়িয়ে থাকবে ডেকচিতে। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, তা-ছাড়া পেঁয়াজ-রসুন-মশলা মাখানো হলদে সুগন্ধে তখন চারদিক আমোদিত হয়ে উঠছিল।

বীভৎস স্বরে বুলা বলল, “কী মজা, কী মজা। কানিটা কিছু দেখতে পায়নি। একটা অন্ধ মেয়ের চোখের সামনে তার প্রেমিককে নিয়ে যা-খুশী তাই করা যায়, না ? এইটেকেই বলছিলাম মজা।”

আমার দুটি হাত ছিল আমার গালে। ঘষে ঘষে বিষাক্ত কয়েকটি দাঁতের দাগ তুলে ফেলতে চাইছিলাম।

এর পরেও দুপুরটা স্বাভাবিক ভাবেই কাটল, যদিও গুমোটটা যাচ্ছিল না, আমরা পাতা পেড়ে খেতে বসলাম, রান্না হয়েছিল অতি চমৎকার, তাতে আবার মাংস খুসবর ছড়াচ্ছিল, যদিও আমি আড়-চোখে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলাম রজনীকে, সে কি দেখেছে, কতটুকু দেখেছে, কিন্তু রজনী স্থির, নিজের মধ্যে নিজেই সংবৃত ধীর, কথাও বলছিল সে, এমন-কী বুলার একবার কী একটা রসিকতায় হেসেও উঠল। আমি স্বস্তি পাচ্ছি, খুনী যেমন কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলে আশ্বস্ত হয়।

খেতে খেতেই বাঁশি বলল "আমার জন্মদিনে বুলা, তুমি আমাকে কিছু দেবে না।"

বুলা বলল "দেব, দেব। সঙ্গে এনেছি। খাওয়া দাওয়া সারা হোক, তারপর।" কী এনেছে, বুলা ভাঙল না।

খাওয়া শেষ, তখনও খুব বেশী বেলা হয়নি। তেজীয়ান ঘোড়ায় চেপে সূর্য সবে মাথার উপরে এসে দম নিচ্ছিল। বুলা চোখে কালো একটা চশমা এঁটে বলল "এই সূর্যটা কেমন বল্ তো?—পুরুষদের মতো শয়তান। প্রথমে খুব মিষ্টিমিষ্টি থাকে, নরম। আস্তে আস্তে ভীষণ হয়ে যায়, প্রেমিক থেকে ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী স্বামী।"

মৃদু স্বরে, কিন্তু ওকে বুঝতে দিয়ে বললাম "ভীষণ কিন্তু বুলা, মেয়েরাও কম হয় না।"

বুলা বলল "হবে না কেন, হয়। তবে যারা স্ত্রী হতে পেরেছে, তারা কমই হয়। হয় তারা, যারা কোনদিন কিছু হবে না—স্ত্রী না, মা না, যারা কারও-না কারও মেয়ে ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পরে তা-ও

থাকে না। তারা হিংস্র হয়, ভীষণ হয়, তুমি যা-যা বললে, তা-ই। পারলে তারা সব ধসিয়ে দিয়ে যায়।"

বুলাকে তখন ওদের ছাদের সেই ক্যাকটাস গাছের মতো লাগছিল।

"এবার—এবার কী?" বুলা নিজেই বলল খানিক পরে, কোমরে হাত দিয়ে বিজয়িনী-বিদ্রোহিনীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

"এবার? এবার গান।" বোধ হয় বাঁশিই বলল ম্রিয়মাণ স্বরে। "বুলা—আমি হারমোনিয়াম ছাড়া গাই না।" তখন, আমি যখন রজনীর দিকে তাকালাম সে মাথা নীচু করে বলল, "আমি, আমি তো গান জানি না।"

তবে তাস? আনা হয়নি। তা-ছাড়া আমি আর বুলা ছাড়া তাস খেলা কেউ জানে না। সেই সময়ে বুলা—হঠাৎ—তরোয়ালের মতো হাতখানি নিষ্কাশিত করে দিয়ে বলে উঠল, "সিগারেট আছে, সিগারেট?"

রজনী অবাক চোখ তুলে তাকাল। আমি আর বাঁশি সমস্বরে বললাম, "তুমি খাবে?" বাঁশি কাঁপা-কাঁপা হাতে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বুলা নিপুণ কায়দায় ধরাল সেটা, কিন্তু একটা ছুটো টান দিয়েই ফেলে দিয়ে বলল "থুঃ!"

একটু পরেই "চৌকিদার—চৌকিদার!" চেঁচিয়ে সে ডাকছিল, শুনলাম। তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বুলা অক্লেশে ফরমাশ করল "চুরুট।"

তার আগে তখনকার দিনে চৌরঙ্গী এলাকায় সিনেমা-টিনেমাতেই খালি মেমদের দু'চারজনকে যা সিগারেট খেতে দেখেছি। চুরুট? কখনও না। ভাবাই যায় না। বোঝাই যাচ্ছে বুলা আজ সংহার-রূপিণী, সব কিছু সংস্কারকে গুঁড়িয়ে-মাড়িয়ে দিয়ে ধাঁধিয়ে দিতে চাইছে আমাদের। সকালে একটা ফুল চটকানো দিয়ে যে-দিনের শুরু, তার উপযুক্ত উপসংহার সে টানবেই।

অত্যন্ত বিশ্রী কায়দায় তুটো ঠোঁটের মধ্যে একটা চুরুট চেপে ধরে ও ধরিয়েছিল, তার পাশে আমরা তুটি ছেলে ; খাচ্ছি ফ্যাকাশে-ফরসা-লিকলিকে সিগারেট—প্যাকাটির মতো সরু ওই ধূমায়িত বস্তুটাকে করুণ অকিঞ্চিৎকর লাগছিল। লাগল বলেই রোখ চেপে গেল আমার—উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় বললাম, "দাও, বুলা, আমাকেও একটা চুরুট দাও।"

"তুই! খাবি!" সে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, বাঁকা থেকে তখনই সোজা হয়ে গেল, ঠিক আমার নাক তাক করে একটা ছুঁড়ে মেরে বলল, "নে—।"

এক অঘোষিত লড়াইয়ে নেমেছি তু'জনে, অলিখিত কোনও প্রতিযোগিতা। এক টান, তু' টান, তিন টান—জমে যাচ্ছে, ধোঁয়া, পুরু ধোঁয়া আমার মগজে, ধোঁয়া আমার বুকে, হৃদয়ে, জমে পাথর হয়ে যাবে নাকি, ধোঁয়ারই কি জমাট রূপ বাঁধা থাকে পাহাড়ে, ভূপৃষ্ঠের কোথাও কি তবে বৃহৎ কোনও চুরুট নিহিত, আমরা তু'জনেই এই মুহূর্তে ধূমায়িত, বুলা আর আমি--চোখে জ্বালা, তাই দৃষ্টিকে নিবিয়ে জড়ানো গলায়, শুনলাম বলছি, মানে বুলাকে বলছি আমি "জোরসে, বুলা, জোরসে। ওই কলের জলটাকে আমরা হারিয়ে দেব।"

খানিক দূরে, ওই প্রেক্ষাপটেই একটা কারখানার চিমনি আরও অনর্গল প্রবল, আরও সাহসী ধোঁয়া উদ্গার করে চলেছিল। ইশারায় বুলাকে বললাম, "আমরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি নাকি ?"

বুলা সতেজে বলে উঠল, "দূর! আমরা এখন আগ্নেয়গিরি। কী ছড়াচ্ছি বল তো! লাভা, লাভা, সোরা, ধূনো, গন্ধক, এই সব —আরতিতে যা লাগে।" সে সত্যিই যেন কোনও অশ্রুত আরতির বাজনার তালে তালে জানু-জঙ্ঘা-কটি-বক্ষ-গ্রীবা-কবরী সমেত হেলে তুলে নাচের ভঙ্গি করছিল। তার দাঁতে চেপে ধরা চুরুটটা বিকালের

ময়লা বাতাসে লাল অক্ষরে কিছু অপাঠ্য কথা লিখে, মুছে, ফের লিখছিল।

ধোঁয়ার ঝাপটায় বুলার চোখ জ্বলছে, ফলে একটু লালচেও, বলে উঠল "ওই চিমনিটার সঙ্গে তুই আমাদের তুলনা দিলি? আমরা পূজো করছি, মানে আরতি তো! ওই একই হল। আর চিমনিটা করছে কী? না, কালো কালো কতগুলো কেচ্ছা ছড়াচ্ছে—চেয়ে ছ্যাখ!"

এক মুহূর্ত চেয়ে দেখে বললাম, "ওর বুকের যত কষ্ট, কালিঝুলি যত, সব বের করে দিচ্ছে, বুলা, ব্যাপারটা তা-ও তো হতে পারে!"

"আমি এসব মানি না", একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বুলা বলল, "আমি এখন বিকেলের এই মরা আলোটাকে একদম ঢেকে দেব, চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার হয়ে যাবে", ক্রূর কুটিল কোনও প্রতিশোধ তোলার মতো ভয়ংকর একটা ভঙ্গি করে সে বলল, বলেই সন্ধ্যা যেন আরও ঘনিয়ে এল, আমার মাথা হঠাৎ চরকির মতো এক পাক ঘুরে গেল, ধোঁয়া, অন্ধকার, কিছু দেখছি না, বুলা হেসে উঠেছে শুনছি, বলছে "এই ছেলেটা ভেলভেলেটা! তুই যে লাট্টু হয়ে যাচ্ছিস! ছুয়ো, হেরে গেলি" বলেই বুলা তরতর করে দৌড়ে বাংলোটার পিছনের দিকে বারান্দায় অন্তর্হিত হল।

তখন আর আমার মগজে বিন্দুমাত্র ধোঁয়া অবশিষ্ট নেই, চোখ স্থির, ঘাসের নরম আসনে বসে আমি স্বচ্ছ শ্বাস নিচ্ছি। পাশে এসে দাঁড়াল যে, তাকে ধরে আমি উঠতে চেষ্টা করলাম। "রজনী, আমার মাথাটা কেমন—" লাজুক কৈফিয়তটা আপনা থেকেই বেরিয়ে এল।

"জানি, তুমি চুরুট খেয়েছিলে।"

"বুলা দিল যে!"

"দিলেই বুঝি খেতে হয়?"

"ও যে অফার করল। ভেবেছিল, পারব না। আমি ছেলে তো।"

সে হেসে বলল, "অফার পেলেই বুঝি নিতে হয়! সত্যিকারের ছেলেরা ফিরিয়ে দিতেও জানে, ওইখানেই তাদের জোর, মনের জোর।"

"আমি পারি না। কেমন রোখ চেপে যায়। 'না' বললে পাছে ওরা ঠাট্টা করে। তাই যে যা বলে, তাই করি। কিছুমাত্র না ভেবেই টলে যাই। ঢলে পড়ি।"

মন আর মমতা দিয়ে শুনে সে বলল, "এটা তো দুর্বলতা, আসলে একটা রোগ।"

তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে বললাম, "তুমি সারিয়ে দাও।" সে বলল "দেব।" অস্পষ্ট আলোয় তাকে আশীর্বাদিকার মতো লাগছিল। সে কি আরও কাছে আসছিল তখন, তার শ্বাস আর আশ্বাস নিয়ে, সেই মুহূর্তে পুনরপি স্নায়ুজালে সম্পূর্ণরূপে ধৃত আমি সম্ভাবিত ঘনিষ্ঠতায় ভীত, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে উঠেছি "রজনী, আমার মুখ তেতো!"

সে পৃথিবীর পবিত্রতম হাসিটি হেসে তখন বলল, "চুরুট খেয়েছ বলে? আর খেয়ো না?"

স্বীকারোক্তির আবেগ আমাকে পেয়ে বসেছে, তাড়াতাড়ি বলেছি, "শুধু কি চুরুট? তারও আগে···দুপুরে···আমার মুখ এঁটোও হয়ে আছে, রজনী, তুমি জানোনা।"

সে বলল, "জানি। বরং তুমিই জানতে না—"

"কিন্তু তুমি—তুমি তো ছিলে দূরে। তা ছাড়া তোমার—" কথাটা কীভাবে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না, তাই অনাবশ্যক শব্দের পর শব্দ; বেড়েই চলেছিল।

"আমার চোখের জ্যোতি কম, তাই বলছ তো। আমার চোখ দুটো তবু তো পুরোপুরি যায়নি। গেলেও কিন্তু ঠিক দেখতে পেতাম। তুমি জানো না। চারধারে কী ঘটছে, অন্ধরা কিন্তু দ্যাখে, দেখতে পায়। তাদের অনুভব দিয়ে! তুমি জানো না।"

আস্তে আস্তে বলছিল রজনী, ছোট ছোট বাক্য সাজিয়ে। শব্দগুলো হিমশীতল হাওয়ার মতো নামছিল আমার মজ্জা, আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। কানের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডে কোনও প্রবেশপথ আছে নাকি? আগে জানতাম না।

মা, আমার পাপ আমাকে প্রহার করছিল, একটি অন্ধপ্রায় মেয়েকে প্রতারণা করার প্রয়াস ভীষণ ভারী একটা বোঝার মতো আমার মাথায় চেপে রইল, ওই স্তম্ভিত অন্ধকারে নিষ্পেষিত করতে থাকল আমাকে। পারছি না, সেই পাপের দায় ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে নিঃশ্বাস নেব কী করে, তাই নিস্তার পেতে অদ্ভুত স্বরে বলে ফেললাম, চাপা গলা, আমার ধরন অবিকল কাপুরুষের মতো; 'বুলা—আমি না—বুলাই—"

হাত দিয়ে সে আমার মুখ চাপা দিল।—"ছি। নিজের দোষের ভাগী অন্যকে করতে নেই। একটু আগে নিজেই তো বলেছ, তুমি দুর্বল, সাড়া না দিয়ে পারো না।"

মরিয়ার মতো তখনও বলছি, "কিন্তু রজনী, বুলা খুব খারাপ যে, ও সবাইকে—"

ছোট ধমকটাকে স্নেহ দিয়ে মিশিয়ে সে বলল, "আবার! কে কী করে তা দিয়ে তাকে ভুল বুঝতে নেই, কেন করে তা-ও দেখতে হয়। সবারই কিছু-না-কিছু দুঃখ আছে। বুলারও আছে নিশ্চয়। দুঃখ-কষ্ট কাউকে বাইরে থেকে দেখতে খারাপ করে; কষ্ট পার হয়ে কেউ আরও বড় হয়ে যায়।"

হাত দুটি ছেড়ে তখন ওর দুটি পা স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঘাসের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইছে। বয়সে ছোটকে প্রণাম করা যাবে না, এ কী অন্যায় একটা নিয়ম, বলো তো মা! শুভ্র-শুদ্ধ পবিত্রতার কাছে, শুধু বয়স্ক বলেই, পাপ মাথা নোয়াবে না? কী অর্থহীন নিষেধ, বলো তো!

শাড়ির খসখসের সঙ্গে ক্রমশ-স্পষ্ট একটি আকৃতি, বোঝাই যাচ্ছিল বুলা ঘনিয়ে আসছে। সামনে এসে সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কী ব্যাপার। যেতে-টেতে হবে না, নাকি আজ এখানেই—" বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে, একটু ঝুঁকে, যেন বাতাসে কিছু শুঁকে, সে ফের বলল, "কী ব্যাপার! ওখানে ফ্যাচফ্যাচ, এখানেও সেই ফ্যাচফ্যাচ? তোরা নাকে-কাঁদুনি ছেলেগুলো সব হলি কী?" বুলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নে, ওঠ। খেয়েছিস তো একটা চুরুট, তা নিয়ে এত নাটুকেপনা করে না। এর পরে যখন পিপে পিপে গিলবি, সময় তো আসছে, তখন করবি কী। আজ তো সবে হাতেখড়ি, যাকে বলে দীক্ষে। আমি হলুম গিয়ে তোর গুরু-ঠাকুরানি।"

(নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী বুলার, তবু প্রথম চুরুট টানার সেই বিকট গন্ধ, উত্তেজনা, কষ্ট, বুক ধড়ফড়, জীবনে পরে, তীব্রতর নেশার ঘোরেও ফিরে আসেনি। প্রথম যা, তা সব দিক থেকেই প্রথম।)

একটা উতলা হাওয়া উঠে আসছিল গঙ্গার দিক থেকে, সটান গাছগুলোর ডালপালার প্রতিরোধের কোথায় ফাঁক, খুঁজে পেতে নিয়ে সেই হাওয়া কিছু শুকনো পাতাকে উড়িয়ে ঝরিয়ে উদাস করে দিচ্ছিল পার্থিব বন্ধন থেকে, তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বললাম "বুলা, বাঁশি কাঁদছে কেন?"

"কাঁদছে, কান্না ওর অভ্যেস বলে। ছিঁচকাঁদুনে বলে।"

তখন আরও স্পষ্ট করে বললাম "বুলা, বাঁশিকে তুমি কী করেছ?"

মাথা নেড়ে নেড়ে বুলা ওর খোলা চুল আরও এলোমেলো করে দিল।—"ওকে আমি জন্মদিনের উপহার দিয়েছি। এই তো একটু আগেই দিলাম।"

"উপহার পেয়ে কান্না?"

(বুলা, তুমি বাংলা বলছ অথচ কথাটার কোনও মানে পাচ্ছি না।)

"কী দিয়েছি শুনবে? নকল দাড়ি আর গোঁফ, হি-হি।" বুলা ওর বিশ্রী হাসিটা মুখের পিচকারিতে পুরে নিয়ে চারদিকে ছড়াতে থাকল।—"বেশী ফ্যাচফ্যাচ যদি করিস তবে তোকেও দেব। ভেবো না, সোনা ভেবো না, তোমাদের সব ক'টাকে আমি ব্যাটাছেলে বানাব।" বুলা সুর করে করে বলছিল।

"তুমি কী বিশ্রী বুলা, কী নিষ্ঠুর।" ওকে আঘাত দিতে বলে উঠেছি, কিন্তু আঘাতটা আত্মসাৎ করে বরং আমারই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বুলা বলেছে "আর তোরা? বাকী সকলে? আমার চারধারে যা-কিছু সব বুঝি দয়ায় ভরপুর? আহা-রে", বুলা বলে গেল "আহা-রে, অতো দয়া আমার সইবে না, আমি যে নিষ্ঠুর! ফুঁ দিয়ে দয়াটয়াগুলোকে খানিক উড়িয়ে দিই।"

বলে বুলা সত্যিই ঘুরে ঘুরে পাগলের মতো চারদিকে ফুঁ দিতে থাকল।

অথচ বুলা, বুদ্ধিমতী বুলাও বোঝেনি বাঁশির কান্নার মানে। খরগোসের মতো সাদা সুন্দর পিকনিকের দিনটিকে গোড়া থেকেই বুলা যেন তাড়া করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল, নিজের সেই বীভৎস কীর্তিতে নিজেই বিমোহিত সে তার শিকারের চোখের জলের উপরে ফুটে-ওঠা ফোঁটাই শুধু দেখেছে, তলার দিকে তাকায়নি।

সমস্ত সুরটা সেদিন কেটে গেল, ফেরার পথে কথা বিশেষ হল না। আর অনেক রাত্রে বাঁশি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ছাদে। ওর চোখে তখন জল নেই, তবু মুখটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে মাটি যেমন নরম থাকে, সেই রকম।

বাঁশি অল্প হাসল।—"ও বলেছে বুঝি? বলেছে কেঁদেছি? নকল দাড়ি গোঁফগুলোর জন্যে? দূর তা নয়, সেজন্যে কেন হবে। ওটা

অপমান, কিন্তু ঠাট্টা বলেও তো ধরা যায়, বন্ধুতে বন্ধুতে। তা ছাড়া থিয়েটারে কত কিছুই তো নকল, পরচুলোও তো পরি। তা ছাড়া আমি কাঁদছি—না। চোখ চকচক করে উঠেছে হয়ত, চোখের পাতা পুড়েছে। কেন? কারণ—ও সব জানে। আমি টের পেয়েছি। ওখানে ওর চলায় ফেরায়—গোড়া থেকেই সব বুঝতে পেরেছি। আগে একবার গিয়েছিল, সে তো জানতাম। তাই বলে সব এত চেনা হবে—প্রত্যেকটা ঘর, খাট, দেওয়াল, জানালা, এত তন্ন তন্ন করে জানা? আমার খটকা লাগল যে। বেশ তো ছিলাম, বাইরে বাইরে, কিন্তু বিকালে ও এসে আমাকে চোরা কুঠুরিটার ভেতরে টেনে নিয়ে গেল কেন, ভাল লাগছিল, তবু অসম্ভব যন্ত্রণা হল আমার, সব ধরিয়ে দিল, ধরে ফেললাম, ফিসফিস ফিসফিস, শুনতে পেলাম, এই প্রথম নয়, আরও অনেকবার ওখানে এসেছে ও, প্রায়ই আসে, ওই চোরা কুঠুরিটার মধ্যে আরও কতজনকে—" বলতে বলতে বাঁশির গলা আবার ধরে এল।

বললাম "তুমি তো জানোই বুলা একটু অন্য রকম—"

সে বলল "জানি। জানা এক কথা আর দেখা আলাদা। ধাক্কা লাগে।"

আজ হলে কথাটা আরও গুছিয়ে বলতে পারতাম বাঁশিকে। বলতাম, বাঁচা নামে যে খেলা, সব খেলার মতো তারও কয়েকটা নিয়ম আছে, তুমি বোধ হয় সব নিয়ম জানো না। একটা নিয়ম এই যে, বেশী কষ্ট পেতে নেই। বাঁশি, অতো বেশী কষ্ট পেও না।

পঁয়ত্রিশ

মা, মোহানার আরও কাছে চলে এসেছি, তার সান্নিধ্য, তার শব্দ নিরন্তর কোনও নিঃশ্বাসের মতো, সুদূর, গভীর, ঈষৎ তপ্ত-ও। এ কোন্ মোহানা? অনেক বাঁকে বাঁকে পাকে-পাকে ঘোরা যে-নদীর নাম ইহকাল—তার। পিছন ফিরে চাইছি—ছড়ানো, গড়ানো অনেকগুলো ধারা। তার একটি কি তোমার আমার সম্পর্ক, তার একটি কি তুমি? তুমি এত দূরে এসেছিলে নাকি? মনে তো হয় না। অনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছে কোনও সমতলে, ঘিঞ্জি গঞ্জে অথবা মাছিতে ছেয়ে ফেলা বাজারে, জীবনের আদিতম সম্পর্কের স্রোতটি সেখানে আর দেখা যায় না।

কিংবা চেনা যায় না তাকে। আরও বহু সম্পর্কের, অভ্যাসের, পাপের উপনদী তাতে এসে মিশেছে। তার কোনখানে এক আঁজলা জল হাতে তুলে নিয়ে বলব, 'এই জলটুকু আমার মা?' মিশে গেছে। তা-ছাড়া ভাটির জল ঘোলাও বটে, যত ভাটি, তত ঘোলা। পরিশুদ্ধ সম্পর্ককে পাওয়া যায় খালি উজানে, অথবা একেবারে উৎসে ফিরে।

সেই দিকে চেয়ে আছি, কিন্তু জল নাড়া দিচ্ছি এখানে, যেখানে সব ঘোলা। নাড়তে গিয়ে কি তলার ময়লা আরও তুলে আনছি?

মা, তাই হয়ত বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল, তুমি আসছ না। একি শাস্তি, একি তিরস্কার, এই শেষ প্রণামটাও অকিঞ্চিৎকরতায় ভরে তুলছি বলে, অকিঞ্চিৎকরতায়, বিকৃতিতে আর নানা তুচ্ছতায়—তাই? তা হলে কিন্তু প্রতিবাদ করব, মা, ভীষণ চেঁচিয়ে উঠব, তোমাকে বলে রাখছি, এই শেষবার। মাঝে মাঝে যাকে বলে গল্প বলা, তার ধাঁচ এসে গেছে, এই কি আমার অপরাধ? সে তো শুধু গলা ভেজাতে, শক্ত শক্ত এক-একটা গ্রাস সহজে নামিয়ে দিতে

ঢকঢক্ করে খানিকটা জল মাঝে মাঝে খেয়ে নিতে হয় না ?—তাই। নইলে, রঙ যদি কিছু-বা লাগিয়েও থাকি, তা শুধু বাইরে, মর্মবস্তুও কি স্পর্শ করেছি ? না।

তবে কি তোমার রোষ সেই মর্মবস্তুরই ব্যবসায়িক ব্যবহারে ? তা যদি হয়, অভিযোগটা মাথা পেতে নেব। মা, তুমি জানো না, মাঝখানে কঠিন জ্বরে পড়েছিলাম যে-কয়দিন, তোমার বাঁধানো ছবিটার দিকে তাকাতে পারতাম না। মনে হত, ছবিটার চোখ যেদিকে যাই সেদিকেই ঘোরে, আমাকে বিঁধিয়ে মারে। তুমি বকছ, ঠোঁট একটুও না নেড়ে আমাকে ধমকে দিচ্ছ—কী করছিস, কী করছিস তুই—একে তো চেঁচিয়ে বলছিস যা বলার নয় সেই সব কথা, যা নিভৃত ; তার উপরে, লোভে পড়ে তাকেও করছিস বিকৃত ? ছি।

ছি বললেও আর শুনছি না। এই অসুখ থেকে ওঠার পরে আর ভয় না। কলমটাকে মুঠো করে ধরেছি, তাকাচ্ছি তোমার ছবির চোখে-চোখে ; মুখ ফিরিয়ে নাও তো এবারে, দেখি কেমন পারো।

এখনও যখন খুব জ্বরে পড়ি, তোমার কথা সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে। তোমার কথা, আর তখনকার সকলের। কিংবা যখন ঝড় ওঠে। জ্বর আর ঝড়, বার বার দেখেছি, পুরনো কালকে তোলপাড় করে তুলে আনে। এই শক্তি আছে দেখেছি বিকালের শান্ত নদীরও, আর আছে কোন-কোনও সুদূর মেঘের। মেঘ আর নদী, নিজে ওরা চঞ্চল, অস্থির, কিন্তু অপরূপভাবে বিশ্বস্তও। নদী তার তলায় আমাদের সব স্মৃতি গচ্ছিত রেখেছে, মেঘ তার নানা রঙের ভাঁজে ভাঁজে। চাইলেই জমানো জিনিসের যতটা চাই ততটাই ফিরিয়ে দেবে।

সেবারের গ্রীষ্মে আমার জ্বরটা তোমার খুব কাছে আমাকে নিয়ে গেল। জ্বর—জ্বর, সে-রকম জ্বর একালে আর হয় না। এখনকার

সব অসুখই জটিল, কঠিন, প্রায়শ শরীরের সঙ্গে মনটাও মেলানো। তখনকার জীবনের মতো তখনকার অসুখও ছিল সরল, সোজা রাস্তায় উঠে যেত, বাঁকা-চোরা রাস্তা চিনত না।

এমন-কী এক-একটা বৎসরও নিজেই কয়েকটা স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে থাকত। গ্রীষ্মে সময়টা নিজেই পড়ত জ্বরে, সারা দুপুর বিকারের ঘোর, রক্তাভ চোখ। বর্ষায় সর্বদাই তার চোখ টলটল, শরতে সে ডুরে ফ্রক-পরা খুকি, অথচ কার্তিক পড়লেই ছানি-পরা বুড়ি, শীতে আরও জড়োসড়ো, কিন্তু যেই ফাল্গুন এল অমনই সব জোব্বা বালাপোষ সে তরুণ, নতুন উদ্দাম হয়ে গেল।

সময়ের এই এক-একটা ভাগের ছাপ আমাদের উপরেও পড়ত। সেই গ্রীষ্মে, তাই, সব গ্রীষ্মের মতোই, আমার জ্বর হল। হবেই, অবধারিত। তবু সেই জ্বরেরও অব্যবহিত একটা হেতু ছিল।

হেঁটে হেঁটে হাওড়া থেকে ফিরছিলাম। রজনীগন্ধা—কিসমিস—চলে যাচ্ছিল। জানালায় বসে সে কী বলছিল মনে নেই কিংবা মন ছিল না শোনবার মতো ; সে কি সব কথা বলছিল বাঁশিকে,—তার দাদাকে ? আমাকে কিছুই না ?—"ছুটি হলে আবার আসব" রজনী কাকে বলল এ-কথা, বাঁশিকে ? নাকি বাঁশিকে সাক্ষী রেখে আমাকে ?—"তখন হয়ত আরও কম দেখব।" কী কম দেখবে, রজনী, কী—কী ? যা দেখা উচিত নয় তা-ই আরও কম দেখবে, নিরর্থক দৃশ্যে নিরাসক্ত হয়ে যাবে, তাই বলল কি ? আমি ভালো বুঝছিলাম না। রজনী চলে যাচ্ছে, এটুকু বুঝেছিলাম ঠিক, আর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম নিরাসক্ত আর একটি বস্তুকে : প্লাটফরমটা বাঁধানো, কঠিন। গাড়ি যখন চলে যাবে, এই প্লাটফরম তখন কাঁপবে, যতবার যত গাড়ি যায় ততবারই কাঁপে, কাঁপাটা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ না। নিজেকে ও শক্ত, হৃদয়হীন করে রাখতেও শিখেছে। তা ছাড়া সবাইকে ছেড়ে দিতেও ; কোনও গাড়িকেই শেষ পর্যন্ত তো আটকায় না।

শেষ সময়ে ঝুঁকে পড়ে রজনী বলল, "সেই জিনিসটা দাদা ? ওটা সাবধানে রেখো। বেশী নাড়াচাড়া কোরো না। তুমি সাবধানে থেকো।"

বাঁশি একটা রিভলভার কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছিল। ক'দিন থেকে সেটা নিয়ে তার সময় কাটত। হেসে বলত, "প্রাণঘাতিকা, কিন্তু বিশ্বস্ত। কিন্তু আমি যা চাই তাতে রিভলভারে তো কুলোবে না। মনে হয় গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব গর্ত করে দিই, যত আসবাব আর চারপাশের এই দেওয়াল। কিন্তু তাতে তো হবে না। রিভলভারের গুলিতে বড় জোর গর্তই শুধু হবে, কিছু ধসে পড়বে না। আমি সব ধসিয়ে দিতেও চাই যে।" ওর গলার শিরা আরও নীল হত। বলতাম "বাঁশি, নাটক ? কোনও পুরুষের পার্ট মুখস্থ করছ ?" অদ্ভুত চোখে তাকাত সে। দৃষ্টির রঙও নীল— ঘৃণার।

সেদিন বাইরে এসে গাড়িতে আর উঠলাম না। বাঁশিকে বললাম, "তুমি যাও, আমি একটু পরে যাব।"

দুপুরবেলাটা তখন জ্বরের বিকারে চীৎকার করছিল। আমি হাঁটলাম, হাঁটলাম ; হাঁটতে থাকলাম।

তুমি ভয় পেলে, চেঁচিয়ে উঠলে।—"এ কী ? তোর চোখ টকটকে লাল যে ? জ্বর হয়নি তো, দেখি।"

আমি টলে পড়ে যাচ্ছি, তুমি ধরে ফেললে, টেনে নিলে—কাছে, কত কাছে, কত দিন পরে বলো তো। দুটি তাপ, আমার শরীরের আর তোমার স্নেহের, মিশে গেল। টেনে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলে। নীচের ঘরে, তোমার বিছানায়। কত দিন পরে বলো তো ?

কপালে জলপটি, মা, তোমার হাতেও জলপটি, আমি চোখ বুজে শুয়ে তোমাকে পাচ্ছি। আমার বয়সও কি কম হয়ে গেল ? বলতে পারব না। অসুস্থ, দুর্বল শরীর শুধু লুব্ধ হয়ে উঠতে জানে, স্পর্শের

জন্যে, একটু সারার মুখে কুপথ্যের জন্যেও, তা-ছাড়া তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এক স্নায়বিক বিকার, কিছুই সে ছাড়তে চায় না, সব কিছু মুঠোর মধ্যে আটকে রাখার একটা ছেলেমানুষি তাকে পেয়ে বসে, আমি যেমন যতক্ষণ জেগে, ততক্ষণ জোর করে পাশে ধরে রেখেছি তোমাকে। যখন ঘুমে, তখনও তোমার আঁচলের শেষভাগ আমার হাতে; জড়ানো থাকত আমার আঙুলের গিঁটে গিঁটে।

আর ঘরে বালতি এনে যখন আমার মাথায় জল ঢালছ, জল, নির্মল নির্মল, তার শতধারা কি ধুইয়ে দিত আমার বয়সকে, এই বছরগুলোকে, জমে-ওঠা সব ময়লাকে?

কখনও রগ-ছেঁড়া যন্ত্রণায়, কখনও চোখ-বোজা গভীর আরামে আর অবসাদে তাই মনে হত বটে। এই ছোঁয়া, এই স্নেহ, উৎকণ্ঠা, প্রগাঢ় গন্ধ, সব চেনা এ-সবই কি ছাড়াতে যাই, ছাড়াতে চাই? ঠাণ্ডা জলের মতো তৃষ্ণা আর কিছুতে কি মেটে? তবু উৎসে গিয়ে সেই ধারা করপুটে গ্রহণ করতে কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকে দাঁড়ায় না কেন। শোক আর আঘাত, ভয়ংকর কোনও রোগ, মৃত্যুভয়—এইসব নইলে মানুষ ফেরে না, ফিরতে চায় না, কদাচ তাকায় না ভিতর দিকে—কিন্তু কেন। আর সেই ফেরা, সেই তাকানোও একান্তই ক্ষণিক, তার পরেই ভিতরেরই কোনও ফুসলানি তাকে ঠেলতে থাকে, ছুটিয়ে মারে—কিন্তু কেন?

তুমি কি ভয় পেয়েছিলে, আমার খুব শক্ত অসুখ ধরে নিয়ে? মানত করেছিলে?

ছত্রিশ

দিনের শেষ নৌকোটিও যখন ছেড়ে যায় পারঘাটা তখন কোন্ চোখে চেয়ে ছাখে? সেই দৃষ্টি কি দেখেছিলাম তোমার মুখে? দেখেছি। দেখিনি। দেখলেও তার মানে পড়তে পারিনি।

জ্বরে জিভ, ত্বক, সব শুকনো ঠেকত। একটু স্পর্শের জন্যে মন তৃষিত হয়ে থাকত। বারবার যে চোখ মেলে, মা, এদিক ওদিক চাইতাম, থেকে থেকেই যে চাইতাম জল, আরও একটু জল, সেই জলের নাম কী? সে কি শুধুই বর্ণহীন একটি পেয়? বোধ হয় না। বোধ হয় তার চেয়ে কিছু বেশী। আমার সন্ধানী দৃষ্টিকে ঘুরতে দেখলেই তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসতে।—"কী রে, কী দেব, কী চাই?" কী যে চাই তোমাকে বোঝানো যেত না। চেয়ে চেয়ে দেখতাম—নেই। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। সব যেন পুরনো, ফুরনো হয়ে গেছে।

কপালে একটি হাত। ঠাণ্ডা, নরম। চমকে উঠতাম। বলতাম, "কে?" সব সময় তুমি উত্তর দাওনি, শুধু আঙুলগুলো বুলিয়ে গিয়েছ। অলস নয়নে তোমাকে দেখে বলতাম, "ওঃ, তুমি!" সেই ভঙ্গিতে যে হতাশা, তুমি কি তা ধরতে পারতে? নইলে বলতে কেন "তুই ভেবেছিলি কে?"

"কে আবার? কেউ না।" বলে চোখ ফের বুজে ফেলেছি। টের পেয়েছি, একটি হাত আমার একটা কবজির যেন একটা রগ টিপে ধরেছে। হাতটা টেনে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলেছি "কী দেখছ?"

লজ্জিত, ধরা-পড়া গলায় বলেছ "দেখছিলাম কেমন আছিস?"

"তুমি বুঝি নাড়ি দেখতে পারো?" আমার গলা তেতো-তেতো।

"এই একটু একটু।"

আমি কিন্তু তোমার মিথ্যেটা ধরে ফেলেছি। আমি কেমন আছি তুমি দেখতে না, দেখতে আমি তোমার কতটা আছি। তোমারই তো?

না, মা, না। শুনে নাও, পৃথিবীর সব কালের সব মা শুনে নিক, আমি তোমার ছিলাম না। দুনিয়ার কোনও ছেলে বা মেয়ে থাকে না। কোন্ নৌকো কবে পারঘাটায় বরাবর বাঁধা পড়ে থাকে? কাছি খুলে তারা বেরিয়ে পড়বেই, মাঝ দরিয়ায় হাবুডুবু খাবে, হয়ত ডুববেও। তবু ভেসে পড়বে।

আমিও ভেসেছি। বিছানায় যখন পড়ে আছি, তখনও ভেসেছি স্বপ্নে।

এই স্বপ্ন ব্যাপারটা মা, বড় অদ্ভুত। মানুষ ছাড়া এ জিনিস আর কে দেখে থাকে, জানিনে। মানুষ দ্যাখে বটে, কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারে না। প্রত্যেকটা স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থে এক-একটা মানস সরোবর। তার থেকে আঁজলা ভরে কতটুকু আর জল তুলে আনতে পারি? প্রায় সবটাই আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে যায়। তবু যা বাঁচে, তাই লেগে থাকে স্মৃতির ঠোঁটে। আধো-জাগরণের ক্ষণেও তার স্বাদটুকু নিয়ে বাঁচতে চাই। চাইলেই কি সাধ মেটে? ঝরা স্বপ্ন মরা স্নেহ-প্রেম ইত্যাদির মত। সহস্রাব্দ কামনাতেও আর অটুট ফেরে না।

কিংবা, মানস-সরোবর নয়, কখনও বা মনে হয়, স্বপ্ন আসলে হল চোর কুঠরি। আমরা সকলের চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে সেখানে প্রবেশ করি। খুঁজি, খুঁজি, অচরিতার্থ বাসনা যা-কিছু আছে, সব পেতে চাই, অন্ধের মত হাতড়াই।

কিন্তু স্বপ্নের কথা থাক। আমাদের কথা বলছিলাম। সেই জ্বরের দিনগুলোরই একটিতে কী বিশ্রী একটা কাণ্ড করেছি, মনে আছে?

বার্লির বাটিটা আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তার পরেই

তোমার হাত থেকে কেড়ে নিলাম জ্বর-মাপা থার্মোমিটার। এক ঝলক দেখে নিয়েই কী দেখলাম কী দেখলাম না, পুট করে ভেঙে ফেললাম সেটাকে। একই সঙ্গে অবাক হয়ে আর ভয় পেয়ে তুমি বললে, "কী করলি, কী করলি তুই?"

"বেশ করেছি।"—আমি ফুঁশছিলাম। আমার ফাটা ঠোঁট চড়চড় করছিল, আমার ভাঙা গলা কুৎসিত হয়ে গিয়েছিল।

"জ্বরটা বোধ হয় বেড়েছে," তুমি বললে শান্ত গলায়, "যাই ওষুধটা নিয়ে আসি।"

চীৎকার করে বললাম, "ওষুধ? ওষুধ আর খাব না আমি। ভেবেছ তোমার ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারিনি?"

"ষড়যন্ত্র?" নীল হয়ে যাওয়া গলায় তুমি বলেছ, "কিসের ষড়যন্ত্র?"

"আমার জ্বরটা পুষে রাখার", বিকারের ঘোরে আমি বলে গেছি "আমাকে যদ্দিন সম্ভব ভোগাবার।"

এতক্ষণে স্থির গলায় তুমি বলেছ, "তাতে আমার লাভ?"

"লাভ? তুমিই ভালো জানো। আমি যাতে নাগালের বাইরে না চলে যাই, তোমার আঁচলের তলায় পড়ে থাকি তাই।"

আশ্চর্য, একটুও রাগ করলে না, গলা কাঁপল না তোমার, নিষ্পলক নিষ্কম্প, বললে, "তুই একথা বলছিস? কই, কাউকে তো তবুও রাখতে পারিনি।"

আমি তখনই যেন দেখতে পেলাম তোমার নিপাড় সাদা শাড়ি, যার প্রান্ত শুধু একটু একটু কাঁপছে, যেন ভয় পেলাম, সেই ভয় কাটাতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ঠিক সেইভাবে যেভাবে, বার্লির বাটি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম "পারোইনি তো, দাদাকে না, বাবাকে না। তার শোধ বুঝি আমাকে দিয়ে তুলতে চাইছ? ছিঃ মা, ছি!"

"পাগল! এইভাবে কাউকে কি রাখা যায়?" শেষবারের মত আমার কপালে একটুখানি ঠাণ্ডা হাতের ছাপ রেখে উঠে যাচ্ছিলে,

সেই ছোঁয়া, সেই হিমশীতল ক্ষমা আমার গায়ে যেন ছ্যাঁকা দিল, তোমার হাত ধরে টেনে রাখলাম আমি—"যেতে পারবে না, বাকীটাও তবে শুনে যাও। আমাকেও ধরে রাখতে পারবে না তুমি। আমিও যাব।"

"জানি। চলে তো গেছিসই। আমি কি জানি না, বুঝতে পারি না ?"

"আরও দূরে যাব। এই অসুখটা একবার সারে যদি, দেখবে, আমি আরও ছড়িয়ে পড়েছি, ছিটকে গেছি, সে এক অন্য জগৎ, আলাদা জীবন, সেখানে তুমি আমার নাগালও পাবে না।"

"না পাই তো না-ই পাব। তুই এখন তো ঘুমো" বলে তুমি উঠে গেছ। দুটি মোটে বাক্য। কিন্তু এত কম কথায় এত কঠোর রায় অদ্যাবধি উচ্চারিত হয়নি।

শেষ রায় ? না। হতো তো মিটে যেত। কিন্তু ফিরে এসেছ আবার, আধ ঘণ্টাটাক পরেই।

সেই দৃষ্টি, সেই স্পর্শ। সেই শান্ত, শীতল উচ্চারণ—"চোখ ফোলাফোলা কেন রে ? কই, জ্বর তো নেই, আর বাড়েনি। তবে ?"

উত্তর দিলাম না। তখন তাই তুমি আবার—"কাঁদছিলি ?"

বোকা, বোকা, কী ভীষণ বোকা তুমি বলো তো, মেয়েরা যা হয়। তুমি এতক্ষণ আড়ালে কেঁদেছ, তার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাই ভাবলে কাঁদছিলাম আমিও ? ছেলেদের তুমি জানো না, ছেলেরা সহজে তো কাঁদে না। তা ছাড়া দু'জন মিলে কাঁদছে এমন ঘটনা ঘটে কদাচিৎ। টেলিপ্যাথি ? ও মানুষের শুধু এক ইচ্ছাময়ী কোমল কল্পনা। দু'জনে আলাদা স্থানে সত্যিই যদি কাঁদত, তা হলে জগতের অনেক সম্পর্কের জ্বালা আর ভুল-বোঝার কাঁটা জল হয়ে জলেই ধুয়ে যেত। সেদিন সত্যিই যদি কাঁদতাম, তা হলে আজ এই লেখালেখির কান্নাকাটি কি দরকার হত ? মা, তুমি কিচ্ছু বোঝনি, বোঝ না।

ওই একটা কথা বোঝাতে আজ এক গাদা কথা লিখতে হল, অথচ সেদিন কিন্তু "কাঁদছিলি?" এই প্রশ্নটার জবাবে বলেছিলাম, "কই? না।"

"তবে মুখ ভার কেন?" তুমি তবুও বলেছ, "একেবারে ছেলেমানুষ। বাইরে কাঠ, নীচে কাদা। তোর বাবাও ওই রকম ছিল। দূর, মন খারাপ করে না, করলে অসুখ সারে না। কথা-কাটাকাটি? ও তো হয়েই থাকে। ঝোঁকের মাথায় না-হয় যা-খুশী বলেছিস।"

"কী বলেছি তোমার মনে আছে?"

"আমাকে যা-তা; আবার কী। তোরা সবাই যা পারিস।"

ইস্, তোমাকে কী-না-কী সব কথা ছুঁড়ে মেরেছি বলে মন ভার করে বসে আছি, তারই জের টানছি আর জাবর কাটছি শুয়ে শুয়ে —মা, এত ঘা খেয়েও তুমি তখন কী ছেলেমানুষই না ছিলে। তখনও জানো না আমি কোন্ পাষাণে তৈরী।

আজ যদি বলি, তোমাকে যা-ই বলে থাকি না কেন, আমার মনে তা নিয়ে কোনও কোনও ঘূর্ণি চলছিল না, তুমি হিংস্রতম আঘাতে দীর্ণ হয়ে যখন চলে গেছ, তখন—তখনও আমি ভাবছিলাম অন্য কারও কথা—কার, কার? হয়ত বুলা, কিংবা কিসমিসই হবে হয় তো। অথবা অপরা যে-কোনও নারী। সরল ধারণা বা বিশ্বাসের বশবর্তিনী জননী বা জায়াকে নিয়ে প্রতারক পুরুষ মাত্রেই যা করি। যে একাগ্র, সমর্পিত, তাকে উপেক্ষা করে অপরায় আত্মহারা। মাকে দিয়ে যে বিদ্যায় হাতে খড়ি, পরবর্তী কালে ঘরণীর ক্ষেত্রেও তারই প্রয়োগ, এই তো রীতি! অবশেষে স্বীকার করছি।

সেদিন আমি উতলা হয়ে ছিলাম অন্য কোন সঙ্গ বা সান্নিধ্যের জন্যে, তারা নেই কেন, তারা আসে না কেন, ওই জ্বরশয্যায় যে-স্পর্শ নেই তার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, নিঃশ্বাস বন্ধ করে তপ্ত কোনও নিঃশ্বাস ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কিনা অনুভব করতে চেয়েছি। বয়সের ধর্ম। ওই

বয়স অবুঝ, শুধু সমবয়সের সাহচর্য খোঁজে। বাকী সব মিথ্যা, বাজে।

সেদিন এ সব বলতে পারলাম না বলেই বিছানার পাশে-রাখা একটা পত্রিকায় মুখ আড়াল করলাম। আমার আরও দু'চারটে লেখা ছাপা হয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে একনজর দেখে নিলে।—"তোর লেখা?"

"তুমি বুঝবে না।"

"কবেকার?"

উত্তর—"তুমি যাও।"

"নতুন কিছু লিখিসনি আর?"

"কী বোঝো এসবের! তুমি যাও।"

যাওনি। তুমিও কি সেদিন মরিয়া, তাই বিছানার এক পাশে বসেছ? বলেছ আস্তে আস্তে "তখন অন্য জগৎ, অন্য জীবনের কথা কী যেন বলছিলি? সে কি এই লেখার?"

"তুমি বুঝবে না।"

"জানি।" ছোট্ট একটু শ্বাস ফেলে বলেছ, "তুই সেদিন মিছে কথা বলেছিলি। প্রথম লেখাটা যেদিন ছাপা হল। কাকে নিয়ে লেখা জিজ্ঞেস করতে ফস্ করে বলে দিলি "তুমি।" অথচ এ সবের কিছুতে আমি নেই। তা কি জানি না? জানি। চমকে উঠছিস কেন, ভয় পেলি? আমি জানি বলে? আমি বুঝি বলে? কিন্তু একটু আগেই না বললি, কিছু জানি না, বুঝতে পারি না আমি! পাগল একটা, আস্ত পাগল। তা হলে এ-ও জেনে রাখ, আমি নেই বটে, আবার আছিও। না থেকেও থাকব। তোর সব কিছুতে আমি আছি।"

মা, এক জন্মে জন্মের মূলকে অস্বীকার করা যায় না, সেদিন তুমি কি তাই বলতে চেয়েছিলে? তা হলে শুনে রাখ, তুমিও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ছিলে না। সেদিন সত্যিই তুমি ছিলে না, বলেছি তো,

মায়েরা থাকে না। থাকে না, কিন্তু ফিরে আসে। যেমন তুমি এসেছ। সেই কবে থেকে আশীর্বাদ, স্নেহ, কৃপা আর করুণার ধারায় ধারায় এই লেখাটার উপরে বর্ষিত হয়ে চলেছ।

জ্বর আসে, জ্বর যায়। আমারও গিয়েছিল। আবার কবে পা টিপে টিপে উঠলাম আমি বাঁশির ঘরে। উঠলাম, না নামলাম? সেটা কোন্ কাল? গ্রীষ্ম তখন ভিতরে ভিতরে তরল হয়ে কি বর্ষায় রুদ্ধ সব রোষ ধুয়ে ফেলে নির্মল হতে চাইছিল? এই এক অক্লান্ত আবর্তন প্রকৃতির। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ়, প্রতিবারই যেন তাপিত কারও অনুতাপিতে রূপান্তর—সম্মোহিত হয়ে প্রত্যক্ষ করি। কঠোর যে, সে রাতারাতি কোমল, চরিত্র-বৈচিত্র্যের বৈপরীত্য মানুষের মধ্যে আর কতটা আছে! নদীতে, মেঘে, আকাশে, সাগরে নিয়ত তার প্রচুর সন্নিবেশ দেখে দিশাহারা হয়ে পড়ি।

জ্বর আসে, জ্বর যায়। আমারও গেল। গেল, তাই আবার ছাদে উঠলাম, সেই চিলেকুঠিতে। আবার নামলাম, পা টিপে টিপে, বাঁশির পিছু পিছু, অথবা তাকে সঙ্গে নিয়ে। যেতেই হবে জানতাম। অন্যায়, গর্হিত অপকর্ম, দেখেছি জীবনের নানা বাঁকে আততায়ীর মতো আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকে। ভীতু তো, তাই মনে মনে আমি একটু কুঁকড়ে যাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া না দিয়ে পারি না।

আমাকে দেখে বাঁশি পাউডারের পাফ নামিয়ে রাখল। বললাম, "কোথায় যাবে বাঁশি, যে ফিটফাট হচ্ছ?"

সে বলল, "কোথাও তো না। এমনি নিজে নিজে—কী করি। সময় তো কাটাতে হবে, তাই, একাই—"

বাঁশির নিঃসঙ্গতা আমাকে দ্রবীভূত করছিল। ফিসফিস কর2 বললাম, "বাঁশি, চলো না যাই!" ও বলল, "কোথায়?" মন

ভোলানো গলায় বললাম, "ওখানে আর যাওনা?" বাঁশি বুঝল, বলল, "যাই। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। বুলাদের ওখানে যাওয়ার কথা বলছ তো? এখন সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"

"তার মানে লীলা মাসি? তিনি তো আছেনই। ছিলেন।"

"এখন একা নন। নতুন একজন জুটেছেন—অরিন্দম।"

অরিন্দম? মনে মনে নামটা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করলাম। একটু ঘষতেই চেনাটা চিকচিক করে উঠল। —"অরিন্দম? আমি চিনি। নতুন তো নন। পুরনো। লীলা মাসির সঙ্গে—"

বাঁশি বলে উঠল—"তিনিই। আদি এবং অকৃত্রিম অরিন্দম। উত্তরাধিকার সূত্রে বুলা তাঁকেই অর্জন করেছে।"

মানে বুঝতে পারছিলাম না। বাঁশি বলল, "উত্তরাধিকার জানো না? যে সূত্রে এক পুরুষের জিনিস পরের পুরুষে বর্তায়। যে নিয়মে আমি এই বাড়ি ঘর, টাকা-কড়ি সব পাব বা পেয়েছি। সেই নিয়মে বুলাও তার মার—"

কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "প্রেমিককে? কিন্তু অরিন্দম তো, মানে···"

"বুড়ো, তাই বলবে তো? কিন্তু ভাই, বুলারা তো বয়স ছ্যাখে না, অন্য কিছু ছ্যাখে। যেমন আমার কাছে এক দিন দেখেছিল—টাকা।" বলতে বলতে বাঁশি হিংস্র হয়ে উঠল, "আমিও অবশ্য দেখিয়েছি, দেখাচ্ছি। টাকা দেখিয়ে যাব। আমার পার্টটা আমি আঁকড়ে রেখেছি।"

সেই ছাদ, যে ছাদে বুলা বলেছিল ফুল ফোটে না, ওখানে শুধু গরমের কালে ক্যাকটাস আর বর্ষায় ক্যানা।

চমৎকার একটা শীতলপাটি বিছিয়ে তার সবটাই যেন জুড়ে বসেছিল বুলা। কোনো চটকানো মালার অকাতর সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছিল। ম্রিয়মাণ ফুলগুলো যেন শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছিল।

আমাদের দেখে বুলা কী যেন ঢাকল, ওর কাঁপানো, ছড়ানো আঁচলের তলায়। অরিন্দম একটা সহর্ষ হ্রেষাধ্বনি করে উঠলেন—"আরে এসো, এসো।" যেন সব সাজানো, যেন সব আমাদের প্রতীক্ষাতেই ছিল। অনেক দূরের আকাশে অবধারিত সেই চাঁদটাকেও ফুটতে দেখলাম, মেঘে আর নীলে আঁকা, যেন বানানো। মনে হল একটা বাঁধা মঞ্চ, এখুনি এক নির্ধারিত নাটকের মহলা শুরু হয়ে যাবে, অথবা পুরো অভিনয়টাই নাকি?

চোখের ইশারায় অরিন্দম বললেন, "ওদের জন্যেও তবে আরও গোটা কতক আনতে দিই?"

অস্বচ্ছন্দ গলায় বলে উঠলাম, "বুলা, আজ এখানে কী?"

অরিন্দম দরাজ গলায় বলে উঠলেন, "কিছু না, কিছু না, এই একটু সেলিব্রেট করব আর কী।"

তবু ছাড়লাম না, কারণ আমার অস্বস্তি যাচ্ছিল না, কেবলই যেহেতু বলতে থাকলাম "কিসের সেলিব্রেশন", তাই অগত্যা বুলা ইশারায় আমাকে উঠতে বলে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল। বললাম, "আজ কী?"

"আজ?" গালে একটা আঙুল রেখে ঘাড় একটু হেলিয়ে বুলা ভাবনার ভান করল। প্রায় তখনই খিলখিল হেসে উঠে বলল, "আজ আমার পাকা দেখা যদি বলি?"

"বুলা, ইয়ার্কি রাখো।"

"ইয়ার্কি রাখব? বলছিস? তবে থাকবে কী? এখানে তবে তোরা কেন এসেছিস? গীতাপাঠ শুনতে? গীতা-টীতা আমি তো জানিনে ভাই, তবে বলিস তো খান দুই গীত গেয়ে দিতে পারি।" বলে সত্যিই ও বিশ্রী ধরনে একটা গানের সুর ভাঁজতে বুঝি শুরু করেছিল, থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "আজ তোমার পাকা দেখা সত্যিই তো নয়।"

সে বলল, "হতে দোষ কী। হয়ে যাক, যখন এসে পড়েছিস।

কেন, আমার পাকা দেখা হবে না কেন? আমার মতো মেয়ের বুঝি কক্‌খনো বিয়ে হবে না তাই ধরে রেখেছিস? নাকি তোরা চাস না যে হোক। তাই, না রে, তাই?"

বুলার চোখ নাচছিল, সেই চোখে সঙ্কোচের সুতোটুকুও ছিল না। বুলা আলগোছে আমাকে একটা ঠেলা দিল। তখন বোকার মতো বলে উঠলাম, "বেশ। পাকা দেখা বলছ, কিন্তু বুলা, বর কে?"

একটা চোখ বুজে, আর-একটাকে টেরচা করে বুলা যেন আমাকে যাচাই করল। বলল, "যদি বলি তুই?"

"যাঃ!"

ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে বুলা, বলল, "তবে তোর ওই বাঁশি। হতে পারত, তবে মুশকিল এই যে, তা হলে বোঝা যাবে না কে বর আর বউ কে। তার চেয়ে—"

হুট করে বলে ফেললাম, "বুলা, তোমার বর ওই বুড়োটা, ওই অরিন্দম নয় তো?"

"হিংসে?" বলে বুলা সেখান থেকে আমাকে আবার ওই শীতল-পাটির আসরে টেনে নিয়ে এল।

চাঁদটা সেখানে আরও প্রকাণ্ড হয়ে নানা কাণ্ড ঘটাতে শুরু করেছিল। দলিত ফুলগুলির সুবাসের লেশমাত্রও ছিল না। মুখ বেঁকিয়ে বুলা বলল, "বিচ্ছিরি! এই জ্যোচ্ছনা একটুও ভাল লাগে না। সব কেমন ফটফট করে, ঢাকাঢাকি থাকে না কিছু।"

সায় দিয়ে অরিন্দম বললেন, "চাঁদ নয় তো, যেন চীনেমাটির বাসনের দোকানে ঢুকে-পড়া একটা ষণ্ড। হাজার তারা মিলে যা পারে না, ও একাই তার চেয়ে বেশী পারে, সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়।"

এ সব কথার অর্থ কী, বুঝতে পারছিলাম না। উসখুস করলাম খানিক। বাঁশি তখন থেকে ঠায় বসে একটা ফুলের কুঁড়ি তুলে কানে সুড়সুড়ির সুখটুকু নিচ্ছিল। বললাম, "বুলা, লীলা মাসি কোথায়?"

"মা ? আছে নীচের ঘরে। ওকে মাংসের সিঙাড়া তৈরী করতে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। মাংসের সিঙাড়া আর ঘুগনি। তোরা খেয়ে যাবি তো ?"

থাকতে রুচি ছিল না, আবার যাবার মত জোরও নেই। অরিন্দম উঠলেন। পকেট থেকে চাবি বের করে রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "কী হে, যাবে নাকি ?"

"কোথায় ?

"একটা সওদা করে আসি। যাব আর আসব। গাড়িতে দু' মিনিট। আসবে ?"

প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না বলেই তাঁর পিছু নিলাম।

সেদিন নীচে নামতে নামতে, পরে গাড়িতে, কী বলেছিলাম অরিন্দমকে ? "আপনাকে অনেক দিন পরে দেখলাম", "আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন" এই সব ?

"কত দিন পরে, বলো তো ?" গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে অরিন্দম বললেন "আগে যখন দেখেছিলে, তখন কেমন ছিলাম আমি ? তেজী ঘোড়ার মতো, বলবে তো ? কিন্তু ছাখো, এখন আমি কী। গালের হাড় বসে গেছে, চুল পাতলা, তাতে কলপ দিয়ে রাখি। জানি, সব জানি।"

"অনেকগুলো বছর তো ?"

"কত আর ? তবু ছাখো এই হাল। শরীরটা ভাঙা গাড়ীর মতো। নিজে থেকে স্টার্ট নিতে চায় না। ঠেলে ঠুলে চালাতে হয়।"

"আর বুলারা ? তারাও তো বদলে গেছে।"

অরিন্দম সংক্ষেপে বললেন, "গেছে।" কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালেন। আমি বললাম, "আপনি এখানে প্রায়ই আসেন, তাই না ?"

"আসি।" বলেই অরিন্দম বললেন, "তুমি ?"

"অসুখ করেছিল মাঝখানে। এবার এলাম অনেক দিন পরে। আরও যেন সব বদলে গেছে। বুলা যেন আরও কেমন—"

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললেন, "ইয়ং ম্যান, ঝেড়ে কাশতে পারছ না কেন। বুলা প্রায় বেশ্যার মতো হয়ে গেছে, তাই বলতে চাইছ তো?"

চুপ করে রইলাম।

গাড়ি সদর রাস্তায় পড়েছিল। অরিন্দম, প্রৌঢ় পাকা অরিন্দম একটা ঝাঁকুনি সামলে বললেন, "কিন্তু তুমি ঠিক কথা বলছ না। বেশ্যা হয়ে গিয়েছি বরং আমি।"

আমার মুখে কথা ছিল না।

অরিন্দম হাসলেন। সেই হাসি কোনও একটা বেদনায় কেমন হলদে হয়ে গেল। বাঁধানো দাঁতে ওঁর প্রত্যেকটা কথাই শোনাচ্ছিল অনিশ্চিত।

"হ্যাঁ, পুরুষেরাও বেশ্যা হয়, একটা বয়সে। যখন তাদের বন্ধু থাকে না। সঙ্গী, সাঙাত, কেউ না। তারা যখন বিপুষ্পিত হয়। হ্যাঁ, পুরুষেরাও বিপুষ্পিত হয়—মেয়েদেরই মতো। তখন তাদের জৌলুস নেবে, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ মুছে যায়, শুধু বিকর্ষণের পালা। তখন, সেই গত-বয়স পুরুষেরা ডেকে ডেকে লোক বসায়, খারাপ মেয়েদেরই মতো। বলে, আসবি? একটু আমার কাছে বসবি? আমি তোদের বিনে পয়সায় মদ খাওয়াব, যত চাস, তোদের নিয়ে মোটরে চক্কর দেব। আসবি? একটুখানি আমার সঙ্গে কাটাবি শুধু। আর কিছু না। আমার এখন সেই পালা চলছে। আমি সেই পুরুষ বেশ্যা এখন, প্রগাঢ়, প্রৌঢ়।"

একটু থেমে অরিন্দমই শুরু করলেন আবার। "তাই মদ খাই। অনুচিত জানি, তবু। অনুচিত আর অস্বাস্থ্যকর। তবু। উপায় নেই। শরীরকে কষ্ট দিয়ে মনটাকে খানিক তাজা রাখা, এইমাত্র। বুঝেছ, এই হল ড্রিংকিং-এর একমাত্র ফিলজফি।"

"কিন্তু" তিনি বলে গেলেন, "শেষ কথা এই নয়, এটা সর্বশেষ দর্শন হতে পারে না কখনও। এর পরেও, তরলিত চেতনা দিয়ে সকলকে সহনীয় করার, সকলের কাছে গ্রহণীয় হবার, পরেও নিশ্চয় কিছু আছে। জীবনের অন্য কোনও মানে আছে। আছে কিনা, আমি তাই খুঁজছি।"

বলেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে অরিন্দম একটা দোকানের সামনে গাড়িটা থামিয়ে দিলেন। নিয়ন-জ্বালা অক্ষরে সেই দোকানের পরিচয় পড়ে আমি তখন কাঁপছি।

সাঁইত্রিশ

তিরতির করে উড়ে যায় পাখি। গাছ বেয়ে তরতর করে উঠে যায় কাঠবিড়ালি। কতবার দেখেছি, আজও দেখি। যখনই সুযোগ ঘটে। কী দেখি? ওদের স্বাচ্ছন্দ্য? ওরা কত লঘুভার, নিজ নিজ শরীরের উপর ওদের সম্পূর্ণ অধিকার—দেখি এই সবই তো? মানুষের যা নেই, মানুষ যা পারে না। পারে না অবলীলায় লাফিয়ে উঠতে, ইচ্ছেমত আপন দেহকে আপনারই আজ্ঞাবহ করতে। এই যে পাখিটা যেমন খুশী খুঁটে খুঁটে কী খেল, আবার অহেতুক চক্রাকারে নাচতে থাকল, তারপর সহসা গতির একটি তীর হয়ে ছুটে গিয়ে বসল কোনও ডালে, হয়ত একেবারে অগ্রভাগে পাতা পল্লবের মাঝখানে, সেখানে শরীরের ভার সঁপে দিয়ে দোল খেতে শুরু করল—আমরা কি তা পারি? পারি না। যেহেতু মানুষ অভিকর্ষের অভিশাপে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা, দেহের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে জাগতিক যাবতীয় নিয়মবিধি তামিল করে চলেছে।

মানুষের তবে মুক্তি কোথায়? অতীতে। সেখানে তার স্বচ্ছন্দ বিহার—ওই পাখি আর কাঠবিড়ালীরই মতো। ইচ্ছেমত সব খুঁটে তুলতে পারে সে, আগডালে মগডালে গিয়ে বসে। শরীর যা পারে না, মন দিয়ে তা উশুল করে। এই মন নিজ খেয়ালেই টেনে বের করে ছবির পর ছবি, যেমন আমি দেখছি, দেখাচ্ছিও, সম্মোহিত, মুগ্ধ। কখনও বা চকিত, কখনও অনুতপ্তও। দেখছি।

অথবা আমি খুঁজছি নাকি? যেন কোথাও এখনও একটি বালক সবুজ কয়েকগাছি দূর্বা হাতে নিয়ে বসে আছে কোনও ব্রতকথার আসরে, সরল বিশ্বাসে, ভক্তিতে বা শুধুই কৌতূহলে, মুগ্ধ হয়ে শুনছে প্রত্যয়াদিষ্ট, মেলানো পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি, সুর করে ছড়া পড়া। কোথায় পাব আজ তাকে? ব্রতপাঠের আসর থেকে সে কবে উঠে

গেছে। বাঘবন্দী খেলার ছকটাতেও ঘুঁটি ছড়ানো, সেখানেই বা সে বসে রইল কই! চলে এসেছে। আজ অতীত তাকে ছোবল মারে শুধু, সে-ও তাই পাল্টা ছুটে ছুটে গিয়ে ছোবল মেরে আসতে চায় তার অতীতকে। এ লেখাটা কি তাই? সেই অতীতের একটা ভাগের সার্বিক প্রতীক তুমি, কিন্তু ভাগীদার, দাবীদার আরও কত জনে, বুলা প্রভৃতি আরও অনেকে।

আজ হাত বোলাচ্ছি সেইখানে, চুরি করে বুঝি ঠোঁটও রাখছি একবারটি, বুলা যেখানটায় ছোবল মেরেছিল, যেখানটায় বিষের ব্যথা আর নেই, নেই, যেহেতু কিছুই থাকে না, আনন্দ বেদনা সবই মিলিয়ে যায়, একই পরিমণ্ডলে সুরভি আর পূতিগন্ধ মিশে থাকে অনায়াসে, সহবাস জীবন মানে আগাগোড়া অশেষ বিপরীতের সহ অবস্থিতি শুধু প্রেম, আক্রোশ, বাসনা, ক্ষমা আর বিদ্বেষ, একই ইন্দ্রধনুতে ছাখো ছাখো কত বিবিধ বর্ণের সমাবেশ, জীবন কি তবে এক ইন্দ্রধনু, বেগুনি থেকে নীল, নীল থেকে হরিৎ, হরিৎই পরে ঈষৎ শুকিয়ে হবে পিঙ্গল বা হরিদ্রা, তার পরে? কমলা। অবশেষে সত্যের মুখ, সূর্যের মুখের মতো রক্তাক্ত।

আঃ, রক্ত, যা ছুপিয়ে যায় সকালে জবায়, হৃদয়ের সহস্রার কমলেও যা অনর্গল বিগলিত, কিন্তু ফের কেন সেই রঙের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম, এলামই যদি আর একটু থাকি না কেন, অন্তত এই কথাটা লিখতে যে, বর্ণের মধ্যে রক্তই সবচেয়ে বয়স্ক, পরিণত।

তবু শেষ পরিণতি, বুঝি রক্তও নয়, সে কি তবে শুভ্র? শুভ্রতায় হয়ত পাই শুচিতাকে, কিন্তু শেষ কথা শুচিতাও নয়। একেবারে শুরুতেও সে ছিল না। আলোকে সব শুভ্র হয়, তবু সেই আলোকও অনাদি হতে পারে না, কখনও-না-কখনও সে সৃষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। তবে? আলোকেরও আগে কী, এই সন্ধানে রত হয়ে তখন অন্ধকারকে দেখি। নিরাকার, ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে হয় না, সে ছিল। আছে! থাকে। সব রঙ যখন মিলিয়ে যায়, শুভ্রতাও

যায় নিঃশেষে মুছে, তখনও কী থাকে? যা অন্ধকার, যা কালো। আদিতে যে, সে-ই অন্তেও। কেউ যখন নেই, কোনও রকমারি রঙ না, তখনও কালো অন্ধকার বলে "আমি আছি।" রজতগিরি-সন্নিভ শুভ্রতাকেও তাই অপরিমেয়, বিশাল অন্ধকারের পদতলে শয়ান দেখি!

কিন্তু মা, এসব কথা তো এখনকার। তখনকার আমাকে তো সেই কখন থেকে বুলাদের ছাদে বসিয়ে রেখে এসেছি। শ্বেতীগ্রস্ত সেই চন্দ্রাকান্ত জ্যোৎস্নার সন্ধ্যাটিকে, চলো যাই, ফিরে গিয়ে দেখি।

সুডৌল একটি বোতল নেড়ে নেড়ে বুলা বলছিল, "কী বল্ তো? তরল অনল—একটা পদ্যে পড়েছি। একটু চাখবি?" প্লেটে-রাখা পাঁঠার ভাজা কলিজা থেকে ধোঁয়া উঠে সেই প্রেতকায় মিহি জ্যোৎস্নায় মিশে যাচ্ছিল। নখ-তীক্ষ্ণ আঙুল দিয়ে একটি খণ্ড বিঁধে তুলে নিয়ে বুলা বলছিল, "কেমন যেন গা শিরশির করে। কল্‌জেগুলো হঠাৎ যদি নড়াচড়া করে ওঠে?"

অরিন্দম প্রজ্ঞাপারমিত কণ্ঠে বললেন, "মরা কল্‌জে কিনা বুলা! একে মরা, তায় ভাজা ভাজা তাই কখনও নড়াচড়া করে না।" তিনিও একটা পিস্ তুলে দাঁত বসালেন। বাঁশি একটা শুকনো মালা গলায় পরে ঘট হয়ে বসেছিল। তার চোখ ঢুলুঢুলু, তার মুখে কথা ছিল না।

আমার ঠোঁটে কষ, রস গড়িয়ে পড়েছিল আমার জামায়, আমিও কি ভাজা কল্‌জেগুলো একটার পর একটা তুলে মুখে পুরতে শুরু করে দিয়েছিলাম?

বুলা ওর আঁচলের একটা কোনা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার বুকে লাগা রস মুছে মুছে দিচ্ছিল, কখন একটা গ্লাসও সে ধরল আমার মুখের সামনে, "একটুখানি খেয়ে নে, দেখবি ঠোঁটের কষ ধুয়ে যাবে", আমি মুখ সরিয়ে নিলাম, বললাম, "বড্ড তেতো, তা ছাড়া ফেনা।"

"ফেনা? ও গোড়ায় একটু থাকে, পরে দেখবি সব ফেনা মরে

যায়, মানুষের মতো। এর নাম সাকুরা যে। একটু পরে দেখবি, ফুরিয়েও যায়। তখন দেখবি, এই ফরাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। যে ফুরলো সেই বোতল আর যারা ফুরিয়ে দিল সেই মানুষ—বোতল আর মানুষ ফরাশে একই সঙ্গে গড়াগড়ি যায়।"

বলছিল বুলা, আর পায়ের রঞ্জিত নখ অলক্ষ্যে আমার পায়ের পাতায় বিঁধিয়ে দিচ্ছিল। তার একটা হাত বাঁশির গলায় জড়ানো, একটা কনুইয়ের ভর সমাধিস্থপ্রায় অরিন্দমের উরুতে, তার মুখখানি ঈষৎ তোলা, যেন বোতলের কাছে যা পাবার সব আদায় করে বুলা এখন চাতকিনী, আকাশের কাছে বাকীটা প্রার্থনা করছে, হিম বা জ্যোৎস্না যাই হোক না কেন, ওর আলগা ছুটি ঠোঁটের ফাঁকে ঝরে পড়ুক।

ওর নখরাঘাতের যন্ত্রণা ভুলতে, মা, আমিও তখন, একটা গ্লাস তুলে মুখে ঠেকালাম।

কতক্ষণ, কতক্ষণ? এক-একটা সেকেণ্ড যেন এক-একটা পিপীলিকা, ধীর পায়ে উঠে আসছে আমার মজ্জা-মেরু বেয়ে; সেই এক-একটা সেকেণ্ডই আবার যেন এক-একটা বেগবান ঘোড়া হয়ে, টগবগ ক্ষুরের ঘায়ে আমার অস্থি-পঞ্জর সমেত সত্তাকে চূর্ণ-চূর্ণ করে গুঁড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আঙুল দিয়ে বুলা দেখিয়ে দিল—কত পরে?—অরিন্দমের নেত্র নিমীলিত। কানের কাছে মুখ এনে বলল, "শিবকে ত্রিনেত্র কেন বলে এবার বুঝেছিস? ওই ছাখ্, ওর চোখ উঠে গেছে কপালে।"

ইশারায় ওকে চুপ করতে বললাম, বুলা শুনল না, আরও কাছে ঘেঁষে এসে বলল, "ধ্যানাসনে যোগী কিছু শুনতে পাবে না। ও এখন এখানে থেকেও নেই। যেটুকু-বা আছে, একটু পরে তা-ও থাকবে না।"

সত্যিই একটু পরে অরিন্দম সেখানে আর ছিলেনও না। হাই তুললেন একবার, নিঃশব্দে, তুড়ি দিলেন, মানে দিতে চেষ্টা করলেন,

কিন্তু আঙুলে আঙুলে ঠেকে শব্দ হল না, বিপন্নের মতো তাকালেন এদিকে ওদিকে

(গ্যাখো, আমার সব গেছে এখন আর চকমকিও জ্বলে
না, অতএব দয়া করো আমাকে, ঘৃণা কোরো না),

শেষে, যত থেতলানো ফুল ছিল ছড়িয়ে, অন্তঃসারহীন যত বোতল আর চুষে-ফেলা সব, আর মরা কল্‌জের প্লেটগুলোর দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে তিনি অরিন্দম, দেখি, হঠাৎ নিরুদ্দেশ। ভোলানাথের মতো টলমল পদপাত—আঃ! চলে যাওয়ার এমন সুন্দর নিস্পৃহ রূপ জীবনে বেশী দেখিনি।

"বুলা", ফিসফিস করে বললাম, "উনি কোথায় গেলেন ?"

"ভয় নেই, বেশী দূরে নয়—নীচে। মার—তোর লীলা মাসির কাছে। এখানকার যা পাওয়া ওর শেষ হল, যতটুকু নিতে পারে ও নিয়ে নিল, এবার তাই চলে গেছে নীচে।"

"সেখানে কী হবে বুলা, কী হবে ?"

বুলা বলল, "কী আবার! বিশেষ কিছু হবে না, ওদের বয়সীরা বিশেষ কিছু পারেও না। বুড়োবুড়ি দু'জনাতে মনের সুখে—কী আর ?—মা ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেবে, সেই সুখটুকু পেতে পেতে ও আরামে ঘুমিয়ে পড়বে, এই পর্যন্ত।...আর মা, মানে তোর লীলা মাসি কী পাবে ভাবছিস ? পাবে, সে-ও পাবে। গায়ে পায়ে হাত বুলোনো, ওতেই ওর পাওয়া হয়ে গেল। সারা সন্ধ্যে ভাজাভুজি যা করেছে, খাটাখাটুনি-টুনি সব কিছুর দাম ওতেই হয়ে গেল।"

পর পর হাতের সব ক'টা আঙুল মটকে বুলা প্রথমে হাই তুলে আলস্যের ভঙ্গি করল, পরে তুড়ি দিয়ে সেই আলস্য কাটাল। বলল, "আমরা চারজন ছিলাম এখানে, এখন হলাম তিন। হারাধনের তিনটি ছেলে নাচে ধিনধিন।" হাওয়া উঠে রাতটা ক্রমশ উতলা হয়ে উঠছিল, আমার কপালে তবু ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। মুছে নিয়ে মনে

মনে বুঝি প্রার্থনা করতে থাকলাম, "ছড়ায় যাই লিখুক, তাই বলে, বুলা, তুমি যেন এখন ধিন ধিন নাচ শুরু করে দিও না।"

তখন, আমাকে চমৎকৃত এবং পরিবেশকে চকিত করে বুলা একটা তালি দিল। বলল, "আয় একটা মজা করি!"

মজা, আরও মজা? নিজে মজে গিয়েছি, তবু ঘোলাটে বোধ দিয়েই ভাবতে শুরু করেছি, আজকের সন্ধ্যার জন্যে, বুলা বাঁচিয়ে রেখেছে আরও কত মজা?

বাঁশি ঢুলছিল, শুকনো কতকগুলো পাতা কোথা থেকে উড়ে এসে ওর মাথার উপরে পড়ল, বুলা উঠে গিয়ে বাঁশির লম্বা লম্বা বাবরি চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে পাতাগুলো ঝেড়ে দিয়ে এল। বাঁশি তবু নড়ছিল না। বুলা কনুইয়ে মুখ রেখে একটা হাসি চাপার ভাব করল।—"দেখলি, ওর হুঁশ নেই। আরও একজন গেল।···রইল বাকী দুই। এবার তোতে আমাতে।"

বিবর্ণ মুখে বলে উঠলাম "কী, বুলা, কী।"

"একটা খেলা। খেলব আমরা দু'জনে। কেউ দেখবে না, টের পাবে না আয়।"

বুলার চোখের মণি সবুজ, কাচে ছোট্ট দুটি দুষ্টুমির গুলি হয়ে যেন জ্বলছিল। "আয়", দুটো মোটে অক্ষরের শব্দ, টেনে টেনে বুলা বলছিল, "আয়, খেলবি আ—য়।" আয় শব্দটা যেন কোন টুকটুকে পাখির মত হাওয়ায় ভর করে উড়ে উড়ে এসে আমাকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল।

উপর দিকে চেয়ে বললাম, আকাশের রঙ আর নীল নয়, পাঁশুটে, নীল নেই দেখে যেন ভয় পেলাম, তাই বললাম, "বুলা, এ কি সেই খেলা যা কিসমিসকে লুকিয়ে আমরা সেই পিকনিকের দিনে খেলেছিলাম?"

"সেই খেলা" আমার গালে টোকা দিয়ে বুলা বলল, "ঠিক বুঝেছিস।"

আকাশের চাঁদটার গায়ে তখন গুঁড়িগুঁড়ি পিঁপড়ে বসেছে, ছোপ ছোপ আলোর সঙ্গে মিশে গেছে ছোপ ছোপ অন্ধকার। রাতটার গায়ে যেন রোঁয়া উঠেছে। শেষ বোতলটা তখন খোলা হল, খুলল সেই—সেই চতুরিকা আর নিপুণিকা যে-নায়িকা সেখানে ছিল। খোলার চাবিটা হাতড়ে হাতড়েও পাওয়া যায় নি, তাই বুলা ছিপিটায় একবার দাঁত বসিয়ে দিয়ে টেনে খুলতে চেষ্টা করল, হল না, বরং ওর ঠোঁটের কোণ কী করে কেটে কষ-কষ রক্ত চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছিল, আমি দু'হাতে চোখ ঢেকেছি, বরাবরের আনাড়ি, তা ছাড়া ওই পটভূমিতে ম্রিয়মাণ বর্ণে অঙ্কিত আমি আর কী করতে পারি, ওরই ফাঁকে পিটপিটে চোখে দেখে নিয়েছি বুলা দমেনি, উঠে গেছে দরজার আড়ালে, আংটায় আটকে এক হ্যাঁচকা টানে বুঝি বোতলটাকে খুলেও ফেলেছে, সেই ছাদে বিবিধ নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল এই সব।

ফিরে এল বুলা, ঢকঢক করে ঢালল বোতলের ভিতরকার পদার্থ, একটা বড় গ্লাসে। আমি কী দেখছিলাম, বুলাকে, যে চুল, আঁচল সব আলগা করে দিয়ে তখন পা ছড়িয়ে বসেছে শীতলপাটিটাতে, বাঁশির কানের কাছে মুখ নিয়ে আর মুখের কাছে গ্লাস ধরে বলছে "খাবি আর একটু? খা।"

অথবা আমি কি দেখছিলাম বাঁশিকে যে-বাঁশি তখন তগ্দত, দারুভূত, অবিচল—অক্লেশে, নিঃশেষে যথা নিযুক্ত তথা চুমুকের পর চুমুক দিয়ে চলেছিল?

না, আসলে হয়তো আমি দেখছিলাম বোতলটাকে, যার তলা থেকে উঠে আসছে বুড়বুড়ি, যেমন বোবা অনেক কথা উঠে আসে মনের তলা থেকে, ক্রমাগত ওঠে কিন্তু ফোটে না, অবশেষে স্থির হয়ে থাকে!

তারপর? সেই খোলাখুলি খেলাটা শুরু করেছিল কতক্ষণ পরে? যত অকপটতারই না ভান করে থাকি এই চিঠিটাতে, মা, খেলাটার

সব কথা তোমাকে খোলাখুলি লেখা যায় না। কতগুলি নিয়ম সংস্কার আর শিক্ষা আমাদের কালের মানুষদের অনুসরণ করে এসেছে, আজও আমাদের সঙ্গে আছে। তাই শালীনতার সীমান্ত যদি বা লঙ্ঘন করি কখনো-সখনো, বেড়াটা গুঁড়িয়ে দিই না।

মানুষ, একটু আগে কী লিখলাম, মানুষ? আমি ওই প্রজাতির দাবীদার, কিন্তু এই দাবী কতটা সঙ্গত, আমি আজও জানি না। মানুষ নামধেয় জীবের কতটা মনুষ্যত্ব, পশুত্বও বা কতটা তার কোনও প্রামাণিক অনুপাত অদ্যাবধি নিরূপিত হয়নি। স্থান কাল বুঝে, বিশেষ-বিশেষ বয়সে আর পরিবেশে সেই অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কখনও কখনও আকৃতি ছাড়া মনুষ্যত্বকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ মাত্রেই প্রাণী, আর প্রাণী মাত্রেই মূলত পশু, এইটেই তখন শেষ সমীকরণের অঙ্ক বলে বোধ হয়।

বুলা কি ছলাকলা করছিল? বুলা কি হঠাৎ এক-একবার খিলখিল করে হেসে বলছিল—বলছিল যখন আমার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত, আমি আর আমাতে ছিলাম না—"এই! না, না, ঠোঁটে না। দেখছিস না আমার ঠোঁটে রক্ত?"

রক্ত আমি দেখিনি, দেখতে পাচ্ছিলাম না কেননা বুলার লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটও দেখেছি একই রকম টকটকে থাকে।

এইটুকু বলা যায়, বুলা মাঝে মাঝে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, কার্ণিসের উপর ঝুঁকে পড়ছিল উপুড় হয়ে, কখনও কাছে এসে, ঘন তপ্ত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে—নিঃশ্বাসেরও দাহ থাকে, তার ফুলকিতে আমার চোখে মুখে নাকে ফোসকা পড়ছিল। আমি তখন শুধু মাঝে মাঝে জান্তব কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিলাম।

একবার, বুলা যেই পালিয়ে যাবে, তখন কি খপ করে ওর আঁচল মুঠো করে ধরেছিলাম? আঁচলটা সামলে টেনে নিতে গিয়ে বুলা কি আরও খুলে গিয়েছিল, যদিও মুখে বলছিল "এই দুষ্টু, এসব কী,

এখন না," বলছিল "এত দূর না", আর আমি ভূতাবিষ্ট বলছি "না কেন বুলা, না কেন। এই খেলাটাই আমরা খেলব, একজন সঙ্গীকে মাতাল করে দিয়ে, তাকে মৃতবৎ জ্ঞান করে তার চোখের সামনে, অন্ধপ্রায় রজনীগন্ধাকেও ফাঁকি দিয়ে সেদিন যেমন—বুলা, সেই খেলারই তো আজ আর-এক রাউণ্ড, তাই না?"

রজনীগন্ধা। ওই একটি নামে হঠাৎ যেন স্থির হয়ে গেল বুলা, সেই বুলা, কাকে কখন কতটুকু দিতে হবে, কিসের বিনিময়ে কত, বড় হোটেলে হোটেলে যেমন ব্রেকফাস্ট পাঁচ টাকা, লাঞ্চ আট, ঘরভাড়া ইত্যাদির, বাঁধা হিসাব লেখা থাকে, সেই রকম একটা হিসাব মেপে রেখেছে যে-বুলা, সেই বুলা হঠাৎ যেন খাতাপত্তর বন্ধ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হিসহিস করে বলে উঠল, "সেই পেত্নীটা বুঝি নামেনি ঘাড় থেকে?"

"ছি বুলা, পেত্নী বোলো না। যে চলে গেছে, তাকে নিয়ে—"

আমার বুকে একটা আঙুল-রেখে বুলা বলল, "লাগছে বুঝি! আহা, কোথায় রে? এখানে?"

"বুলা, সে বড় দুঃখী।"

একটু সরে গিয়ে বুলা মণি স্থির করে তাকাল আমার চোখে চোখে।—"আর আমি? আমার বুঝি সবটাই সুখ?" তার চোখে তখন আর ফুর্তির লেশ ছিল না।

একটা উগ্র গন্ধে আমার গা গুলিয়ে যাচ্ছিল, সেই গন্ধ ওর চুলের, না চটকানো কিন্তু তখনও ওর গ্রীবামূলে সেঁটে-থাকা কোনও ফুলের, আমি বুঝতে পারছিলাম না। চৌকিদার চাঁদটা মাথার উপরে উঠে এসে তখন আরও লালচে হয়ে গিয়েছিল, তারই নীচের কোনও স্তরে হিম কিংবা কুয়াসা জমে জমে পৃথিবী তখন সত্যিই যেন ধূমাবতী।

শুকনো গলায় বললাম, "আমাকে এখন ছেড়ে দাও বুলা, আমি এখন যাব।"

"যাবি? যাবি বই কি, এখানে থেকে যেতে কে আর আসে।" এই পর্যন্ত বুলা বলেছিল স্বাভাবিক গলায়, দীর্ঘশ্বাস চাপার ধরনে, তার পরেই পলকে সে আবার তরল হয়ে গেল, আমার দুটো হাত মুঠো করে ধরে সে নিয়ে গেল তার কণ্ঠতটে, হাত দুটিকে এক লহমা সেখানে থাকতে দিয়েই দূরে ছুঁড়ে দিল, নিমেষে নিমেষে এইসব ঘটছিল, হঠাৎ দেখি বুলা ওর হাত বাড়িয়েছে আমার গলায়, কাঁধে নাক ঘষে ঘষে বলছে, "এই, আমাকে বিয়ে করবি?"

এই প্রলাপের উত্তর দিতে নেই আমি জানতাম। বুলা তখন আরও ঘন হয়ে আরও ঘন করে জ্বাল-দেওয়া গলায় বলল, "আমার সত্যিই খুব বিপদ—বিপদে পড়েছি। তুই কিন্তু মানিক ইচ্ছে করলে আমাকে উদ্ধার করতে পারিস।"

"কিসের বিপদ বলছ বুলা, বুঝতে পারছি না।"

"সত্যিই খুব বিপদ, মাইরি। এই তোকে ছুঁয়ে বলছি।"

"তুমি যদি থিয়েটারে কখনও না নামতে বুলা, তবে হয়ত বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তুমি প্লে-ও করো কিনা, তাই সব সময়ে ধরতে পারি না, কোন্‌টা অভিনয় তোমার, আর কোন্‌টা ঠিক বলছ। যাক, বলো না কী বিপদ।"

"বিপদ মেয়েদের তো একটাই হতে পারে," কেমন ঢঙে বুলা কথাটা যে বলল!—"বুঝলি না? বিয়ে না করিস, আমার উদ্ধারের উপায়টা অন্তত বাতলে দিতে তো পারিস?"

তবু চুপ করে আছি দেখে বুলা হঠাৎ যেন হিংস্র হয়ে গেল, একটা বিড়ালীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে, কাঁধে থাবা বসিয়ে, যেন মাংস খুবলে নেবে, সেইভাবে বসিয়ে, বলতে থাকল, "এখনও বলতে চাস যে বুঝিসনি? তিলে খচ্চর কোথাকার। তোর ওই কিসমিস নামে মেয়েটার তবে কী হয়েছিল? বলতে চাস তুই তাকে বিপদে ফেলিসনি? ফেলিসনি তো নেকী-খুকী মেয়েটা ডুব দিয়েছে কেন? তোর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, পুরো বদমায়েশি তোর পেটে

পেটে। বলতে চাস, তোর কিসমিসকে তোর দেওয়া কাঁটা থেকে মুক্ত হয়ে আসবার জন্যে ষড় করে পাঠাসনি ?"

"কী যা-তা বকছ," বলে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু বুলা দিল না, সাঁড়াশির মতো শক্ত করে ধরেছে আমাকে, আমি চেপটে যাব, বুলা পাগলের মতো শ্বাস ছাড়ছে, হা-হা করে বলছে, "জানিস তুই সব জানিস—এ-বিদ্যে তোদের ফ্যামিলিতে আছে। তোর মা নষ্ট করেছিল একটাকে, তুই নিজেই বলেছিস একদিন। বলিসনি ?"

এবার ওর হাত মুচড়ে মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পালা আমার। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে বুলা, মার-খাওয়া সাপের মতো ওর শরীরটা বেঁকে গেছে তবু থামছে না। ওর কণ্ঠ তখন যেন আর ওর বশে নেই, স্বরনালী একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, বুলা তখনও দম নিয়ে, ফুলে ফুলে বলছে, "তোর বাবা সন্দেহ করত, তোর মা তাই ওটাকে নষ্ট করেছিল। আমি জানি—"

বাকীটা ওকে আমি আর শেষ করতে দিইনি, শরীরে যত শক্তি ছিল সব সংহত করে ওকে আমি প্রচণ্ড একটা চড় মারলাম। লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে বুলা পড়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বেশ্যা! হারামজাদী!"

হ্যাঁ মা, আমি পুরুষ হয়েও একটি মেয়েকে মারলাম। আমি সংস্কৃতি-অভিমানী, আমি রুচিমান, তবু অনায়াসে "হারামজাদী" কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম। পায়ের কাছে পড়ে থাকা সাপিনীটাকে পা দিয়ে থেঁতলে দিতেও বুঝি তখন আমার আটকাত না।

কিন্তু বাঁশি গোলমালে কখন উঠে পড়েছিল, হঠাৎ চমকে দেখি সে আমাকে পিছন থেকে জামা ধরে টানছে।

বাঁশিই এক রকম টানতে টানতে আমাকে নীচে নিয়ে এল।

বাঁশি আমার পাশে, অন্ধকারে। ওদের বিরাট জুড়ি গাড়িটার ভিতরে আমরা বসে আছি। ঠক-ঠক, ঠক-ঠক—ঘোড়ার ক্ষুর ঘা দিয়ে দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় শব্দ তুলছে। টগবগ, টগবগ—ওই ঠক-ঠক আওয়াজটা চলার লয় যে-ই দ্রুততর, অমনই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ঠকঠক আর টগবগ—হয় হাতুড়ির শব্দ, নয়তো ভিতরে অনবরত কিছু ফুটতে থাকা, এ ছাড়া চারপাশে তখন প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না। রাত তখন খুব বেশী নয়, তবু শহরতলি তখনকার দিনে ওরই মধ্যে কেমন ঝিমিয়ে পড়ত।

বাঁশির মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফাঁকে ফাঁকে এক-একটা গ্যাসের বাতি ঝলসে যাচ্ছিল বটে, প্রেতবৎ পীত একটা উপস্থিতিকে প্রকট করে তুলছিল।

"স্টেজে আগুন ধরে গিয়েছিল, তাই না রে?" বাঁশি সহসা বলে উঠল, "আর তাই আমরা পালিয়ে এলাম?"

বাঁশির প্রথম বাক্যটি সাজানো ছিল জিজ্ঞাসার আকারে, কিন্তু উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করল না, পরবর্তী সংলাপ নিজেই বলে গেল—"পালিয়ে এল দু'জন অভিনেতা, তার মধ্যে একজন অবশ্য কাটা সৈনিক, যে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য দ্যাখো, কাটা সৈনিক যে, সেই কিনা জ্যান্ত নায়ককে টানতে টানতে নিয়ে এল।"

ভাবলেশহীন নিস্তর কণ্ঠস্বর বাঁশির, মা, আমি তখনও বুঝিনি, সেই সন্ধ্যার নাটকটা তখনও শেষ হয়নি, আরও একটু বাকী আছে। মঞ্চে আগুন লেগেছে, তাই ছোট্ট একটি দৃশ্য এখন অভিনীত হবে গাড়ির অভ্যন্তরে।

আমার গা ছমছম করছিল, যেহেতু একটা অপরাধবোধে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম।—"বাঁশি," আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "আমি তোমার প্রতি একটা অন্যায় করেছি।"

সেই স্বীকারোক্তিতে কান না দিয়ে বাঁশি বলে গেল "পালাটা কিন্তু বেশ জমেছিল। নেহাত স্টেজে আগুন ধরে গেল, তাই—"

বলতে গেলাম, "বাঁশি, তুমি জানো না—"

তেমনই নিরুত্তাপ স্বরে বাঁশি ধীরে ধীরে বলে গেল, "আমি সবই জানি।" ওর পাশে বসেই আধো অন্ধকারে টের পেলাম একটা ছোট্ট ধাতব বস্তু ও হাতে করে নাচাচ্ছিল।

"সবই জানো?" আমি যেন দীর্ণ হয়ে চীৎকার করে উঠলাম, "জানো যে, বুলা ইচ্ছে করে তোমাকে অত অত মদ গিলিয়েছিল, যাতে তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়ো, কিছু টের না পাও, তোমারই চোখের সামনে আমরা যাতে বিনে বাধায় মজা করতে পারি—"

আরও কত কী হয়তো অনর্গল বলে যেতাম, বাঁশি আবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "জানি। আমি বেহুঁশ হইনি তো, ঘুমিয়ে পড়িনি। সটান হয়ে পড়ে ছিলাম খালি। ভুলে যাও কেন যে আমিও একজন অভিনেতা, যদিও কাটা সৈনিক ছাড়া কোনও পার্ট পাইনি।" একটু থেমে সে বলল, "আমি সব দেখেছি, সব জানি।"

সেই ধাতব পদার্থটা তখনও সে হালকা হাতে লুফে লুফে ধরছিল। রাস্তার আলো এক-একবার উঁকি দিয়েই পিছিয়ে পড়ছে, বস্তুটাকে আমি চিনেও যেন চিনতে পারছিলাম না, ফলে অস্পষ্ট একটা ভয়ে অবশ হয়ে বললাম, "বাঁশি, ওটা কী?"

সে নিশ্চিন্ত, অলস গলায় বলল, "রিভলভার।"

তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বললাম, "বাঁশি, তুমি কি—" হাত ছাড়িয়ে সে বলল, "এ ছাড়া আমার উপায়ই বা কী? জীবনে যার কিচ্ছু হল না, হবেও না, গোটা দুনিয়া যাকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা করল, সবাই মিলে খালি ঠকাল, এমন কি আশ্রিত, রাস্তার যে-কুকুরটাকে তুলে এনে ঘরে ঠাঁই দিলাম, ঠকাল সে-ও—কোন্ সুখে সে বেঁচে থাকবে বলতে পার?"

ওর চরম আঘাতটাও গায়ে মাখার মতো মনের জোর তখন আমার ছিল না, আরও একবার ওর হাত চেপে বললাম, "বাঁশি, আমাকে ক্ষমা করো। আত্মঘাতী হতে তুমি পারবে না, কিছুতেই পারবে না।" মনের জোর ছিল না তাই গায়ের জোর খাটিয়ে আমি ওই ধাতব হাতিয়ারটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম।

আর তখনই বোমা-ফাটার মতো হাসি হেসে—বাঁশির গলায় এত যে জোরালো আওয়াজ আছে আমি জানতাম না—সে আমার কাঁধে থাবড়া মেরে বলে উঠল, "বিলকুল বুদ্ধু, তোকে কেমন ঘাবড়ে দিলাম? আরে, এটা সত্যিকারের জিনিস নাকি, দেখেও বুঝিসনি, এটা একটা খেলনা—থিয়েটারে যা দুমদাম ফাটে সেই টয় রিভলভার?" বলতে বলতে অকস্মাৎ সে আবার তার পরিচিত রুগ্ন বিষণ্ণতায় ফিরে এল। জড়িত গলায় তাকে বলতে শুনলাম, "সত্যিকারের জিনিস পাব কোথায়, পেলেও তাকে ব্যবহারের সাহস কি আমার হবে? জানিস, আমার অদৃষ্ট আমি পড়ে নিয়েছি—মিথ্যে একটা জীবনে বেঁচে আছি, কিন্তু সত্যিকার মরার সাধ্যও আমার হবে না।"

বলতে বলতে এবার বাঁশিই আমার হাত চেপে ধরল, "কিন্তু কী করব, কোথায় যাব বলতে পারিস? যুদ্ধটা জমে উঠেছে, মাঝে মাঝে ভাবি নাম লেখাব। তবে এই চেহারায় লড়াইতে তো আমাকে নেবে না, এমন-কি সিভিল গার্ডও করবে না। নিত্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি, তবু ওদের চোখে আমার মধ্যে সৈনিকের কোনও গুণ নেই। কখনও ভাবি, একটু-আধটু অ্যাকটিং তো জানি, তবে কেন 'এন্সা'-র দলে ভর্তি হই না! যাকে বলে ফৌজী দিলখুশ, নেচে গেয়ে যারা পলটনদের মন ভোলায়। কিন্তু সেই দলেই কি আমাকে নেবে? দেহচিহ্নে আমি যে আবার পুরুষ! সুতরাং রাস্তা একদম বন্ধ--" সে কৃত্রিম অথচ করুণ গলায় প্রবল বেগে বলে উঠল, তারপর হঠাৎ—"রোখকে, জেনানা হ্যায়!" বাঁশি নিজেকেই তাক-করা গলায় যেন গুলি ছুঁড়ল, ওদের বাড়ির বন্ধ ফটকের সামনে গাড়ি থেমেছিল, বাঁশি

রিভলভারটা লুকিয়ে ফেলল জামার তলায়, তার মুখে তখন আর সুখ-দুঃখের লেশমাত্র ছিল না।

মা, আমি আজও জানি না, ওই রিভলভারটা মিথ্যে ছিল, না সত্যি।

গাড়ি দাঁড়াতেই বাঁশি টলতে টলতে উপরে চলে গিয়েছিল। আমিও নেমেই টের পেলাম আমার পা-ও টলছে। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে, তাই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো ভয়ের ধস ভেঙে পড়েছে মাথার উপরে—ঠাণ্ডা, কঠিন, চাপ-চাপ ভয়, তারই কুচো-কুচো গুঁড়ো আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের ভিতরে, পথ কই, কোন্ দিকে যাব, নাকি ফিরব, কিন্তু ফেরার রাস্তাটাও খোলা পাব তো, তদুপরি কানের কাছে একটা ভোমরা, একটা নয়, দুটো ; দুটো নয় তো, তিন—না, না চারটে ; কে জানে ক'টা—আমি আর জানতে পারছি না, হে ঈশ্বর, রাতেও ভোমরা বেরিয়ে পড়ে, কই কোনদিন শুনিনি, ভোমরা, বোলতা, মৌমাছি এ-সবের গুঞ্জন, আক্রমণ ইত্যাদি তো জানতাম শুধু দিনে— তবে ? এত জোনাকিই বা ফুটছে কোথা থেকে, নাকি জোনাকি নয়, তারা—আকাশটা হঠাৎ মাটিতে ঝরে গেছে ? দূর দূর, প্রফুল্ল হতে চেষ্টা করে একবার ভাবলাম কিসের জোনাকি কিসের তারা, এ-সব তো সর্ষেফুল, তবু ভয় করছিল, এই নিশুতি-রাতে কে আমাকে একটা সর্ষেক্ষেতে নামিয়ে দিয়ে গেছে ? থই পাচ্ছিলাম না যেহেতু টলছিলাম, অথবা আমি নই, পায়ের নীচের মাটিই টলছিল। জোরে মাটিতে লাথি মেরে তাকে স্থির হতে বলতে কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। পড়ে গেলাম, কিংবা যাচ্ছিলাম, আর তখনই একটা হাত আমাকে চেপে ধরল। সেই হাতও কঠিন, ঠাণ্ডা, যেন বরফের মতোই।

আমার ভয়, আমার মৃত্যু, আমার ভক্তি, আমার প্রীতি, এই তো আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি তোমার, এবার কী বলবে বলো।

কী বলছ, স্পষ্ট করে বলো, অমন জড়ানো গলায় কথা বলছ কেন, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তুমি যখন জড়ানো গলায়-কথা বলো, মা, আমার কেমন কান্না পেয়ে যায়। সত্যি বলছি, ছেলেবেলায় খাওয়া তোমার বুকের সব দুধ যেন দই হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। টক-টক গন্ধ—বিশ্রী। তার চেয়ে তুমি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, শুনি। তোমার জপতপ, স্তব, মন্ত্র এক সময়ে পাশে বসে চুপ করে শুনতাম, হাতে দূর্বা নিয়ে, মনে আছে? সেই যে আমাদের ফেলে-আসা বাড়িতে, বাসী হয়ে যাওয়া দিনগুলোতে—বাসী, বাসী, বাসী, হোক না, তবু সেই বয়সের মতো আর কিছু না। তখন তুমি আর আমি, আর রোজ সকালে সুধীর মামা…

আরে, তোমার পাশে সুধীর মামাই দাঁড়ানো না? সুধীর মামা আবার কেন, ওকে চলে যেতে বলো। খালি 'তুমি আর আমি থাকি, আমার মৃত্যু আমার প্রীতি, মুখোমুখি। তুমি আর আমি আর তুমি'…

"কোথায় ছিলি, কোথায় গিয়েছিলি?" কে জিজ্ঞাসা করছে, জানতে চাইছি এ কার কণ্ঠস্বর। এই সুদূর জলপ্রপাতের মতো প্রবল অথচ গভীর, নিশ্চিত এবং তীব্র ধ্বনি সে পেল কোথা থেকে?

"কোথায় গিয়েছিলি?" সেই একই জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা না জেরা?—আবারও? সরো। কোথা থেকে আসছি, কী করে ফিরছি, তা বলা যায় না। সব কথা জানা উচিতও না, দুঃখ পাবে। সরো। পথ দাও। উপরে যাব। ফের যদি জেরা করো, তা হলে বলে দেব। দেব কিন্তু। যদি বলে দিই আজকের সন্ধ্যায় সব কাহিনী, আমার মনুষ্যত্বকে আমি বিকিয়ে দিয়ে এসেছি, বলি দিয়ে এসেছি আমার নিষ্পাপতাকে, সইতে পারবে? আমার আর কী, আমার তো সবে

শুরু, কিন্তু মা, তোমার সব যাবে। শেষ পিদিমটাকে ফুঁ দিয়ে নেবাতে নেই।

তা ছাড়া পাপ করে এসেছে যে, সে মরিয়া হয়ে গেছে, তাকে আর ঘাঁটাতে নেই। সে আরও পাপ করতে পারে। আসল খুন হল জীবনের প্রথমটা—বাকীগুলো সব পরম্পরা। নাও, এবার রাস্তা দাও, পথ ছাড়ো।

"আগে বল কোথা থেকে এলি। তুই নীচে নামছিস টের পেয়েছিলাম, যখন এ-বাড়ির ওই মেয়েটার সঙ্গে যাচ্ছেতাই মেলামেশা শুরু করলি। তারপর কত নীচে নেমেছিস আজ জানতে চাই আমি।"

"টের পেয়েছিলে?" টিটকারি দিয়ে বলে উঠলাম আমি।—"তবে মা, তখন কেন কিছু বলোনি?" একটু অবকাশ দিয়ে ফের বললাম, "আমি জানি কেন। তুমি দোটানায় পড়েছিলে।"

"কিসের দোটানা?"

"এক দিকে আমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছি, তোমার ভাল লাগত না। অন্য দিকে লোভ। মালিকদের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলে ভাব করছে, মন্দ কী। একেবারে কব্‌জা করতে পারে যদি, তা হলে তো তোফা—এ-বাড়ির হেড ঝি থেকে একেবারে শাশুড়ি! তুমিও লোভে পড়েছিলে মা, লোভে পড়ে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলে। আমি শুধু তার সুযোগ নিয়েছি।"

তুমি থরথর কাঁপছ, এইবার তুমি টলছ—কেন? তুমিও একটি মৃত্যু দেখছ নাকি, আমি কি সেই মুহূর্তে মরে গেলাম তোমার চোখে, তাই কাঁপছ, যেমন কাঁপছিলে দাদার মৃত্যুর দিনে, ছেলে আর ছেলে রইল না বলে? আর তাই সুধীর মামা তাঁর লাঠি ছাড়াই এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরেছেন তোমাকে, "আন্নু চুপ করো, চুপ করো, স্থির হও," ঠিক যেমনটি বলেছিলেন দাদার মৃত্যুর রাত্রিটিতে? ইতিহাস থেকে আমি পুরনো ছবিটাকে যেন উঠে আসতে দেখলাম।

তুমি সেই তেমনই পাগলের মতো মাথা নাড়ছ অবিরত, অস্ফুট গলায় বলছ "ছেড়ে দাও সুধীরদা, ছেড়ে দাও," কী শক্তি তোমার, আর অদ্ভুত ধৈর্য তখনও ধপ করে মাটিতে বসে পড়োনি, নিজেকে যেন আরও কঠিন করে বেঁধে একেবারে সরাসরি বলছ "তোর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, চোখ টকটকে, তোর মুখে গন্ধ। কিসের গন্ধ ?"

বেশ, তবে তৈরী হও। আড়াল তুমি যখন রাখলে না, তখন রাখব না আমিও। সঙ্কোচের পর্দা ফালাফালা করে ছিঁড়ব। এই ছাখো, টানটান হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমার সামনাসামনি, আমার বাঁকানো শিং দুটো, তেরিয়া আর মরিয়া—দেখতে পাচ্ছ না ? "কিসের গন্ধ," কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছি, "সাবালক ছেলের মুখে কিসের গন্ধ থাকে ? দুধের গন্ধ নয়, তোমাকে দিব্যি গেলে বলতে পারি।"

"তবে ?"

"এ গন্ধ তোমার তো একেবারে না-চেনা হবার কথা নয়, মা। বাবার মুখে কখনো পাওনি ?"—জোর দিয়ে বলে উঠলাম "অনেক দিন পেয়েছ।"

আর বেশী নেবার ক্ষমতা নেই তোমার, ফুরিয়ে আসছ, দেখতে পাচ্ছি। চোখ দুটি একবার প্রজ্বলন্ত হয়েই নিবে গেল, সে কী কারণে ? তোমাকে অপমান, না বাবাকে, কোন্‌টা বেশী বাজল ?

"যে চলে গেছে, তোকে আশীর্বাদ করতে করতে, তাকে তুই এত বড় আঘাত করলি ?"

কাপুরুষ আর পিশাচ, এই দ্বৈত কণ্ঠ নকল করে অনায়াসে বলেছি, "করলাম।"

তখনও যদি থেমে যেতে মা, বেঁচে যেতে। কিন্তু কত জন্মের পাপ তোমারও বুঝি জমা ছিল তাই প্রাপ্য শাস্তি পুরো করে নেবে বলেই মাথাটা আরও এগিয়ে দিলে। "চলে যা, চলে যা তুই, দূর হয়ে যা।

যে নরকে ছিলি, যেখানে গিয়েছিলি, আরও খারাপ সেই মেয়েটার ওখানে তো ? ফিরে যা।"

আর আমি, তৎক্ষণাৎ বললাম "যাব, যাবই তো। যার বাবা মদ খেতো, খারাপ পাড়ায় যেত—সেই নলিনীর কথা মনে নেই ?—সে আর কতদূর হবে, যাবে কোথায় ?"

"বললি, তুই বললি ?"

বিকৃত, তেতো গলায় বললাম, "তুমি যদি আর কিছু না বলো, মা, তাহলেই সব থেকে মানায়। নইলে কী বলতে কী বলে ফেলব—"

"বাকী রেখেছিস্ কী ?"

"অনেকখানি। এখনও বলিনি যে, বাবাকে আমি আঘাত দিয়েছি, বড় গলায় একথা বলা তোমার মুখে মানায় না। আঘাত আমি আর কতটুকু দিয়েছি ? তুমি দাওনি ? আরও বেশী দিয়েছ, তুমি আর উনি ছু'জনে মিলে—"

আঙুল তুলে স্থধীর মামাকে দেখিয়ে দিলাম।

ফ্যাকাশে গলায় বলেছ "আমরা ছু'জনে ?"

"নয় ?" যতটুকু বিষ ছিল তার সব ঢেলে দিয়ে তখনও বলছি "না হলে উনি এখনও এখানে আছেন কেন ! ছি, মা, ছি, ওঁকে চলে যেতে বলো। এত রাত্রে ভাল দেখায় না।"

তুমি যদি বুলাদের মতো হতে, সেইক্ষণে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে। কিন্তু তুমি নিথর হয়ে যাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছি। তাই তোমার হয়ে জবাব দিলেন স্থধীর মামা। শান্ত গলায় বললেন, "যাচ্ছি। তুমি এতক্ষণ আসোনি, আন্নু ভেবে ভেবে সারা, তাই অপেক্ষা করছিলাম।"

"আর ভাবতে হবে না। এবার যান।"

লাঠিটা পড়ে রইল, ছু'হাত বাড়িয়ে আর্ত, আহত, কোনও বৃদ্ধ পাখির মতো যেন ডানা মেলে, হাওয়া হাতড়ে হাতড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, এখনও দেখতে পাই।

কুয়াসার আস্তরের মধ্যে তাঁর দীর্ঘ শরীরটা মিলিয়ে যেতে তোমার দিকে ফিরে বললাম "আর কেন। এবার যেতে দাও। মানে মানে তুমিও যাও।"

মাথা নীচু করে, স্তিমিত, ধীর, নীচু, তুমি বললে "হ্যাঁ, এইবার যাব।"

মা, অতি নির্লজ্জ, তাই এখনও ডাকছি "মা", তারপরেও কিন্তু সকাল এল। সকালগুলো আসে, নেহাত অভ্যাসবশতই আসে। সকালের আর-একটা নাম কি প্রসন্নতা, স্নিগ্ধতা ? কই তেমন প্রত্যয় সর্বদা তো বোধ করি না। সব সকালই আমার কাছে যেন তেতো-তেতো, সারা মুখে তেতো স্বাদ জড়ানো, আবশ্যিক কয়েকটি প্রাতঃকৃত্য—কদর্য। পাখির রব ? আরে দূর! পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জাগি—এ সব একেবারে বানানো। আমরা প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু প্যাঁচার ডাক শুনতে শুনতে শুয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙে কাকের ডাকে। রাত্রিদিনের বৃত্তান্ত এই তো!

পরদিন সকালে—তুমি নেই। তুমি ছিলে না।

চমকে উঠে সুধীর মামা বললেন, "কই সে তো এখানে নেই। আসেনি। আয়, তুই ভেতরে আয়।" শান্ত কণ্ঠ, এতটুকু উত্তাপ, অভিমান বা অভিযোগ নেই।

"নেই ? এখানেও নেই ?" চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গোঙানির চেয়ে স্পষ্ট কোনও স্বর পরিস্ফুট হল না।

আর সুধীর মামা ? দেখতে পাচ্ছি তিনি কাছে এসেছেন, একটু নত হয়ে হাত রেখেছেন আমার পিঠে, বলছেন "পাগল, তুই কি ভেবেছিলি সে এখানে এসে উঠবে। না রে, তুই ভুল করেছিস,

আবার ভুল করছিস আনু এখানে কি আসবে ? কখনও আসেনি, আসবে না।”

কী বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন “আস্তে। ও-ঘরে ভামতী—” একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন “মানে, তোর মামী, অসুস্থ, ঘুমোচ্ছে। ওকে ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না।”

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সুধীর মামা বলে গেলেন ধীরে ধীরে, “তোকে কোনও দিন বলিনি, আজ বলতে বাধা নেই, তাই বলি। ওকে, মানে ভামতীকে নিয়ে ভুল বুঝেছে তোর মা-ও। আনু বলত, ‘তোমার কী সুধীরদা, তুমি তো সুখ, তৃপ্তি এই সব নিয়ে আছ। কিন্তু আমার কী আছে বলো তো। কিন্তু ছাখ, মানুষের কী যে আছে, কী থাকে, মানুষ নিজেই জানে না। যা আছে তা দেখতে না পেয়ে, আরও নেই কেন সেই নালিশ করে করে খালি হাহাকার করে। সুখ আর দুঃখ এই দুটোকে আলাদা ছকে বসিয়ে কষ্ট পায়। যেন দুঃখ হল শীত, আর সুখ হল লেপ, সেই লেপখানার নীচে ঢুকে যেতে চায়। কিন্তু লেপে তো শুধু চাপা পড়ে, কিন্তু শীত যায় কি ? শীতের হাত থেকে মুক্তি যদি চাস তবে ডুব দিস। একবার ডুব দিলে দেখবি শীত আর নেই।”

সুধীর মামা থামলেন। লজ্জিত মুখে বললেন, “কিন্তু এসব কী বকবক করছি। আনু কোথায় ?”

“মাকে কোথায় খুঁজব সুধীর মামা, কোথায় পাব ?”

“কোথায় পাবি জানি না, তবে খুঁজতে হবে।” সুধীর মামা গভীর প্রত্যাদেশের স্বরে বললেন।

মা, আজও যখন ভাবি, মনে হয়, কোনও মোহানায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি আর সুধীর মামা, আর তিনি প্রবল কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে, মন্ত্রপাঠের মতো একটার পর একটা কথা উচ্চারণ করে চলেছেন।

সেই মোহানা, যেখানে একটি সম্পর্কের সংহারকারী কৃতাঞ্জলিপুটে

দণ্ডায়মান। আশীর্বাদের মতো আশ্বাস ঝরে পড়ছে তার শিরে, "ভাবছিস কেন, ভাবিস না। সব মানবিক সম্পর্কই নদী কিংবা উপনদী, বিলীন হয় শেষ এক মহাসঙ্গমে। তাঁর সঙ্গে সেই সম্পর্কটা একবার স্থাপিত হয়ে গেলে দেখবি, পাপ-পুণ্য, অনুসন্ধান, সব অর্থহীন কিছু না।"

হঠাৎ চুপ করে সুধীর মামা বললেন, "তুই ভুল করেছিস, আনু ভুল করেছে, আমরা সবাই করি। জাগতিক সম্পর্ককে বড়ো করে দেখে। আমি ভুল করেছি সেদিন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে। ভোগের মধ্যেই আমি বাঁচার রসদ পেতে গিয়েছিলাম। আনু ভুল করেছে আমাকে সুখী ভেবে। কিন্তু কী সুখ পেয়েছি, দেখবি, একবার দেখবি ?"

সুধীর মামা ভিতরে ডেকে নিয়ে সেদিন দেখিয়েছিলেন। করুণ, কৃশ, শয্যালীন একটি মূর্তি—ভামতী। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে। আমাকে দেখল কি দেখল না, চিনল কি চিনল না, কিন্তু তার চোখে পলক পড়তে দেখিনি।

আবার বাইরে ডেকে নিয়ে এসে সুধীর মামা বললেন, "এই সুখ। এই ভামতী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এখন চোখে দেখতে পায় শুধু, আর কানে শুনতে পায়। ওকে আমি আগলে রেখেছি, কীভাবে জানিস ? ওকে সব উত্তেজনা থেকে বাঁচিয়ে রাখি। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে ও, অনেক অশুভ দেখেছে। নতুন করে আর কোনও অশুভ ওকে যেন দেখতে না হয়, কোন কষ্টের কাহিনী যেন আর না শোনে। তাই তো তোকে বাইরে ডেকে এনেছি। আমি যা পারি ওর জন্যে আজকাল তাই করি। শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু তো জানি না ; ওকে শুধু নামকীর্তন করে শোনাই।"

সুধীর মামা এর পর গুনগুন করে কয়েক কলি কীর্তনও গেয়েছিলেন কি না মনে নেই।

তিনি একবার বাবার কথাও তুলেছিলেন মনে আছে।—"তুই

কাল সবচেয়ে অন্যায় করেছিস প্রণববাবুকে নিয়ে। অথচ তিনি যে কী ছিলেন, তুই জানিস না। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর কিছু কিছু ডায়েরী দেখেছি। একটাতে কী ছিল জানিস? লিখেছেন, 'একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল, দেশকে স্বাধীন দেখিয়া যাইতে পারিলাম না, অথচ এই স্বাধীনতার জন্য একদিন সব উৎসর্গ করিয়াছি। আর একটা? ক্ষোভ নহে—তৃপ্তি। আমার পুত্র আমারই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আমাকে সে অতিক্রম করিবে, তাহার সূচনা দেখিয়াছি। পরম তৃপ্তিতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে আর তো আমার বাধা নাই, বাধা রহিল না।' এ-সব কথার তাৎপর্য কী, বুঝেছিস?"

আর্তস্বরে বলে উঠলাম, "আর পারছি না সুধীর মামা। একটি স্বেচ্ছামৃত্যু, আর-একটি জানি না কী। মা নিরুদ্দেশ, হয়তো বা আত্মঘাতী। কী করব, কোথায় যাব বলে দিন; নাকি সারা জীবনই এই দুইয়ের ভার বহন করে যেতে হবে?"

সুধীর মামা স্মিতমুখে বললেন, "আবার কী। ভার বয়ে যেতে হবে, স্বীকারোক্তিতে আর প্রায়শ্চিত্তে, রোজ শরীরকে রগড়ে রগড়ে মুছে সাফ থাকার মতো। ভার বইতে হবে, এই আমি যেমন বইছি, যদি না, যতদিন না, তাঁর উপরে সব ভার অর্পণ করে হালকা হতে পারি।"

[লেখকের উক্তি: সেই ব্যক্তিটি একেবারে গোড়ায় যার কথা আছে; তার ধারা বিবরণীর পাতাগুলো "সাজিয়ে দাও" বলে একদিন যে আমাকে আধি-ভৌতিক আদেশ দিয়েছে; এই কাহিনী উত্তম-পুরুষে যার জবানী, তাকে আমি আর দেখিনি। তার খসড়াটা পড়া শেষ হলে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার মাকে সত্যিই কি পাননি আর, খবর-টবর

কোনও-কিছু ? আজও কি জানেন না তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন ?"

ক্লিষ্ট স্বরে লোকটি বলল "ঠিক জানি না যে। কখনও মনে হয়, নেই, আর নেই। কোথাও —বাইরে কি ভিতরে—তাঁর অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাই না। কখনও আবার অনুভব করি, আছেন, প্রবলভাবে আছেন। যেন বড় করে মেলে-রাখা ছুটি চোখ রেখে গেছেন। একটু ইতস্তত করে সে বলল "সে-কথাও লেখা আছে, বাকী কয়েকটা পাতা পড়ে দেখুন।"

বলেই সে তিরোহিত হল, তাকে আর দেখিনি। সে মিলিয়ে গেছে অথবা মিশে আছে আমারই মধ্যে। আমি শুধু তার এলোমেলো বাকি পাতাগুলো সাজাচ্ছি।]

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ সব শেষে ॥

সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। কোথায় নয়, বলো! গঙ্গার ঘাটে ঘাটে কোথাও কি কোন চিহ্ন পড়ে আছে, পরিত্যক্ত পরিধেয়-র অংশ-টংশ কিছু? খবর নিয়েছি হাসপাতালে, এমন-কি মর্গে।

রেললাইনের ধারে ধারেও হেঁটেছি, যদি কোথাও রক্তের দাগ লেগে থাকে। সেই রেললাইন মা, যে-লাইন চলে গেছে আমাদের দেশে। দেশ, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের বাড়ি। কলকাতায় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, তুমি কতদিন আমাকে বলতে, "যাবি, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি?" নিয়ে যেতে পারিনি। তুমি কি এক দিন একাই তাই সেই পথ ধরেছিলে, আঘাতে, অভিমানে আর অপমানে, —কেন মা? হয়ত পৌঁছে গেছ। যদি দুর্দম কোনও লৌহরথ

তোমার বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়ে থাকে অতর্কিত কোনও ক্ষণে? পৌঁছে গেছ তবুও। যেখানে বাবা আছেন, দাদা আছে। সেখানে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেখানে আমিও আছি। আর দেরী নেই, মা, দেরী নেই, ছাড়াছাড়ির পর সকলের মিলন, এক স্বদেশে। তোমাকে নিয়ে যাইনি, কিন্তু আমরা সবাই যাব, সবাই সেখানে আছি।

মা, সেদিন বিজয়া গেল, আজ কোজাগরী। মধ্যযামেও জেগে জেগে এই "শ্রীচরণেষু"-র পাঠ শেষ করে দিচ্ছি। বিজয়ার রাত্রেও এই সময়ে পথে আর কোলাহল-কলরব নেই, শেষ প্রতিমাটিও বিসর্জিত। কিন্তু আর একটি প্রতিমা? কলম থামিয়ে ভাবলাম, তার কথা জানি না। বিজয়া—জানি না এই তিথি বিচ্ছেদ আর বিষাদের, না মিলনের। আমি শেষ বেহাগের সুরে মিলনেরই আবাহন করছি।

কবে আরম্ভ হয়েছিল আর সবে এই উদযাপন, মাঝখানে কতো মাস, বলো তো! শুরু হয় সেই শীতকালে আর এখন শরৎ শেষ হতে চলল, পদ্ম বা শিউলি কিছু আর অবশিষ্ট নেই, গভীর নীল অনচ্ছ একটা আবরণে ঢেকে ফেলছে নিজেকে। দশ মাস এই লেখার প্রয়াসকে আমি ধারণ করেছি।

থামিনি। কিন্তু কেন। সে কি এক স্নায়বিক ভীতি, যা পেয়ে বসেছিল আমাকে? এই লেখায় যেই ক্ষান্তি দেব, অমনই আমার মৃত্যু হবে? হোক না, যা অবধারিত তা নেমে আসুক, আমার আর ভয় নেই, অবশেষে এই তো আমি মুক্ত হতে পেরেছি।

এর মূল্য কী জানি না। কিছু নেই। আর অল্পকাল পরে আরও থাকবে না। জানি যে, সেই সময় আসছে যখন কোন-কিছু লেখাই দুষ্কর হবে। ভেবে দ্যাখো সেই সময়, তখনও কত মানুষ দলে দলে, কিন্তু তারা কারা? হৃদয় দিয়ে তারা কোনও হৃদি কি অনুভব করবে? কার কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, মৃতের অক্ষিতারা নিয়ে কে বাঁচছে,

কে দেখছে, কিছুই বোঝা যাবে না। সমান ইথর তরঙ্গে ছটি মানুষ কথা বলতে পারছে না, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। জীবনের সমস্ত অর্থ বিপর্যস্ত হবে। মৃত্যুই কি অটুট থাকবে তার সব অর্থ নিয়ে? মানুষ যখন জীবকোষ সৃষ্টি করতে পারছে, তখন মৃত্যুও যে ঠিক ঠিক মৃত্যু হবে না। পুনর্জন্ম প্রভৃতি সব বিশাল কল্পনার মাধুর্য লুপ্ত হবে।

তাই এই লেখা, তার আগে আগে। সমসময়কে অস্বীকার করে, কেননা তাকে বুঝি না। ভাবীকালের কোনও ভরসা না রেখে, কেননা তখন হয়তো শুকনো বিজ্ঞান বই কিছুই থাকবে না।

তাই লিখে গেছি। কী অদ্ভুত ধারণা জানো, মনে হত, এই লেখা যখন লিখছি, তখন যদি আয়নায় আমার ছায়া পড়ে, দেখব যা ছিলাম, তার চেয়ে বুঝি একটু সুন্দর হয়ে গেছি!

আসলে জানতাম না, এই লেখা শেষ না হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীচরণেষু পাঠটা এতই কি আবশ্যক ছিল, যার পাতায় পাতায় মায়ার সঙ্গে এত কালো কালো ছায়া, আত্ম-উন্মোচনের পর্বে পর্বে এত আত্মগ্লানি? যদি অসমাপ্ত থাকত? থাকতই বা।

প্রথমে তো প্রতিজ্ঞা ছিল, একটার পর একটা চিঠি লেখার—অনেক চিঠি অনেককে! অন্তিম উপকরণ এই ম্রিয়মাণ জীবনের। কেউ শেষ শ্বাস টানে অক্সিজেনের নলে, কেউ আসন্নের আতঙ্কে কম্পিত কণ্ঠে অবিরত মন্ত্রপাঠে, নামগানে আর কীর্তনে, কেউ বা তার লেখায়। লেখা আর লেখা—অন্তর্জলি-কালের অক্সিজেন।

তাই ভেবেছিলাম, অনেক চিঠি অনেককে। পাতার পর পাতা ভরে দেব দেদার ফরিয়াদে। অথচ শেষ পর্যন্ত সব চিঠি ঠেকল এসে একটিমাত্র চিঠিতে। শ্রীচরণেষু। কিন্তু এটাও শেষ না হলে কী হানি ছিল, যদি শেষ পত্রটি উৎসর্গ করে দিয়ে যেতাম তাঁকে—সেই একজনকে? তাঁকে লিখলে আর কাউকে লেখার দরকার হয় না। আমাকে তাঁর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার যে বড় দরকার তাঁকে!

এক খঞ্জকে যিনি একটু একটু হাঁটতে দিচ্ছেন, নির্বিবেক এক অবিশ্বাসীকে পৌঁছে দিচ্ছেন নির্বেদে তার এই শেষ নমস্কারে।

মা, আমি কিছুকাল আর তোমার ছবিটার দিকে চাইতে পারি না। চোখ নামিয়ে নিই। কোথায় যেন লাগে। ওই ছবি মস্ত করে আমিই বাঁধিয়েছিলাম। তুমি হারিয়ে যাবার বেশ কয়েক বছর পরে। ফিরে আসবে আশা যখন লুপ্ত, তখন বিধিমতো শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে। সেই বাসরে পুষ্পমাল্যে ছবিকে সাজিয়েছি, চর্চিত করেছি চন্দনে, তবু খোঁজা শেষ হল না তো!

যখন জানি দৈহিক, ঐহিক প্রভৃতি অর্থে তুমি মৃত, খুঁজছি তখনও। চোখ বুজে কখনও দেখি, রাত্রে কোনও রেলপথের ধারে নিঃসঙ্গ এক জননীমূর্তি, অভিমানিনী ; ক্রমাগত দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছেন, দূর থেকে দূরে। আবার গয়া-কাশী-পুষ্করের ভিড়ে, তীর্থে তীর্থে থমকে দাঁড়াই। কোনও সন্ন্যাসিনী কিংবা আশ্রমবাসিনী—আমার মা? অথবা রিক্ত, হাত প্রসারিত করে যে বসে আছে, সেই বা কে। আমার মা কি আজ এই ভিখারিনী? কী আশ্চর্য, মৃত্যুতে তুমি কি আরও জীবিত, পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছ স্তরে স্তরে? তাই কি আজ তোমাকে দেখতে চাই করুণা আর লাবণ্য দিয়ে গড়া অর্চিত দেবী প্রতিমায়, চিনতে চেষ্টা করি আকাশে চিরায়ত শুভ্র কোনও কোনও তারায়? কোন্‌টি তুমি?

জীবন থেকে মায়েরা হারিয়ে যায়, তাই নিয়ম, জানি, তবু সমস্ত জীবন সেই জন্যেই কি মা-র জন্য একটা শূন্যতা, একটা শোচনা, সতত একটা প্রয়োজনবোধ চেতনাকে আঘাত করে, এমন কি অবচেতনকে?

জিজ্ঞাসায় কাজ কী। বরং খুঁজে চলি। তোমাকেই কি? হয়ত না, একমাত্র তোমাকে না, তোমার সঙ্গে এক করে—তাঁকে। জীবনের যিনি মূল, আর মূলাধার যিনি, একসঙ্গে উভয়কে। সব স্তর পার হয়ে সবশেষে ওই একটা খোঁজাই বুঝি বাকী থাকে। মা, তাই না?

পাঠকরা কী বলেন ঃ

["দেশ" পত্রিকায় এই উপন্যাস গত বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, বিশেষ করে উপন্যাসটি শেষ হবার পর, লেখকের কাছে ওই রচনাটি সম্পর্কে পাঠকদের বহু চিঠি আসে। তার কিছু ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে। লেখকের ফাইল থেকে যেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সেই কয়েকটি চিঠির কিছু কিছু অংশ এখানে ছাপা হল।]

১.

"কিনু গোয়ালার গলি" (১৯৪৯-৫০) থেকে যাত্রা শুরু করে সন্তোষকুমার "শেষ নমস্কারে" উপনীত। বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা কালে এই মাইল—ফলকগুলি কোনও অনুসন্ধিৎসুরই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করিনা।

'শেষ নমস্কার' সম্বন্ধে, একজন পাঠিকা হিসেবে, কিছু বলবার আগে একটা তুলনা—অ্যানালজি বলাই বোধহয় ঠিক—টানতে চাই। একটি বিদেশী পত্রিকায় বহুদিন পূর্বে জনৈক সার্থক ব্যবসায়ীর একটা তীরের মত মন্তব্য পড়েছিলাম ; স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করছি (ভুল মার্জনীয়) : 'Every institution is a lengthened shadow of one single individual.' এই মন্তব্যটিরই ধুয়া ধরে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে, যদি এই বিশ্বাসে উপনীত হই যে, তাঁর অন্য উপন্যাসগুলি হোক বা না হোক, 'শেষ নমস্কার' সন্তোষকুমারের নিজেরই এক দীর্ঘায়িত ছায়া—তবে সেটা কি তাঁর প্রতি খুব অবিচার করা হবে ? কারণ এই উপন্যাসের শুরুর লাইনটি এই রকম : **তার প্রথম চিঠি 'শ্রীচরণেষু মা।'** কার প্রথম চিঠি ? কে সে ? জবাবটা একেবারে সবশেষে পাওয়া যায় ; যেখানে লেখক বলেছেন, **'...এই কাহিনী উত্তমপুরুষে যার জবানী, তাকে আমি আর**

দেখিনি।…সে মিলিয়ে গেছে অথবা মিশে আছে আমারই মধ্যে। আমি শুধু তার এলোমেলো বাকী পাতাগুলো সাজাচ্ছি।' এই 'সে', 'আমি' এবং লেখক স্বয়ং—একই অভেদের ডাইমেনশনাল ভ্যারিয়েশন কি-না, বা উপন্যাসের সঠিক রস আহরণের অজুহাতে অতবেশী জানতে চাওয়ার অধিকার পাঠকের আছে কি-না, জানিনা। তবে ভাবতে ভালই লাগে, এঁরা সবাই এক ও অভিন্ন এবং লেখকের এই দীর্ঘায়িত ছায়া একই কালে পাঠকবর্গের অনেকেরই রক্তের গভীরে প্রতিফলিত এবং, গভীরতর আর এক অর্থে এক সর্বব্যাপী সীমাহীনতা তথা সময়হীনতায় প্রসারিত।

মাতৃ অন্বেষণ এবং স্ব-অন্বেষণ এই উপন্যাসে শুধু একটা স্থূল জৈব আকুতি হিসেবে প্রতিভাত হলে কি পাঠকের মনে এই উপন্যাসের ছাপ এত গভীর ভাবে মুদ্রিত হতে পারত! বোধহয়, না। মাতৃ অন্বেষণের ভেতর দিয়ে এক দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই লেখককে বারে বারে অনুপ্রাণিত করেছে কথার মালা দিয়ে তর্পণের অর্ঘ সাজাতে।

সন্তোষকুমারের রচনারীতি—বিশেষতঃ তাঁর জটিল আঙ্গিক—সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের যে কোনই অভিযোগ নেই তা নয়। আছে এবং একটু প্রবল ভাবেই তা আছে। কিন্তু 'শেষ নমস্কারে'র ক্ষেত্রে তাঁর সেই জটিল আঙ্গিক কাহিনী-প্রবাহকে দুরন্তভাবে গতিময় করেছে। এই অপূর্ব আঙ্গিকের অববাহিকা একান্ত বিশ্বস্তভাবে তাঁর কাহিনীকে পরিণতির মোহানায় ঠেলে দিয়েছে। বহুপুরাতন ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে বর্ণিত কাহিনী যে গুচ্ছ গুচ্ছ পত্রে এত গতিসম্পন্ন হতে পারে—না পড়লে বিশ্বাস করা কঠিন—যদিও উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের জবানীতে কাহিনী বিধৃত করার বহু উদাহরণ বর্তমান।

আমার ধারণা 'শেষ নমস্কারে' সন্তোষকুমার একই সঙ্গে দুটি বিপরীতমুখী অথচ সমান্তরাল কালকে সার্থকভাবে জোড়বদ্ধ করবার

চেষ্টা করেছেন এবং সার্থকও হয়েছেন। এই উপন্যাসে এক অনন্ত সময়হীনতার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্ষুদ্রাবর্ত বর্তমানকে-প্রবাহিত হতে দেখতে পাই। নাবিক লেখকের ক্ষুদ্র নৌকো উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে মাতৃলোকের উদ্দেশ্যে যাতে আরোহী হিসেবে দেখি নায়কের ব্যর্থজীবন জনক প্রণববাবু (যার ব্যর্থ লেখক জীবনের ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে আত্মজের লেখক সত্তার উন্মেষ হল এবং যেটা তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে পারলেন) মাতৃবন্ধু সুধীর মামা এবং (প্রায়) দৃষ্টিহীনা রজনী; আর সেই নৌকোরই গা ঘেঁষে দ্রুত অপসৃয়মান তরঙ্গ মালায় কাগজের নৌকো বা ভাসমান শৈবাল দলের মত নায়কের চকিত বর্তমান—লীলামাসী, বুলা, অরিন্দম এবং বাঁশি। হয়ত একটু ভুল হল। বাঁশি যেন এক অনন্ত সময়হীনতা এবং ক্ষণপ্রভ বর্তমানের ফাঁদে আটকে যাওয়া এক হতভাগ্য ত্রিশঙ্কু; এবং সর্বোপরি 'মা' হলেন অন্তিম ধ্রুবতারা।

পরিশেষে, একটা বিষয়ের উল্লেখ না করলে আমার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এই আশঙ্কাতেই নিবেদন করছি—এই উপন্যাসে শব্দ চয়নের, বাক্যমালা গ্রন্থের এবং স্পষ্টবাদিতার যে অসাধারণ স্বাক্ষর সন্তোষকুমার রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা বলেই চিহ্নিত হবে—অন্তত আমি তা মনে করি।

শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়
গিরিডি

২.

"শেষ নমস্কার" শেষ করে সন্তোষকুমার ঘোষ দেশের পৃষ্ঠা থেকে আপাতত বিদায় নিলেন।..."দেশ" হাতে এলেই কি "শেষ নমস্কার" শেষ করে ফেলতাম? মোটেই তা নয়, বরং সব কিছু পড়া হয়ে গেলে—যেদিনটা বিষণ্ণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তীব্র বিরোধ চলছে সারা

মনের, সেইদিন গঙ্গায় ডুব দেবার মত এক শীতল ও পবিত্র স্পর্শের কামনা করে ডুব দিতাম ওই কয়েক পৃষ্ঠার প্রতিটি ছত্রে—তারপর কি শান্তি, কি শান্তি, সারাদিন ওই আবেশে আমি মগ্ন, রজনীগন্ধা আমার চারপাশে, বুলা যে-কোনো মুহূর্তে আমায় ডাকতে পারে, কানে আসতে পারে প্রণববাবুর নিভৃত আলাপ অথবা মা-র সুধাকণ্ঠ, সেদিন বুঝতে পারতাম না, "শেষ নমস্কার"-এর উত্তমপুরুষ ও আমি আলাদা কিনা।···

"শেষ নমস্কার" কৌস্তুভ, সন্তোষকুমার ঘোষ নির্লিপ্তভাবে সেই কৌস্তুভ তুলে নিলেন, বুলা-রজনীগন্ধা-সুধীর মামার জগতের উপর সমাপ্তি টেনে দিলেন।

এতদিন তো স্নান করেছি আপনার লেখায়, সন্তোষবাবু, ঋণে ডুবে আছি, প্রণামে কি তার শোধ হবে, তবু আপনার উদ্দেশে যে-অসংখ্য প্রণাম ও নমস্কার যাবে এই লেখার জন্য তাদের ভিড়ে আমিও প্রণাম করছি আপনাকে···।

অজিত মিশ্র

কলকাতা—১৪

৩.

···ইদানীং বাংলা উপন্যাস পড়ে এত আনন্দ পাইনি যা এখানে পেলাম। সন্তোষকুমার আমাদের জটিল কালের শিল্পী, তা এখানে প্রমাণিত হল। তাঁর অন্বিষ্ট জীবনের সত্য। তিনি ডিটেকশ্যনে নিপুণ—তা সরল জীবনের নয়, জটিল জীবনের।···"মুখের রেখা", "জল দাও", "ত্রিনয়ন", "স্বয়ংনায়ক", "শেষ নমস্কার" : সন্তোষকুমার একটি নিশ্চিত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।···

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪.

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের···"শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" উপন্যাসটি···তুঃসাহসিক স্বীকারোক্তিতে এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পারদর্শিতায়···প্রাণবন্ত আকার ধারণ করেছে।···সবচেয়ে ভাল লাগে পার্থিব কোন বস্তুকে নিয়ে লেখকের কল্পনাপ্রবণ, পরিণত, কাব্যিক মনের মনোরম আলোচনা।···বর্তমান সাহিত্যে এই লেখকের সঙ্গী পাওয়া নিতান্তই কঠিন। লেখক সঙ্গীহীনভাবে একাকী এই দুর্গম পথে পদচারণা করেন। তিনি নিজে জানেন, এ-পথে সাহিত্য সেবার পারিশ্রমিক নিতান্তই অল্প—তথাপি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইখানেই সন্তোষবাবুর কৃতিত্ব—এখানেই তিনি অতুলনীয়।

গৌতম বিশ্বাস

সাদার্ণ অ্যাভেনিউ, কলকাতা—২৯

৫.

···এই গ্রন্থে হৃদয়ানুভূতির গভীরতা, সত্য ভাষণের দৃঢ়তা ও সূক্ষ্ম সমীক্ষার ব্যঞ্জনা তুলনাহীন। মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক কালধর্মে কীভাবে রূপান্তরিত হয়, পরিশেষে ঘাত-প্রতিঘাতের অন্তর্দাহে তাকে পরিণত করে, তারই এক সুস্পষ্ট আলেখ্য দেখলাম।···লেখকের উপলব্ধির সূত্র অনুসরণ করেই বলি, দিনান্তের খেয়াশেষে নৌকো আবার পারঘাটায় এসে বাঁধা পড়ে—যেখানে রয়েছে তার নাড়ির যোগ।····

জগতে আমরা যা পাই তা হারাই—আর খুঁজি। এই খোঁজার বিরাম নেই, যতক্ষণ না খণ্ডাংশ যুক্ত হয় অখণ্ডের সঙ্গে। · এই এষা মানুষকে কোথাও থামতে দিল না।···

লেখক এই রচনার সংহতি রক্ষা করেছেন সিন্ধুতে বিন্দুর মিলনে। মূল আর মূলাধারের সমন্বয়ে। শেষ প্রশ্নের মীমাংসার তুলনা হয় না।

বসুধারা গুপ্তা

কলকাতা-৬১

৬.

"শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" খুবই আগ্রহের সঙ্গে পড়ে শেষ করলাম।…শেষের সংখ্যায় লেখক যেভাবে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তা পড়ে লেখকের প্রতি মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে। …আমার ভাললাগাটুকু নিয়ে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিমানবিহারী ঘোষ
বোলপুর

৭.

অবশেষে "শেষ নমস্কার" শেষ হল। সত্যি বলতে কী, আনন্দে, বিস্ময়ে, উপলব্ধিতে মুগ্ধ হয়েছি। …উপন্যাসের শেষে শিল্পের উত্তরণ ঘটেছে এক অতীন্দ্রিয়লোকে।…আশা রাখি, শক্তিমান লেখকের অপূর্ব, সুন্দর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে চিরকালের মানসভূমিতে গৃহীত হবে।

কমলা ঘোষ
জামশেদপুর

৮.

আপনার "শেষ নমস্কার" সম্পূর্ণ হল।

বিলম্বিতে, দ্রুতে ত্রিসপ্তকে অনায়াসগমনে, ক্বচিৎ বিবাদী স্বরের সুনিপুণ প্রয়োগে করুণ-গম্ভীর একটি সুন্দর রাগিণীর সার্থক রূপায়ণ যেন এইমাত্র সমাপন হল। এখন করতালিধ্বনি হবে কিছুক্ষণ, শ্রবণে মনে সুমধুর রেখাটুকু লেগে থাকবে অনেকক্ষণ, প্রশ্ন জাগবে প্রাণে—তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী!

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১৪

৯.

"শেষ নমস্কার···"-এর লেখককে অসংখ্য নমস্কার। ···এ কি উপন্যাস, না মা'র চরণে শ্রদ্ধাভক্তি আর স্বীকারোক্তির ডালি!···এক-একটা সময় আসে—নতুন অনুভূতির সন্ধিক্ষণ—যখন আমরা অচ্ছেদ্য সম্পর্ককেও যেন অস্বীকার করে বসি, লেখকের সঙ্গে তখন গলা মিলিয়ে বলতে চাই: "শুনে নাও, পৃথিবীর সব কালের মা শুনে নিক, আমি তোমার ছিলাম না, দুনিয়ার কোনও ছেলে বা মেয়ে থাকে না।" আবার বয়সের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত, যখন একা, তখন সেই একাকীত্বের অন্ধকার ভেদ করে মা'র মুখখানি ভেসে ওঠে। তখনই লেখক-বর্ণিত একটি চিরন্তন সত্য, "মায়েরা থাকে না, কিন্তু ফিরে আসে" উপলব্ধি করি।

প্রোজ্জ্বলবিকাশ দাস
কাকরা, মেদিনীপুর

১০.

সাল-তারিখের হিসেব না রেখেও স্মরণীয় হয়ে আছে মাঘের সেই শিশির-ভেজা সকাল···।···শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের "শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে"-র প্রথম চিঠি সেই অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস। তারপর প্রতি সপ্তাহের আকাঙ্ক্ষিত একটি ছেলের ভোরে তীর্থস্নানের মত অবগাহন করেছে মন-প্রাণ সেই স্বচ্ছসলিলা মুক্তধারায়। অবশেষে···"বরং খুঁজে চলি। তোমাকেই কি? হয়ত না, একমাত্র তোমাকে না, তোমার সঙ্গে এক করে—তাঁকে। সব স্তর পার হয়ে সব শেষে ওই একটা খোঁজাই বুঝি বাকী থাকে। মা, তাই না?"—এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন হৃদয়ে এঁকে দিয়ে শেষ হল "শেষ নমস্কার···"

…কথাশিল্পী শ্রীসন্তোষ ঘোষকে আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
উমা চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া।

১১.

সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা ইতিপূর্বেও অনেক পড়েছি। মাঝে মাঝে তাঁর লেখা খুব কঠিন মনে হত। সবটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। "শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মা-কে" 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কিস্তি পড়েই চমকে উঠেছিলাম। এতো সেই দুর্বোধ্য লেখা নয়—এযে এক চিরন্তন সৃষ্টির ইংগিত বহন করছে! তারপর দারুণ আগ্রহে একের পর এক সংখ্যা পড়েছি আর বিস্মিত হয়েছি। শেষের সংখ্যাখানা পড়ে বুকের ভেতরটা শুধু হাহাকার করে উঠেছে। নায়কের হাহাকার যেন পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। সুধীরমামার কাছে প্রণববাবুর ডাইরীর সংবাদ জেনে এবং মার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য শুনে মা-বাবার জন্য নায়কের বুকভরা বেদনা ও হাহাকার পাঠকের চোখ অশ্রুসিক্ত করেছে। গঙ্গার ঘাটে, হাসপাতালে, মর্গে রেলপথের ধারে, নানা তীর্থে, সন্ন্যাসিনী, আশ্রমবাসিনী এবং ভিখারিনীদের মাঝে মাকে খোঁজার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। মনে হয় আমরা প্রত্যেকে নিজেদের বাপ মায়ের কাছে এ জাতীয় অন্যায় কিছু না কিছু করেছি যার জন্য মাকে কেউ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি, কেউ বা খুঁজেই চলেছি, আবার কেউ এভাবে ভবিষ্যতেও খুঁজবে। মাকে খোঁজার এই Tradition সমানে চলবে নদীর স্রোতের মতো!

ভুপেন্দ্র চন্দ্র সরকার
৪২নং আনন্দনগর, লক্ষ্ণৌ-৫

১২.

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের "শেষ নমস্কার..." শেষ হল। অথচ মনে হচ্ছে, এর শেষ পেলাম না।...পড়তে পড়তে বার বার নিজেকে আমার অতীতের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। এই লেখাটি মা-কে নতুন করে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে শেখায়। এমন হৃদয়স্পর্শী লেখা অনেক দিন পরে পেলাম।

মা হারিয়ে গেলেন আর আমাদের দিয়ে গেলেন কিছু শিক্ষা। আর লেখক আমাদের, পাঠকদের, তাঁর কাছে ঋণী করে রাখলেন।

রঞ্জিত বসু

পুনা-১৯

১৩.

...পরম শ্রদ্ধায় লেখককে জানাই আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন। ...উপন্যাসের উপসংহারে মায়ের প্রতি অবিচারে ছেলের চোখে অনুতাপের অশ্রুজল জীবনের প্রতি ভালবাসাকে আবার যেন ফিরিয়ে আনে।

রমা বসু

কলকাতা-২৬

১৪.

"শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" লেখার জন্য শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে আন্তরিক ধন্যবাদ।......যতই পড়েছি ততই মনে হয়েছে এ-লেখা অনন্তকাল ধরে প্রকাশিত হোক। "দেশ" পত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি প্রতি সপ্তাহে...। তাই যখন "দেশ"

পত্রিকায় একদিন দেখলাম "শেষ নমস্কার" আগামী সংখ্যায় সমাপ্য' তখন এক অব্যক্ত বেদনায় মন ভরে উঠেছে। মনে হয়েছে, একান্ত পরিচিত একজন যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

পার্থপ্রতিম বসু

নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা

১৫.

"শেষ নমস্কার" শেষ করেছি। ··কী অভিভূত হয়ে যে উপন্যাসটি পড়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী —সবদিক দিয়েই "শেষ নমস্কার" বাংলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।···

শুধু আমার যেন মনে হল, লেখকের আরও কিছু বক্তব্য, কিছু উপলব্ধির প্রকাশ বাকী থেকে গিয়েছে। মনে হল, সমাপ্তিটা যেন একটু দ্রুত···। এই অনুভূতি কতটা সত্য জানি না। তবু পাঠক হিসাবে যা মনে হয়েছে তা জানালাম।

শিপ্রা লাহিড়ী

কলকাতা-১৪

১৬.

সন্তোষকুমার ঘোষের "শেষ নমস্কার" বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল। ···কখনও মনে হয়নি, গল্প পড়ছি; মনে হয়েছে, স্মৃতিচারণ করছি নিজেরই সঙ্গে অজ্ঞাতে, নির্জনে। মার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আবেগ আবার তারুণ্যের আগমনে সবকিছু অগ্রাহ্য করার বাসনা সুন্দর ফুটে উঠেছে। শেষাংশ সুন্দরতর। ···শেষ

পর্যায়ে মা'র অন্বেষণে প্রবৃত্ত লেখক উপলব্ধি করলেন মা'র স্মৃতিতে তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়।

অপূর্বকান্তি সাহা
ব্যারাকপুর

১৭.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

...প্রকাশিত অন্যান্য রচনার মধ্যে আপনার রচনা গুরুভার এবং সাধারণের পক্ষে খানিকটা দুষ্পাচ্যও বটে। এই জন্যই হয়তো আপনি নির্জন। আমি কিন্তু আপনার স্বেচ্ছা-নির্বাসন ছেড়ে আপনাকে জনারণ্যে আসতে বলছি না। তা হলে পাঠক শহরের একঘেয়েমি ছেড়ে দ্বীপান্তরে এসে মুখ বদল করবে কী করে!

..."শেষ নমস্কার..."এর আত্ম বিশ্লেষণ প্রয়াসে আপনি অনন্য। ...সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি আপনার প্রকাশের মধ্যে আমার ভাবনার প্রতিফলনে, আমার অনুভূতির সঙ্গে আপনার অনুভূতির সাম্যে এবং সেই তুলাদণ্ডের ওজনেই বুঝতে পারছি, লেখক হিসেবে আপনার হৃদয় কত খাঁটি, কলম কতটা বিশ্বস্ত। ...আপনার উপন্যাসের "আমি"র সঙ্গে আমারও এক স্বরে বলতে ইচ্ছা করে, "...আমার লেখা কোনও চঞ্চলা রমণীর মত, যতটা আমার প্রতি বিশ্বস্ত, অবিশ্বস্ত ততটাই, ছেড়ে যায়, আবার ফিরে ফিরে আছড়ে পড়ে আমাকে মারে, মেরে বাঁচায়।"

নমস্কার জানবেন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১২